মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য

মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য

(১৭৫৭-১৯১৮)

— পরিবেশক —

পুস্তক বিপণী

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা -৯

Muslim-Manas O Bangla Sahitya
[The Mind of the Muslims and Bengali Literature, 1757-1918]

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০০

প্রকাশক :
শ্রী বীরেন্দ্রমোহন গুহ
নূতনপল্লী, বালিয়া, গড়িয়া।
কলিকাতা-৮৪

মুদ্রক :
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট,
কলকাতা-১৬

প্রচ্ছদ : কৌশিক ভট্টাচার্য

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্যে অনুমোদিত গবেষণাগ্রন্থ 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হল। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০। এর মধ্যে এক বছর বাঙলা একাডেমীর গবেষকরূপে এবং মাস কয়েক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষকরূপে কাজ করেছি। আমাকে এই সুযোগদানের জন্যে বাঙলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং আমার গবেষণা-নির্দেশক অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কাছ থেকে যে উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করেছি, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থরচনায় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে পূর্ববঙ্গে পাটচাষের প্রসার ও কলকাতার খানসামাদের দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক আমাকে অবহিত করেন। মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে কোন কোন মন্তব্য সংশোধন করেছি অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার ফলে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ ও জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতামত থেকেও উপকৃত হয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ম লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। বৃটিশ মিউজিয়ম এবং ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের মাইক্রোফিল্ম কপি আনাবার ব্যবস্থা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক খান আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

নানাভাবে আরো অনেকে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে জনাব এনায়েত করিম, পি. এফ. এস. ও তাঁর পত্নী বেগম হোসনা করিমের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

বইটি অনেক আগেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মুনীর চৌধরীর আগ্রহে লেখক সংঘ প্রকাশনী এর প্রকাশভার নিলেন। অত্যন্ত দ্রুত সময়ে এর মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হতে পারল পরিবেশক ও মুদ্রকের আনুকূল্যে। সেজন্যে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও রয়ে গেল।

মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যাধিক্যবশত: সেসবের থেকে উদ্ধৃতি-গ্রহণের জন্যে অনুমতি নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবে যথাস্থানে প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য নির্দেশ করেছি। এই সুযোগে এসব বইয়ের লেখক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর মার্জনা ভিক্ষা করি।

পুস্তকাকারে প্রকাশকালে তথ্যনির্দেশে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছি নিয়মভঙ্গ করে। আশা করি, পণ্ডিতজনেরা ক্ষমা করবেন।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১ অক্টোবর ১৯৬৪

আনিসুজ্জামান

নিবেদন

'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকায়, সাত বছর আগে। এতদিন পরে তার পুনর্মুদ্রণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে স্বভাবতই কুণ্ঠাবোধ করছি। বর্ণিত যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য ও গ্রন্থ গত কয়েক বছরে আত্মপ্রকাশ করেছে। উনিশ শতকের মুসলমান লেখকদের আরো কিছু রচনার সন্ধানও পেয়েছি। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের আশা করেছিলাম। তা হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় পুনর্মুদ্রণের সময়েও তা হয়ে উঠল না ; আশা করি তার কারণ পাঠকেরা অনুমান করতে পারবেন।

আমার অনুরোধে শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বর্তমান মুদ্রণের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুক্তধারা-কর্তৃপক্ষ বইটির পুনর্মুদ্রণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধু প্রণবরঞ্জন রায় বইটি তাঁকে সংগ্রহ করে দেন। নির্ঘণ্ট তৈরির কষ্টস্বীকার করেন কল্যাণীয় বিপ্রদাস বড়ুয়া। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আর অজ্ঞতাপ্রসূত ও মুদ্রণজনিত প্রমাদের জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আনিসুজ্জামান

কলকাতা
১৭ অক্টোবর, ১৯৭১

ভূমিকা

এক সময় পূর্ব বাংলার ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইতিহাস বিভাগ থেকে ডক্টরেট্-ডিগ্রির জন্যে রচিত কোনো কোনো গবেষণা-গ্রন্থ আমার কাছে আসতো পরীক্ষা করে তার উপর প্রতিবেদন পাঠাবার জন্যে। সীমানার ওপারে পূর্ব বাংলায় তরুণ লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শ্রম ও নিষ্ঠার, বুদ্ধি ও বোধের, কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কী অর্থগর্ভ বিবর্তন, কী বৈপ্লবিক উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে, এইসব গবেষণা-গ্রন্থের মাধ্যমে তার কিছু কিছু আভাস পেতাম। স্পষ্টতর আভাস পাওয়া যেতো তাঁদের কণ্ঠের গানে, রচিত গল্প ও কবিতায়, প্রমাণ পাওয়া যেতো তাঁদের নানা অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানান্বেষণের বিচিত্র উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে। দশ-বারো বৎসর আগেই বুঝতে পারছিলাম, পূর্ব বাংলায়—আমার জন্মভূমিতে—সমাজ-জীবনে এক নবজন্মের সূচনা হচ্ছে।

দেখতে দেখতে, দু'দিন যেতে না যেতেই নবজাতকের অস্তিত্ব-ঘোষণা শোনা গেল, আমি এসেছি, আমি উপজাত হয়েছি, আমার স্বীকৃতি চাই এই পৃথিবীর মুক্ত উদার আলোয় বাতাসে। আজ সানন্দে বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছি তার এই ঘোষণার সর্বতোভদ্র রূপ।

দশ-এগারো বছর আগে আনিসুজ্জামানের এই গবেষণা-গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এসেছিল পরীক্ষা ও প্রতিবেদনের জন্যে। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তরুণ গবেষকের শ্রম, নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসায়, তাঁর তথ্য-সংগ্রহের শৃঙ্খলায়, তাঁর তথ্যনির্ভর যুক্তিতে, সর্বোপরি তাঁর স্বচ্ছ মুক্তবুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্যে আমি সাতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থটি আমার সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল, এবং আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্-উপাধি লাভ করেছিলেন।

বছর পাঁচ-ছয় আগে পাণ্ডুলিপিটি ঢাকা থেকে মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলায় গ্রন্থটির প্রচার ও সমাদরও হয় যথেষ্ট। কিন্তু, সীমানার এপারে, পশ্চিম বাংলায়, বইখানা দেখবার সুযোগও আমাদের হয়নি, রাষ্ট্রবিধানের এমনই পরিহাস!

এ-পরিহাস কত নিষ্ঠুর, নির্মম, বর্বর ও অমানুষিক হতে পারে আজ পূর্ব বাংলায় আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। ছ'মাস ধরে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা যে মারণযজ্ঞের আগুন জ্বালিয়েছেন লক্ষ লক্ষ জীবন তাতে নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়েছে, আরো কত পুড়বে কারো জানা নেই। সেই আগুনের দহনশিখার তাড়নায় লক্ষ লক্ষ সর্বস্বরিক্ত মানুষ সীমানার এপারে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন। আনিসুজ্জামান সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন। এঁরা বাঁচতে চান, নিজ বাসভূমে ফিরে গিয়ে নিজেদের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যে সগৌরবে বাঁচতে চান। আনিসুজ্জামান এই বাঁচার সংগ্রামে একজন অংশীদার।

ইতিমধ্যে, সীমানার এপারের বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে আনিসুজ্জামান রাজি হয়েছেন তাঁর গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রচারে। আমাকে তিনি অনুরোধ করেছেন এই নতুন সংস্করণটির একটি পরিচয়পত্র লিখে দেবার জন্যে। বইটি তার নিজের পরিচয় নিজেই বহন করছে এবং যিনি এই বই লিখেছেন, তাঁরও। কাজেই পরিচয়পত্র লিখবার কিছু প্রয়োজন আছে, মনে হয় না। মুক্তিসংগ্রামরত বুদ্ধিজীবীর জ্ঞানান্বেষণের এই প্রয়াস বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের দুয়ারে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে, আমার এই আশা ও প্রার্থনা।

ঠিক এই সংকট-মুহূর্তে এই বইটির পুনঃপ্রকাশ গভীর অর্থবহ। সে-অর্থ আমাদের মর্যাদালাভ করবে, এই আমার গভীর বিশ্বাস।

নয়াদিল্লী
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নীহাররঞ্জন রায়

চতুর্থ মুদ্রণের ভূমিকা

'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে, পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শরণার্থী হয়ে যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুক্তধারা এটি পুনর্মুদ্রণ করেন সেখানে। তাঁরাই ১৯৮৩ সালে এর আরো একটি মুদ্রণ করেন ঢাকায়। এখন প্রতিভাসের আনুকুল্যে এটি আবার কলকাতায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

যে-বই এতকাল আগে লেখা, সেটি যে বিনা সংশোধন ও পরিবর্তনে প্রচারিত হচ্ছে, তার কারণ আছে। আমার আলোচ্য কালের বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে গত ৩৫ বছরে এত বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এত লেখকের রচনাবলি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এবং অনেকের এত অজ্ঞাতপূর্ব রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে যে, তার সাহায্য নিতে হলে বইটি নতুন করে লিখতে হতো। তাহলে তার আদিরূপ আর রক্ষিত হয়না। অথচ, আমার মনে হয়, একটা বিশেষ স্থানকালের রচনা হিসেবে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে এদেশের সাহিত্য-গবেষণায় এর কিছু প্রভাবও পড়েছে। সেদিক দিয়েও মূল পাঠ অবিকৃত রাখা সংগত।

এ বই যে আমি লিখেছিলাম, বা এই বিষয়ে গবেষণায় যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তারও একটি সুদীর্ঘ পটভূমি আছে। আমার জন্ম কলকাতায়, এখানেই থেকেছি পার্ক সার্কাসে। রশীদ আলী দিবসে স্কুলের ক্লাস বর্জন করে সভায়-মিছিলে যোগ দিই। এখানেই ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখি: আমার চোখের সামনে আমাদের অবাঙালী গোয়ালা আর অজ্ঞাতপরিচয় একজন যুবক খুন হয়ে গেল—প্রবীণেরা চেষ্টা করেও গোয়ালাকে বাঁচাতে পারলেন না। অভিনেতা ছবি বিশ্বাসসহ আমাদেব হিন্দু প্রতিবেশীরা পুলিশের সাহায্যে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে, আমাদের অনেক আত্মীয় হিন্দুপ্রধান এলাকা থেকে একইভাবে আমাদের এলাকায় এসে পৌঁছোলেন। শিখদের তখন গণ্য করা হতো হিন্দুর জঙ্গি অংশ হিসেবে। গুজব রটলো, শিখেরা পার্ক সার্কাস আক্রমণ করতে আসছে। আমাদের সকলের বাড়ির ছাদে ইট-পাটকেল আর সোডা ওয়াটারের বোতল জড়ো করা হলো ওই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে। শিখেরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে নি, তবে পরবর্তী দু-বছর যখনই ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি, তখনই জ্বরের ঘোরে দেখতাম, শিখ আসছে। বিহার রিলিফ ফান্ডের জন্যে টাকা তুলে আমি মুকুল ফৌজ থেকে পুরস্কৃত হলাম এবং আমার আবক্ষ প্রতিকৃতিসহ সেই সুকৃতির সংবাদ দৈনিক 'আজাদে' প্রকাশিত হলো।

আমাদের পরিবারের সকলেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্গবিভাগ হতে যাচ্ছে, তা জেনে তাঁরা মুষড়ে পড়লেন। বঙ্গবিভাগের জন্যে তাঁরা দায়ী করলেন মূলত হিন্দুর একগুঁয়েমিকে। আমার বাপমায়ের

পৈতৃক বাস চব্বিশ পরগনা ভারতভুক্ত হওয়ায় বাউন্ডারি কমিশনে 'আমাদের' দিকটা ঠিকমতো তুলে না ধরার দোষ দিলেন মুসলিম লীগকে। আমার আব্বার বয়স তখন ৫০ বছর, জীবনের অধিকাংশ তিনি কাটিয়েছিলেন কলকাতায়–তাঁর নিজের শহরের মায়া ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসতে তাঁর মন সরছিল না। তার ওপর, পদ্মার ওপারে বসবাসের চিন্তা তাঁর কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। আমার মা কিন্তু বারবার বলতে থাকলেন যে, তাঁদের দুই ছেলের ভবিষ্যৎ যদি থাকে, তবে তা পাকিস্তানেই আছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে–আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি–আমরা কলকাতার পাট চুকিয়ে খুলনায় চলে এলাম। খুলনায়, কারণ জায়গাটা কলকাতার কাছে, সেখানে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, আর পাকিস্তান যদি না টেকে, তাহলে কলকাতায় ফিরে যাওয়া সেখান থেকে সহজ হবে। আমার দুই পিতৃব্যের মনে কিন্তু গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা একবারও মনে হয় নি।

১৯৪৮এর ডিসেম্বরে আমরা চলে এলাম ঢাকায়–পরে এটাই পরিণত হয় আমার শহরে। ১৯৫০ সালে সীমান্তের দু-দিকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গেল। বোঝা গেল যে, দেশভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে নি। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি–তখন মনে আরো কিছু প্রশ্ন জাগলো। বাংলা সাহিত্য আমার প্রিয় বিষয় বলে তাতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ছায়াপাতটা অনুসন্ধানের একটা তাগাদা অনুভব করলাম। আমি জানতাম যে, বাঙালি মুসলমানের মনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে প্রবল ক্ষোভ আছে। অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' পড়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই "আনন্দমঠ ও বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। কিছুকাল পরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র হয়ে যখন সবে ঢুকেছি, আমাদের এক সাহিত্য-সংগঠনের বিশেষ অধিবেশনে সেটা পড়েও ফেললাম। আমার প্রবন্ধ শুনে লোকসাহিত্যবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, সভাস্থলেই তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আর কালবিলম্ব না করে আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা কর্তব্য।

এরপর অন্যদিকটা যাচাই করার লক্ষ্যে "বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি" নাম দিয়ে একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখি। সেটা পড়ে আমার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই আমাকে এম এ পাশ করে গবেষণা করতে পরামর্শ দেন। এভাবেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯৪৭)' বিষয়ে গবেষণা করি। পরে আলোচ্য সময়সীমাটা কমিয়ে ১৯৪৭এর বদলে ১৯১৮ করা হয়। ইচ্ছে করলে, আরম্ভের সময়টাও সঙ্কুচিত করে ১৮৭০ করতে পারতাম। তা যে করিনি, তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। পাকিস্তান-আন্দোলনের সময়ে এবং তার পরেও–অর্থাৎ ১৯৪০ ও ১৯৫০এর দশকে–দ্বিজাতিতত্ত্বের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাতারা বারবার বলতেন যে, 'পুথি সাহিত্য'ই (মুসলমানি বাংলা রচনা, বটতলার পুঁথি বা দোভাষী পুঁথি বলেও তা পরিচিত) আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উৎস। এই পুঁথি-সাহিত্যের মাহাত্ম্যটা যে কী, আমি তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম।

'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' প্রকাশের পর তেত্রিশ বছর অতিবাহিত হলো। এই সময়ের মধ্যে আমার চিন্তাভাবনার যে কোনো পরিবর্তন হয় নি, তা নয়। বাংলার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রচলিত পর্ববিভাগ মেনে নিয়ে এ বইতে আমি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের কথা বলেছি। পরে এই বিভাজন নিয়ে আমিই প্রশ্ন তুলেছি। আমার মনে হয় ইতিহাসের ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিন যুগের এই ভাগটা করা হয়েছিল। ইংরেজ আমলে একটা নতুন ও সুদূরপ্রসারী জাগরণের উল্লেখ আমার বইতে আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা বলা নেই যে, ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় সর্বত্রই এ-ধরনের জাগরণের বড়রকম সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়। এই জাগরণের ফলে সমৃদ্ধ সাহিত্যের বিকাশের কথা বলেছি ; তার সঙ্গে একথাটাও বলতে পারতাম যে, সে-সাহিত্য প্রধানত ইংরেজিশিক্ষিত পাঠকের জন্যে মূলত ইংরেজি শিক্ষিত লেখকের সৃষ্টি।

রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনায়ও অনুরূপ বিচ্যুতি আছে। খিলাফত আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন এবং অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানের ব্যাপক অংশগ্রহণকে আমি নবযুগের সূচনা হিসেবে দেখেছিলাম। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন যে রাজনীতি ও ধর্মকে আগের চেয়ে বেশি কাছাকাছি নিয়ে এলো, একথাটা একেবারেই বলা হয় নি।

এরকম অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই বইয়ের মূল সিদ্ধান্তগুলো এখনো আমার কাছে যথার্থ বলে মনে হয়। কেবল সেই কারণেই বইটি পুনর্মুদ্রণ করতে ভরসা পেলাম। এ-বিষয়ে 'প্রতিভাসে'র উদ্‌যোগের জন্যে বীজেশ সাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সূচিপত্র

সংকেত-সূচি

আঃ	আনুমানিক
টী	পাদটীকা
তা. বি.	তারিখবিহীন
ব. মু. সা. প.	বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা
র. সা. প. প.	রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা
স.	সংস্করণ
সা. প. প.	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
BMC	*Catalogue of Printed Bengali Books in the Library of the British Museum, 3 vols.* (London, 1886-1939).
Browne	*A Literary History of Persia,* 4 vols. (6th edn; London, 1956).
ed.	edited by.
edn.	edition.
Hunter	*The Indian Musalmans* (3rd edn; London, 1876).
IOL	*Catalogue of the Library of the India Office,* vol. II, pt. iv : 'Bengali, Oriya and Assamese Books' (London, 1905).
JASB	*Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
JASP	*Journal of the Asiatic Society of Pakistan.*
n.	note.
n. d.	no date.
Proc. ASB	*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.*
trans.	translated by.
JBRAS	*Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society.*

অবতরণিকা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানে সমৃদ্ধ। এর তুলনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের পশ্চাৎপদতা বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে — বাঙালী মুসলমান সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয়। অথচ তাঁদের সাহিত্যানুরাগ বা সৃষ্টিক্ষমতা যে লোপ পায় নি, তার প্রমাণ আরবী-ফারসী শব্দবহুল কাব্যধারার মধ্যে পাওয়া যায়। এই রীতির কাব্য অবশ্য রসে-রূপে বিচিত্র নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচ্ছন্নতাও সেখানে অনুপস্থিত। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনার ইতিহাসে এই কাব্যধারা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করেছে মাত্র।

একমাত্র সামাজিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বাঙালী মুসলমানের এই অবস্থা-সংকটের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইংরেজ-শাসনকালে বাংলাদেশে যে ব্যাপক নবজাগরণের সূচনা হয়, বাংলার সমৃদ্ধ আধুনিক সাহিত্য তার ফল। এই নবজাগরণ এসেছিল প্রধানত হিন্দু সমাজে। একালে মুসলমান সমাজে যেসব ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তাব মূলে ছিল প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা। এসব আন্দোলনের মূল্য স্বীকাব করেও বলা যায় যে, বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে এদের দায়িত্ব যথেষ্ট। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের দিকে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয় এবং আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে তার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসময়েই তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, এর পূর্বে এদিকে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

এই সময়টা আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। যেসব বাঙালী মুসলমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা অগ্রগামী হিন্দু লেখকদের অনুসরণ করেছেন, নতুন পরীক্ষা করতে সাহসী হন নি। তাই শ্রেষ্ঠ হিন্দু লেখকদের তুলনায় তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিষ্প্রভ। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভা তাঁদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নি।

বাঙালী মুসলমানের হাতে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে যে ফসলটুকু ফলেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের দ্বারা সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পাকিস্তান-সৃষ্টির পর সেকালের মুসলিম সাহিত্যব্রতীদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল জেগেছে, অনেক উৎসাহী কর্মী তাঁদের জীবনকাহিনীর পুনর্গঠনে এবং তাঁদের রচনার সন্ধান ও সংগ্রহে, পরিচয়দান ও মূল্যনিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর মূল্য আছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ও সাধারণ আবেগ যে পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে, সে পরিমাণে জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ বিকশিত হয় নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং শ্রদ্ধাবোধ সাহিত্যবিচারকে বিচলিত করেছে।

বর্তমান গ্রন্থে সামাজিক পশ্চাৎপটের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ-আমলে (১৭৫৭-১৯১৮) বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত লেখকদের

সৃষ্ট সহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু এটি সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সাহিত্য-সমালোচনাও নয়। ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের ধারা অনুসরণ করে লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয়দান আমার লক্ষ্য। একালে যাঁরা গ্রন্থপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের সবার উল্লেখ করা তাই প্রয়োজন মনে করি নি। তবে সাহিত্যকর্ম বা চিন্তাধারার দিক দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ লেখককে বাদ দিই নি বলে ভরসা করি।

দুই

অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একালের মুসলিম-রচিত বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা — সামাজিক ইতিহাসের অভাব। কোন অর্বাচীন লেখকের পক্ষে এ কাজ সাধন করাও অসম্ভব। বিভিন্ন সূত্র থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে আমি এই দুরূহ কর্মের একটি খসড়া তৈরী করতে চেয়েছি এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে। ইতিহাসের রূপরেখা স্পষ্ট করে তোলার জন্যে কখনো কখনো অনেকখানি জায়গা দিয়েছি। যেমন, ইংরেজ-আমলের সামাজিক পটভূমি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এর পূর্ববর্তী সময়কার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে হয়েছে এবং তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ এবং আরবের ওয়াহাবীদের মতামত বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

প্রথমভাগে দেশকালের পরিচয় দিয়েছি চারটি অধ্যায়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আমার আলোচনার যতি টেনেছি। অনতিবিলম্বে অসহযোগ আন্দোলনে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আর নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে বাঙালী মুসলমান লেখকদের চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সাহিত্য ও চিন্তাধারা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে।

ইংরেজ-শাসনকালে আমাদের সমাজব্যবস্থায় কতকগুলো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে ভাঙন ধরে, জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে শহরমুখী, আর অর্থনৈতিক জীবনের মূল মাপকাঠি জমি থেকে রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে নঙ্গে নতুন শ্রেণীবিন্যাস দেখা যায়। নবগঠিত এইসব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়মানুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পুরাতনের ক্ষয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে দেখা দিলেও মুসলমানেরা পুনর্গঠনের সুযোগ পান নি। তার একটি প্রধান কারণ এই যে, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে সক্রিয় ছিল যে মুদ্রার প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সেই নগদ অর্থ মুসলমানের হাতে সঞ্চিত হতে পারে নি। ইংরেজ-আমলে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত পুরানো অভিজাতের পতন হয় বটে, কিন্তু নতুন জমিদারী যাঁরা লাভ করেন, তাঁরাও হিন্দু-সন্তান। একালে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের শোচনীয় দুর্দশা ঘটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান হিন্দু সম্প্রদায়ের আরেক দল। এমনি করে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেও আমরা হিন্দুপ্রাধান্য দেখতে পাই। এঁরাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন সমাজ ও

সহিত্য-আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠলেন, বাংলার নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফল উপহার দিলেন।

ঐতিহাসিক শক্তি ও ঘটনার পারম্পর্যে মুসলমান সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়েন; কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তির পরিচয় পাই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে। সমাজের নতুন বিন্যাস, মানবিক সম্পর্কের পুনর্নির্ধারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ — এই সমস্ত উদ্দেশ্য তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া, ফারায়েজী আন্দোলন এবং তিতুমীরের সংগ্রামের মধ্যে সুস্পষ্ট। তবে তাঁদের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং তাঁদের আন্দোলন প্রাচীনতর জীবনযাত্রার দিকেই সকলকে আকর্ষণ করেছে, আধুনিক জীবনপদ্ধতির সঙ্গে যোগ ঘটায় নি। এই ধর্মান্দোলনের আরেকটি ফল হচ্ছে, মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি এবং অমুসলিম-সংস্কার সম্পর্কে অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক মনোভাবের সূচনা।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পরে আধুনিকতার সঙ্গে — এবং ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে — মুসলমানের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা চলল। উত্তর-ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ এই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। মুসলমানের এই পুনর্জাগরণের মুহূর্তে অগ্রসর হিন্দু আব অনগ্রসর মুসলমানের বাস্তব অবস্থার যে পার্থক্য, তার সঙ্গে উভয় পক্ষে নানারকম মানসিক কারণ যুক্ত হয়ে তাদের যাত্রাপথ পৃথক করে দিল। যাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ে তার বিকাশ ঘটে এ সময়ে। এবং একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে তার প্রকাশ হল বলে এই আন্দোলন অনেকখানি হিন্দু জাতীয়তাবোধের রূপ নিল। মুসলমানের সঙ্গে তাই এই আন্দোলনের গভীর আত্মিক যোগ স্থাপিত হতে পারলো না। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-অর্জনের চেষ্টা মুসলমান সমাজে দেখা দিল আরো পরে — তখনো তা স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ নিল। উভয় সম্প্রদায়ের অনেকের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের একযোগ সম্ভবপর হয়ে উঠল না। কেবল একবার তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল — খিলাফত আন্দোলন আর অসহযোগ আন্দোলনের যুগে। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি।

একালের সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা করতে যেয়ে কয়েকটি প্রচলিত মত আমাকে বর্জন করতে হয়েছে। যেমন, হান্টার এবং তাঁর অনুসারীদের ধারণা এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারের জায়গায় হিন্দু জমিদারেরা স্থলাভিষিক্ত হন। আমি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি যে, নবাবী আমলে জমিদার বলে যাঁদের আখ্যা দেওয়া যেত, তাঁদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ইংরেজ আমলে পুরানো জমিদারের বদলে নতুন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ফলে, একদিকে বর্ধমান, দিনাজপুর ও রাজশাহীর মতো সমৃদ্ধ হিন্দু জমিদারীর যেমন পতন হয়, তেমনি নতুন হিন্দু জমিদারও দেখা দেন। ঘটনাক্রমে নতুন জমিদারেরা সকলেই আসেন হিন্দু সমাজ থেকে, কিন্তু পুরোনো যুগেও আধিপত্য ছিল তাঁদের। তেমনি লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তবে নগদ টাকা হাতে থাকায় হিন্দুরা একই প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠনের যে সুযোগ পান, মুসলমানেরা তা লাভ করতে পারেন নি।

ইংরেজের মুসলিম-বিদ্বেষ বা মুসলমানের ইংরেজ-বিরোধিতা সম্পের্কেও নানাকথা প্রচলিত আছে। মুসলমানের প্রতি কোন কোন ইংরেজ-শাসক বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করলেও এটি সরকারী নীতিতে পরিণত হয় নি। এবং রাজ্য হারাবার জন্যে মুসলমানেরাও

সরাসরি ইংরেজ-শাসনবিদ্বেষী হয়ে পড়েন নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরবী-ফারসী পড়াতেন মুসলমানেরা, তাঁদের কেউ কেউ বিলেতে হেলিবারী কলেজেও অধ্যাপনা করতে যান। কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাও ইংরেজ শাসক ও শাসিত মুসলমানের সহযোগিতার ফল। এই মাদ্রাসা স্থাপনের একটি উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসকের প্রয়োজনে মুসলমান কর্মচারী সৃষ্টি করা।

সৈয়দ আহমদ বেরিলভী-প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলন (ওয়াহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত হলেও এর প্রকৃত নাম তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া) মূলত ধর্মান্দোলন, অনেক পরে তা ইংরেজ-শাসনবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে অনেকটা ঘটনাক্রমে। তিতুমীর ও শরীয়তউল্লাহ্ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানত ধর্মান্দোলনের। ঘটনাক্রমে সেগুলোও ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে এবং ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধরূপে শুরু হয়েছিল ইংরেজ-শাসন-বিরোধী সংগ্রাম। কিন্তু তারপরেই কেরামত আলী জৌনপুরীর মতো প্রভাবশালী আলেমরা আবার শাস্ত্রীয় বিচারে এই সংগ্রামকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, একথা প্রমাণ করা দুষ্কর। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই আধুনিক শিক্ষার দ্বার মুসলমানের পক্ষে রুদ্ধ ছিল। ১৮৭০-এর পর শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটায় মুসলমানের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষালাভ করা সহজ হয় এবং তাঁরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজে ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা অনেকখানি ব্যাপকতা লাভ করে, এতে সন্দেহ নেই। সমাজের এক অংশে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইংরেজ-শাসনবিরোধী যে মনোভাবের সূচনা হয়, তার পরিণতি দেখা দেয় প্যান ইসলামবাদী ভাবধারার প্রসারে। খিলাফত আন্দোলনে এই মনোভাবের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা যায়। এখানে যে বহির্মুখী মানসিকতার প্রবল প্রকাশ দেখি, তার লালন-পালন চলেছিল পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাস্তব জীবযাত্রার সংকটজনিত ক্ষোভ—যার ফলে বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক সংগ্রামে বাঙালী মুসলমান এগিয়ে এসেছিলেন।

তিন

সমকালীন ভাব-আন্দোলনের মতোই ইংরেজ-আমলের বাঙালী মুসলমানেরসাহিত্য-সাধনাকেদুটি পর্বে ভাগ করে দেখা যেতে পারে : পুরানো ধারার অনুবর্তন এবং আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা। পূর্ববর্তী কালের—অর্থাৎ আধুনিকপূব সাহিত্যধারাকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী শব্দবহুল কাব্যরচনার একটা ধারা মুসলমানের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা সাধারণত মুসলমানী বাংলা কাব্য, বটতলাব পুঁথি বা দোভাষী পুঁথি নামে পবিচিত। ভাষাবৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে আমি এই ধারাকে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য

নামে আখ্যা দিয়েছি। অনেকের মতে, এই কাব্যধারার বিকাশকাল সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ঘটনাটা ঘটে আরো একশ' বছর পরে —মুঘল আমলে ফারসী ভাষার সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সময়ে। তবে বিংশ শতাব্দীতেও এই রীতিতে কাব্য রচিত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। পঞ্চম অধ্যায়ে এই ধারার প্রধান কবি ও কাব্যসমূহের আলোচনা করেছি— যাতে এর গতিপ্রকৃতি বোঝা সম্ভবপর হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশ বছর আগে আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন যে, ৮৩২৫টি বটতলার পুঁথি রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৪৪৪৬ টি তখনো প্রচলিত ছিল ('মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩৩৭)। তাঁর এই সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি কি, তা অবশ্য তিনি জানান নি। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও এই তথ্য মেনে নিয়েছিলেন ('বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, মাঘ ১৩২৫)। কিন্তু তিনিও লক্ষ্য করেননি যে, সিদ্দিকী সাহেব অনেক খোঁজ করেও সাড়ে চার শ'র বেশী বইয়ের নাম করতে পারেন নি। এই তালিকাটি ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রকাশকের কারসাজিতে বিভিন্ন কবির নামে প্রচারিত একই কাব্য স্বতন্ত্র রচনার মর্যাদা পেয়ে তালিকায় একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা পরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে যে, সিদ্দিকী সাহেবের সংখ্যাতত্ত্ব নির্ভরযোগ্য নয়। এখন পর্যন্ত এই ধারায় লেখা মোট গ্রন্থসংখ্যা তাঁর প্রদত্ত সংখ্যার কাছাকাছি যেতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত পুরানো ধারায় লেখা, অথচ মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নয়, এমন রচনার আলোচনা করেছি ষষ্ঠ অধ্যায়ে। একালে গদ্য রচনার ও সংবাদপত্র প্রকাশের যে চেষ্টা হয়—যাকে আধুনিকতার পূর্বসূচনা বলা যেতে পারে— তারও পরিচয় এখানে দিয়েছি।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ সময়টাকে আমরা বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার নতুন পর্বের সূত্রপাত বলে গণ্য করতে পারি। তবে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের আগে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির নমুনা নেই। পূর্ববর্তী বৎসরে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (১৮৬৯) গদ্যে লেখা হলেও, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পুরোপুরি মধ্যযুগীয়। ১৮৭০ খৃস্টাব্দকে কালান্তর ধরার আরো একটা যুক্তি আছে। এই সময় থেকে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত — প্রায় এই পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করেছি দুটি ভাগে, কিন্তু তিনটি অধ্যায়ে। যেসব সৃষ্টিধর্মী লেখকের গ্রন্থাদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে, তাঁদের আলোচনা করেছি সপ্তম অধ্যায়ে। বিশ শতকের সৃষ্টিধর্মী লেখকদের আলোচনা আছে নবম অধ্যায়ে। একালে আমরা আরেক শ্রেণীর লেখক দেখতে পাই —যাঁরা ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-বিষয়ক রচনায় এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে তাঁদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

চার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আমাদের সমাজ-জীবনে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যার জের চলেছিল (কেননা আগেই দেখেছি যে, মুসলমান সমাজে পুনর্গঠনের সুযোগ ছিল না), মিশ্র ভাষা-রীতির কাব্যে তার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। এর মধ্যে যে প্রধান লক্ষণগুলো আছে—যেমন, বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার প্রচেষ্টা, আদর্শবাদের অভাব, সমকালীন জীবনের সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদ, নারী-সৌন্দর্যের স্তুতি সত্ত্বেও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা—এর সবকিছুই ক্ষয়িষ্ণু সমাজভুক্ত মানুষের মানসিকতার ফল। ধর্ম সম্পর্কে খুব একটা আবেগের প্রকাশ এতে আছে, কিন্তু সমকালে তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া, ফারায়েজী বা তিতুমীরের আন্দোলনের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ-জীবন পুনর্বিন্যাসের যে সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, তা এসব কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নি। ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ আবেগ ও অনুভূতি অনেক সময়ে আজগুবী, বিকৃত ও মৌলিক ধর্মাদর্শবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আলীর মাহাত্ম্যকীর্তন করতে গিয়ে পরোক্ষে শিবের অস্তিত্বে আস্থা, তরবারিবলে ইসলামপ্রচারে উল্লাস, নানারকম ভোজবাজিতে বিশ্বাস কবিদের রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এসবের মধ্য দিয়েও পরোক্ষভাবে পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রতিবেশী হিন্দুর বাস্তব অস্তিত্ব, তার ধর্মকর্মবিশ্বাস, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এসবই ভিন্নরূপে কাব্যে দেখা দিয়েছে এবং এভাবে পরোক্ষে সমাজের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্যথায় অচেতন বা উদাসীন কবির রচনায়। একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ভাবগত দৈন্য সত্ত্বেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে কখনো কখনো উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি ঘটেছে।

হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব বা সমন্বয়েরও কিছু আভাস মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আছে। 'সত্যপীরের পুঁথি' তার নমুনা। মধ্যযুগীয় আদর্শে লেখা অথচ মিশ্র ভাষারীতির নয়, এমন আরেকটি কাব্য 'গাজী কালু ও চাম্পাবতী'তে হিন্দু-মুসলমানের আপাতবিরোধের অন্তরালে দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ মিলনের পরিচয় পাই। এই ভাবধারার পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটেছে বাউল গানে। যেকালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার আন্দোলন চলছিল, সেকালে এই সমন্বয়পন্থী মতবাদের অস্তিত্ব আমাদের একটি প্রবণতার পরিচয় দেয়।

বটতলার ছাপাখানা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত দু'একটি বইতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের প্রচেষ্টা আছে। তবে প্রায়-অশিক্ষিত লেখকদের হাতে এর রূপায়ণ সার্থক হতে পারে নি। সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে বাস্তবতা সম্পর্কে যে সচেতনতার পরিচয় পাই তা উত্তরকালের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির পথনির্মাণ করেছে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম যুগ। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া প্রভৃতি ভাব-আন্দোলনের প্রভাব সাধারণভাবে এযুগেও দেখি না—যদিও কোন কোন লেখক হয়তো এই আদর্শের অনুসারী। বরঞ্চ মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর প্রভাব অনেকটা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আলীগড়-আন্দোলনের প্রভাবও অনুভব করা যায়, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক-বিষয়ে আলীগড় আন্দোলনের মনোভাব বাঙালী মুসলমান লেখকদেরকে স্পর্শ করেছিল।

এর মূলে রয়েছে মুসলমান হিসেবে লেখকের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং—সঙ্গে সঙ্গে—গৌরববোধ। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা যা লক্ষ্য করেছি, অর্থাৎ ইতহাস, ধর্মতত্ত্ব বা

সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন সচেতন না হয়েও নিজের ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে এক ধরনের মুগ্ধতা, মুসলমানিত্বের একটা অন্ধ গৌরব—আধুনিককালের অধিকাংশ লেখকের মধ্যে এই আবেগ একটু উন্নত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের নির্দেশ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে কতদূর আচরিত কিংবা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি ত্রুটিমুক্ত, সে কথা সবসময়ে তর্কের বিষয় হতে পারে। তবু নিজেকে মুসলমান বলতে গর্ববোধ করেন বলে এই লেখকেরা যা কিছু মুসলমানের নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করেছেন, তারই অর্চনা করেছেন। এই জন্যে এঁদের রচনায় ইসলামের নামে কখনো সুফী মতবাদের, কখনো লুপ্ত অতীতের, কখনো তুরস্কের পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের আর কখনো বৃথা ঐতিহ্যগর্বের প্রকাশ হয়েছে। এই প্রবণতার জন্যই অধিকাংশ লেখক বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাইতে অতীতের গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। সে অতীতের ব্যাখ্যায় তাঁরা যে ভাবধারার পরিচয় দেন, তা আমীর আলীর চিন্তাধারার সগোত্র।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন এবং যাঁরা ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছেন—তাঁরাও স্বাতন্ত্র্যপন্থী ও ইংবেজের আশীর্বাদপ্রার্থী মুসলমানের মতোই — ইসলামের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করেছেন। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এঁরা ছিলেন অধিকতর সচেতন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা এবং পরাধীনতার জন্যে গ্লানিবোধ অনেক লেখকের রচনায় খুব স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরের মুসলিম-সৃষ্ট রচনাবলী সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। তার একটা কারণ এই যে, যে সময়ে বাঙালী মুসলমান লেখকেরা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, সেটা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের যুগ। হিন্দু ঐতিহ্যগর্বের একটা ফল দেখা দিয়েছিল মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব উদ্বোধনে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল মুসলমান সমাজে। হিন্দু লেখকদের রচনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধস্মৃতির চর্চা করা হয়েছিল; মুসলমান লেখকেরাও তার জবাব দিয়েছিলেন। সম্পর্কের তিক্ততা এতে বৃদ্ধি পায়। তার উপরে, একালে বাঙালী মুসলমান নানারকম উন্নতিলাভের আশা করেছেন। এক্ষেত্রে হিন্দুকে তাঁরা মনে করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় হিন্দুও উৎসাহিত বোধ করেন নি।

সুতরাং বাঙালী মুসলমান লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হল তাঁর সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুভূতি। এক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুসলমান লেখকের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। আমাদের সমাজে আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা সমাজের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কে ক্রমেই তাঁরা যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাও স্মরণীয়।

এই লেখকদেরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

১. সৃষ্টিধর্মী লেখক : কখনো কখনো সমসাময়িক জীবন থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা পেলেও ইসলামের ঐতিহ্য থেকেই এঁরা প্রধানত প্রেরণা লাভ করেছেন।

২. তথ্যনিষ্ঠ লেখক : ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা গ্রন্থরচনা করেছেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে এঁরা কিছুটা পরিচিত এবং ইসলামের ব্যাখ্যায় অনেকটা উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন।

৩. ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক লেখক: বিধর্মীর সঙ্গে ইসলামের মাহাত্ম্য নিয়ে এবং স্বধর্মীর সঙ্গে ধর্মের নির্দেশ নিয়ে বিচার করা এঁদের উদ্দেশ্য। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের পরিচয় সীমাবদ্ধ।

দেখা যাবে যে, যে ধরনের বিষয় নিয়েই লিখে থাকুন না কেন, লেখকের ধর্মীয় অস্তিত্ব সেখানে ছায়া ফেলেছে।

প্রথম ভাগ

দেশ ও কাল

প্রথম অধ্যায়

১৭৫৭ —১৮০০

১৭০৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে ভারতে মুঘল রাজশক্তির পতনের সূচনা হয়। তাঁর মৃত্যুর আগেই মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্যের ধারণা বিপর্যস্ত হচ্ছিল, এখন কেন্দ্রে শক্তিশালী শাসকের অভাবে কোন কোন প্রদেশের সুবাদাররা দিল্লীর অধীনতা একরকম অস্বীকার করলেন। ১৭১৭তে বাংলাদেশে স্থায়ী দেওয়ানরূপে মুর্শিদকুলী খানের নিয়োগে মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধতম প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে এক স্বাধীন নবাববংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। দশ বছর পর মুর্শিদকুলীর জামাতা শুজাউদ্‌দৌলা আসাদ জঙ্গ নবাবী পেলেন, তারপর তাঁব স্থলাভিষিক্ত হলেন পুত্র সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০)। কিন্তু হতভাগ্য সরফরাজকে হত্যা করে সেই মসনদ অধিকার করলেন তুর্কিস্থান থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী মীর মুহম্মদ আলী অর্থাৎ আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬)। আলীবর্দীর দেহত্যাগের পর কেবল এক বৎসরের জন্যে (১৭৫৬-৫৭) তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্‌দৌলা সেই মসনদে আসীন থাকতে পেরেছিলেন।

নবাবী আমলের শাসনব্যবস্থায় বংলাদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীন বাজা ও জমিদারদের দমন করে সমগ্র বাংলাদেশে একচ্ছত্র শাসন-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই।[১] রাজস্ব-সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলী খানের সদাজাগ্রত দৃষ্টি যখন অর্থলোলুপতায় পরিণত হল, তখন সামন্ত ও জমিদারদের ওপর তাঁর অত্যাচারের আর সীমা রইল না। তাঁর প্রবর্তিত *মাল-জামিনী* ব্যবস্থায় এইসব রাজা ও জমিদারদের পতন যেমন অনিবার্য হয়ে উঠল, তেমন অভ্যুত্থান ঘটল নতুন রাজস্ব-সংগ্রাহক *ইজারাদার*দের। এই ইজারাদাবরা দু-তিন পুরুষের মধ্যেই পুরানো জমিদারদের স্থান দখল করে ফেললেন এবং পরিচিত হলেন *জমিদার*, *রাজা*, *মহারাজা* হিসেবে।[২]

ইজারাদার হিসেবে মুর্শিদকুলী খান কেবল বাঙালী হিন্দুদেরকেই নিয়োগ করতেন, ঐতিহাসিক সলিমউল্লাহ্ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৩] উচ্চ সরকারী চাকবিতে এতদিন পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরকেই নিয়োগ করা হত: এই প্রথার ব্যতিক্রম করে তিনি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] তাঁর পরবর্তী নবাবেরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।[৫] রাষ্ট্রপরিচালন বিষয়ে এই প্রাধান্য-সত্ত্বেও হিন্দু-মানসে মুসলিম শাসনজনিত অস্বস্তি একেবারেই দূর হয়ে যায় নি : তার একটি কারণ, জমিদারদের উপরে নবাবের ক্রমাগত আর্থিক চাপ। ১৭৫৪ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল স্কট লিখেছিলেন যে, হিন্দু রাজারা মুসলমান সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, মনে মনে এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনকামী।[৬]

কিন্তু এই কামনার কোন প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই না। সিরাজউদ্‌দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার যে-ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তাতে হিন্দু রাজা ও জমিদারেরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা থেকেও কিছু প্রমাণ হয় না। বাংলাদেশের শাসকেরা বরাবরই নামত মুঘল সম্রাটের অধীন, কার্যত তাঁরা স্বাধীন নবাব। তখন দেশে রাজনৈতিক শক্তি

বলতে কিছু ছিল না, রাজনৈতিক স্থিরতা বলতেও কিছু নয়। জাতীয়তাবোধ ব্যাপারটাই ছিল অজানা, আনুগত্য বলতে বোঝাতো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশ্বস্ততা। তাই ষড়যন্ত্র আর নবাব-পরিবর্তন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা—তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না।[৭]

অতএব, সিরাজউদ্‌দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মধ্যে যেমন অভিনবত্ব ছিল না, তেমনি এতে দেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনাও কারো চিন্তায় উদয় হয় নি। ইংরেজ কোম্পানীর শক্তিমত্তায় চক্রান্তকারীদের বিশ্বাস ছিল বলে এই প্রাসাদ-চক্রান্তের মধ্যে তাদেরকে টেনে আনা হয়েছিল।[৮] এর প্রায় একশ বছর আগে থেকেই অলক্ষ্যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চরিত্রবদল হচ্ছিল : ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য। তাই যা ছিল মূলত এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ধীরে ধীরে তা পরিণত হয়ে উঠছিল এক সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তিতে। এ বদল যে একেবারে অচেতনভাবে হচ্ছিল, তা নয়। ১৬৮৭ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর ডাইরেক্টররা মাদ্রাজ কুঠির অধ্যক্ষকে লিখেছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে এমন এক সামরিক ও বেসামরিক সংগঠন গড়ে তুলতে, যা ভবিষ্যতে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি হতে পারে।[৯] এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্য তাই তুচ্ছ ছিল না। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩-এ জুন পলাশীর প্রান্তরে যে এই উপমহাদেশে বিদেশী শাসনের প্রথম অঙ্কুর বোপিত হল, এ কথা সেদিন কেউ ভাবে নি।

মীরজাফর নবাব হলেন তিন বৎসরের জন্যে (১৭৫৭-৬০)। কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান অর্থগৃধ্নুতা মিটিয়েও মসনদে আসীন থাকা সম্ভবপব হল না তাঁর পক্ষে। লর্ড ক্লাইভ তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। হাতের কাছে যত ধনরত্ন পেলেন, সেসব সংগ্রহ করে ষাট জন বেগমপরিবৃত হয়ে *ক্লাইভের গর্দভ* আশ্রয় নিলেন ফোর্ট উইলিয়মে।[১০] মীরকাসিম নবাব হলেন (১৭৬০-৬৩)। কোম্পানী-কর্মচারীদের অবাধ শোষণ বন্ধ করতে যেয়ে তিনি হলেন রাজ্যচ্যুত। মীরজাফর আবার নবাবী পেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তা টিকিয়ে রাখলেন। এরই অব্যবহিত পরে ক্লাইভ বিলেত থেকে ফিরে এলেন। মীরজাফরের আঠারো বৎসর বয়স্ক জারজ পুত্র নাজিমউদ্‌দৌলাকে (১৭৬৫-৬৬) মসনদ দিলেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে নতুন নবাব বলে উঠলেন : আল্লাহকে ধন্যবাদ। *আমি এখন যত খুশী নর্তকী রাখতে পারব।*[১১] তারপর তাঁর অনুজ সাইফউদ্‌দৌলা নবাবী করলেন মাত্র কয়েক দিন (১৭৬৬)। তাঁর মৃত্যুতে মীরজাফরের তৃতীয় পুত্র মুবারকউদ্‌দৌলা নিযুক্ত হলেন বাংলার নাজিম।[১২] নবাবী আমল অবশ্য এর আগেই শেষ হয়েছিল। ১৭৬৫তে সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এর পরেই ক্লাইভের বিখ্যাত দ্বৈত-শাসন প্রবর্তিত হয়। তারপর বাংলার গভর্নর হিসেবে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, ১৭৭৪-এ তিনি হলেন গভর্নর-জেনারেল, বারো বছর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করলেও ১৭৭২ পর্যন্ত রাজস্ব-আদায়ের দায়িত্ব রয়ে গেল নায়েব-দেওয়ানদের হাতে। ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটকে দিতে হত ছাব্বিশ লাখ টাকা, নবাবকে বত্রিশ লাখ টাকা, বাদ বাকী রাজস্ব কোম্পানী পেত। অরাজকতার

সময়ে রাজস্ব-আদায়কারীরাও যথেচ্ছা শোষণ শুরু করলেন — এর সবটুকু চাপ এসে পড়ল সাধারণ লোকের উপর।

নবাবী আমলেও জমিদারদের কাছে নবাবের দাবি শেষ পর্যন্ত সাধারণ রায়তদের উপরে জমিদারদের অত্যাচারের রূপ পরিগ্রহ করত, সন্দেহ নেই। তবু সেকালে বাংলার কৃষি ও শিল্পের অবস্থা অনুন্নত ছিল না। কোম্পানী কর্মচারীদের শুল্কবিহীন অন্তর্বাণিজ্য এবং তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর উপরে তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলার শিল্প ও কৃষি ধ্বংস হতে বসেছিল। কোম্পানী-কর্মচারীদের বিলাস, আলস্য ও অত্যাচার দেখে ক্লাইভও শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি।[১৩] কোম্পানীর কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্য একচেটে করে নিয়েছিলেন; নবাবের রাজস্ব আর দেশী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বের বিনিময়ে তাঁদের প্রচুর অর্থাগম হতে থাকল। রাজস্বের ক্ষতি করেও দেশী ব্যবসায়ীদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন মীরকাসিম : কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর মর্মান্তিক বিরোধ বেধেছিল এ কারণেই।[১৪] বহির্বাণিজ্যও কোম্পানীর একচেটে হয়ে গিয়েছিল। উইলিয়ম বোল্টস্ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, তাঁতিদেরকে সাধ্যাতীত পরিমাণ কাপড় বয়ন করে দেবার চুক্তি করতে বাধ্য করা হত। যারা কাঁচা রেশম বয়ন করত, তাদের উপর অত্যাচার এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময়ে এই অসাধ্য দাবি এড়াবার জন্যে তারা নিজেদেব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলত। তিনি আরো বলেছেন যে, সাধারণত রায়তেরাই ছিল একাধারে চাষী ও কারিগর : খাজনা মেটাবার জন্যে গোমস্তাদের অত্যাচারের ফলে তাদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে হত কিংবা ছেলেমেয়ে বিক্রি কবতে হত।[১৫] ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর ডাইরেক্টররা স্পষ্টই তাঁদের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, বাংলাদেশে রেশমজাত দ্রব্যের পরিবর্তে, যাতে কাঁচা রেশম উৎপাদন বেশী হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাঁরা আরো চাইলেন যে, শিল্পী ও কারিগরদেরকে বাড়ী বসে কাজ করতে না দিয়ে যেন কোম্পানির কুঠিতেই কাজ করতে বাধ্য করা হয়।[১৬] বিলেত থেকে আমদানীকৃত তৈরী জিনিসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্পের পরাজয় হতে থাকল প্রতি পদে। বাংলার গঠনশীল শিল্প ও বাণিজ্য এভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পর মুর্শিদাবাদের কোম্পানি-কুঠির অধ্যক্ষ বেকার লিখলেন :

> I well remember the Country when Trade was free, and the flourishing State it was then in, with Concern I now see its present ruinous Condition which I am convinced is greatly owing to the Monopoly that has been made of late years in the Company's Name of almost all the Manufactures in the Country. Let the Trade be made free, and this fine Country will soon recover itself, the Revenues increase ..[১৭]

আরো খোলাখুলিভাবে তিনি বললেন :

> It must give pain to Englishmen to have Reason to think that since the accession of the Company to the Dewanee the condition of the people of this Country has been worse than it was before and yet I am afraid the Fact is undoubted.[১৮]

দেশের আরেকটি বড়রকম ক্ষতি হচ্ছিল প্রতি বছর প্রচুর টাকা বিদেশে চলে যাওয়ায়। দেশের মানুষেকে শোষণ করে বছরে বছরে যে-রাজস্বসংগ্রহ করা হত, তার এক-তৃতীয়াংশেরও

বেশী পরিমাণ অর্থ বিলেতে চলে যেত।[১৯] এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল। কোম্পানী-শাসনের কুফল ফলতে বেশী দেরী হল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে ও অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হল। অথচ সেই বছরে খাজনা আদায় হল তার আগের বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী।[২০]

রাজস্ব-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কোম্পানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নীলামে যিনি সর্বোচ্চ রাজস্ব দেবার ডাক দিতে পারতেন, প্রথমে জমিদারী বিলি করা হত তাঁকে। তিনি জমিদারী পেয়ে নানারকম উৎপীড়ন করে অর্থ সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হতেন। ১৭৯০তে দশ সালা বন্দোবস্তেও এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। সেই পরিবর্তন ঘটল আরো তিন বৎসর পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পরাজিত পুঁজি নিয়োজিত হল কৃষির ক্ষেত্রে—বেশী চাপ পড়ল জমির উপরে।[২১] এই ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফল হল এক শ্রেণীর অনুগত জমিদার-সৃষ্টি—উত্তরকালে যাঁরা নানাভাবে নতুন শাসকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন।

দুই

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বা অনেকের পূর্বপুরুষ বহিরাগত, এ কথা সত্য, কিন্তু এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা মূলত এদেশীয় অমুসলমানদের উত্তরপুরুষ।[২২] আমাদের দেশে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে সামাজিক বর্ণ-বিন্যাস গড়ে উঠেছিল, তার উপরের স্তরে থাকতেন বিদেশাগত মুসলমানেরা—এঁদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, শরীফজাদ-আজলাফজাদ হিসেবে বৈষম্য ছিল। এদেশের হিন্দুধর্মত্যাগী মুসলমানেরা আবার তাঁদের পূর্বেকার বা পূর্বপুরুষগত বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত থাকতেন।[২৩]

বাংলাদেশের মুসলমান জনসমষ্টির মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবীর প্রাধান্য ছিল, এমন অনুমান করা চলে। অতএব ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় সাধারণ প্রজাদের যে-দুর্দশার কথা আমরা বলেছি, তার অনেকটা অংশ তারা ভোগ করেছিল।

মুসলমান উচ্চবিত্তের উপরে প্রথম আঘাত আসে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্কোচনে। এর ফলে, নবাবের আশ্রিত মুসলমান কর্মচারী, সভাসদ, জায়গীরদার ও অনুগৃহীতেবা সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। ইংরেজ-অধিপত্যের সূচনায় অনেকে বাংলাদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে চলে যান, এমন কথাও শোনা যায়।[২৪] খুব সম্ভব, বাইরে থেকেই বাংলাদেশে এঁরা এসেছিলেন— এঁদের বাংলাদেশ ত্যাগ করে যাওয়া তাই খুব তাৎপর্যমূলক ঘটনা নয়।

হান্টার বলেছেন, নবাবী আমলে অভিজাত মুসলমানদের অর্থাগমের তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল—সামরিক পদলাভ, রাজস্বভোগ আর বিচার ও রাজনৈতিক নিয়োগ।[২৫] কোম্পানী-আমলে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও ছাঁটাইয়ের ফলে অনেকে চাকরি হারালেন।[২৬] কোম্পানীর দেওয়ানী-লাভের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত রাজস্ব-বিভাগে মুসলমান কর্মচারীদের আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয় নি। কিন্তু নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থায়, বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ কালেক্টরদের নিয়োগ হতে থাকায়, এঁদের স্থান সঙ্কুচিত হল।[২৭]

নবাবী আমলে জমিদার বলতে যাঁদেরকে বুঝি, কোম্পানীর নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থার ফলে তাঁদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। বাংলাদেশের তিনটি বৃহত্তম জমিদারী—বর্ধমান, রাজশাহী ও দিনাজপুর এস্টেটের বিপর্যয়—তাঁর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।[২৮]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানেরা জমিদারী হারিয়েছিলেন বলে যে-মত সাধারণভাবে প্রচলিত এবং হান্টার কর্তৃক সমর্থিত, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল বলে মনে হয়। একালে নবাবী আমলের জমিদারদের পতন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কত, সেকথা বিচার করে দেখা দরকার। নবাবী আমলে জমিদার ও ইজারাদার হিসেবে বাঙালী হিন্দুর প্রাধান্যের কথা আগেই বলেছি। নবাবী আমলে (১৭২৮ খৃ.) বাংলার বৃহত্তর পনেরোটি জমিদারীর মধ্যে দুটি এবং একুশটি ছোট জমিদারীর মধ্যেও মাত্র দুটি মুসলমানের অধীনে।[২৯] সুতরাং এ কথা বলা চলে না যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুসলমানেরা জমিদারী হারালেন আর সেগুলো গিয়ে পড়ল হিন্দুর হাতে। নবাবী আমলের ভূমি-ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজ আমলের বন্দোবস্তের ছিল যথেষ্ট পার্থক্য। অতএব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এক ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা এবং এক শ্রেণীর জমিদারের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধরনের রাজস্ব-ব্যবস্থা এবং নতুন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব হল। নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন, যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল। এই শর্ত পালন করতে পারলেন কেবল নবাবী আমলের হিন্দু রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা। তাই নতুন জমিদার-শ্রেণীতে হিন্দু-প্রাধান্যই দেখা যায়। এ কথা বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে বাংলার ধনবান হিন্দুরা পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানেরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর লর্ড কর্নওয়ালিস দৃষ্টি দিলেন লাখেরাজ সম্পত্তির প্রতি—যার প্রতিক্রিয়া ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।

কর্নওয়ালিসের আরেকটি সংস্কার শিক্ষিত মুসলমানকে অন্তত বড় রকম মানসিক আঘাত দিয়েছিল। নবাবী আমলে *কাফের*দের সাক্ষ্যে কোন মুসলমানের প্রাণদণ্ডাদেশ হতে পারত না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না বলে ১৭৯২ তে গভর্নর-জেনারেল এই নিয়ম রহিত করেন।[৩১]

মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ অভিজাত ও প্রভাবশালী মুসলমানদের প্রতি কোন কোন ইংরেজ শাসক অকারণ বিদ্বেষ পোষণ করতেন। ১৭৫৯ খৃস্টাব্দে ক্লাইভ লেখেন :

> .. but the Musselmans are so little influenced by gratitudes that should he [Meer Jafar] ever think it his interest to break with us, the obligations he owes us would prove no restraint.[৩২]

১৭৬৮তে তিনি এর পুনরুক্তি করেন :

> You may lay it down as a maxim that the Musalmans will never be influenced by kind treatment to do us justice. Their own apprehensions only can, and will, induce them to fulfil their own agreements.[৩৩]

কিন্তু এটি সরকারী নীতিতে পর্যবসিত হয় নি এবং একালেও মুসলমানদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতালাভের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত ছিল না। প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের অনুরোধ সত্ত্বেও লর্ড কর্নওয়ালিস বেনারসের ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারকের পদ থেকে আলী ইবরাহীম

খানকে অপসারিত করে সেখানে একজন ইওরোপীয় প্রার্থীকে নিয়োগ করতে সম্মত হন নি।[৩৪] ১৭৭২এ জনৈক মুসলমানকে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে গভর্নর কার্টিয়ার সাহায্য করেছিলেন।[৩৫] মুসলমান কর্মচারী সৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে কলকাতা মাদ্রাসার পরিকল্পনা হয়। আর ইংরেজ শাসক ও শাসিত মুসলমানের সহযোগিতার ফলেই সে-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল।

তিন

নবাবী আমলে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালায় আর সংস্কৃতের প্রথম পাঠ দেওয়া হত চতুষ্পাঠীতে।[৩৬] মুসলমানেরা পাঠশালায় বাংলা শিখতে যেতেন, তবে ধর্মীয় কারণে মক্তবে যাবার উপরেই জোর পড়েছিল।[৩৭] তবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই ফারসী ভাষাটা শিখতেন সরকারী চাকরীর সুবিধে হবে বলে। বস্তুত নবাবদের অধীনে উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীরা প্রত্যেকেই ফারসী ভাষার উপরে যথেষ্ট অধিকার বিস্তার করেছিলেন।[৩৮] ফারসী শেখার প্রবণতা যে কতদুর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার চমকপ্রদ উদাহরণ পাই ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী থেকে। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে তিনি যখন ফারসীর পরিবর্তে সংস্কৃত শিখতে চাইলেন, তখন হতবুদ্ধি ও দলচ্যুত বিবেচিত হয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন।[৩৯] তবে সেকালে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা যে খুব হীন ছিল না, তার প্রমাণ পাই অ্যাডামের উক্তিতে :

> Perhaps we shall not err widely if we suppose that the state of learning amongst the Musalmans of India resembles that which existed among the nations of Europe before the invention of printing.[৪০]

ব্যবহারিক প্রয়োজনে ফারসীর আদর থাকলেও শাস্ত্রালোচনায় আরবী ও সংস্কৃতেরই প্রাধান্য ছিল। এ প্রাধান্য ইংরেজ আমলের প্রথম পর্যায়ে অব্যাহত ছিল। হিন্দু ও মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আরবী ও সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ দিলেন।[৪১] প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ে ইওরোপীয় গবেষকদের উৎসাহও এইসঙ্গে যুক্ত হল। তার ফলে ১৭৮০তে কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়, ১৭৮৪তে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়, ১৭৯২তে বেনারসে সংস্কৃত কলেজের উদ্বোধন হয়। কিন্তু তখনো সরাকারী উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় নি, এমন কি, চার্লস গ্র্যান্ট নামে কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী (পরে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি) এ বিষয়ে চেষ্টা করেও সফলকাম হন নি।[৪২]

১৭৯২ খৃস্টাব্দে উইলবারফোর্স ভারতবর্ষে স্কুল-মাস্টার পাঠাবার প্রস্তাব করে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর জনৈক ডাইরেক্টরের বক্তৃতা থেকেই তাঁদের মনোভাব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তিনি বলেছিলেন যে, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলেই ইংল্যান্ড আমেরিকাকে হারিয়েছে, ভারতবর্ষে সেই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি চলবে না। নেটিভরা শিক্ষাবিষয়ে তেমন আগ্রহশীল হলে তাদেরকে ইংল্যান্ডে আসতে হবে।[৪৩]

১৭৯৩ থেকে ১৮১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন খৃস্টান মিশনারীরা — দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাই জড়িয়ে গিয়েছিল খৃস্টধর্মের সংশ্রব।[৪৪] মিশনারীদের সর্বপ্রধান কর্মী ছিলেন উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। ১৭৯৩তে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং সোৎসাহে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী সাহায্য চেয়েও তিনি পান নি, তবু স্কুল গড়েছেন, বাংলায় বাইবেলের অনুবাদ করেছেন, বাংলা বইপত্র ছেপেছেন।

১৮০০ খৃস্টাব্দে কোম্পানীকর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ কলেজ যদিও স্থাপিত হয় কোম্পানী-কর্মচারীদেরকে দেশী ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে, তবু এই কলেজকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও উর্দু গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়েছে এবং তার প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

চার

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঠিক নয়, কতিপয় অভিযোগের প্রতিকার না হওয়ায় ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল আর্মীর সৈন্যরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[৪৫] তবে এর চাইতে ইংরেজ সরকারকে যা অধিকতর বিব্রত করে তুলেছিল, তা হচ্ছে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের বিদ্রোহ। সরকারী তথ্যাদি অবলম্বনে লেখা এই বিদ্রোহের দুটি বিবরণ আছে,[৪৬] তার মধ্যে একটি এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়মূলক গ্রন্থ। এতে আমরা দেখতে পাই যে, ১৭৬০ থেকে শুরু করে ১৭৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ও ফকীররা কোম্পানীর সঙ্গে নিয়মিত শক্তিপরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন।[৪৭] ফকীরদের মধ্যে মাদারীয়াপন্থীদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তাঁদের নেতা কানপুরের মজনু শাহ্‌র নাম সেকালে ত্রাসের সঞ্চার করত। মজনু ছিলেন বুরহানপন্থী ফকীর, তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল মাখনপুর। তাঁর অনুগামী হাজার হাজার সন্ন্যাসী ও ফকীরদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল অবশ্য উত্তরবঙ্গ, তবে পূর্ববঙ্গেও তাঁদের যাতায়ত ছিল। মজনু শাহ্‌র সঙ্গে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়।[৪৮] ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে কখনো কখনো সংঘর্ষ লেগেছে বটে, তবু পরে তাঁরা প্রায় একযোগেই কাজ করেছেন। নেপাল সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত অনেকে নেপালেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৭৮৭তে মজনু শাহ্‌র মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা মুসা শাহ্‌ এবং পরে পুত্র চেরাগ আলী শাহ্‌ ফকীরদের নেতৃত্ব দেন। এঁদের বারংবার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সরকার ফকীর নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন এবং তাঁদেরকে ধরে দেবার জন্য মোটা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ক্রমাগত লোকক্ষয় ও সাংগঠনিক দুর্বলতায় উনিশ শতকের প্রথমেই সন্ন্যাসী ও ফকীরদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

সমসাময়িকালে আরেকটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তে। এটি চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জঙ্গলমহলের সামন্ত ও রাজারা, তবে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে-অঞ্চলের আপামর জনসাধারণ। ইংরেজদের আধিপত্য-বিস্তারের অভিযানের সম্মুখে জঙ্গলমহলের রাজারা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারেন নি। কিন্তু বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করবার অভিপ্রায়ে স্থায়ী বাসিন্দারা — যাদেরকে চুয়াড় বলা হত — বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সামন্ত রাজাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

সাহায্য-সত্ত্বেও ইংরেজ রাজশক্তির কাছে এ বিদ্রোহ পরাজয় মানতে বাধ্য হয়।

১৭৯৮তে ঢাকার নবাবের ভ্রাতা দুজন দূত পাঠিয়েছিলেন অযোধার নবাব ওয়াজির আলী শাহ্‌র কাছে। এঁদের মধ্যে একজন পরে কাবুলে গিয়ে জামান শাহ্‌র সঙ্গে দেখা করেন। নবাবের ভ্রাতা জামান শাহ্‌কে ইসলামের নামে সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন, তিনি যেন এদেশে এসে ইংরেজ রাজশক্তির অঙ্কুর বিনষ্ট করেন।

পাঁচ

মুঘল আমলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। দেশের ভিতরে লৌকিক প্রভাবে, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজটাও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। নবাব-পরিবারের হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান যেভাবে প্রবেশলাভ করেছিল, তা থেকেও এই সমন্বয়ের ব্যাপারটা উপলব্ধি কর সম্ভব। মতিঝিল প্রাসাদে শাহ্‌মত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজউদ্‌দৌলা সানন্দে *হোলি* উৎসব পালন করেছিলেন।[৫১] মীরজাফরও হোলিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কীর্তীশ্বরীর পাদোদক পান করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি।[৫২] মুবারকউদ্‌দৌলা সাড়ম্বরে ভেলা ভাসান পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন এবং আরো কয়েকটি অনৈসলামিক অনুষ্ঠানের মতো এটিও অভিজাত মুসলমানদের খুব প্রিয় ছিল।[৫৩]

সমাজের উপর মহলে যেমন, তেমন সমস্ত সমাজদেহেই ধর্ম-সমন্বয়ের কাজ চলছিল। অবশ্য কেবল নবাবী আমলে নয়, তার বহু আগে থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় প্রধানত সুফী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত পীর-দরবেশের দ্বারা এবং সুফী সাধকেরা ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা উপেক্ষা করেছিলেন। যে-বিস্তৃত জনসমষ্টিকে এঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁরাও ইসলাম-সম্মত সকল আচার-অনুষ্ঠানকে জীবনে গ্রহণ করেন নি। এদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে।[৫৪] ধর্মমত-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সকলেন মনের বদল হয় নি এবং পূর্বকালের অনেক সংস্কারও তাঁদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছিল।

জনৈক ইওরোপীয় গবেষক ভারতে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের চারটি পথ নির্ণয় এগুলো হচ্ছে : হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রীগ্রহণ র মধ্যে একটি বহুলপ্রচলিত প্রথা ছিল), মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম-মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব (আকবর ও দারাশিকো যার প্রতিভূ) এবং ধর্মান্তর-গ্রহণের অসম্পূর্ণতা(ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ)।[৫৫]

এর ফলে, মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস, কোন সিদ্ধান্ত-গ্রহণের জন্যে কুরআন শরীফ খুলে দেখার প্রথা, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দিওয়ালীর মতো উৎসবে যোগদান এবং মুসলমান

ফকীরদের মাথার চাঁদি কামানো ও সর্বদেহ ভস্মাচ্ছাদিত করার রীতি প্রভৃতি দেখা যায় আর হিন্দু সমাজের অনুকরণে এক ধরনের বর্ণপ্রথাও গড়ে ওঠে।[৫৬]

অবশ্য ইসলামের উপরে এই অনৈসলামিক প্রভাব যে কেবল ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, একথা বলা চলে না। বিজয়ী ও বিজেতাদের ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা মুসলিম-অধিকৃত পারস্যেও হয়েছিল। তাই দেখা যায়, জোরাস্টার ইবরাহীমের সঙ্গে, আবেস্তা সুহুফের সঙ্গে এবং অনৈতিহাসিক ও পৌরাণিক রাজা জামসিদ সোলেমানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন।[৫৭] ভারতে মুসলমানদের উপরে যে-অনৈসলামিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি, তার অনেকগুলো প্রথা ইরানেও প্রচলিত ছিল। আর ইসলামের জন্মভূমি আরবেও যে এই ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থাকে নি, তার প্রমাণ ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। মোটকথা, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মবহির্ভূত নানারকম সংস্কার ও বিধিনিষেধের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল।

ধর্ম-সম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যবোধও আবার এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু দেবদেবীদের সংখ্যাধিক্য ও তাঁদের গুণাবলীর পরিচয় মুসলিম-মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার ফলে এসব দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপও গড়ে ওঠে। যেমন, হিন্দু বনদুর্গার প্রতিপক্ষ মুসলমানের বনবিবি ফাতেমা, বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের রূপান্তর গাজীপীর ও কালু শাহা, মৎস্যেন্দ্রনাথের মুসলমান সংস্করণ পীর মসন্দলি, সত্যনারায়ণের প্রতিরূপ সত্যপীর। শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবদেবী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্য ছিল। মুসলমান সমাজে খাজা খিজির, বদর পীর, মাণিক পীর ও পাঁচ পীরের উপাসনাও দেখা যায়। এইসব পীরের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। হিন্দুরা যেমন পীরের আস্তানায় মানত করতেন ও মসজিদে শিরনি দিতেন, তেমনি মুসলমানেরাও হিন্দু দেবদেবীদের স্মরণ করতেন।

এই দেব ও পীর-পূজার পশ্চাতে অমুসলিম ভাবধারার প্রভাব কেবল প্রত্যক্ষভাবে নয়, সুফী চিন্তাধারার মাধ্যমেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। সুফীবাদের ভিত্তি অবশ্য কুরআন শরীফের কতকগুলো সুরায়, কিন্তু এতে নিওপ্লাতোনিজম ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব আছে,[৫৮] খৃস্ট ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।[৫৯] স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের শিক্ষা দিয়েছিলেন হজরত মুহম্মদ (দঃ)। প্রথম যুগের সুফী সাধকদের প্রধান লক্ষণও ছিল তাই, কিন্তু পরে তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে শেখান পীরের কাছে। সুফী ধারণামতে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সত্যপথে চলার জন্যে পীরের নির্দেশ অত্যাবশ্যক। পীরকে সুফীরা অলৌকিক পুরুষ বলে মনে করেন। স্রষ্টার সঙ্গে পীরের একাত্মতায় তাঁরা আস্থাবান, তাই পীরের চিন্তায় নিজেকে লীন করে দিলেই বাঞ্ছিতের সঙ্গসুখ লাভ করা সম্ভবপর বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।[৬০] ইমাম গাজ্জালীর মতো দার্শনিকও বলেছেন যে, যার কোন পীর নেই, শয়তানই তার পথপ্রদর্শক।[৬১] সুফী মতবাদের বিকাশের ধারায় পীরবাদের আবির্ভাবের মূলে বৌদ্ধধর্মত্যাগী মুসলমানদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল, এমন অনুমান[৬২] অসঙ্গত নয়। সুফী সাধনার *ফনা, মোরাকাবা* ও *কেরামত*-এর সঙ্গে ভারতের *নির্বাণ, যোগ* ও *অলৌকিকতা*কে মিলিয়ে নেওয়া চলে, *জিকির* ও *প্রাণায়াম*ও মূলত অভিন্ন।[৬৩]

সুফী প্রভাব, বিশেষ করে, সুফী সাধকদের প্রভাব সারা ভারতবর্ষেই খুব ব্যাপক ছিল। গোঁড়া সুন্নীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এঁদের জনপ্রিয়তা পল্লবিত হয়েছিল। *আইন-ই-আকবরীতে* চৌদ্দটি সুফী সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে : তাঁদের মধ্যে চিশ্‌তী, সুহ্‌রাওয়ার্দী, কাদিরী, সাত্তারি ও নক্‌শবন্দী শাখা প্রধান।[৬৪] ভারতে প্রাচীনকাল থেকে *গুরুচেলা* প্রথা চলে আসছিল বলে সুফী সাধনসম্মত পীরপ্রথাও প্রায় তৈরী ক্ষেত্র পায়। নবদীক্ষিত মুসলমানেরাও পীরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের পৌত্তলিক মনকে সান্ত্বনা দেবার একটা অবলম্বন খুঁজে পেলেন।[৬৫]

খৃস্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাংলাদেশে সুফী মতবাদ প্রবেশ করতে থাকে। অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ মুসলিম-শক্তির করায়ত্ত হলে এই প্রভাব ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। বাংলায় প্রথমে সুহ্‌রাওয়ার্দীয়াহ ও পরে চিশ্‌তীয়াহ সম্প্রদায়ভুক্ত সুফীরা আত্মপ্রকাশ করেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে দেখা দেন নক্‌শবন্দীয়াহ্‌ ও কাদিরীয়াহ্‌ শাখার সাধকেরা। এ দুয়ের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভাব ঘটে কালন্দরীয়াহ্‌, মাদারীয়াহ্‌, আদ্‌হামীয়াহ ও খিজিরী শাখার সুফীদের।[৬৬]

নবাবী আমলে সুফী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল আরো একটি কারণে। ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পর বহু ধর্মতাত্ত্বিক ও সুফী মতানুসারী ব্যক্তি বাংলায় এবং ভারতের অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[৬৭]

সারা দেশে এই যেসব পীর-ফকীর ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদেরকে কল্পনা করা হত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে। দেহত্যাগের পরও তিনি জীবিত থাকেন (জিন্দাপীর), এ ধারণাও প্রচলিত ছিল। তাঁর আস্তানায় মানত, তাঁর মূর্তিধ্যান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকটে ইচ্ছাপূরণের প্রার্থনা, পীরের কবরের উপর সৌধ-নির্মাণ এবং সেখানে আতর, গোলাপ-পানি ও লোবান দেওয়া, ফুল ও বাতি রাখা, শিরনি ও চিরাগ প্রভৃতি মানসিক করা এবং পীরের নামে উৎসর্গিত বস্তুকে তবররুক বা প্রসাদ বলে গ্রহণ করা — এসব হচ্ছে পীরবাদের প্রচলিত আচার।[৬৮] পীরের মাজারে অনুষ্ঠিত উরস শরীফে বিংশ শতাব্দীতেও হজরত মুহম্মদের (দঃ) শ্মশ্রু, পোশাক ও কদম-শরীফ (অর্থাৎ পাথরের উপরে তাঁর পায়ের ছাপ — যার সঙ্গে বিষ্ণুপদ-প্রদর্শনের তুলনা সহজেই মনে পড়ে) প্রদর্শিত হতে দেখা গিয়েছে।[৬৯]

পরবর্তীকালে সুফী চিন্তাধারার মধ্যে নানারকম প্রভাব এসে পড়ে এবং মূল ভাবধারা থেকে অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরকম বিচ্ছিন্ন সুফী সম্প্রদায় বা তাঁদের অনুবর্তীদের থেকে লৌকিক প্রভাববশত হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেবধনী, জিকির, ফকীর ও বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[৭০]

সুফী সাধনায় পৌত্তলিক প্রভাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংস্কারবাদের ধ্বজা তুলেছিলেন মহাপণ্ডিত শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪), যিনি মুজদ্দদ-ই-আলফ-ই-সানী নামে প্রসিদ্ধ। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর ইঙ্গিত সংস্কারকেই সম্রাট আওরঙ্গজেব কঠোরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিধর্মী আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব রোধ করাবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি দিল্লীর শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (১৭০৩-৬২)।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র পিতা আবদুর রহীম আল-দেহ্‌লভী ও পিতৃব্য ছিলেন সর্বজনপরিচিত সুফী। বাল্যকালে তিনিও নকশবন্দীয়াহ্ পন্থায় দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৭১] কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনে এই সুফী প্রভাব কার্যকর হয় নি—তার জন্যে আরবে তাঁর শিক্ষালাভ অনেকাংশে দায়ী। যে-সময়ে তিনি আরবে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তখন সেখানে আদিযুগের ইসলামের বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে একটি *পিউরিট্যানিক* ধর্মান্দোলনের সূচনা হয়েছিল — বিশেষত চিন্তার ক্ষেত্রে। আরবের সুবিখ্যাত ওয়াহাবীদের মতো চরম পিউরিট্যানিক মনোভাব অবশ্য ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল না। তাঁর মতবাদের একটি প্রধান কথা এই যে, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।[৭২] তাই, ওহাবীদের মতো সুফী মতবাদের উচ্ছেদ তিনি চান নি, তিনি চেয়েছিলেন এর সংস্কার করতে—যাতে সুফী মতবাদ ও শাস্ত্রীয় ইসলামের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হয়।[৭৩] ধর্মকে ওয়ালীউল্লাহ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে পেরেছিলেন। কেবল ঈশ্বরপ্রেরিত বলেই ধর্মপালন করতে হবে, এ কথা তিনি মনে করেন নি। তাঁর ধারণায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্যেই ধর্মপালনের আবশ্যকতা।[৭৪] কেননা, তাঁর মতে প্রত্যেক ধর্মেরই প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধন, ধর্মের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের স্থান তার পরে। প্রাচীন পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের জন্যেই প্রধানত হজরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব হয়েছিল, একথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি।[৭৫]

ভারতবর্ষের তৎকালীন পতনোন্মুখ অবস্থা-সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্ সচেতন ছিলেন। সেদিনের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধ:পতনের দুটি মূল কারণ তিনি নির্ণয় করেছিলেন : প্রথমত, মুঘল রাজসভায় আশ্রিত অকর্মণ্য পরগাছা-জাতীয় লোকদের সংখ্যাধিক্য — যার ফলে, দেশের অর্থের অপচয় ঘটছে। দ্বিতীয়ত, রাজস্বের এই ক্ষতিপূরণের জন্যে সাধারণ মানুষের উপরে অন্যায় করভার চাপানো হচ্ছে—যার ফলে, লোকের মনে দেখা দিয়েছে অসহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহের ভাব। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এর প্রতিকারের একমাত্র পথ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য বিধান করা—যাতে সাধারণ লোকে আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তা না হলে দেশের পতন অনিবার্য।[৭৬]

ধর্মীয় অবনতির প্রতিকার হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের আদি সারল্য ও বিশুদ্ধতায় প্রত্যাবর্তন করতে। তিনি বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন, বিবাহানুষ্ঠানে ও মৃতের কল্যাণকামনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে অমিতব্যয় ও অনাবশ্যক আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন এবং পীরপ্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।[৭৭]

ধর্মের নির্দেশ যেন মানুষ বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, যেন তা অন্ধ যান্ত্রিকতায় ও অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণে পর্যবসিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ওয়ালীউল্লাহ্ কুরআনের প্রথম ফারসী অনুবাদ করেন। এজন্যে তিনি গোঁড়া আলেমদের শত্রু হয়ে দাঁড়ান, এমন কি, কিছুদিনের জন্যে দিল্লীর বাইরে গিয়ে থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এতে তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান হয় নি। সুফীদের বিভিন্ন শাখার ঐক্যবিধান করতে গিয়ে তিনি সকলের অপ্রিয় হয়েছিলেন। সুন্নীরা তাঁকে শিয়া মনে করতেন, আর শিয়ারা তাঁকে ভাবতেন সুন্নী।[৭৮] তাঁকে ভণ্ড বলে আখ্যা দিয়েও অনেকের তৃপ্তি হয় নি, মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে তাঁকে প্রকাশ্যে অপমানিত করে এঁরা সান্ত্বনা খুঁজেছেন।[৭৯]

সমসাময়িককালে তিনি এই নিগ্রহ ভোগ করে থাকলেও উত্তরকালে তাঁর চিন্তাধারার অপরিসীম গুরুত্বের উপলব্ধি ঘটে। সমাজ ও সভ্যতার সেই সঙ্কটকালে তিনি নতুন সমাজবিন্যাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে। তিনি যে-যুগের মানুষ, সে-যুগে ধর্মকে পরিত্যাগ করে জীবনধারার পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখা সম্ভবপর ছিল না। তাঁর থেকে অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে রাজা রামমোহন রায়ও (১৭৭২-১৮৩৩) তা পারেন নি। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের একটি ফল দেখা যায় Theological Criticism- এর বিকাশে : ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা অবলম্বন করে ধর্মবিষয়ক স্বাধীন আলোচনার উদ্ভবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন যে, হিউম্যানিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'প্রাচীন শাস্ত্রকেই তাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেন। এও নবযুগেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[৮০] তাহলে একথাও বলা চলে যে, সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই নবযুগের আলোকবর্তিকা প্রথম যাঁর হাতে দেখা দিয়েছিল তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্। মানুষের নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভাবধারার অবদান একালেও তাই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দাবি করে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারা বিকশিত ও প্রচারিত হয়েছিল প্রধানত পুত্র শাহ্ আবদুল আজিজের (১৭৪৬-১৮২৩) মাধ্যমে। তাঁর অপর পুত্র শাহ্ আবদুল কাদির কুরআন শরীফের প্রথম উর্দু অনুবাদ সংকলন করেন। অর্থাৎ মাতৃভাষার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব এবং সে ভাষার উন্নয়নে আগ্রহপ্রকাশও এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর আবদুল আজিজ পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মবিষয়ে তাঁর উদারতার পরিচয় পাই একটি ছোট ঘটনায়। সেকালে আবদুল আজিজের সমতুল্য আলেম আর ভারতবর্ষে ছিল না : তবু জনৈক মুসলমানের প্রশ্নোত্তরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বরানুপ্রাণিত পুরুষ' বলে আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নি। দিল্লীতে যখন কোম্পানীর উদ্যোগে কলেজ স্থাপিত হয়, তখন স্থানীয় মুসলমানেরা এই কলেজে পড়বেন কিনা, এ সম্পর্কে তাঁর কাছে *ফতওয়া* দাবি করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদেরকে পড়তে উপদেশ দেন এবং বলেন যে, সেটি ধর্মসিদ্ধ কাজ হবে। ইংরেজ সরকারের অধীন চাকরি গ্রহণ করাও তিনি সমর্থন করেছিলেন।[৮১] কিন্তু পরে বোধ হয় তাঁর এই মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলকে *দার-উল-হর্‌ব* বা বিধর্মীশাসিত দেশ বলে অভিহিত করেছিলেন।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব তখনই বাংলাদেশে দেখা দেয় নি। তবে এর পরোক্ষ প্রভাব দেখা দেয় সৈয়দ আহ্‌মদ বেরিলভী-প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের মাধ্যমে, যার স্বরূপ আমরা পরে আলোচনা করব।

তথ্যনির্দেশ

১ Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal* II (Dacca 1948), 234.

২. ঐ 409

৩. *তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ্* থেকে উদ্ধৃত, ঐ, 403-404

৪ ঐ 454

৫. Seid Gholam Hossain, *Seir Mutaqherin* (2nd edn, Calcutta 1902) I, 279, 281, 346

৬. উদ্ধৃত,

৭ R C Majumdar H C Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India*, III (2nd edn, London 1949) 659

৮ Kalikinkar Datta, *Alivardi and his Times* (Calcutta 1939) 118 'So when Mir Jafar and some of the influential Zamindars of Bengal assembled in the house of Jagat Seth at Murshidabad to drive plans for the overthrow of Sirajuddaulah, the wisest among them Maharaja Krisnacandra of Nadia suggested the advisability of inviting the help of the English against the Nawab, because of their efficient administration of justice and steady protection of those who sought their help" তুলনীয় · ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের সিক্রেট কমিটির কাছে ২৬ জুলাই ১৭৫৭ তারিখে লেখা লর্ড ক্লাইভের পত্র। A B Keith (ed) *Speeches and Documents on Indian Policy* (London 1922) I, 6-7

৯. Majumdar, Raychaudhuri and Datta 638-9

১০. Edward Thompson and G T Garratt, *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, (2nd edn, London, 1935) 100

১১. ঐ, 105

১২. Gholam Hossain, III, 13, 20

১৩. ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সের কাছে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫ তারিখে লেখা লর্ড ক্লাইভের পত্রের উদ্ধৃতি, Romesh Dutt, *The Economic History of India under early British Rule* (3rd edn, London, 1968) 37 "The source of tyranny and suppression opened by the European agents acting under the authority of the Company's servants and the numberless black agents and sub-agents acting also under them, will, I fear, be a lasting reproach to the English name in this country"

১৪. ঐ, 23.

১৫ উদ্ধৃত, ঐ, 25-27

১৬. ঐ 45

১৭. উদ্ধৃত, Thomson and Garratt, 109

১৮. উদ্ধৃত, ঐ, 109

১৯. Dutta পূর্বোক্ত, 46.

২০. ঐ 52-53

২১. Majumdar, Raychaudhuri and Dutta. 809

২২ 'Bengal', *Encyclopaedia of Islam*, I (Leyden 1913) 696 "India" *Encyclopaedia of Islam* II (Leyden 1927), 479

২৩. Murray T Titus, *Indian Islam* (Oxford, 1930), 169

২৪. W W. Hunter, *Statistical Accounts of Bengal*, IX (London. 1876), 60 কেউ কেউ এ

বিবরণের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। দ্রষ্টব্য : Khondkar Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal* (Calcutta, 1895), Ch I

২৫ W W Hunter, *The Indian Musalmans* (3rd edn , London, 1876), 159

২৬. A R Mallick, *British Policy and the Muslims of Bengal* (Dacca, 1961), 32

২৭ ঐ, 33

২৮ Dutt, পূর্বোক্ত, 60

২৯ James Grant Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal, W K Firminger (ed), *Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company* (Calcutta, 1917), 11, 194-20

৩০ তুলনীয় Hunter, 162 'For the whole tendency of the [Permanent] Settlement was to acknowledge as the landholders the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen '

৩১ Thompson and Garratt, 194

৩২. রাইট-অনারেবল উইলিয়ম পিটের কাছে ৭ জানুয়ারী ১৭৬৯ তারিখে লেখা লর্ড ক্লাইভের পত্র। Keith, I, 14

৩৩ ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে ২৮ নভেম্বর ১৭৬৮ তারিখে লেখা লর্ড ক্লাইভের পত্র। উদ্ধৃত, H Beveridge, 'Warren Hastings in Lower Bengal' October, 1877, 220

৩৪. Thompson and Garrat, 175

৩৫ Mallick, 169

৩৬ Datta, 236-37

৩৭. Mallick, 149

৩৮ Sarkar, 410, Datta, 166

৩৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' থেকে উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী* (দ্বি-স, কলিকাতা, ১৩৫৭), ভূমিকা, ২৬।

৪০. J Long (ed) *Adm's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar* (Calcutta, 1868), 1215

৪১ Indian Education Commission Report (1822) থেকে উদ্ধৃত, Syed Mahmud, *A History of English Education in India* (Aligarh, 1895), 147 'When in 1782 the Calcutta Madrassa was founded by Warren Hastings it was designed to qualify the Muhammadans of Bengal for the public service and to enable them to compete, on more equal terms, with the Hindus for employment under Government '

৪২. Majumdar, Raychaudhuri and Datta, 816-17

৪৩ *Second Report of the House of Lords* (1852-53) *on Indian Territories*, 113- তে বর্ণিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাক্ষ্য। উদ্ধৃত, Syed Mahmud, 2-3

৪৪. Thompson and Garratt, 244

৪৫. Abdur Razzaq, 'The Mind of the Educated Middle Class in the Nine-teenth century', *New Values*, IX, no 2, 30

৪৬. J M Gosh, *Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal* (Calcutta, 1930), Brajendranath Banerji, *Dawn of New India* (Calcutta 1927). Chs I-IX.

৪৭. Ghosh, Ch I

৪৮. ঐ, Ch XI

৪৯. L S S O'Malley *Bengal District Gazetteers Midnapore* (Calcutta, 1911), 39-45, বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, (কলিকাতা, ১৯৫৭), ৩৫৬-৫৭।

৫০. R C Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of* 1857 (Calcutta, 1957), 26
৫১. *মুজাফ্ফরনামা* অবলম্বনে, Dutt, 116
৫২ Gholam Hossain, II, 265, 558
৫৩ ঐ, III 142-46
৫৪ India', *Encyclopaedia of Islam*, II, 479
৫৫. Titus, 56
৫৬ ঐ, 166-69
৫৭ Edward G Browne, *A Literary History of Persia* (6th edn , Cambridge, 1956) I, 113-14
৫৮ ঐ, I, 416-21
৫৯ H A R Gibb, *Mahomedanism* (2nd end,, London, 1950), 130 138
৬০ Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture* (Allahabad, 1946), 81-82
৬১. উদ্ধৃত, Gibb, 150
৬২. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (কলিকাতা, ১৯৩৫), ২২৯।
৬৩ Tarachand, পূর্বোক্ত, 67 82
৬৪ Titus, 111-12
৬৫. ঐ, 131
৬৬ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, ৮৯-১১২।
৬৭. Sarkar, 223
৬৮ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, ২১১, ২২৫-২৬।
৬৯. Titus, 137
৭০ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, ১৮৪-৮৬।
৭১ Shah Waliullah, '*Autobiogrphy*', *JASB*, N S VII, 163
৭২ Tarachand, 'Growth of Islamic Thought in India', S Radhakrishnan *et al* (ed), *History of Philosophy—Eastern and Western* (London, 1952),I,504
৭৩ S M Ikram 'Shah Waliullah (I)' Mahmud Hussain *et al* (ed), *Histroy of the Freedom Movement* (Karachi, 1957), I, 457
৭৪ ঐ, 1506
৭৫ F M Asiri 'Shah Waliullah', *Visvabharati Annal*, IV, 37
৭৬ Tarachand, 'Growth of Islamic Thought in India', পূর্বোক্ত, 505-6
৭৭. Ikram, 'Ṣhah Waliullah (I)', পূর্বোক্ত, 507-8
৭৮. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্, 'ভাবতে ওহাবী আন্দোলন', 'ইতিহাস', ৭:১৩৯।
৭৯. Tarachand, 'Growth of Islamic Thought in India', পূর্বোক্ত, 506
৮০. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (কলিকাতা, ১৩৬৪-৬৫) ১:৭, ৫৪।
৮১. হবিবুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, ২০৭।
৮২. Khaliq Ahmad Nizami, 'Shah Waliullah (II)', Mahmud Hussain *et al* (ed), *History of the Freedom Movement* পূর্বোক্ত, 1,540

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮০১-১৮৫৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে-অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তার সম্প্রসারণ ঘটে। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলেছে, আর একের পর আরেক রাজ্য কোম্পানীর করতলগত হয়েছে। ভারতবর্ষকে শোষণ করে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি হলেও এদেশের মৌলিক উন্নতি সাধিত হয় নি। এককালে যে-দেশ রেশম ও সুতী জিনিস রফতানী করত, কোম্পানীর অনুসৃত নীতির ফলে সেই দেশ এখন ইংল্যাণ্ড থেকে এসব দ্রব্য আমদানী করতে বাধ্য হল। কোম্পানী এবং বৃটিশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহে ভারতবর্ষের শিল্প কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত জে. সি. মেলভিল, সি. আই. ট্রেভেলিয়ান, এইচ লার্পেন্ট ও মন্টগোমারী মার্টিন প্রমুখ ব্যক্তির সাক্ষ্যে।[১] লার্পেণ্ট খোলাখুলি বলেন 'We have destroyed the manufacture of India'[২] দেশী শিল্প ধ্বংস করার ফল কতদূর শোচনীয় হয়, তা জানা যায় ট্রেভেলিয়ানের প্রদত্ত তথ্য থেকে। তিনি জানান যে, মসলিন শিল্পের ক্রমবিলোপের ফলে ঢাকার জনসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।[৩] পূর্বপরিকল্পিত উপায়ে ভারতবর্ষের শিল্প তো ধ্বংস করা হল, কিন্তু তার কৃষির উন্নতিসাধনের কোন ব্যবস্থা হল না, সেচব্যবস্থাও অবহেলিত হল। অন্যদিকে ভারতীয় ঋণের (Indian debt) সূচনা হওয়ায় এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় আরেকটি আঘাত পড়ল।

১৮১৩ খৃস্টাব্দের সনদে কোম্পানীর একচেটে বাণিজ্যের অধিকার রহিত করা হয় এবং ১৮৩৩-এ তার বাণিজ্যের ক্ষমতা একেবারে বিলোপ করা হয়।[৪] কিন্তু তাতে এদেশবাসীর কোন সুবিধে হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরাই সর্বেসর্বা ছিলেন, এদেশীয়দের স্থান হয়েছিল তাদের দালাল ও বেনিয়ান হিসেবে। এর উপরে দেখা দিল নীলকরদের অত্যাচার। উনিশ শতকে নীল চাষের উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। অচিরেই বাংলাদেশে গড়ে ওঠে প্রায় তিন চারশ নীলকুঠি।[৫] এসব কুঠিয়ালরা কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করতেন এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রায়তদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এই নিগৃহীত কারিগর ও চাষীদের মধ্যে যে অনেক মুসলমান ছিলেন, এই অনুমান আমরা করেছি।[৬]

১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো আইন তৈরী হয়। এইসব আইন-কানুন লোকসাধারণের গোচরীভূত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। ফলে, অনেকের সম্পত্তি তাদের অগোচরেই নতুন আইন-অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন করেও সাধারণত কোন ফল হত না।

লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান উচ্চবিত্তের পতন হয়, এই মত লোকপ্রিয়। এই ব্যবস্থায় মুসলমানদের ক্ষতি হল ঠিকই, কিন্তু এ ক্ষতি কেবল তাঁদেরই হল না। দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তিতে হিন্দুর ক্ষতিও কম হয় নি; কিন্তু হিন্দু সমাজ

অন্যভাবে (যেমন, নতুন জমিদারী লাভ করে বা কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করে বা ইংরেজ বণিকদের সহকারী হয়ে) নিজেদের পুনর্গঠন করতে পেরেছিলেন, মুসলমানেরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।

কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ থেকে এ-দেশীয়দেরকে বঞ্চিত করা হয়। এই অন্যায় প্রথা দূর করে বেন্টিঙ্কই প্রথম ভারতীয়দেরকে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে বিচার বিভাগে কিছু সংখ্যক মুসলমানের স্থান হল বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে গৃহীত অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে এই ভাগ্যলাভ থেকে বঞ্চিত করল। ১৮২৯-এ ফারসীর স্থানে ধীরে ধীরে ইংরেজী প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত হয়।[৭] ১৮৩৫এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং আরো দু বছর পরে সরকারী ভাষা হিসেবে ফারসীর স্থানে ইংরেজীকে গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে ইংরেজী-শিক্ষিতেরাই কেবল সরকারী চাকরির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে আরম্ভ করেন। তখন দেখা গেল, ইংরেজী শিক্ষায় বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর তুলনায় অনেক পশ্চাদপদ হয়ে রয়েছেন।

দুই

ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণাবশত: এদেশের মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে যে-ধারণা প্রচলিত আছে, তার পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন।

১৮১৩ খৃস্টাব্দের সনদ-অনুযায়ী ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার দায়িত্ব অর্পিত হয় কোম্পানীর উপরে। এরপরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তারের তেমন চেষ্টা দেখা যায় নি। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোই বিকাশলাভ করতে থাকে : ১৮১৪র পর এইসঙ্গে যুক্ত হয় ডেভিড হেয়ারের মতো বিদ্যোৎসাহী বিদেশী ও রাজা রামমোহনের মতো শিক্ষিত বাঙালীর মিলিত প্রচেষ্টা।[৮] মিশনারী স্কুলে মুসলমান ছাত্রেরাও পড়ত তার প্রমাণ পাই চুঁচুড়া অঞ্চলে স্থাপিত রবার্ট মে'র স্কুলগুলোয় মুসলমান শিক্ষার্থীর সমাবেশ।[৯] ১৮১৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিতে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন।[১০] পরবর্তী বৎসরে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সদস্যদের মধ্যে প্রথমে মুসলমান ছিলেন অধিক, পরে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যসংখ্যা সমান করা হয়।[১১] সোসাইটি-পরিচালিত স্কুলসমূহে মুসলমান ছাত্রেরা — হিন্দুর তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও — পড়াশোনা করত।[১২] এমন কি, এ যুগে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভও অজ্ঞাত ছিল না।[১৩]

অন্যপক্ষে, আমরা এমনও দেখতে পাই যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছে[১৪] এবং পরিণামে সেই ব্যবস্থা বিলোপ করতে হয়েছে।[১৫] শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে ফারসী পড়বার দাবিও বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়েছিল।[১৬]

আবার এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে ইংরেজী স্কুল-প্রতিষ্ঠার জন্যে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।[১৭] মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত নিজামত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।[১৮] হাজী মুহম্মদ মহসীনের দানে স্থাপিত হুগলী

কলেজেও ইংরেজী শিক্ষালাভের অনুরূপ সুযোগ ছিল।[১৯]

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কলকাতা মাদ্রাসায় এ বিষয়ে নানারকম গোলযোগ দেখা দেয়। প্রথমে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২৯- এর দিকে যখন ইংরেজী ক্লাস খোলা হল, তখন দেখা গেল, ইংরেজী পড়ার ব্যয় - সঙ্কুলানের ক্ষমতা মুসলমান ছাত্রদের নেই। ১৮৩৩এ ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য করা হল মাদ্রাসায়, কিন্তু নানাকারণে তার সুফল হল না।[২০] এ প্রসঙ্গে ডক্টর মল্লিকের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> The obvious conclusion that suggests itself in respect of education under State patronage upto 1835 is that the Muslims who cared for education were not in any way prejudiced against receiving English or western education, but that they had very limited opportunities of acquiring this education The system and course of studies offered to them was defective and their only Institution was very badly managed and inefficiently run Again, the early efforts of the company to educate the people were made in the city of Calcutta where the Hindus predominated The overwhelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive the much needed attention of the Government till very late Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from the Government Without ascribing any motive, whatsover, it can also be said that the policy of the ruling authorities was often faltering and, in most cases, though well-intentioned, it served to benefit the Hindus rather than the Muslims.[২১]

আর্থিক সঙ্গতির অভাবই বাঙালী মুসলমানের ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই সঙ্গতি ছিল বলেই যুক্তপ্রদেশের মুসলমানেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন —ধর্মীয় গোঁড়ামি বা আত্মাভিমান বাঙালী মুসলমানের চাইতে তাঁদের কম ছিল না।

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুসলমানের মনে সন্দেহ জেগেছিল আরো পরের দিকে। শিক্ষাবিভাগীয় কমিটির সভাপতি মেকলের পরামর্শ-অনুযায়ী লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫এ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার প্রতি মেকলের ছিল চরম ঘৃণা।[২২] তাঁর এই উগ্র মনোভাবের জন্যে যখন শেক্সপীয়র ও জেমস্ প্রিন্সেপের মতো ব্যক্তি কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সভাপতি ও সম্পাদকের পদ ত্যাগ না করে পারেন নি,[২৩] তখন তা এদেশের হিন্দু-মুসলমানকে নিশ্চয় আহত করে থাকবে। সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী যখন ফারসীকে স্থানচ্যুত করল, তখন কিছু-সংখ্যক হিন্দু দুঃখিত হয়ে থাকলেও মুসলমানের বেদনাই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এরপর শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট সকল অর্থ যখন সরকার কেবল ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ব্যয় করার সঙ্কল্প করলেন এবং গরীব ছাত্রদেরকে স্টাইপেন্ড দেবার নিয়ম রহিত করে কেবল মেধার ভিত্তিতে স্কলারশীপ দানের ব্যবস্থা করা হল, তখন মুসলমান সমাজ প্রমাদ গণলেন। এই দুটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলকাতার সকল সম্ভ্রান্তমুসলমান ও মৌলভীসহ আট হাজার

ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। নীতিগতভাবে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এতে বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রালোচনার পথ বন্ধ করে সরকার যেভাবে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছেন, তার ফলে, প্রজাদের মনে এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, সরকারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা।[২৪]

এরকম সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছিলেন আসলে খৃস্টান মিশনারীরাই। এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও একথা বলা যায় যে, তাঁরা এদেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিলেন। মিশনারীদের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার অনুষঙ্গ হয়তো ধর্মনিষ্ঠ মনে বিভ্রান্তি ও বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। এই মনোভাব হিন্দু সমাজের মধ্যেও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অধিকাংশের আর্থিক সঙ্গতি ছিল বলে বাঙালী হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেন। আর তার অভাবে বাঙালী মুসলমান পিছিয়ে পড়লেন। ১৮৫১ পর্যন্ত কলকাতা মাদ্রাসা থেকে মাত্র দু'জন জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন : একজন আবদুল লতিফ (পরে নবাব আবদুল লতিফ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন), অপরজন ওয়াহিদ্‌উন্‌নবী। এই সময় পর্যন্ত হুগলী কলেজ থেকে একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলমানের সংখ্যাও মাত্র দুই ঃ মুসা আলী ও ওয়ারিস আলী।[২৫]

এ অবস্থার উন্নতি হয়েছিল ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগের প্রবর্তনে। এখানে স্বল্পবেতনে (হিন্দু স্কুলের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ খরচে) ইংরেজী পড়ার সুযোগ পান মুসলমান ছাত্রেরা। ফলে, যেখানে ছাব্বিশ বছরে মাদ্রাসা থেকে মাত্র দুজন জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা পাস করেন, সেখানে শুধু ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে সাতজন ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর ১৮৫৬-৫৭ খৃস্টাব্দে ১৫৮জন ছাত্র ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকে।[২৬]

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো যুগপুরুষের আবির্ভাব হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশে এঁরা কেউই বর্ধিত হন নি, কিন্তু তার প্রাণশক্তি এঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। ইংরেজ আমলের নতুন জমিদার ও বিদেশী বণিকদের সহচরেরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফলে, পুরোনো আর্থিক কাঠামো ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে পুনর্গঠনের কাজও শুরু হয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার চলছিল। দেশী হিন্দু ও বিদেশীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮১৬ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলার উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে এই কলেজের বৈপ্লবিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। হিন্দু কলেজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস এক অর্থে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। প্রথম যুগে এই কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত *ইয়ং বেঙ্গল*দের ভূমিকা সামাজিক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রাচীন সংস্কারের ভিত্তিমূলে তাঁরা যে-দৃঢ় আঘাত করেছিলেন তার গুরুত্ব কম নয়। সে যুগে একদিকে ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল, অন্যদিকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীলেরা। মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা। প্রথম যুগের উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হলেও ইয়ং বেঙ্গলেরা এই সামাজিক সংস্কারবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার নবজাগণের পথ নির্মাণ করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা প্রকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়নের সম্পূর্ণ সুযোগসৃষ্টির জন্যে আরেকটি শিক্ষাকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। তার ফলে ১৮২৪ খৃস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়।

তালিকা – ১

সরকারী স্কুল-কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা[২৭]

সাল	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যধর্মীয় ছাত্র	মোট ছাত্র
১৮৪১	৩১৮৮	৭৫১	৯৫	৪০৩৪
১৮৪৬	৩৮৪৬	৬০৬	৮৫	৪৫৩৭
১৮৫১	৩৮১৪	৭৯৬	৬৪	৪৬৭৪
১৮৫৬	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	৭২১৬

তালিকা – ২

হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিতের অনুপাত [২৮]

	মুসলমান	হিন্দু
ফারসী জানা	১ ১/৩	১
বাংলা জানা	১	২৪
শিক্ষারত	১	১০ ১/২
পড়তে সক্ষম	১	৭ ১/৩
মোট শিক্ষিত	১	৯

তালিকা – ৩

বাংলা ও ফারসী-শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত[২]

বাংলা জানা		ফারসী জানা	
হিন্দু	১৯ ২/৩	মুসলমান	১
হিন্দু	৩৩ ১/৪	হিন্দু	১
মুসলমান	১	মুসলমান	১ ১/৩
মোট	১২ ১/২	মোট	১

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল রামমোহনের ধর্মান্দোলনে। বাংলায় ও বাংলার বাইরে মুসলমান সমাজেও ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে আলোড়ন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ ঘটায় নি — সে আন্দোলন তাকে নিয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীলতার সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে। এই রক্ষনশীলতা থেকে আধুনিকতায় আসতে তার প্রয়োজন হয়েছিল অনেক সময়ের এবং আরো একটি ভাব-আন্দোলনের

তিন

দিল্লীর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুই পুত্র, আবদুল আজিজ ও শাহ্ আবদুল কাদির, পিতার ভাবধারা-প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদেরই এক শিষ্য সারা ভারতব্যাপী ধর্মান্দোলন গড়ে তোলেন, যা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিতে আঘাত করেছিল। তাঁর নাম সৈয়দ আহ্মদ বেরিলভী।

১৭৮৬ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত রায়বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম হাসানের বংশে অধস্তন ৩৪তম পুরুষ। স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি দিল্লীতে শাহ্ আবদুল আজিজ ও বিশেষ করে শাহ আবদুল কাদিরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন (১৮০৭-০৯)। রায়বেরিলীতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বিবাহ হয়। বছর দুই পর তিনি টংকের নবাব আমীর খান পিন্ডারীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। আমীরের চাকরি ত্যাগ কবে ১৮১৭ খৃস্টাব্দে তিনি আবার দিল্লীতে আসেন এবং ভারতে ইসলামের সংস্কার-আন্দোলন করবেন বলে স্থির করেন। শাহ্ আবদুল আজিজের ভাগিনেয় শাহ্ ইসমাইল ও জামাতা মৌলভী আবদুল হাইও এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সৈয়দের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে অচিরেই এঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন — এতে সৈয়দের মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন পর্যন্ত তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অনৈসলামিক ভাবধারা থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠান করে তিনি বহু সংখ্যক লোককে নিজের মতবাদে দীক্ষিত কবেন। ১৮২১এ কলকাতায় এসে পৌঁছলে তাঁকে এক অভূতপূর্ব সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনমাস কলকাতা-অবস্থিতির পর হজ্ করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা যাত্রা করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮২৪এ।[২৯]

শিষ্যদের মধ্যে থেকে সৈয়দ আহমদ চার জনকে খলিফা মনোনীত করেন। এঁরা হচ্ছেন বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী, কেরামত আলী ও জয়নুল আবেদীন – এই তিনজন নেতার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশে : বিলায়েত আলীও কর্মব্যপদেশে সারা বাংলা ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলায় এঁদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।[৩০] শাহ্ মুহম্মদ হোসেন ছিলেন পাবনার অধিবাসী।[৩১] আর বিলায়েত আলী ও কেরামত আলী ছিলেন শাহ্ আবদুল আজিজের ছাত্র।[৩২]

কথিত আছে যে, সৈয়দ আহ্মদ যখন শ্রীরামপুরে প্রচার করতে আসেন, তখন কয়েকজন পাঠান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জনান যে, পাঞ্জাবে শিখেরা বহু মুসলমান রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করেছে। এই অবমাননার প্রতিকার না হলে কেবল সংস্কার-আন্দোলনে কি লাভ,

তাঁরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই সংবাদ অবগত হয়ে সৈয়দ শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।[৩৩] হজব্রত পালন করে দেশে ফিরে এসে সেই জন্যে তিনি প্রস্তুতি নিলেন দু বছর ধরে — একবার সারা ভারত পর্যটন করলেন। ১৮২৬এ পাঁচ-ছশ অনুসারী সঙ্গে নিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। সৈয়দকে ইমাম নির্বাচন করা হল। অচিরেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে তাঁর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল ৮০,০০০এ।[৩৪] ১৮৩০-এ পেশোয়ার দখল করে তাঁরা সরকার গঠন করেন। কিন্তু এরপর তাঁর কোন কোন সংস্কারপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যেমন হিন্দুস্থানী পুরুষদের সঙ্গে পাঠান মহিলাদের বিবাহদানের চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সৈয়দ পলায়ন করতে বাধ্য হন।[৩৫] যা হোক, ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। ডক্টর মাহ্‌মুদ হোসেন মনে করেন যে, শিখেরা তাঁর দেহ ভস্মীভূত করে ফেলে।[৩৬]

সৈয়দ আহ্‌মদ বেরিলভী-প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার। সাধারণত এই আন্দোলন ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত, কিন্তু নেতারা এর নামকরণ করেছিলেন তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বলে।[৩৭] আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্যের সঙ্গে এর কিছু মিল আছে বলে অধিকতর পরিচিত নামেই এর খ্যাতি হয়েছে। মূল ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে মধ্য-আরবের নেজদ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আগত যেসব প্রভাব ইসলামকে তার আদিরূপ থেকে বিচ্যুত করে, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনে অনুসৃত ধর্মাচরণের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সেকালের ইসলামের বিশুদ্ধতা ও সরলতায় প্রত্যাবর্তন করা। দেরাইয়ার শাসক সউদ ইব্‌নে আবদুল আজিজের সহায়তা লাভ করে তিনি শক্তিসঞ্চয় করেন এবং ইসলামের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করে আরবের অধিকাংশ রাজ্য জয় করে তাঁর মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৩ তে আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র-পৌত্র ও শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এই আন্দোলন চালিয়ে যান। সউদের পুত্র আবদুল আজিজ ১৮০২-৩ খৃস্টাব্দে মক্কা জয় করে যে-ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাতে ওয়াহাবী আন্দোলনের কতকগুলো মূলকথা বলা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌র একত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর কোন শক্তিকেই তাঁর অংশীদার বলে মনে করা চলবে না; পাঁচটি ফরজ পালন করতে হবে; হজরত মুহম্মদ (দঃ)-কে মরণশীল মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে; স্বীকার করতে হবে যে, তিনি সাম্প্রদায়বিশেষের নন, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; পীর ও মাজার পূজা এবং সকলরকম আড়ম্বর পরিহার করতে হবে।[৩৮] আবদুল ওয়াহাবের পৌত্র আবদুল্লাহ (নিহত ১৮১৮ খৃ.) মক্কা জয় করার পর তাঁদের মতবাদ ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে : কাউকে আল্লাহ্‌র ভাগী করা চলবে না; বিপদমুক্তির আশায় পীর বা নবীর নাম ধরে আহ্বান বা তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চলবে না; আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ধর্মসাধকেরা অলৌকিক শক্তি হয়তো লাভ করতে পারেন, কিন্তু প্রার্থনাপূরণের ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্‌রই আছে; চার জন ইমাম-নির্দেশিত পথসমূহের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করতে হবে এবং চারটি মজহাবের

মধ্যে কোন পার্থক্য করা চলবে না; কবরপূজা ও মিলাদ-অনুষ্ঠান বা হজরতের নামে প্রশস্তিমূলক কবিতা-পাঠ নিষিদ্ধ; যুদ্ধের ঢাক ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চলবে না; যদি ধর্মের রীতিনীতি পালন করে সুফী মতবাদ পোষণ করা হয়, তাতে ক্ষতি নেই, অন্যথা তা বর্জনীয়।[৩৯]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্রও মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ইসলামের সংস্কারসাধন। ওয়াহাবী মতবাদের দ্বারা তাঁর বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হবার কথা নয়, কেননা, তাঁর ও আবদুল ওয়াহাবের চিন্তাধারা প্রায় একইকালে বিকাশলাভ করে। তাঁদের ধ্যানধারণায়ও কিছু পার্থক্য ছিল। ওয়াহাবীদের তুলনায় ওয়ালীউল্লাহ্ উদারনৈতিক ও ক্ষমাশীল ছিলেন।[৪০]

সৈয়দ আহ্মদ বেরিলভীর চিন্তাধারা ওয়ালীউল্লাহ্র ধ্যানধারণা-প্রসূত। অনেকে মনে করেন যে, তিনি মক্কায় ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৪১] পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেন যে, তিনি কখনোই ওয়াহাবী দলভুক্ত হন নি।[৪২] ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তাধারার সঙ্গে ওয়াহাবী ভাবধারার কিছু পার্থক্য-সত্ত্বেও মৌলিক ঐক্য আছে। তাই এমন অসম্ভব নয় যে, ওয়ালীউল্লাহ্র শিক্ষায় তাঁর মানস গড়ে উঠলেও মক্কায় তিনি ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

তাঁর ভাবধারার মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে শাহ্ ইসমাইল-সঙ্কলিত *সিরাত্-উল-মুস্তাকীম*গ্রন্থে। এটি সৈয়দের মক্কা যাবার আগেই রচিত হয়েছিল। এতে ভারতীয় ইসলামের অন্তর্গত নানারকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। পীরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, তাঁদের মাজার পূজা, কবরে চিরাগ দেওয়া, উচ্চবংশের দম্ভপ্রকাশ করা, জ্যোতিষে বিশ্বাস-স্থাপন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থাজ্ঞাপন, শীতলা প্রভৃতির পূজা, মুহররম উৎসবে যোগদান — এ সবই নিষিদ্ধ বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, সত্যকার মুমীনের কর্তব্য বলপূর্বক মুহররমের তাজিয়া ভেঙ্গে ফেলা : এই কাজ প্রতিমাধ্বংসের সমান পুণ্যময় বলে বিবেচিত হবে। যদি কারো পক্ষে একাজ করা সম্ভব না হয়, তবে তার কর্তব্য হবে মুহররমের উৎসব থেকে ঘৃণাভরে দূরে সরে থাকা। পালাপার্বণে এবং মৃত ব্যক্তির উপলক্ষে অতিরিক্ত ব্যয় নিষেধ করা হয়েছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রায় বাধ্যতামূলক করে তোলার নির্দেশও এতে আছে। *হিদায়ত-উল্-মুমেনীন* নামক পুস্তিকায় দুঃখ করে বলা হয়েছে যে, হিন্দুদের যেমন গয়া, কাশী ও মথুরা, ভারতীয় মুসলমানদের তেমনি তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাখনপুর, বরাইখ ও আজমীর। *তক্বীআত্-উল-ঈমান* নামক অপর একটি রচনায় বলা হয়েছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়া আর কোন নির্দেশ অনুসরণযোগ্য নয় : তা সে নির্দেশ মুজতাহীদ, ইমাম, গাউস, কুতুব, মৌলভী, মুশায়েব, রাজা, মন্ত্রী, পাদরী, পুরুত — যার কাছ থেকেই আসুক না কেন।[৪৩]

সৈয়দ আহ্মদের জীবনে এইসব নীতি-অনুসরণের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁর আসল নাম নাকি ছিল গোলাম মুহম্মদ : কিন্তু এ ধরনের নামকরণ ইসলামের মৌলিক আদর্শের বিরোধী, এই ভেবে তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করেন।[৪৪] বিধবাবিবহ শরীয়তসম্মত হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল : তিনি নিজের বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৪৫]

অতএব, সৈয়দ আহমদ বেরিলভী-প্রবর্তিত আন্দোলন প্রথমত এবং প্রধানত ইসলামের বিশুদ্ধতা-রক্ষার আন্দোলন। এই সংস্কার-আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে কেন তিনি

শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন, তাও আমরা বুঝতে পারি। শিখ-অধিকৃত পাঞ্জাবে মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করতে যেয়েই এই রক্তপাত ঘটল। শাহ্ আবদুল আজিজ ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে *দার-উল্-হরব* বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সৈয়দ আহ্মদের ক্ষোভের কোন বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি না, বরঞ্চ তিনি ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন।[৪৬] শিখদের বিরুদ্ধে এঁদের সংগ্রামকে ইংরেজ তাই সন্দেহের চোখে দেখেন নি। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর বিষয়টি অন্যরূপ ধারণ করল। আফগান যুদ্ধে সৈয়দের অনুসারীরা ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করলেন এবং ইংরেজ পাঞ্জাব অধিকার করলে তার সঙ্গে এঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন।[৪৭]

সৈয়দ আহ্মদের মৃত্যু অনুসারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সূচনা করল। শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে ইসমাইল ও আবদুল হাইও মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার নেতৃত্বভার এসে পড়ে ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলীর উপরে। সূচনায় সৈয়দ আহ্মদ কর্মসূচী স্থির করেছিলেন এবং সে কর্মসূচী আকৃষ্ট করেছিল স্বেচ্ছাসেবকদেরকে। সৈয়দের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরাই কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। তাই সৈয়দের মৃত্যুর পর থেকে এই আন্দোলন ইংরেজ-শাসনবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, সৈয়দের মৃত্যু হয় নি এবং অচিরেই ভারতভূমি থেকে ইংরেজ কাফেরদের দূর করার জন্যে মুমীনদের সেনানায়করূপে তিনি আবির্ভূত হবেন। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পাঞ্জাব অবধি এঁরা সরকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন।[৪৮] সৈয়দের জীবিত থাকার কথাটা যে একটা ভাঁওতামাত্র, জয়নুল আবেদীন এটা ধরে ফেলেন এবং এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যান।[৪৯] এর পরবর্তীকালের ঘটনাটুকু একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে :

> In 1850 Enayet Aly preached sedition in Rajshahi, then went to Patna, and by the end of the year had joined the Wahhabys at Sittana, with not more than eighty followers. He was a blind fanatic who actualluy thought it possible to overthrow the British Government and urged the Wahhabys to attempt it at once. Vilayet Aly, however, who had also arrived at Sittana, but had travelled through Central India, the Bombay Presidency and Sind, and was also aware of the power of the English, considered an invasion of India to be sheer madness. This difference of opinion between the two leaders caused a split in the camp of Sittana, the Hindustanis siding with Vilayet Aly, whilst the Bengalis supported the view and the claim of Enayet Aly to the position of chief Pyr and General.[৫০]

এই সঙ্কট শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল অনতিবিলম্বে বিলায়েত আলীর মৃত্যুতে। এবারে ইনায়েত একচ্ছত্র নেতা হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১৮৫১ তে সরকার জানতে পারেন যে, এঁরা পাঞ্জাবে ইংরেজ শক্তিকে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।[৫১] ১৮৫২ থেকে ১৮৫৭র মধ্যে ইনায়েত আলীর মৃত্যু হয়, অন্যান্য নেতাকে ইংরেজ সরকার বন্দী করে ফেলেন। সিপাহী অভ্যুত্থানের পূর্বেই আন্দোলনের এই স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর শেষবারের মতো তাঁরা অগ্নুৎপাত করেন শতাব্দীর সপ্তম দশকে।

চার

সৈয়দ আহ্‌মদ বৈরিলভী-প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলন এবং তার থেকে উদ্ভূত জিহাদের বিপুল সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে এই আন্দোলনের বিস্তার-সম্পর্কে জনৈক লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> The Bengalis were somewhat backward at first; of a timid nature and longer under the influence of a fixed Government than the people of the North West, they furnished fewer recruits. But in the course of time their intellectual superiority prevailed, and the movement became to a great extent a Bangali Muhammadan revival.[৫২]

অর্থ ও লোকবল, দুই-ই এদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে স্বতন্ত্রভাবেও দুই সংস্কার-আন্দোলন গড়ে ওঠে।

পশ্চিম বাংলায় এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন মৌলভী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। চব্বিশ পরগণা জেলার হায়দারপুর গ্রামের এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে তিনি কলকাতায় পেশাদার পালোয়ান ছিলেন। পরে তিনি নদীয়ার জমিদারের অধীনে লাঠিয়ালের চাকরী গ্রহণ করেন এবং একটি দাঙ্গায় জড়িত হযে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর তিনি দিল্লীর কোন রাজপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরই সঙ্গী হিসেবে মক্কায় যান হজ করতে। সেখানে তিনি সৈয়দ আহ্‌মদ বেরিলভীর সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২৯এ দেশে ফিরে এসে তিনি ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনে ব্রতী হন। একাজে তিনি মিসকিন শাহ্ নামক জনৈক ফকীরের সহায়তা লাভ করেন।[৫৩]

পীর-মানা, মাজার তৈরী করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা এবং মুহর্‌রম উৎসবে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে তিতুমীর ঘোষণা করেন। 'দাড়ি, কাছা-খোলা এবং মাথার মধ্যভাগ কামান, তিতুর মতের বিশিষ্ট বাহ্য স্বাতন্ত্র্য।'[৫৪] তিতুমীরের অনুসারীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ কেবল এই বাহ্যরূপই গ্রহণ করে নি, নিজেদের মতামত সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এমন গোঁড়ামি প্রবেশ করেছিল যে, অন্য মতাবলম্বী সম্পর্কে তাঁদের বিরোধ উপস্থিত হয়। তবে এর চেয়ে তীব্র হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের প্রতিক্রিয়া। তিতুমীরের নেতৃত্বে রায়তদেরকে সংগঠিত হতে দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এই সংগঠন ভেঙে দেবার পন্থা অন্বেষণ করতে থাকেন। খুব সহজ একটা উপায়ও পাওয়া গেল। তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং অন্যান্য জমিদার ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের জমিদারীতে যারা দাড়ি রাখবে, তাদের প্রত্যেককে আড়াই টাকা করে খাজনা দিতে হবে। সরফরাজপুরের রায়তেরা এই অন্যায় কর দিতে অস্বীকার করায় জমিদার তাদের উপর হামলা করলেন। গোলযোগের মধ্যে একটা মসজিদ ভস্মীভূত হয়ে গেল। থানায় নালিশ করে প্রজারা কোন ফল পেল না। তখন তিতুর অনুগামীরা দারোগার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দু দফা আবেদন জানালেন এবং কলাকাতায় কমিশনারের কাছে প্রতিকার চাইতে গেলেন। যখন এতেও কোন সুফল হল না, তখন তাঁরা প্রতিকারের ভার নিলেন নিজেদের হাতে। তিতুর নেতৃত্বে পুঁড়ায় প্রবেশ করে তাঁরা গোহত্যা করলেন এবং মন্দিরে গোরক্ত লেপন করলেন। লাওঘাটায় এক সংঘর্ষের ফলে

জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হলেন। পর পর দুটো শক্তিপরীক্ষায় জয়লাভ করে এঁদের আত্মবিশ্বাস গেল বেড়ে। এবারে তাঁরা দেশে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ও মুসলিম-শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। একটি নীলকুঠি আক্রমণ করে তার তত্ত্বাবধায়ককে তাঁরা বন্দী করে নিয়ে যান। এঁদেরকে দমন করতে এসে পরাজয় মানতে বাধ্য হন বসিরহাটের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার আর কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আলেকজাণ্ডার ও স্কটের মিলিত অভিযান শুরু হল। বাঁশের কেল্লার ভেতর থেকে তিতুমীর যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকলেন। কিন্তু বাঁশের কেল্লা আর কতক্ষণ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে পারে! শেষ পর্যন্ত তিতুমীর আর তাঁর বহু অনুসারী নিহত হলেন, সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ অনেক যোদ্ধা বন্দী হলেন। বিচারে মাসুমের প্রাণদণ্ডাদেশ, এগারো জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ১২৮ জনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হল।[৫৫]

তিতুমীরের বিদ্রোহের কাহিনী থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কারসাধন। কিন্তু রায়তেরা তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছিলেন বলে জমিদারেরা অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হবার ভয় করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁকে দমন করতে চেয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে রায়তেরা ছিলেন মুসলমান, আর জমিদারেরা হিন্দু। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশ্নটি তাই আকস্মিকভাবে এসে পড়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিতুমীর একজন হিন্দু জমিদারের সমর্থন লাভ করেছিলেন।[৫৬] ইনি প্রজাহিতৈষী ও উদারচেতা ছিলেন বলেই হয়তো রায়তদের একটি সংগঠনকে সাহায্য করেছিলেন। এই সাংগঠনিক আয়োজনই তিতুর সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ অনিবার্য করে তোলে। আর এসব ক্ষেত্রে থানা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী জমিদারের আনুকূল্য করেছিলেন। প্রজাপক্ষ তাই ইংরেজকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। জমিদার আর সরকার উভয়পক্ষ বিধর্মী হওয়ায় এই সংঘর্ষ প্রায় ধর্মযুদ্ধের তীব্রতা নিয়েই প্রজাদের কাছে দেখা দিয়েছিল।

অনতিকাল পরে অনুরূপ যে-আন্দোলনটি পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হয়, তা ফারায়েজী আন্দোলন নামে বিখ্যাত। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া। শরীয়তউল্লাহ্ ছিলেন ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা পরগণার অধিবাসী। তাঁর সমাধি-প্রস্তরে উৎকীর্ণ ফলকের পাঠ নির্ধারণ করে সম্প্রতি তাঁর জীবনকাল স্থির করা হয়েছে ১৭৮০/৮১ থেকে ১৮৩৯/৪০ খৃস্টাব্দ বলে।[৫৭] আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কা যান এবং কুড়ি বছর পর দেশে ফিরে আসেন উনিশ শতকের প্রথমে।[৫৮] জনৈক লেখকের মতে, তিনি দু বার হজ করতে যান এবং ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮২৮ খৃস্টাব্দে। কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে তিনি ইসলামের সংস্কার-আন্দোলন গড়ে তোলেন। অসাধারণ দ্রুতগতিতে তাঁর মতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের ছ ভাগের এক ভাগ মুসলমান এবং ঢাকার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান তাঁর অনুসারী হয়ে পড়েন।[৫৯] *সমাচার দর্পন*-এ প্রেরিত এক পত্রে তাঁর ১২,০০০ শিষ্যের উল্লেখ আছে।[৬০]

শরীয়উল্লাহর মতবাদের মূল কথা হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে কুরআন শরীফের নির্দেশ-পালন এবং কুরআন-বহির্ভূত সকল আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করা। ইমাম হাসান-হোসেনের মৃত্যুতে

শোকপ্রকাশ করে মুহররমের উৎসব পালন, এমন কি, তাঁর দর্শন পর্যন্ত তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ১০ই মুহররম তারিখে তাঁরা অনাড়ম্বর উৎসব পালন করতেন, হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের দিন হিসেবে। আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রাই তাঁরা আচরণীয় বলে মনে করতেন। বিবাহ ও মৃত্যু-উপলক্ষে অত্যধিক ব্যয়, সমতল থেকে উঁচু করে সমাধিনির্মাণ, সমাধিতে পুষ্পদান করা কিংবা ফাতেহা পড়া — এসবও তিনি বর্জন করতে বলেছেন।[৬১] তাঁরা পীর ও মুরীদ খেতাব বর্জন করেন এবং জীবিত ও মৃত ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা থেকেও বিরত হন। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে *দার-উল-হরব* বলে ঘোষণা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, এখানে ঈদ বা জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। লক্ষণীয় এই যে, শরীয়উল্লাহ্ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি।[৬২] কিন্তু এ-সত্ত্বেও সরকারের রোষদৃষ্টি থেকে তিনি রক্ষা পান নি। টেলর লিখেছেন :

> The Ferajees have the character of being sricter in their morals than their other Mahommedan brethren but they are inclined to intolerance and persecution, and in showing their contempt of the religious opinions of their neighbours, they frequently occasion affrays and disurbances in the town. Their leader 'Hajee Shuritulla' has more than once been taken in custody on this account, and is at present under the ban of the police, I believe, for exciting his disciples in the country to withold the payment of revenue.[৬৩]

শরীয়তউল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮১৯এ তাঁর জন্ম হয়, অল্প বয়সে তিনিও মক্কা গিয়েছিলেন। পিতার প্রচারিত আদর্শ থেকে তাঁর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায় — দুদু মিয়া *পীর* বলে গণ্য হয়েছিলেন। সাংগঠনিক কার্যে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে তিনি প্রতি অঞ্চলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। শিষ্যদের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। জমিদারদের অন্যায় খাজনা দাবির বিরুদ্ধে দুদু মিয়া মাথা তুলে দাঁড়ান। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমুদয় জমির মালিক আল্লাহ্ — সুতরাং এতে কারো খাজনা চাইবার অধিকার নেই। তাঁর এই ঘোষণায় জমিদার ও নীলকরেরা যেমন সচকিত না হয়ে পারেন নি, তেমনি হৃতসর্বস্ব রায়তদের সম্পূর্ণ সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। হিন্দু জমিদারেরা দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে মুসলমানদের উপরেও নানা রকম কর ধার্য করতেন। দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীরা এই কর প্রদান করতে অস্বীকার করেন। প্রজারা যাতে দুদু মিয়ার দলে যোগ না দেয়, সেজন্যে জমিদারেরা নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং দলপতির নামে অনেকগুলো মিথ্যে মামলা রুজু করেন।[৬৪] দুদু মিয়ার ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবও কারো অবিদিত ছিল না। শেষ অবধি, ১৮৩৬এ[৬৫] মতান্তরে ১৮৫৭[৬৬] তাঁকে আলীপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়। শেষ তারিখটি সম্ভবত যথার্থ। ১৮৩৬এ তিনি বন্দী হলে *সমাচার দর্পন*-এ প্রেরিত পত্রে হয়তো তাঁর উল্লেখ থাকত। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে বন্দীদশায় তাঁর মৃত্যু হয়।[৬৭] তারপর এই আন্দোলনও নিঃশেষ হয়ে আসে।

শরীয়তউল্লাহ্‌র চেয়ে দুদু মিয়া অধিকতর রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার তুলনায় পুত্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের তাৎপর্যও ছিল গভীরতর। ফারায়েজী আন্দোলনের

সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সংশ্লিষ্ট হবার একমাত্র কারণ এই যে, রায়তেরা অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান আর জমিদারেরা ছিলেন হিন্দু। শ্রেণীস্বার্থের বিরোধকে তাই ধর্মীয় শত্রুতা বলে ভুল করবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আর জমিদার ও নীলকর বনাম রায়তের দ্বন্দ্বে সরকার প্রথম পক্ষকেই সাহায্য করতেন। রায়তেরা এই ঘটনাকে দেখলেন হিন্দু বাঙালীর সঙ্গে খৃস্টান ইংরেজের মিতালী হিসেবে। যা শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে পরিণত হতে পারত, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে বসল ধর্মীয় প্রতিরোধ-আন্দোলন। তার আরেকটি কারণ এই যে, সূচনায় ফারায়েজী আন্দোলন ছিল ধর্মসংস্কারেরই আন্দোলন।

প্রসঙ্গক্রমে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলার এই আদিবাসীদের উপরে বিদেশী কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও দেশী হিন্দুর আচার-ব্যবহারের ভার চেপে বসেছিল। তারা ইংরেজের কাছে জমি হারিয়েছিল এবং ভারতীয় মহাজনের ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এর সবটুকুই ঘটেছিল তাদের শিশুসুলভ সারল্যের সুযোগে। আবেদন-নিবেদনে ফল না পেয়ে সাঁওতালেরা বিদ্রোহ করে ও দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে অত্যাচারীদেরকে হত্যা করে। সরকারও নির্মমভাবে এ বিদ্রোহ দমন করেন। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল *নন-রেগুলেশন* এলাকা বলে ঘোষিত হয়।[৬৮]

পাঁচ

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ একটি জটিল সমস্যারূপে পরিগণিত হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতান্তরের অন্ত নেই। কেউ কেউ একে ধর্মান্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসেবে দেখেছেন, কেউ বা একে মনে করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। আবার অনেকেই একে চিত্রিত করেছেন এদেশবাসীর প্রথম স্বাধীনতা-সমর হিসেবে। মনে হয়, অভ্যুত্থানটির মধ্যে এই সব কটি লক্ষণই সমীকৃত হয়েছিল।

এই বিদ্রোহের আশু উপলক্ষ ছিল নতুন কার্তুজের প্রবর্তন। এই কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হত। গুজব রটেছিল যে, এর সঙ্গে শূকর আর গোরুর চর্বি মিশ্রিত আছে। এই রটনা যে মিথ্যা ছিল না, তা পরবর্তী কালে জানা গেছে।[৬৯] সিপাহীদের মনে আশঙ্কা জেগেছিল যে, কোম্পানীর উদ্দেশ্য বোধহয় সকলকে খৃস্টান করে ফেলা। এই ভীতির জন্যে মিশনারীদের প্রচারের ধারা অনেকখানি দায়ী, আর বিশেষভাবে দায়ী ১৮৫৫তে লেখা এডমণ্ডের পত্র। তিনি কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীর কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, ভারতের জনসাধারণকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার সময় এসেছে।[৭৮] সৈন্যদের ছাউনীগুলোয় বর্ণবৈষম্য খুবই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কোম্পানীর শাসনকালে গৃহীত কতিপয় সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থাও — যেমন, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবার পুনর্বিবাহের আইন, ধর্মান্তরিত হিন্দুসন্তানের পক্ষেও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের বিধি, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি — রক্ষণশীল সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু এই রকম অভ্যুত্থানের পশ্চাতে আরো কতকগুলো গুরুতর কারণ ছিল। তার একটি হচ্ছে তখনকার ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। এ বিক্ষোভ যেমন সাধারণ শ্রেণীর পক্ষে সত্য ছিল, তেমনি সত্য ছিল ভূস্বামীদের পক্ষেও। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

হওয়ার ফলে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।[৭১] অযোধ্যায় তালুকদারদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছিল। দেশশাসনে সাধারণ লোকের অংশ ছিল না, এও বিক্ষোভ-সৃষ্টিতে সহায়তা করে। তার উপর, মুঘল বাদশাহ্ ও অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতাচ্যুতি যেমন মুসলমানদেরকে বেদনাবিদ্ধ করে, তেমনি নানাসাহেব ও ঝাঁসীর রানীর প্রতি কোম্পানীর অন্যায় আচরণ হিন্দু-মানসকে ক্ষুণ্ন করেছিল।[৭২]

আত্মশক্তিতে সিপাহীদের অত্যুগ্র বিশ্বাস তাঁদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণার প্ররোচনা দেয়। তাঁরা জানতেন যে, বর্মা থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাদেরই বাহুবলে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়েছে। সিপাহীদের সাহায্য ছাড়া কোম্পানীর রাজত্ব ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে; তাই তাঁদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে কোম্পানী বাধ্য।[৭৩] সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তাই কোম্পানী-আমলে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তেরা এবং সত্যকার স্বাধীনতাকামীরা এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তখনই তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হল।

এই অভ্যুত্থান পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা, এটি গুরুতর প্রশ্ন। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, এ বিদ্রোহ আকস্মিক — কোন ধীরস্থির পরিকল্পনার ফল নয়। কিন্তু চাপাটি আর পদ্ম বিলি হবার কাহিনী যত অতিরঞ্জিতই হোক না কেন, এর মূলে কিছু সত্যতা নিশ্চয় ছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও কথাটা স্বীকার করেছেন।[৭৪] এই পূর্ব-পরিকল্পনার পশ্চাতে তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া-পন্থীদেব অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্রোহী সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক বখ্‌ত আলী খান এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর গুরু সরফরাজ আলী ছিলেন কেরামত আলী জৌনপুরীর শিষ্য। বিদ্রোহীদের আর দু জন নায়ক, শাহ্‌জাদা ফিরোজ শাহ্ ও মৌলভী আহমদউল্লাহ্, *ওয়াহাবী* ছিলেন। এই বিদ্রোহে হাজার হাজার *ওয়াহাবী* স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছিলেন।[৭৫]

বাংলার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই অভ্যুত্থানের প্রতি নানাভাবে বিমুখতা প্রকাশ করলেও, স্মরণ রাখা দরকার যে, এর সূচনা হয় বাংলাদেশেই — বারাকপুর ও বহরমপুরে। এই দুই জায়গায় বিদ্রোহ দমন করতেই মীরাটে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। সেখানকার সৈন্যেরা কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি দিলেন, ইওরোপীয়দেরকে লাঞ্ছিত করলেন এবং তাঁদের একদল দিল্লী এসে আভূমিনত প্রণতি জানালেন মুঘল বংশের ক্ষমতাহীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে। বিদ্রোহীদের দখলে দিল্লী চলে এলে এটিই হল বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। তারপর এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল রোহিলাখণ্ডে, কানপুরে, লক্ষ্ণৌতে, বেনারসে, ঝাঁসীতে, পাটনায়।[৭৬] বাংলাদেশে এর প্রতিধ্বনি জাগল ঢাকা ও চট্টগ্রামে।[৭৭]

কোম্পানীর রাজ্যগ্রাসনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদীরা যে বিদ্রোহের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। বাহাদুর শাহ্, ওয়াজিদ আলী শাহ্, রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব — এসব নেতার প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল এই বিদ্রোহের সঙ্গে। অযোধ্যার তালুকদারদের বিদ্রোহও অনেকখানি স্বার্থপ্রণোদিত। তাই বলে একথা মনে করা সঙ্গত নয় যে, এঁদের সকলেই কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন। জনৈক লেখক সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, এ সময়ে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে অনেক সামন্তবাদীর স্বার্থ মিলে গিয়েছিল।[৭৮] এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ যেমন, বাহাদুর শাহ্ স্বয়ং — সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। পরে এই

দুর্বলচিত্ত সম্রাট ইংরেজদের সঙ্গে আতাঁতের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি।

এ বিদ্রোহ-যে সামন্ততন্ত্রের পুনরুত্থান নয়, তার একটি প্রমাণ বাহাদুর শাহ্‌র এই আচরণেই পাওয়া যায়। সিপাহীরা যদিও তাঁকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আগেকার মুঘল সম্রাটদের মতো তিনি সিপাহীদের আজ্ঞাকারী হতে পারেন নি। বিভিন্ন সময়ে সিপাহীরা তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন, নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাগজপত্রে সম্রাটের স্বাক্ষর আদায় করেছেন, বিদ্রোহের প্রতি তাঁর আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে বেগম জিনাত মহলকে তাঁরা জামিনস্বরূপ (hostage) রাখতে চেয়েছেন। বখত্‌ খান যুবরাজদের বন্দী করার হুমকীও দিয়েছেন।[৭৯] পুরানো ভূমিব্যবস্থার পুন:প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর হাতে জমি দিতে প্রতিশ্রুত হন বিদ্রোহের নায়কেরা। আর অন্যায় করভার থেকে প্রজাদের মুক্তিদানেরও সিদ্ধান্ত করেন।

তবু এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তার কারণ, সিপাহীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কোম্পানীর পক্ষে এদেশবাসীর বিরুদ্ধে এদেশবাসীকে দাঁড় করাবার কূটকৌশল প্রয়োগ। এ-সত্ত্বেও, এবং সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসেবে সূচিত হলেও, ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে এটিই সর্বপ্রথম গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। আর এই গণ-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসলমানদের ভূমিকা যে সক্রিয় ও প্রধান ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

তথ্য-নির্দেশ

১. Romesh Datt, *The Economic History of India in the Victorian Age* (3rd edn London 1908) Bk. I. Chs VII দ্রষ্টব্য।
২. উদ্ধৃত, ঐ, 110.
৩. উদ্ধৃত, ঐ, 105.
৪. Dutt, *The Economic History of India under early British Rule*, 270
৫. ঐ, 279
৬. পূর্বে, পৃ. ২০ দ্রষ্টব্য।
৭. Bimanbehari Majumdar, *History of Political Thought*, (Calcutta, 1934), 1, 390-91.
৮. Razzaq, পূর্বোক্ত, 30
৯. Long, 42, 'In 1818 when he [Robert May] died' he had thirty six schools under his superintendence attended by about 3,000 Natives both Hidoos and Mahomedans' তুলনীয়, ঐ, 25 'There is also a Christian school on the Mission premises at Mirjapur,. and a separate school for the Mahomedan pupulationd'
১০. *সমাচার দর্পণ* ১১ জুলাই ১৮১৮ ও ২১ অক্টোবর ১৮১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (তৃ-স; কলিকাতা, ১৩৫৬), ১:৩)।
১১. যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার জনশিক্ষা* (কলিকাতা, ১৩৫৬), ১৪।
১২. ঐ, ২২।
১৩. *সমাচার দর্পণ*, ২৭ ডিসেম্বর ১৮২০: '*১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশটার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকাদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্বশুদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়েছে।*' ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, ১:১৬।
১৪ *সমাচার দর্পণ*, ২৭ মার্চ ১৮৩০। ঐ, ১:৩০-৩১। *সমাচার চন্দ্রিকা*, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১। ঐ, ২:৩৪। সমাচার দর্পণ, ৮মে ১৮৩০। ঐ, ২:৩।
১৫. *সমাচার দর্পণ*, ৮মে ১৮৩০। ঐ, ২:৩।
১৬. *সমাচার দর্পণ*, ১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫। ঐ, ২ ৪।
সমাচার দর্পণ, ২৫ মে ১৮৩৩। ঐ, ২:৭।
১৭. *'শ্রীযুত ডেবিড কারমাইকেল স্মিথ সাহেব বরাবরেষু' 'হুগলী জেলানিবাসী জমিদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারাদার উকীল মোক্তারকার ও গয়রহ'র নিবেদন, 'সমাচার দর্পণ'*, ২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ঐ, ২:৩১৩-১৪।
১৮. *সমাচার দর্পণ*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৬। ঐ, ২:৮০-৮১।
১৯. *সমাচার দর্পণ*, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ঐ, ২.৪৪-৪৬।
২০. Mallick, 189.
২১ ঐ, 193
২২. শিক্ষাবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে মেকলে লেখেন . *'I have never found anyone among themselves [orientlists] who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia*

The question before us is simply whether, when it is in our power to teach this language (English), we shall teach languages, in which by universal confession there are no book on any subject which deserve to be compared to our own, whether, when we can teach European science, we shall teach systems which by universal confession whenever they differ from those of Europe differ for the

worse and whether, when we can patronise sound philosophy and true history, we shall countenance at the public expense medical doctrines which would disgrace and English farrier, astronomy, which would move laughter in girls at an English boarding school, history abound with kings thirty feet high and reigns 30,000 years long and geography made up of treacle and seas of butter '—উদ্ধৃত, Thompsn and Garratt, 661.

১৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (নতুন-স, কলিকাতা, ১৯৬২), ১৪২।

১৪. *Sixth Report of the Select Commitee of the House of Commons on Indian Territoties,* 12- এ বর্ণিত H. H Wilson- এর সাক্ষ্য। উদ্ধৃত, Syed Mahmud, 52-53

১৫. Bimanbihari Majumdar I, 392

১৬ Mallick 253-55

১৭. *Reports of the General Committee of Public Instruction* 1840-41 1841-42 1845-46 এ প্রদত্ত তথ্য-অবলম্বনে। উদ্ধৃত, Mallick 277-78

১৮. *Adam's Reports*- এ বর্ণিত তথ্য-অবলম্বনে। উদ্ধৃত, 'Bengali Literature and Newaspapers', Calcutta Review, XIII, 140)

১৯. Mahmud Husain 'Sayyid Ahmad Shahid (I)' *History of the Freedom Movement* I 556-63

৩০. Hunter, 13 তুলনীয়. 'A Sketch of Wahhabis in Indian down to the death of Sayyid Ahmad in 1831' *Calcutta Review* 1870 95 'One Maulavi Keramat Ali of Jaunpur travelled through Chittagong, Noakhali, Dacca, Mymensing, Faridpur and Barisal Inayat Ali of Patna confined his exertions to middle Bengal and preached in Faridpur, Pabna, Rajshahi, Maldah and Bogra but his mission lay chiefly among the people of Central India, Hyderabad and Bombay'

৩১. বিহারীলাল সরকার, *তিতুমীর* (কলিকাতা, ১৩০৪), ২৫।

৩২. হবিবুল্লাহ, পূর্বোক্ত, ২০৭।

৩৩. ঐ, ২০৯।

৩৪. Mahmud Husain, 'Sayyid Ahmed Shahid (II)', *History of Freedom Movement,* I, 587

৩৫. E Rehatsak 'The History of the Wahhabys in Arabia and in India' *JBRAS* XIV 355

৩৬. Mahmud Husain 'Sayyid Ahmed Shahid (I)', পূর্বোক্ত, I, 565

৩৭. J R.C , 'Notice of the peculiar Tenets held by the followers of Syed Ahmed', taken chiefly from the 'Sirat-ul-Mustaqim, a principal Treatise of this sect written by Moulavi Mohammed Ismail' *JASB,* I, 480

৩৮ Rehatsak, পূর্বোক্ত, 275-91.

৩৯. J O'Kinealy, 'Translation of an Arabic Pamphlet on the History and Doctrines of the Wahhbis, written by Abdullah, grandson of Abdul Wahhab, the founder of Wahhabism' *JASB* XLIII, 63-82

৪০. Ikram, পূর্বোক্ত, I 509-10.

৪১ Rehatsak, পূর্বোক্ত 352-53, Titus, 179, Hunter, 14 'A Sketch of Wahhabis in India', পূর্বোক্ত।

৪২. K A Hakim, 'Contemporary Indian Thought (B)', *History of Philosophy Eastern and Western* I, 538

৪৩. J R C. পূর্বোক্ত I, 489-93

৪৪. Rehatsak পূর্বোক্ত, 360n.

৪৫. Mallick, 95

৪৬. হাবিবুল্লাহ, পূর্বোক্ত, ২১২।

৪৭. K M Ashraf, 'Muslim Revivalists and the Revolt of 1857', P C Joshi (ed) *Rebellion 1857-A symposium* (New Delhi, 1957), 81

৪৮. Hunter, 22

৪৯. Rehatsak, পূর্বোক্ত, 352

৫০ ঐ, 357.

৫১. Ashraf, পূর্বোক্ত, 81-82

৫২. *'A Sketch of the Wahhabis in India'* পূর্বোক্ত, 104

৫৩. বিহারীলাল সবকাব, ১৫-২৬। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত দলিলপত্রেব সাহায্যে ডক্টর মল্লিক (76-86) ও ডক্টর আবদুল বারী ('The Reform Movement in Bengali', *History of the Freedon Movement*, I, Ch. XVIII) তিতুমীরেব যে জীবনী বিধৃত করেছেন, তার সঙ্গে হান্টারের বর্ণিত (Ch IV) জীবনকাহিনীর মোটামুটি ঐক্য আছে। 'A Sketch of the Wahhabis in India' প্রবন্ধের লেখকের অনুসরণে ডক্টর বারী মনে করেন যে, সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তিতুমীরেব প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় ১৮২১-২২ এর দিকে। এটি খুবই সম্ভবপব।

৫৪. সবকার, ২৮।

৫৫. Bari পূর্বোক্ত I, 551-55

৫৬. বিহারীলাল সবকাব, ৮০ : 'শুনিতে পাই, ভূষণার অপ্রাপ্তবয়স্ক জমীদাব মনোহর বায় তিতুর দলভুক্ত হইযাছিলেন। মনোহব রাযের শক্তি সামর্থ্যে ও অর্থ সাহায্যে তিতুব অনেক উপকাব হইয়াছিল'।

৫৭. Muinuddin Ahmad Khan, 'Tomb Inscription of Haji Sharit Allah', *JASP* III, 187-98

৫৮ Faraidi Sect, *'Encyclopaedia of Islam'*, II, 57

৫৯ James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca* (Calcutta, 1839), 248

৬০. সমাচাব দর্পণ, ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ব্রজেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, ২ঃ ৩৭৯-৮০।

৬১ Taylor, 249-50

৬২ Bari, পূর্বোক্ত I, 546-47

৬৩. Taylor, 250

৬৪. Bari, পূর্বোক্ত I, 548-49

৬৫. ঐ I, 549

৬৬. Mallick, 75

৬৭. Benoy Gopal Ray, 'Islam in Modern Bengal', *Visvabharati Quarterly*, I, No 1

৬৮. Thompson and Garratt, 414-15

৬৯. Field Marshal Lord Roberts, *'Forty-one year in India'* (London, 1897), 1431, 'The recent researches of Mr. Forrest in the records of the Government of India prove that the lubricating mixture used in preparing the cartridges was actually composed of the objectionable ingredients, cows' fat and lard, and that incredible disregard of the soldiers' prejudices was displayed in the manufacture of these cartridges'.

৭০. Syed Ahmad Khan *The Causes of the Indian Revolt* (Benares 1873) 21-22

৭১ ঐ, 26 'It is a remarkable fact that wherever the rebels have issued proclamation to decive and reduce the people they have only mentioned two things the one, interference in matters of religion, the other, the resumption of rent free lands It seems fair to infer that these were the two chief causes of the public discontents. More especially was it the case with the Muhammedans, on whom this grievance

fell more heavily than on the Hindus'

৭২. Majumder, Raychaudhuri and Datta, 712.

৭৩. Syed Ahmed Khan, 51.

৭৪. Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of* 1857, 199, "It seems very probable, therefore, that there was some secret discussion among some leading figures of the sepoys in different cantonments regarding the Mutiny, but the rank and file were ignorant of it"

৭৫. Ashraf, পূর্বোক্ত, 97-98

৭৬. Majumdar, Raychaudhuri and Datt 775-76. 779.

৭৭. Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of* 1857, 63

৭৮. P C. Joshi, '1857 in our History', Rebellion 1857, 167 . 'During 1857 the class interests of a section of Indian feudals coincided with national interests, against British Rule, and they played an active part in the national uprising'

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৫৮-১৯০৫

সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রথম ফল ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পরিসমাপ্তি। এই অভ্যুত্থানের কালে উভয় পক্ষে যে-নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল, তার বিবরণ ইংল্যাণ্ডে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। অনেকটা এই সূত্র ধরেই ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের শুরুতে বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষকে সরাসরিভাবে মহারানীর শাসনাধীনে আনার সংকল্প প্রকাশ করেন। এর বিরোধিতা করে কোম্পানীর পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের কাছে এক দীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরিত হয়।[১] এতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে কোম্পানীর কার্যকলাপ সর্বদাই বৃটিশ মন্ত্রিসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই সিপাহী বিদ্রোহ বা অন্য কোন সময়কার কার্যকলাপের জন্য কোম্পানী এককভাবে দায়ী হতে পারে না। কিন্তু এসব আবেদন-নিবেদন কার্যকর হয় নি। পার্লামেন্টের সরকারী প্রস্তাব (১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন আইন) গৃহীত হয় এবং ১লা নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

এই ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থনৈতিক তাৎপর্য-সম্পর্কে রমেশ দত্তের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> By this singular clause [Sec. 42 of the Act for the better Government of India] the capital stock and the debts of the East India Company were virtually added to the Public Debt of India; and the annual tribute which India has so long paid as interest on the stock was made perpetual. *The Crown took over the magnificent empire of India from the Company without paying a shilling, the people of India paid, and are still paying the purchase money* It was an act of injustice towards a British Dependency unexampled in the history of British Empire. It was an act of injustice which pressed heavily on the people, after the expenditure of forty millions sterling for suppressing the Mutiny had been saddled on them.[২]

রানীর ঘোষণাপত্রে পরাধীন ভারতবাসীর অধিকার-সম্পর্কে অনেক রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেসব কার্যে পরিণত হতে পারে নি। কেননা, যে শোষণের মনোবৃত্তি দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ-মানসে লালিত হয়েছিল, তার কোন পরিবর্তন হয় নি। আক্ষেপ করে স্যার জন লরেন্স লিখেছিলেন :

> The difficulty on the way of Government of India fairly in these matters is immense. If anything is done, or attempted to be done, to help the natives, a general howl is raised, which reverbrates in England and find sympathy and support there. I feel quite bewildered sometimes what to do. Everyone is, in the abstract, for justice, moderation, and such like excellent qualities; but when one comes to apply such principles so as to affect anybody's interests, then a change comes over them.[৩]

এই কারণেই মহারানীর রাজত্বের প্রথম দু বছরে ভারতের আমদানী-অনুযায়ী অপরিমিত অর্থ বিদেশে চলে যেতে থাকল।[৪]

ভারতবর্ষের কৃষির পক্ষে প্রধানত প্রয়োজন ছিল সেচের সুব্যবস্থা। ইংরেজ-রাজত্বে এটি অবহেলিত হয়েছিল বলে বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৫] দুর্ভিক্ষের জন্য শস্যের অভাব যতটা দায়ী, তার চাইতেও বেশী দায়ী আর্থিক নীতির জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি —অর্থাৎ গ্রামীণদের সর্বনিম্ন ক্রয়ক্ষমতার অভাব।[৬]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্বাধীন দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠে নি বা উঠতে দেওয়া হয় নি। রেলপথের সূচনা হওয়ায় এবং ভারতীয় বণিকশ্রেণীর হাতে শিল্পোদ্যম গ্রহণ করার মতো পুঁজি সঞ্চিত হওয়ায় দেশীয় শিল্পের সূচনা হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ এর মধ্যে একটি সুতোর কল, কয়েকটি পাটকল ও কয়লার খনির কাজ শুরু হয়। ১৮৮০ তে কয়লা খনির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬তে, ১৮৮২তে ইউরোপীয় মালিকানায় ২০টি পাটকল চলতে থাকে এবং ১৮৯৭তে সমগ্র ভারতবর্ষে ৫৬টি সুতোর কল গড়ে ওঠে। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে আবার আর্থিক মন্দা প্রভৃতি কারণে শিল্প বিকাশের ধারা নিম্নগতি লাভ করে।[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নীলের ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এদেশের উর্বর ভূমিতে নীলচাষের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কিছুসংখ্যক 'প্ল্যানটার্স' নিয়ে আসেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। এদেশে ক্ষয়িষ্ণু নীলশিল্পের সমৃদ্ধিসাধন করলেও প্রকৃতিগতভাবে এই নীলকরেরা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত আইন-অমান্যকারী অত্যাচারী। প্রথম যুগে এঁদের চরিত্র অনেকের কাছেই ধরা পড়ে নি। ১৮২৯এ রাজা রামমোহন রায় এবং ১৮৩০এ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলকরদের অত্যাচারের খবরাখবরকে আকস্মিক ঘটনা ও ব্যতিক্রম বলে অভিহিত করে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, নীলকরদের এলাকায় লোকে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে।[৮]

সিপাহী অভ্যুত্থানের পর এইসব নীলকর সাহেবের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেল। বিদ্রোহকালীন তিক্ততার স্মৃতি তাঁদেরকে সহায়হীন চাষীর উপরে অমানুষিক উৎপীড়ন করতে প্ররোচনা দিল। দরিদ্র রায়তদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ নীলচাষী ধর্মঘট করল। যে-সব স্থানে নীলচাষ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল- যেমন, যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর ও পাবনা জেলায়— সেইখানে এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারে দেখা দিল। কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও প্রজাদের প্রতিরোধ চলতে থাকল পরবর্তী দু বছর ধরে। এই ঘটনাই *'নীল বিদ্রোহ'* নামে বিখ্যাত। অনতিবিলম্বে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এই আন্দোলন প্রসারলাভ করে। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *'হিন্দু পেট্রিয়ট'* পত্রিকার প্রচারণায়, দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পণ'* নাটক রচনায়, মধুসূদন-কৃত তার ইংরেজী অনুবাদে, এর প্রকাশক জেম্‌স লং-এর মতো সহৃদয় ইংরেজের সহানুভূতিতে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো বিত্তবান ব্যক্তির সক্রিয় সমর্থনে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে সরকার নীল কমিশন বসালেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হতে নীলকরদের অত্যাচার কমাবার জন্যে অনেকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সরকার বাধ্য হন।

এর আগে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের বেঙ্গল রেন্ট অ্যাক্টে চাষীদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। এই প্রথমবার জমিদার ও মহাজনের অবাধ অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ চাষীরা লাভ করে।[৯]

সিপাহী অভ্যুত্থানের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় এদেশবাসীর কোন অংশ না থাকায় প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই অসন্তোষ দুর করবার জন্যে সরকারপক্ষ থেকে এবারে কিছু কিছু চেষ্টা দেখা গেল। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে গৃহীত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট-অনুযায়ী পরবর্তী বৎসরে ভাইসরয়ের যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তাতে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে পাতিয়ালার মহারাজা, বেনারসের রাজা ও স্যার দীনকর রাওকে সদস্য নিযুক্ত করা হয়। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯২তে ভারতীয়দের নির্বাচনের অধিকার আংশিক হলেও স্বীকৃতি লাভ করে।[১০]

সরকারী চাকরিতে দেশীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রথমে তাদেরকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হত না। উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্যে প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয় ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা হয় আরো পাঁচ বছর পরে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সর্বোচ্চ বয়স প্রথমে স্থির হয় তেইশ। তাকে কমিয়ে ১৮৫৯এ করা হয় বাইশ, ১৮৬৬তে একুশ এবং ১৮৭৭ এ উনিশ।[১১] এভাবে বয়স কমানোর হেতু সকলের বোধগম্য হল। নীতিগতভাবে উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তার বাস্তব রূপায়ণের পথে যতদূর সম্ভব বাধাসৃষ্টিই ছিল এ সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষা ছাড়াও কোন কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরিতে দেশীয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে, এই মর্মে ১৮৭০এ একটি আইন পাস করা হয়। কিন্তু এটিও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় প্রায় দশ বৎসর পরে।[১২]

দুই

ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় ভারতবর্ষের গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় কিভাবে ভাঙন ধরল, তার বিবরণ এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেইসঙ্গে যে-পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল, তার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এদেশের গ্রাম্য-সমাজের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা।[১৩] ইংরেজ শাসন আমাদের গ্রাম্য-সমাজের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে নষ্ট করল। এর একটি ফল হল, স্বতন্ত্র জনসমষ্টিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্রমবর্ধমান তাগিদের উপলব্ধি। অন্যটি হল, আমাদের জীবনযাত্রাকে গ্রামমুখিতা থেকে মুক্তি দিয়ে শহরমুখী করে তোলা। ইংরেজ-শাসনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে গ্রামের এই প্রাধান্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে কিছু কিছু সমৃদ্ধ শহরের বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু এইসব শহর পুরোপুরি বন্দী হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের হাতের মুঠোয়। ইংরেজ-শাসন তার এই বন্দীদশা ঘুচিয়ে শহরকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।[১৪] অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠিও রূপান্তরিত হয় জমি থেকে মুদ্রায়।[১৫] অতএব, 'বৃটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হল, প্রাচীন ভারতীয় সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল করে দিয়ে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তনের অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করা।'[১৬]

অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল। যেমন বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে রায়ত-শ্রেণী গড়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দিল বড় ও ছোট জোতদার, ক্ষেতমজুর, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর লোকের। শহর এলাকায় তেমনি সৃষ্টি হল পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও বণিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, ছোট-বড় ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিভোগী শ্রেণী।[১৭] অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক রূপান্তর এবং নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস সাধনের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিহিত।

নবগঠিত এইসব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়ম-অনুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলে। বাংলার ভাববিপ্লবের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী বা ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের শুরু থেকেই হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এই কর্মপ্রচেষ্টা ও ভাবধারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাজাত। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে যখন যুক্ত হল বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা ও অভাব সংকটের তাড়না তখনই সূচনা হল রাজনৈতিক আন্দোলের।'জমিদারী কেনাবেচা করে, ব্যবসা বাণিজ্য দালালি দেওয়ানী এজেন্সী করে, যেভাবেই ধনসঞ্চয় করা হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রম শিল্প-ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তা না করতে পারলে ধনতান্ত্রিক যুগের পরিপূর্ণ বিকাশও হতে পারে না। এদেশের উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর এই চেতনা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।'[১৮] কিন্তু যেহেতু এই উদীয়মান উচ্চবিত্ত শ্রেণী ছিল ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতিদের পার্শ্বচর, তাই ইংরেজ শাসকদের শুভেচ্ছায় এদের আস্থা ছিল যথেষ্ট। তেমনি বাস্তব জীবনযাত্রার সংকট মধ্যবিত্তকে জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা দিলেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-আনয়নকারী ইংরেজ শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তাদের কম ছিল না।

বাংলার উদীয়মান উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হিন্দুপ্রাধান্য দেখা দিয়েছিল নানা ঐতিহাসিক কারণে। এ সম্পর্কে ডক্টর দেশাই লিখেছেন :

> The upper starta of the Muslim community in the pre-British period, were on the whole, divorced from mediaeval trade or moneylending and were mainly engaged in military and administrative careers. Further they predominantly resided in Northern India which came under British rule much later The vast Muslim population of Bengal mainly belonged to the poorer classes Hence a modern intelligentsia, a modern educated middle class and a bourgeoisie, on a substantial scale, sprang from within the Muslim community later than from within the Hindu community.[১৯]

এই কারণে বাংলার হিন্দু সমাজ পরিবর্তিত অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি তাই স্বাভাবিক।

তবে অনতিবিলম্বে বাঙ্গালী মুসলমানও নবোৎসাহে আধুনিক জগতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের চেয়ে একটু পরবর্তী সময়ে হলেও, একই পথ ধরে সামাজিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টায় তারাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ইতিহাস একটু পরেই অনুসন্ধান করা যাবে।

তিন

সিপাহী বিদ্রোহোত্তর মুসলিম ভারতের চিন্তারাজ্যে কি বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তার সম্যক উপলব্ধির জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-৯৮) জীবনকাহিনী বর্ণনা করা প্রয়োজন। স্যার সৈয়দের জনৈক বন্ধুর প্রয়াসে তার যে পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচিত হয়েছে, তা অবলম্বন করে আমরা এই কাহিনী বিবৃত করব।[২০]

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়ায়, বিলীয়মান মুঘল রাজশক্তির শেষ রশ্মিচ্ছটার মুহূর্তে সৈয়দ আহমদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দিল্লীতে (১৭ অক্টোবর ১৮১৭)। তাঁর পিতা সৈয়দ মুহম্মদ তকী ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের (রাজত্বকাল ১৯০৬-৩৭) প্রধান মন্ত্রী খাজা ফরিদউদ্দীন আহমদের জামাতা এবং স্বয়ং সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌র (রাজত্বকাল ১৮৩৮-৫৭) সভাসদ। পিতার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে ও সম্রাটের বদান্যতায় সৈয়দ আহমদ পৈতৃক পদবীসমূহ লাভ করেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই পড়াশুনা সাঙ্গ করে এবং সম্রাটের সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে চাকরি নিতে হল ইংরেজ শক্তির আশ্রয়ে -- দিল্লীর সদর আমীন অফিসের ফৌজদারী বিভাগের সেরেস্তাদার হিসোব। ১৮৩৯ এ তিনি আগ্রায় বদলী হলেন কমিশনার অফিসের নায়েব-মুনশী হয়ে, দু বছর পর ফতেহপুর সিক্রিতে গেলেন মুনসিফ পদে উন্নতি লাভ করে, ১৮৪৬ এ সেই পদে এলেন দিল্লীতে। ১৮৫০ এ সাব-জজ নিযুক্তি হয়ে যান রোহ্‌টাকে, ১৮৫৫ এ সেখান থেকে বদলী হলেন বীজনুরে। এখানে থাকতেই তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা দেখতে পান।

কর্তব্য স্থির করতে সৈয়দ আহমদের দেরী হয় নি। তিনি কি করেছিলেন, তা সকলেই অবগত আছেন, তবে এ সম্পর্কে স্যার জন স্ট্রাচীর একটি মন্তব্যে সকল কথার সার লুকিয়ে আছে :

> No man ever gave nobler proofs of conspicuous courage and loyalty to the British Government than were given by him in 1857. No language that I should use would be worthy of the devotion he showed.[২১]

বিদ্রোহের সময়ে রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তিনি যে মাসে মাত্র দু'শ টাকা করে অতিরিক্ত ভাতা পেতেন, তা কিছুই নয়। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সিপাহীদের দিল্লী অবরোধের কালে মানসিক আঘাত ও দুশ্চিন্তাজনিত কারণে সৈয়দের জননীর মৃত্যু হয়; আর বিদ্রোহকালীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র নিহত হন। আত্মীয়বিয়োগের শোকে মুহ্যমান সৈয়দের চিত্তে বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতির অভাব যে এত প্রবলতর হয়েছিল, এমন অনুমান করা স্বাভাবিক।

১৮৫৮তে মুরাদাবাদে বদলী হবার পর উর্দুতে লেখা তার 'সিপাহী বিদ্রোহের হেতু' বইটি প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত অভিব্যক্ত হয়েছে। বিদ্রোহের কারণ

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অযোধ্যা-অধিকার, তালুকদারদের উপস্বত্ব লোপ, আইন-সভায় দেশীয়দের প্রতিনিধিত্বহীনতা, মিশনারীদের প্রচার, ইস্কুলে খৃস্টানী শিক্ষা, এডমন্ডের পত্র, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে দেশীয়দের প্রতি সহানুভূতির অভাব প্রভৃতি কারণ থেকে উদ্ভূত জনসাধারণের অসন্তোষের ফলে এবং ভারতীয় সৈন্যদের অহঙ্কারের ফলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর পেছনে কোন সংগঠিত ষড়যন্ত্র ছিল না, অথবা বিদেশী সাহায্যও সক্রিয় ছিল না — পারস্যের তো নয়ই। কেননা, রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মতো পারস্যের ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব ঘটা অসম্ভব।[২২]। সম্রাট বাহাদুর শাহকে — যাঁর রাজসভায় একদা সৈয়দ আহ্‌মদ সাদরে বৃত হয়েছিলেন — তিনি 'imbecile' বলে অবহিত করেছেন; যাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাদের পরিচয় দিয়েছেন: 'vagabonds and ill-conditioned men', 'wine drinkers', 'debauch', 'scoundrels prompted by greed and hoping to gain their end by deceiving fools' বলে।[২৩] সম্রাট আকবরের সময় থেকে সম্রাট শাহজাহানের আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল, সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে তার অবসান ঘটা সৈয়দের কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সামরিক সংগঠনের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই আবার 'ভেদ ও শাসননীতি'র সুপারিশ করেছেন :

> The English Army system in India has always been faulty, and one great fault was the paucity of English troops When Nadir Shah conquered Khorassan, and became master of the two kingdoms of Persia and Afghanistan, he invariably kept the two armies at equal strength. The one consisted or rather was composed of Afghans. When the Persian army attempted to rise, the Afghan army was at hand to quell the rebellion and *vice versa* The English did not follow this precedence in India Government certainly did put the two antagonistic races into the same regiment, but constant intercourse had done its work and the two races in regiment had almost become one. If separate regiment of Hindus and separate regiments of Mohammedans had been raised, this feeling of brotherhood could not have arisen.[২৪]

সৈয়দ আহমদের আগেই অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ-সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র।[২৫]

সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বটাই কিন্তু ভারতীয় মুসলমানের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসকমহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানেরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।[২৬] ১৮৬০খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান* বইটিতে সৈয়দ আহমদ এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহের সময়ে মুসলমানেরাই সব চাইতে রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় যে-ভাবে গোটা মুসলমান জাতটাকেই এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেটা খুবই শোচনীয়।[২৭]

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ক্রোধ প্রশমিত করার পর স্যর সৈয়দ আহমদ এবারে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার-আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই আন্দোলনের মূলকথা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকলাভ করা এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অধিকার লাভ করা। গাজীপুরে বদলী হয়ে আসার বছর দুই পর, ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে, তিনি Translation Society র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে যদিও ইংরেজী জানতেন না,[২৮] তবু আধুনিক বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ (ছ বছর আগে মুরাদাবাদে আধুনিক কালের ইতিহাস শিক্ষার জন্যে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)। এই সোসাইটি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানভান্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে দেশে প্রচার করতেন।

১৮৬২তে 'বাইবেল সম্পর্কিত টীকা' প্রকাশ করে তিনি খৃস্টান ইংরেজ ও মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যেকার ব্যবধান খর্ব করার চেষ্টা করেন। অনুবাদ সমিতি এ কাজেরও সহায় ছিল। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে আলীগড়ে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্যর সৈয়দ বলেন :

> The rule of these former emperors and rajahs [of India] was neither in accordance with the Hindu nor the Mahommedan religion It was based on tyranny and oppression . After this long period of what was but mitigated slavery, it was ordained by a higher power than any on earth that the destinies of India should be placed in the hands of an enlightened nation, whose principles of Government were in accordance with those of intellect, justice and reason [২৯]

এর সঙ্গে আক্ষরিকভাবে তুলনা করা চলে রাজা রামমোহন রায়ের উক্তির। 'Final Appeal on the Christian Public' শীর্ষক রচনায় রাজা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন .

> for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness , as well as free inquiry into literary and religious subjects among those nations to which that influence extends.[৩০]

রামমোহনও তাঁর মতোই ভারতীয় জনসাধারণকে রাজভক্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যেমন সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন, রামমোহন তেমনি নীলকরদের সপক্ষে দাড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৈয়দও বিলেতে গিয়েছিলেন (১৮৬৯) এবং ফিরে এসে *Mohamedan Social Reformer* নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *The Brahmanical Magazine*-এর সম্পাদক দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন, আর স্যর সৈয়দের চেষ্টায় ১৮৭৩ এ আলীগড়ে মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের সূচনা হয়।

বিলেতে থাকতে তিনি ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এবং হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর জীবনী ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে দুটি বই প্রকাশ করেন। শেষোক্ত রচনায় যুক্তিধর্মিতার প্রাধান্যে গোড়া মুসলমানেরা ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর

দীর্ঘ ন বছর ধরে তার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ভারতীয় মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে বিশেষভাবে আহ্বান জানায়। এর ফলে মক্কার ধর্মগুরুরা তাকে ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা করেন এবং তার কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। তারপর থেকেই তাঁর জীবননাশের হুমকী দিয়ে বহু বেনামী চিঠি আসতে থাকে। একটি পত্রে লেখা হয় :

লর্ড মেয়োর হত্যাকারী শের আলী একটা আহম্মকের মতো কাজ করেছে— সৈয়দ আহমদকে খতম করে সে তো অনায়াসেই অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতে পারত।[৩১]

১৮৭২এ স্যর উইলিয়ম হান্টারের *The Indian Mussalmans* প্রকাশিত হলে স্যর সৈয়দ আহমদ এর একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেন যে, ওয়াহাবী আন্দেলন ও ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহ এক নয়। ওয়াহাবীরা অনেকটা রোমান ক্যাথলিকদের মতো গোঁড়া। ভারতীয় মুসলমানেরা তাদেবকে ঘৃণাই করে থাকে।[৩২] অথচ, প্রথম জীবনে তিনি এই ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।[৩৩]

আলীগড় কলেজের উদ্বোধনের বছর তিনেক পর স্যর সৈয়দ চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন (১৮৭৬)। তবে ১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত তিনি ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এর অল্পকাল পরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৮৫)। এই সম্মেলন ও সংগঠনের প্রতি সরকারের শুভেচ্ছা থাকলেও সৈয়দ আহমদ নিজে এর থেকে দূরে থাকলেন এবং ভারতীয় মুসলমানেরা যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত না হয়ে পড়েন, সেজন্যে তিনি সচেষ্ট হয়ে পড়লেন। এর ফলেই The Indian United Patriotic Association এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ বিষয়ে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে সৈয়দ নিজেই 'তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর দায়িত্ব' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪] কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, ১৮৭৭-এ কলকাতায় সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত National Mahommedan Associationকে সমর্থন জানাতেও তিনি অস্বীকার করেছিলেন।[৩৫] এই সংগঠন থেকে ভারতীয় নাগরিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি ধ্বনিত হবে, এই আশঙ্কা থেকেও এই অস্বীকৃতি প্রণোদিত হতে পারে, অথবা, নিজের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এই বিরূপতা দেখা দিয়ে থাকতে পারে।

স্যর সৈয়দের ভাবধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাঁর ধর্মনৈতিক চিন্তার মধ্যে। ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে 'দার-উল-ইসলাম' আখ্যাদানের মধ্যেই শুধু এই চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না। হজরত মুহম্মদ (দঃ) যে প্রেরিত পুরুষ ছিলেন এবং কুরআন শরীফ-যে প্রত্যাদিষ্ট, একথা যে-কোন মুসলমানের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন। এ-সত্ত্বেও, কুরআন ও সহি হাদিসের মর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যাখ্যা এবং যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতার উপরে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, ধর্মের মূল নীতি ও নির্দেশসমূহ প্রকৃতির বিধানসম্মত হওয়া দরকার।[৩৬] ধর্মজীবনে এই যুক্তিপ্রয়োগের আবশ্যকতা নির্দেশ করে সৈয়দ তাঁর চিন্তাধারার প্রগতিশীল রূপ চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন।

অবশ্য আলীগড় কলেজের মধ্যে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার যে-সাফল্য প্রতিমূর্ত হয়ে উঠেছিল, স্যর সৈয়দ আহমদ জনসমক্ষে স্মরণীয় হয়ে আছেন সেজন্যেই। তাঁর প্রয়াসের ফলে

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় মসলমানের যোগাযোগ ব্যাপক হতে পেরেছিল। তাঁর আরেকটি কৃতিত্ব এই যে. 'উর্দুকে স্যার সৈয়দ এবং তার সহকর্মী শিষ্য হালী সহজ করে তুললেন... । স্যার সৈয়দ সংস্কৃতির ভাষাকে জনতার জীবনের স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন'।[৩৭]

১৮৯৮তে স্যার সৈয়দের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আরব্ধ কর্ম এগিয়ে নেবার মতো লোকের অভাব তখন হয় নি।

চার

কিন্তু একথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে. স্যার সৈয়দ আহমদের মনোভাব সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের ঐক্যমতের দ্যোতক। সিপাহী অভ্যুত্থানের পূর্বে তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামেব কথা বলেছি. তার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৮৬১.১৮৬৩. ও ১৮৬৮ তে।[৩৮] বড়রকম যুদ্ধ যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তখন দেখা দিয়েছিল — যাকে বলা হয় — সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। বস্তুতপক্ষে ১৮৭০ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই "ওয়াহাবী" সংগ্রাম চলেছে। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ইংরেজের ব্যাপক দমনকার্যে এবং নেতৃস্থানীয় সংগ্রামীদের গ্রেফতার, বিচার ও শাস্তিদানে।

প্রায় এরই সঙ্গে সঙ্গে জিহাদের নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে ভারতের মুসলামানদের পক্ষ থেকে দুটি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হল।[৩৯] এটি অবশ্য কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ 'দার-উল-হরব' কি না. এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল শুরু থেকেই। তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া-পন্থীদের শেষ অগ্ন্যুদ্গারের পর প্রশ্নটি পুনরুত্থাপিত হলে. মক্কার হানাফী. শাফায়ী ও মালেকী সম্প্রদায়ের তিনজন মুফ্তী ভরতবর্ষকে 'দার-উল-ইসলাম' আখ্যা দেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে উত্তর-ভারতের কয়েকজন মওলানা ভারতবর্ষে ইংরেজবিবোধী জিহাদ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে মওলানা কিরামত আলী জৌনপুরী এই মমে ফতওয়া দেন যে. ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ কেবল যে অসিদ্ধ. তা নয়; তেমন সংগ্রাম দেখা দিলে মুসলমানের কর্তব্য হবে তথাকথিত জিহাদীদের বিরুদ্ধে শাসককে সাহায্য করা।[৪০]

কেরামত আলী জৌনপুরী ছিলেন শাহ্-আবদুল আজিজের ছাত্র ও সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর শিষ্য। কিন্তু সহকর্মীদের মতো শিখ-বিরোধী জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাংলা ও বিহারে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও সংস্কারকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষকে তিনি কখনোই 'দার-উল-হরব' বলে মনে করেন নি। তাই জুমা ও ঈদের জামাত নিষিদ্ধ করে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ও দুদু মিয়া যে নির্দেশ দেন. সে বিষয়ে তার প্রবল মতানৈক্য ছিল। ফারায়েজীদের বিরুদ্ধে তো বটেই. ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধেও তিনি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন এবং পীর মুরীদ প্রথারও পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন।

আলোচ্য ফতওয়া-দানের পর কেরামত আলী বেশীদিন বাঁচেন নি (মৃত্যু ১৮৭৩)। কিন্তু ধর্মভাবের দ্বারা ইংরেজ শাসকদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব পুষ্ট করার যে-ব্যবস্থা তিনি করলেন, তা তার পুত্র হাফিজ আহ্মদ (মৃত্যু ১৮৯৮) ও ভাগিনেয় মুহম্মদ মহসীনের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশে বহু মুসলমান কেরামত আলী ও তার উত্তরাধি

মুরীদ ছিলেন। সেদিক দিয়ে তার প্রভাব যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল।[৪১] কোন কোন লেখক ফুরফুরার (হুগলী) পীর আবুবকর ও বিনোদীয়ার (মুর্শিদাবাদ) হজরতকে এদেরই মতাবলম্বী বলে দাবী করেছেন।[৪২]

ধর্মভাবের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসনবিরোধী চেতনাও সঞ্চারিত হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে যুক্তপ্রদেশের একটি ছোট শহরে (শামলী) কয়েকজন মুসলমান বিদ্বজ্জন কোম্পানী-শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করেন এবং কিছুকালের জন্যে ঐ শহর থেকে ইংরেজদেরকে বহিষ্কৃত করতে সমর্থ হন। এদের নেতা ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ্ (১৮১৭-৯৯), সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন মুহম্মদ রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (১৮২৮-১৯০৫)। বিদ্রোহের বিপর্যয়ের পর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মক্কায় চলে যান স্থায়ীভাবে। অপর দুজন দেওবন্দের একটি আরবী মক্তবকে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে দার-উল-উলমে উন্নীত করেন। মওলানা কাসিমই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার। তাঁরা এর জন্য যে সব নিয়ম কানুন তৈরী করেন, তার একটা মোটা কথা হচ্ছে এই যে, কোন অবস্থায় দেওবন্দ মাদ্রাসা কোনরকম সরকারী সাহায্য গ্রহণ করবে না।[৪৩]

অল্পকালের মধ্যেই দেওবন্দ ইসলামী শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি, তার বাইরে থেকেও ছাত্রেরা এখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসে। প্রতিষ্ঠানটির ইংরেজ-শাসনবিরোধী ভাবধারাও অক্ষুণ্ন থাকে। এই কারণে স্যর সৈয়দ আহমদ ও আলীগড় কলেজের ভাবধারার সঙ্গে এঁদের সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের সময়ে (১৮৯৭) স্যর সৈয়দ আহমদ তুরস্কের সুলতানের পক্ষ সমর্থন করেন নি, বরঞ্চ ইংরেজ শাসকের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য দাবি করেন। দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ বরাবরই সুলতানের পক্ষপাতী ছিলেন। এরা ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হরব' মনে করতেন, স্যর সৈয়দ যা কখনোই মেনে নেন নি।[৪৪]

দেওবন্দে শিক্ষিত মওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (জন্ম ১৮৫১) পরবর্তীকালে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মসূচি অনুযায়ী মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে আফগান ও তুরস্ক সরকারের সাহায্য চাইতে যান। এ প্রচেষ্টা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[৪৫]

স্যর সৈয়দ আহমদের সঙ্গে মওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) ও স্যর সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাধারার পার্থক্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্যর সৈয়দ অনেকটা পাশ্চাত্ত্য মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের ব্যাখ্যাদান করেন। শিবলী উদ্যোগী হন ইসলামী মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্ত্যকে বিচার করতে।[৪৬] সৈয়দ আহমদ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইসলামের সঙ্গে উদারনৈতিকতা ও প্রগতির বিরোধ নেই। পক্ষান্তরে আমীর আলীর বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলামই হচ্ছে প্রগতির যথার্থ সহায়। তাই সৈয়দ আহমদের চেয়েও শিবলী ও আমীর আলী ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-সম্বন্ধে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেছেন।[৪৭] স্যর সৈয়দের মতো আমীর আলী যদিও খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের মৌলিক ঐক্যের উপরে জোর দিয়েছিলেন, তবু অনেকের ধারণা, ইসলামের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় তিনি সৈয়দ আহমদকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ বহুবিবাহ প্রভৃতি সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আমীর আলীর ব্যাখ্যায় বহুবিবাহ,

দাসপ্রথা, অবরোধ-ব্যবস্থা ও শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামসম্মত নয়। স্যর সৈয়দের তুলনায় তাঁর ইংরেজ-প্রীতিও অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ছিল — যদিও উত্তরসূরীদের তুলনায় তিনি ছিলেন ইংরেজের পরম বন্ধু।[৪৮] স্যর সৈয়দের রাজনৈতিক মতামত শিবলীর ভাল লাগে নি।[৪৯] এক্ষেত্রেও আমীর আলীর সঙ্গে স্যর সৈয়দের মিল হয় নি।[৫০]

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ জামালউদ্দীন আল্-আফগানের (১৮৩৮-৯৭) কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার মিত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার এত বড় শত্রু সেকালের মুসলিম জাহানে আর দেখা দেন নি। তাঁর ভাবধারার প্রভাবে তুরস্ক, মিশর ও পারস্য নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল আর এই প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল আফগানিস্তান এবং ভারতবর্ষে। মক্কায় হজ করতে যাবার পথে ভারতে তিনি আসেন ১৯৫৭ ও ১৮৬৯ এ। ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য মুসলমান নেতাদেরকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় নি দ্বিতীয়বারে। ১৮৭৯ তে মিশর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং হায়দরাবাদে আশ্রয় নেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে কলকাতায় দীর্ঘকাল ধরে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখেন। বাধাবিপত্তি-সত্ত্বেও ভারতে জামালউদ্দীনের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানের অর্থসাহায্যে ও মুফতী আবহুর সহযোগে তিনি প্যারিস থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ভারতে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হয় এবং ভারতবর্ষে পত্রিকাটির প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫১] প্যান- ইসলামপন্থীদের যে ধারণা তিনি প্রচার করেছিলেন, পরবর্তীকালে সে ভাবধারা অনেকটা প্রবল হয়। গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে দাবি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তা যাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেসব ভারতীয় মুসলমান যে অন্তরে ইংরেজ শাসন-বিরোধী চেতনাকেই লালন করেছিলেন, এতে সন্দেহ নেই।

জামালউদ্দীন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর যুক্তিবাদী প্রবণতার কথাও সর্বজনবিদিত। ওয়াহাবীদের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য এখানে, এবং এখানেই স্যর সৈয়দ আহ্মদের ভাবধারার সঙ্গে তার মিল।

আধুনিক জ্ঞানচর্চার ও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের যাঁরা বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই ইংরেজ-শাসনবিরোধী চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, একথা মনে করার আবশ্যকতা নেই। সামাজিক কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মীয় গোড়ামী এক জিনিস আর রাজনৈতিক সচেতনতা অন্য জিনিস। ইংরেজ-শাসনের পটভূমিকা অনুপস্থিত থাকলেও রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিকামীদের বিরোধ নিশ্চয় দেখা দিত।

পাঁচ

আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্য যে, আধুনিককালে ভারতের জাতীয় চেতনা বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই জন্মলাভ করেছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা খুব সংগতভাবেই সেই ধারার সূচনা দেখেছেন, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। এমন কি, একালের কর্মসাধনার ইতিহাস রচয়িতারাও ধর্মচেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারার এই গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন।

এর কারণ আছে। ইংরেজ আমলে নতুন ধর্মান্দোলনের প্রেরণা জেগেছিল আধুনিক শিক্ষালব্ধ আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদে এবং খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে।

যোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ধর্ম প্রচারের কাজে মিশনারীরা নবাবী আমলে যেমন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কোম্পানী আমলের প্রথম দিকেও সে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কোম্পানীর এলাকায় প্রথম যুগে কোন মিশনারী বসতি স্থাপনের অনুমতি পেতেন না। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী যখন কলকাতায় আসেন, তখন মিশনারী বলে তাকে সেখানে নামতে দেওয়া হয় নি। তাই তাকে বসতি স্থাপন করতে হয় সুদূর মালদহে — তাও নীলকর হিসেবে। ধর্মপ্রচারের সুযোগ তিনি লাভ করেন শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হবার পর সেখানে যোগ দিয়ে।

১৮১৩ খৃস্টাব্দের সনদে কোম্পানী-এলাকায় মিশনারীদের বসতিস্থাপন সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়।[৫২] ফলে, খৃস্টান ধর্মপ্রচারকেরা এদেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করার সুযোগ লাভ করেন আরো ব্যাপকভাবে। তাঁদের এ ধরনের প্রচারণা-যে একজন বিদেশী খৃস্টানকেও কতখানি ব্যথিত করে তুলেছিল, তার পরিচয় আছে লন্ডনে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে লেখা লর্ড মিন্টোর একটি পত্রে।[৫৩] দেশীয়দের অনেক কুসংস্কার ভেঙ্গে দেবার জন্য বাইরের আঘাতের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সহানুভূতিহীন আক্রমণ সেই প্রয়োজন সম্পন্ন করতে পারত না। বরঞ্চ, বিধর্মীর আঘাতের জবাবে তাদের পক্ষে নিজেদের সংস্কারগুলোকে পরম প্রিয় ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করা স্বাভাবিক ছিল। শুধু তাই নয়, এই ধরনের সাহনুভূতিহীন আক্রমণকে নীরবে মেনে নেবার মধ্যেই হীনমন্যতার পরিচয় আছে। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আবশ্যকতা সেদিন ছিল। সেক্ষেত্রে রামমোহনই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন।

রামমোহনের তুলনায় কেশবচন্দ্র খৃস্টান প্রভাবকে অনেক বেশী আত্মস্থ করেছিলেন বলেই হয়তো এ বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য তিনি করেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খৃস্টান প্রচারকদের এই অভিযান সহ্য করতে পারেন নি। এর প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে আপস করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।[৫৪] তবে পাদরীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ করে সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্রেরাই।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রেরণায় যারা এ দেশের সবকিছুকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন, সকল সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান লঙ্ঘন করাকেই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ মনে করেছিলেন, তাঁরা মানুষের মনে বরঞ্চ সেই জিজ্ঞাসারই সৃষ্টি করেছিলেন — মধুসুদনের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে — একেই কি বলে সভ্যতা? পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের অনেকেই অবশ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন — যেমন, রামগোপাল ঘোষ বা রাজনারায়ণ বসু। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁদের চিন্তাজগতে একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।[৫৫] ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে যে-চরমপন্থী মতামত স্থানলাভ করেছিল, তার বিপরীত কোটিতে দেখা দেয় রাজা রাধাকান্ত দেব-ভুদেব মুখোপাধ্যায় সেবিত ধর্মসভা। এই চরম রক্ষণশীলদের একটি শাখা আবার ভারতবর্ষের আর্য-যুগকেই সকল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সূতিকাগৃহ বলে স্থির করে বসেছিল।

ব্রাহ্মসমাজকেই সমন্বয়পন্থার সর্বোত্তম কেন্দ্র বলতে হবে। রামমোহনের শাস্ত্রাশ্রয়ী এবং শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ, আর, কেবল পরমার্থ নয়, বাস্তব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ এই সমন্বয়-চিন্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৫৬] মানবতাবোধ ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ, ধর্মের প্রতি যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টি প্রয়োগ, ধর্মচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি, উদারনৈতিক মনোভাবের চর্চা, এই ছিল তাঁর অনুসারীদের সামগ্রিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি। এই উপলব্ধির মধ্যে মানুষের ন্যূনতম মর্যাদা ও অধিকারের যে সহজ স্বীকৃতি আছে, সেই বোধকেই পরবর্তী কালের রাজনৈতিক চেতনার অঙ্কুর বলা যেতে পারে। স্মরণযোগ্য যে, ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যিনি সমালোচনার তীব্র কশাঘাত করেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র নাস্তিক সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।[৫৭]

ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হবার পরও কেশবচন্দ্র সেনের ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রতিপক্ষের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মানুষের মৌলিক ন্যায় ও অধিকারকে যোগ্য মর্যাদা দেবার নীতিতে অবিচল থেকেছে। প্রথম যুগে ধর্মসভার প্রচারণায় এবং পরবর্তী কালে প্রার্থনা সমাজ ও আর্যসমাজের প্রভাবে বা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের অন্তরালে হিন্দুর পুনর্জাগরণবাদ যেভাবে মাথা তুলেছিল এবং পরাধীন ভারতবাসীর মধ্যে ভেদবুদ্ধির বিকাশে সহয়তা করেছিল, সেই তুলনায় ব্রাহ্মসমাজের পরতমসহিষ্ণুতার আদর্শ সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনাবিকাশের সহায়ক ছিল।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনাবিকাশের মূলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় সক্রিয় ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য এবং কতিপয় স্বদেশী পণ্ডিতের গবেষণার ফলে ঐতিহ্যচেতনা জাগ্রত হয় এবং সে সম্পর্কে গর্ববোধ দেখা দেয়। আবার, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে কেশব সেন ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্রোহও দেশবাসীব মনকে গভীরভাবে আলোড়িত কবে। পশ্চিমের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও অস্ফুট ছিল না।[৫৮] তাই, প্রথম যুগে যেখানে বাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুব, রামগোপাল ঘোয, কেশব সেন প্রমুখ সমাজনেতা ইংরেজ-শাসনের প্রশংসা করেছেন এবং এর স্থায়িত্ব কামনা করেছেন, সেখানে পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি নেতা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। দেশে জনমত-গঠনের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথের *ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন* ও শিশিরকুমারের *ইন্ডিয়া লীগ*। সেই কাজ আরো বড় আকারে সম্পন্ন করার জন্যে ১৮৮৫তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল — যদিও এর প্রারম্ভিক সুর ছিল অনেক নীচুতে বাঁধা।

কংগ্রেস সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া তাই প্রথমে খুবই অনুকূল ছিল। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ভূতপূর্ব সরকারী অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমের মস্তিষ্কপ্রসূত তো বটেই, এমন কি, ভাইসরয় লর্ড ডাফরীনকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করাও অযৌক্তিক নয়।[৫৯] কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশের সকল নেতাও যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন নি এবং তাদের একত্র করবার সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা হয় নি, তার বড় প্রমাণ সুরেন্দ্রনাথের আচরণের মধ্যেই পাওয়া যায়। আগে থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদ না পাওয়ায় তাঁর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্মেলন ঠিক একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৬০]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেল, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও তেমনি বেড়ে গেল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হোক বা না হোক প্রথম কয়েক বৎসর সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন মতামত প্রকাশ করে নি।[৬১] কিন্তু এই পারস্পরিক প্রশংসা-বিনিময় বেশীদিন চলতে পারল না। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, নানামুখী সংকটও তীব্রতর হতে লাগল। কংগ্রেসে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রতি আপসমূলক মনোভাবে ভাঁটা পড়ল। ১৮৯২তে নির্বাচনের নীতি মেনে নিয়ে সরকার আপসরফা করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে সরকারও কংগ্রেসের ভাবী পরিণতি সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলেই 'neutrality circular' প্রচারিত হয়। এই সার্কুলার মারফৎ সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে যোগদানে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬২] কংগ্রেস-সংগঠনে দাদাভাই নওরোজীর যোগদানের পর এর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ইংরেজ-শাসনকালে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে কি রকম শোষণ করা হয়, নওরোজী সেই ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁর আরেকটি কৃতিত্ব বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ স্থাপন। এই জনসমাজের মধ্যে কম হলেও মুসলমান নেতা ও সমর্থকের অভাব ছিল না।

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত — এই বিশ বছর ধরে — কংগ্রেসে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলা হয় উদারনৈতিক বা নরমপন্থী। রাজা রামমোহন ও স্যর সৈয়দ আহমদের মতো এঁরাও ইংরেজ-শাসনকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করতেন এবং ইংল্যান্ডের প্রতি তাঁদের একটা সশ্রদ্ধ আনুগত্যের মনোভাবও ছিল। এ-সত্ত্বেও, তাঁরা সমগ্র দেশবাসীকে নিজেদের অধিকার-সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন এবং ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, এটি তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়েছিলেন শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ পৃথক করার জন্যে, ভারতীয়দেরকে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিয়োগ করার দাবিতে, আর্থিক নিষ্কাশন (economic drainage) বন্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের প্রত্যাশায় এবং সামরিক খাতে ব্যয়-বরাদ্ধ হ্রাস করার জন্যে।[৬৩]

কিন্তু সরকার এইসব আবেদন-নিবেদনে বিশেষ কর্ণপাত করেন নি। কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান জনসংযোগে তাঁরা প্রীত হন নি এবং এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের হাতে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিচ্যুত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে তিনি এদেশবাসীকে 'মিথ্যাবাদী' বলে অভিহিত করায় সারা দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ তখন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার জন্যে সরকার পক্ষ আরো শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে মুসলমান সমাজের সমর্থন পাবার আশায় ঘোষণা করলেন যে, দেশভাগের নীতিটি গৃহীত হয়েছে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কথা বিবেচনা করে। কার্জনের এই ব্যবস্থা দেশে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তা আমরা পরে দেখব। তার আগে এখানে বলে রাখা দরকার যে, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের

মৌলিক পার্থক্য ছিল। পরবর্তী কালে মুসলিম জনশক্তি সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি দাবি করেছিল। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠায় এবং পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের বিভাগে সেই দাবির বাস্তব ফল রূপায়ণ ঘটেছে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ জনসাধারণের কোন দাবির ফল নয় – শাসকচক্রের পরিকল্পনা সেদিন জনসাধারণের উপর আরোপিত হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনায় এদেশবাসীকে স্বাধীনতা-দানের কোন ইচ্ছা প্রকাশ পায় নি।

লর্ড কার্জনের আচরণ উদারনৈতিক কংগ্রেস নেতাদেরকে বিমূঢ় এবং তাদের নেতৃত্বকে শিথিল করে দিল। এই সুযোগে কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন চরমপন্থী নেতারা। হিন্দু ঐতিহ্যগর্বে এরা সকলেই গর্বিত ছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর বিশেষত বাঙালী হিন্দুর চেতনায় বেশ একটা লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয় ১৮৭০ এর দিকে। সেই সময় থেকে নব্য বঙ্গ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন হন এবং প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের সপক্ষে মতামত প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করেন।[৬৪] এর কিছু পূর্বে রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন[৬৫] এবং ১৮৭৩-এ কলকাতায় 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা[৬৬] এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও ধর্মতত্ত্ব-সম্পর্কে নবোৎসাহ দেখা দেবার ফলে তাঁদের সম্পূর্ণ চিন্তাধারাই হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হযেছিল। প্রসঙ্গক্রমে ১৮৬৫ তে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বরাহনগরের "সাধারণ ধর্মসভা"র কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ব্যাপক মিলনক্ষেত্র রচনা করা। এখানে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃস্টান ও বৌদ্ধরা পরধর্মকে আক্রমণ না করে নিজের নিজের ধর্মের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে আলোচনা করতে পারতেন।[৬৭] কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবধারার চাপে তাঁর প্রচেষ্ট ব্যাহত হয়ে গেল।

এই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চেতনা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। সামজিক ক্ষেত্রে দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চমন্যতাকেই তখন সকলে মনে করতেন জাতীয়বাদী চেতনা বলে। জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হল সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। এর একটি অভিব্যক্তি দেখা যায় হিন্দু মেলার মধ্যে। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির উৎসাহে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা হয়। "যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।"[৬৮] কিন্তু এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে অহিন্দু জনসংখ্যার কথা কেউ ভাবলেন না। জাতি ও হিন্দু কথাটা সমার্থক হয়ে দাঁড়াবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিত্বের একটি মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত হল। স্যর সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের উপরে জোর দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধে প্রথম সংঘর্ষ বাধল ১৮৮২ তে যখন দয়ানন্দ সরস্বতী গোহত্যানিবারণী আন্দোলন শুরু করলেন এবং ১৮৯৫ তে যখন বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনা দিলেন। তিলক ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের গুরু। ১৯০৫ এর পর কংগ্রেসে এই চরমপন্থীদের প্রাধান্য হিন্দু মুসলমানকে তাই কাছে না টেনে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

ছয়

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কলে বাঙালী মুসলমান সমাজে নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যর সৈয়দ আহমদের মতো তাঁরও সমগ্র কর্মজীবন পরিচালিত হয়েছিল দুটি লক্ষ্য স্থির করে : মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো আর ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তাদের মিতালী পাতানো। স্যর সৈয়দ ও তিনি একই সময়ে একই ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে আবদুল লতিফ আলীগড়-নেতার পূর্বগামী ছিলেন।

আবদুল লতিফ ছিলেন ফরিদপুরের অধিবাসী। তিনি শিক্ষালাভ করেন কলকাতা মাদ্রাসায়, পরে সেখানে শিক্ষকতা করতেন। ১৮৪৯ এ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে অবসরগ্রহণ করেন ১৮৮৪ তে। ১৮৬২ খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সর্বপ্রথম মুসলমান সদস্য নিযুক্ত হন এবং দু'বার পুনর্নিয়োগ লাভ করে একাদিক্রমে দশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ১৮৮০ তে নবাব ও ১৮৮৭ তে নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন সরকারের কাছ থেকে। শেষ জীবনে তিনি ভূপালের বেগমের মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন।[৬৯]

১৮৫০ এর পর থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। এ উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্যে তিনি সারা ভারতের মুসলমান ছাত্রসমাজের কাছ থেকে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের সুফল' সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় একটি রচনা প্রতিযোগিতা আহবান করেন। কোন কোন প্রবন্ধ-লেখক, মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষালাভ করা অকর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেন এবং এই মতেব সমর্থনে কুরআন- হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থিত করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতা আহ্বানকারীর প্রচেষ্টা ধর্মীয় স্বার্থের বিরোধী বলে গণ্য করে তাকে 'কাফের' পদবাচ্য বলেও কেউ সিদ্ধান্ত করে বসেন। যাহোক, এসময়ে কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুল লতিফ সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এরপর তিনি বাঙালী মুসলমানদের জন্যে উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে আন্দোলন করেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে সুবিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্স কলেজে রূপান্তবিত হয় এবং সেখানে মুসলমান ছাত্রদেরকে অধ্যয়নের সুযোগদান করা হয়।[৭০]

আবদুল লতিফের মূল যে দুটি উদ্দেশ্যর কথা বলেছি, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এবারে তিনি একটি ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। ১৮৬৬তে কলকাতায় *মেহোমেডান লিটারীর সোসাইটির* প্রতিষ্ঠা তাঁবই কীর্তি। সংগঠনটির কার্যধারা ছিল দ্বিমুখী : আলোচনা ও রচনাপাঠের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয়দান এবং নিজেদের চিন্তাধারার উন্নতি ও বিকাশসাধন, আর উপদেষ্টা-সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সরকারকে নানারকম পরামর্শদান। চার বছরের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা পাঁচশ হয়ে দাঁড়ায়।[৭১]

ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই ধরনের সংগঠন এই প্রথম স্থাপিত হয়। স্যর সৈয়দের অনুবাদ-সমিতি আরো এক বছর পরে জন্মলাভ করে। এই সোসাইটি তাই সরকারের

পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সাধারণত এর পৃষ্ঠপোষকের পদ অলঙ্কৃত করতেন বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরেরা। এর বিভিন্ন সভায় ডিউক অফ এডিনবরা, প্রিন্স অফ ওয়েলস, ভাইসরয় (লর্ড লরেন্স ও লর্ড মেয়ো), লেফটেন্যান্ট-গভর্নর (স্যার সিসিল বীডন ও স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী), কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (জে.পি. নর্ম্যান) প্রভৃতি ইংরেজ-শাসনযন্ত্রের সর্বোত্তম স্তম্ভেরা যোগ দিয়েছেন। এই সংগঠনের সঙ্গে যে-সব দেশীয় মুসলমান সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহীশূরের সুলতান, অযোধ্যার নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম ও মুর্শিদাবাদের নবাবের উত্তরাধিকারীদের এবং বিভিন্ন বড় জমিদারীর কর্ণধারদের নাম উল্লেখযোগ্য। স্যার সৈয়দ আহমদের আশীর্বাদপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠান রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডক্টর কানাইলাল দে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ তারাপ্রসন্ন রায়, প্রিয়লাল দে প্রভৃতি হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিব এবং ডক্টর হর্নলে, ডক্টর ম্যাককান, ডক্টর উড্ ও জাস্টিস গীব্স প্রভৃতি কলকাতার ইওরোপীয় বিদ্বজ্জনের সহযোগিতা লাভ করেছিল।[৭২] তবে কর্মকর্তাদের তালিকায় কোন অমুসলমান নাম দেখি না।

মেহোমেডান লিটাবারী সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসকের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের সহৃদয় সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ঘটানো। আততায়ীর কবলে নিহত বিচারপতি নর্ম্যান ও ভাইসরয লর্ড মেয়োব জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে শের আলীকে এঁরা অভিহিত করেছিলেন 'a convict villain, claiming to belong to the Mahomedan persuasion' বলে। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার ইংরেজ শাসনবিরোধী প্রভাব বাধাহত করার উদ্দেশ্যে ১৮৭০-এ তাঁরা কলকাতায় একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ধর্মীয় নির্দেশাবলী আলোচনা করে স্থির হয় যে, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম' এবং এখানে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী। এই বিশেষ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কেরামত আলী জৌনপুরী।[৭৩] এই সভার সিদ্ধান্তটি সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছিল।

কেরামত আলী জৌনপুরীর ফতওয়া-প্রচার ছাড়া লিটারারী সোসাইটির সরকার-প্রীতির আরো কতকগুলো দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৮৫-র কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ থেকে সোসাইটিকে একটি পত্র লেখা হয়। সোসাইটি সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাহত হবার আশঙ্কায়।[৭৪] ১৮৯৯তে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষাবিষয়ে অনুসৃত সরকারী নীতির সমালোচনা করনে। লিটারারী সোসাইটি আমীর আলীর বক্তব্যের প্রতিবাদে সরকারী নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।[৭৫]

সৈয়দ আমীর আলী এবং আরো কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমানের নেতৃত্বে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে *ন্যাশনাল মেহোমেডান এসোসিয়েশন* নামে এসটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরে এটি পরিচিত হয় *সেন্ট্রাল মেহোমেডান এসোসিয়েশন* নামে। এর সভাপতি ছিলেন পাটনার নবাব আমীর আলী খান বাহাদুর, সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী এবং ব্যবস্থাপক সমিতির সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সদস্য ছিলেন সৈয়দ আমীর হোসেন। নামত না হোক বাস্তবত আরো অনেক *আমীর* এই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের দ্বার অমুসলমানদের জন্যেও উন্মুক্ত ছিল। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ব্যবস্থাপনা সমিতির সপ্ত-সদস্যের মধ্যেই নাম দেখতে পাই বাবু গণেশচন্দ্র চন্দের।[৭৬]

শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ অসিদ্ধ, এই মর্মে পুস্তিকা রচনা করে (১৮৭০) নবাব আমীর আলী খান বাহাদুর বিখ্যাত হয়েছিলেন।[৭৭] তিনি একদা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সূতী বস্ত্রের উপরে আরোপিত নতুন করভারের প্রতিবাদে ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে লর্ড লিটনের কাছে প্রেরিত এই এসোসিয়েশনের প্রতিনির্ধিদলের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য।[৭৮] সৈয়দ আমীর আলীর মতবাদের কিছুটা পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।[৭৮ক] সৈয়দ আমীর হোসেন ছিলেন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৮০তে বাঙালী মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কে তিনি যে-প্রবন্ধ রচনা করেন,[৭৯] তা সরকারী ও বেসরকারী মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে।[৮০] ১৮৮২তে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মার্কুইস অফ রিপনের কাছে প্রেরিত স্মারকপত্রে মুসলমানের শিক্ষার প্রশ্নটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার দাবি জানানো হয়[৮১]। এ প্রস্তাবটিও সরকারী মহলে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এই সংগঠনের মুহম্মদ ইউসুফ (বিহার প্রদেশে এঁর আদিবাস হলেও থাকতেন কলকাতায়) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩তে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা দাবি করেন। মুহম্মদ ইউসুফের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি এই যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবীও তিনিই সর্বপ্রথম ধ্বনিত করেন[৮২]।

ন্যাশনাল মেহোমেডান এসোসিয়েশনের প্রতি স্যর সৈয়দ আহমদ বিরূপ ছিলেন, একথা আগে বলেছি।[৮৩] ১৮৮২ খৃস্টাব্দে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় মুসলমানদের একটি জাতীয় সম্মেলন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, কিন্তু স্যর সৈয়দের বিরোধিতার ফলে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৮৪] মেহোমেডান লিটারারী সোসাইটি কিন্তু স্যর সৈয়দের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছিল। এই সোসাইটির সঙ্গে মেহোমেডান এসোসিয়েশনের যে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে ইংরেজ-শাসনের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী চেতনাবিকাশের উদ্দেশ্যে যে-সব সভাসমিতি গঠিত হয়, মেহোমেডান এসোসিয়েশন তার সঙ্গে যোগ দিতেও ইতস্তত করে নি। ১৮৮৫তে সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, জমিদারদের সংগঠন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, আর সেন্ট্রাল মেহোমেডান এসোসিয়েশন সম্মিলিতভাবে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহের পুনর্গঠনের প্রশ্নই প্রধানত আলোচিত হয়।[৮৫] লিটারারী সোসাইটি চেয়েছিলেন ইংরেজদের পক্ষপুটে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে, আর এঁদের লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করা।

এইসব উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতার কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বাস্তব সুযোগ-সুবিধার আকস্মিক যোগে বাঙালী মুসলমানেরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করতে অগ্রসর হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলাদেশে পাটচাষ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অষ্টম দশকের শুরু থেকে পাটের চাহিদা ও চাষ দু-ই গেল বেড়ে। উনিশ শতাব্দীর শেষে এবং বিশ শতাব্দীর প্রথমে তা আরো বৃদ্ধি পায়।[৮৬] পাটের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলত মুসলমানপ্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়েছিলেন, একথা মনে রাখতে হবে।[৮৭] সুতরাং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের হতে কিছু পয়সা এসেছিল এবং তাদের মধ্যে সন্তান-সন্ততির শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কলকাতায় সাহেবদের

খানসামারাও কিছু কিছু দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদেরকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে এবং শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাদেরকে পড়বার সুযোগ দিতেন। এই দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে।[৮৮] অতএব, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী মুসলমানদের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ দেখা দিলে আগের চেয়ে বেশি এবং এই শিক্ষার প্রসার হতে না হতেই তাদের পক্ষ থেকে সরকারি চাকরীর অংশ দাবি করা হল। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে বাংলা সরকারের অধীনে ২১১১জন কর্মচারীর মধ্যে ১৩৩৮ জন ইওরোপীয়, ৬৮১ জন হিন্দু ও মাত্র ৯২ জন মুসলমান স্থানলাভ করেছিল।[৮৯] এই তালিকা দেখিয়ে হান্টার সাহেব দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং পাঁচ বছর পরেও অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি, একথা জানিয়েছেন। অনেকেই মনে করে থাকেন যে, এই অবস্থার জন্যে দায়ী সরকারের মুসলমান-বিরোধী মনোভাব। কিন্তু একই সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সবকারী কর্মচারীদের তালিকায় ৬০ জন খৃস্টান, ১৭৮ জন হিন্দু এবং ১৮২ জন মুসলমান দেখা যায়, অথচ সেই প্রদেশের সমস্ত জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানেরা ছিলেন একসপ্তমাংশ মাত্র।[৯০] সুতরাং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের পশ্চাদ্‌পদতার কারণ ছিল শিক্ষাবিষয়ে তার অনগ্রসরতা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী মুসলমান এক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চেয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের অনগ্রসরতা-সম্পর্কে সচেতন হবাব ফলে মুসলমান নেতারা এ বিষয়ে যে-আন্দোলন উপস্থিত করেন, তা বৃথা যায় নি। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের দিকে সরকার এদিকে গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হলেন। ১৮৭১ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে যে-কটি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার সবকটিতেই মুসলমান সমাজে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর ফলেই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং সেখানে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।[৯১] মাতৃভাষা এবং আরবী-ফারসী শিক্ষা, এর কোনদিকেই কম জোর দেওয়া হল না। সাধারণ স্কুলসমূহে আরবী-ফারসী পড়াবার ব্যবস্থা, মুসলমানদের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার জন্যে মুসলমানশিক্ষক নিয়োগ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা -- এইসব সুপারিশের ফল। মহসীন তহবিলের টাকা এর আগে পর্যন্ত অপব্যয় হয়েছে। সরকার এবার স্থির করলেন যে, মুসলমানদের দান থেকে যে-সব তহবিল গঠিত হয়েছে, তার অর্থ কেবল মুসলমানের শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে। এতে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের খুব সুবিধা হল।

এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুফল দশ বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে বাঙালী মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১৪.৭ ভাগ মাত্র স্কুল-কলেজে পড়ত। ১৮৮১-৮২তে ছাত্রসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ২৩.৮ ভাগ।[৯২] এই উন্নতি বিস্ময়কর।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকার সর্বত্রই মুসলমানের আনুকূল্য করতে চাইলেন। ১৮৮৫র শিক্ষাপ্রস্তাবে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয় যে, সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে অনগ্রসর বলে মুসলমানেরা কোন বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করতে পারে না।[৯৩] লেখাপড়া শিখে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই তারা ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির অংশভাগী হতে পারে মাত্র। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিপ্রার্থী মুসলমান তাই হিন্দুকেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য করল।

তথ্য-নির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য Petition from the East India Company to the Parliament February 1858 Keith, I, 298-319

২ Romesh Dutt *The Economic History of India in the Victorian Age, 230* বাঁকা হরফ আমার।

৩ উদ্ধৃত, ঐ, 247।

৪ ঐ, 343-44।

৫ দ্রষ্টব্য ঐ, 360 ও পবরর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৬ A R Desai *Social Background of Indian Nationalism* (2nd edn Bombay, 1954), 113

৭. ঐ, 87-88

৮ Bimanbehari Majumdar, 129n, 195

৯. Dutt, *The Economic History of India in the Victorian Age, 263*

১০ Majumdar, Raychaudhuri and Datta, 852-53

১১ ঐ, 856

১২. ঐ, 856

১৩ Desai, I, 'A self-sufficient village, based on agriculture carried on with the primitive plough and bullock-power, and handicrafts by means of simple instruments, was a basic feature of pre-British Indian Society '

১৪ A K Nazmul Karim, *Changing Society in India and Pakistan* (Dacca, 1956), 56 'From the standpoint of social change and social stratification, the most significant point is that the British for the first time released forces in India, which *freed* the towns from feudal control During the pre-British rule a commercial class or the town municipal institutions were never free from feudal control '

১৫ ঐ, I

১৬ বিনয় ঘোষ, *বাঙলার নবজাগৃতি* (কলিকাতা, ১৩৫৫), ১ ৪৭-৪৮। তুলনীয়, Desai, 37-38 'Historically speaking, the destruction of the self-sufficient village was a progressive event though it involved much tragic destruction But the capitalist unification of India based on the village anarchy and co-operation on the narrow village scale paved the way for a national economy and nationscale collaboration It paved the way for higher forms of economy and social collaboration It paved the way for a national economy and nationscale collaboration amongst the Indian nation out of the amorphous mass of the Indian people which, before this unification, were scattered in numerous villages between which there was very little exchange, social or economic, and hence, hand hardly any positive or common interest '

১৭. ঐ, 152-153

১৮. বিনয় ঘোষ, *বাঙলার নবজাগৃতি* পূর্বোক্ত, ১ : ৮৮।

১৯ Desai, 152 মুসলমান শাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে মুসলমান উচ্চবিত্তের কোন যোগ ছিল না, তা নয়। দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। তবে এই ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালী মুসলমানের অংশ কতটুকু ছিল, তার পরিচয় নেই।

২০. G.F I Graham, *The Life and Works of Sir Syed Ahmed Khan* (2nd edn London, 1909).

২১. উদ্ধৃত, ঐ, 15

২২. Syed Ahmed Khan *The Causes of Indian Revolt,4*
২৩. ঐ, 8।
২৪. ঐ, 50।
২৫. সুরেন্দ্রনাথ সেন, *ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলী,* ইতিহাস, ৭:১।
২৬. উদ্ধৃত, C F Andrew and Girija Mukerji, *The Rise and Growth of the Congress in India* (London, 1938) 49
২৭. উদ্ধৃত, Graham 42
২৮. ঐ, তুলনীয়, Surendranath Banerjea, *A Nation in Making* (2nd edn London 1925) 48
২৯. উদ্ধৃত, Graham, 59
৩০. Rammohun Roy, *Works* (Allahabad, 1906), 874
৩১. Graham, 140
৩২ উদ্ধৃত, ঐ, 142
৩৩. সৈয়দ আহমদ খান, '*আসার-উস-সনাদিদ*'[উর্দু] থেকে উদ্ধৃত। Ashraf, পূর্বোক্ত 79
৩৪. Graham, 225
৩৫. Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India* (2nd edn . London, 1945), 25
৩৬. ঐ, 21-22, Titus, 194
৩৭. হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য* (দ্বি-স: কলিকাতা, ১৩৬৫), ৮০।
৩৮. Hunter, 27 ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, 98.
৩৯. 'Wahhabiya', *Encyclopaedia of Islam,* IV, 1090
৪০. Hunter, Appendices
৪১. 'Karamat Ali', *Encyclopaedia of Islam* II, 752-54
৪২. Benoy Gopal Ray, পূর্বোক্ত।
৪৩. Ziya-ul-Hasan Faruqi, *The Deoband School and the Demand for Pakistan* (Bombay, 1963), 20-27
৪৪. ঐ, 46
৪৫. ঐ, 55-61 প্রধানত দেওবন্দের মওলানাদের উদ্যোগেই খিলাফত আন্দোলনের প্রাক্কালে জমিয়ত-উল-উলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠা হয় (১৯১৯)। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে এরা সহযোগিতা করেছিলেন। এঁদের একজন প্রসিদ্ধ নেতা মওলানা হোসেন আহমদ মদানী বলেছিলেন যে, ভৌগোলিক সীমারেখাই হচ্ছে জাতীয়তার ভিত্তি। দ্রষ্টব্য ঐ, ৪৪.
৪৬. Smith, (Lahore edn 1947), 36
৪৭ ঐ, 51-52.
৪৮. Benoy Gopal Ray, পূর্বোক্ত।
৪৯. Faruqui, 50.
৫০. পৃ ৭২ ও ৮৫ দ্রষ্টব্য।
৫১. Edward G Browne *The Persian Revolution of 1905-1909* (Cambridge, 1910), 4-9.
৫২. J N Farquhar, *Modern Religious Movements in India* (New York, 1924), 10-11.
৫৩. Thompson and Garratt, 247-এ উদ্ধৃত।
৫৪ কাজী আবদুল ওদুদ; 'বাংলার জাগরণ' (কলিকাতা, ১৯৫৬), অধ্যায় ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।
৫৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, ১১৭-১৯: রাজনারায়ণ বসু,'আত্মচরিত' (তৃ-স; কলিকাতা, ১৯৫২)।
৫৬. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', অধ্যায় ১।
৫৭. Bimanbehari Majumdar, I, 152-53
৫৮. ঐ, I, 235-41

৫৯. Andrews and Mukerji, 123
৬০ Surendranath Banerjea, 98-99
৬১ Andrews and Mukerji, 145
৬২. ঐ, 146
৬৩ Desai, 284
৬৪ Farquhar, 354
৬৫ রাজনারায়ণ বসু, ৮১-৮২।
৬৬. Farquhar, 187
৬৭. ঐ, 186-87
৬৮. হিন্দু মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী',১ (দ্বি-স., কলিকাতা, ১৩৫৩) : ৪৬।
৬৯ Nawab Abdool Luteef Khan Bahadur, *A Short Account of My Public Life* (Calcutta, 1885), F B Bradley-birt, *Twelve Men of Bangal in the Nineteenth Century* (Calcutta, 1910)
৭০ Luteef
৭১ ঐ।
৭২ *A Quarter Century of the Mahomedan Literary Society of Calcutta* (Calcutta, 1889)
৭৩. পূর্বে ৭৩ পৃ দ্রষ্টব্য।
৭৪. *Calcutta Review*, LXXXIX, x-xi
৭৫ *A Quarter Century of the Mahomedan Literary Society*
৭৬ *Proceedings of an Extraordinary General Meeting of the National Mahomedan Association held on Sunday the 16th February*, 1879
৭৭ Benoy Gopal Ray, পূর্বোক্ত।
৭৮. Bimanbehari Majumdar, I, 395-96
৭৮. ক পূর্বে পৃ ৭৫ দ্রষ্টব্য।
৭৯ Syed Ameer Hossein, *A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengal* (Calcutta, 1889)
৮০ *The Opinion of the Press and the Resolution of the Bengal Government on the Pamphlet of Syed Ameer Hossein, Khan Bahadur, on, Mahomedan Education* (Calcutta, 1882)
৮১ Syed Mahmud, 171 ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
৮২. Bimanbehari Majumdar, I, 398-400
৮৩. পূর্বে পৃ ৭২ ও ৭৫ দ্রষ্টব্য।
৮৪. 'India', *Encyclopaedia of Islam*, II, 483
৮৫. Surendranath Benerjea, 98
৮৬. Vera Anstey, *The Economic Development of India* (London), 279-80
৮৭. Sir George Wyatt *The Commercial Products of India* (London, 1908), 411-12
৮৮. Hunter, 199
৮৯. Hunter, (Calcutta edn, 1945), 161
৯০. উদ্ধৃত, বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, 'বিভক্ত ভারত' (কলিকাতা ১৩৫৬), ৫-৬।
৯১. Syed Mahmud, 160
৯২. ঐ, 158-59
৯৩. ঐ, 174-75

চতুর্থ অধ্যায়

১৯০৫-১৯১৮

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা বাঙালী হিন্দু সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করল। মুসলমান সমাজের একাংশ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন, কিন্তু অধিকাংশই তা মেনে নিলেন। শাসনকার্য-পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশের সীমা বেশী বড় হয়ে গেছে, এ ধবনের মতামত অনেকদিন ধরেই সরকারী মহলে উঠেছিল। প্রথম দিকের প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ঐ তিন জেলার সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোও নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল।

মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া অবিমিশ্র হয় নি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সমর্থকেরা। এর কারণ ছিল। ১৮৬০এর পর থেকে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের মিতালীবন্ধনের যে-প্রচেষ্টা বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে আর সারা ভারতে স্যর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, তা নিষ্ফল হয় নি। অনেকেই মনে করেন যে, ১৮৭০এর পর থেকে ইংরেজ সরকার মুসলমানের আনুকূল্য শুরু করেন।[১] এ আনুকূল্য মৌখিক ছিল — কার্যক্ষেত্রে এর কোন প্রকাশ আমরা দেখতে পাই না। ১৮৭০এ সরকারি চাকরিতে বাঙালী মুসলমানের যে শোচনীয় সংখ্যালঘুতা, ১৮৭৬এও তার ব্যতিক্রম হয় নি, তা আমরা দেখেছি।[২] এরপর মুসলমানেরা চাকরী পেতে আরম্ভ করেন, তার কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা চাকরী পাবার ক্ষমতা অর্জন করতে আরম্ভ করেছিলেন। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রসারের মূলে রয়েছে : (১) সমাজনেতাদের আন্দোলন, (২) নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং (৩) সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা। সরকারী শিক্ষানীতি তার নিজস্ব ধারায় চললেও কোন না কোন পক্ষ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। যেমন, প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত সুযোগ হিন্দু সমাজ লাভ করেছিলেন, তেমনি এখন এই সুযোগের কিছুটা অংশ গ্রহণ করতে পারলেন বাংলার মুসলমানেরা। অতএব, এই শিক্ষাপ্রসারের ফলে ইংরেজের চাকরীপ্রার্থী হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে উঠল এতকাল পরে।

মুসলমানদের প্রতি সরকার যে পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তা কথাবার্তায়, বক্তৃতায়। লোকে বিভ্রান্ত হয়েছে কথাবার্তা শুনেই। তাই বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে মুসলিম জনশক্তির সমর্থন আদায়ের জন্যে সরকার যখন বললেন যে, মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উঠেছে, তখন মুসলমানেরা সে কথা বিশ্বাস না করে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার বলেছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর দুই স্ত্রী'র মতো : এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর।[৩] এই উক্তিতে সরকারের পক্ষে হিন্দুর বিরাগ এবং মুসলমানের

অনুরাগ লাভ করা যেমন স্বাভাবিক, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তেমনি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস জাগবার কথা। ১৮৭০ থেকে হিন্দু পুনর্জাগরণের ভাবধারাটা যে প্রবল হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি।[৪] এই সময়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রভাবে মুসলমানেরাও নিজেদের স্বার্থ আলাদা করে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনেক বড়। বঙ্গভঙ্গের ফলে অনগ্রসর মুসলমানদের অনেক সুবিধে হবে, একথাও সরকারী মহল থেকে ঘোষিত হয়েছিল। অতএব, এটা খুব স্বাভাবিক যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে-আবর্তের সৃষ্টি হল, তাতে অধিকাংশ মুসলমান আর অধিকাংশ হিন্দু পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। ফলে, বঙ্গভঙ্গের সংকটময় মুহূর্তে বাঙালী হিন্দু-মানস কেবল-যে ইংরেজ-বিদ্বেষী হল, তা নয়, মুসলমানের প্রতিও তার বিরূপতা জাগল। মুসলমানও হিন্দুকে আরো বেশী করে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধাবলীতে রবীন্দ্রনাথ এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবার প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক একদিকে এবং অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যাকে তিনি স্বতন্ত্র করে তুলে ধরলেন।

> এক কথায় ইংরেজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না; অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয়, তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।...
>
> ... অতি দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিমপ্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়াআসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।...
>
> কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে।... বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরেজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন।...
>
> ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদেব অন্তবে যে-একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে।[৫]
>
> আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরেব মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।[৬]

এই মর্মান্তিক বিরোধের আভাস তাঁর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসেও (১৯১৫) আছে। এই বিরোধের বীজ ইংরেজের দ্বারা রোপিত হয়েছে, একথা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ অভ্যন্তরীণ-দুর্বলতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন :

> ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যর্থাথ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোনদিনই দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না।[৭]
> বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে।....
> ....মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পবিমাণে সরকারী পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশে ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।[৮]

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সমস্যাটিকে দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টি সকলে লাভ করতে পারেন নি। 'আরও বেশি চেষ্টা' তাই হতে পারে নি, আর তাই তাঁর প্রার্থিত পরিণাম বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। মুষ্টিমেয় মুসলমান — যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন— তাঁরাও মুসলমান সমাজে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন, মুজিবুর রহমান, মোহম্মদ আকরাম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি মুসলমান বুদ্ধিজীবীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে এঁদের অগ্রণী ছিলেন কুমিল্লার অধিবাসী আবদুর রসুল, অক্সফোর্ডে শিক্ষিত ব্যারিস্টার। এঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধানিবেদন করতে যেয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করায় তিনি স্বসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।[৯] অন্যপক্ষে, নবাব সলিমুল্লাহ্ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো স্বজনহিতৈষী বিত্তবান নেতারা সমস্ত প্রভাবটাই নিয়োগ করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার সপক্ষে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ, যখন ঢাকার নবাবের উপর শারীরিক আক্রমণ পরিচালিত হল এবং বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হল, তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের যোগাযোগ-রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন বাংলাদেশে বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল যাঁদের উপরে, তাঁরা ছিলেন মোটের উপরে নরমপন্থী এবং

ইংরেজের শুভবুদ্ধিতে আস্থাবান। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা তাঁদের নেতৃত্বকে শিথিল করে দিল। বিশ শতকের শুরুতে চাকরীর অভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্নসমস্যা প্রবল হয়ে ওঠায় তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন।[১০] এই বিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের প্রবল ঘৃণার ভাব। 'আবেদন-নিবেদনের থালা' বহন করে উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্‌রা বিশেষ কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। শিক্ষিত হিন্দুর মনে আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছিল বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, সিস্টার নিবেদিতার ভক্তিতে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি থিওসফিস্টদের শ্রদ্ধানিবেদন প্রভৃতিতে।[১১] রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ ইওরোপীয় সামরিক শক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সশ্রদ্ধ ভীতি খর্ব করে দিয়েছিল। চীনে ইওরোপীয় পণ্যবর্জন-আন্দোলনের সার্থকতায় নতুন প্রেরণা এসেছিল শিক্ষিত বাঙালীর মনে। অতএব এটা স্বাভাবিক যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সেদিন সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধের মনোভাবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। চীনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়েই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী এবং বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আন্দোলন সর্বত্র শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে নি। তাই নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠল। পরের বছর সুরাট কংগ্রেস এই দু দলে ভাগ হয়ে গেল।[১২] এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে নির্বাসিত করে এবং শক্তিপ্রয়োগ করে সরকার ভীতির সৃষ্টি করতে চাইলেন: বিস্ফোরক আইন, সংবাদপত্র আইন, প্রেস আইন, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সভাসমিতি-সংক্রান্ত আইন জারি করে অসন্তোষ দমন করতে চেষ্টা করলেন। ফলে, প্রকাশ্য পথ ছেড়ে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকল গুপ্ত পথে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগল, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব। মুসলিম-মানসের কাছে তা গ্রাহ্য হবার কথা নয়, হয়ও নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের অবদান স্বীকার করেও একথা বলতে হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের নৈকট্য বিধান না করে তাঁরা দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সাধারণত তাঁরা মুসলমানদেরকে ইংরেজের পোষ্য জ্ঞান করতেন। এ বিষয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়েছেন :

> In those days [1905-06] the revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu middle classes. In fact all revolutionary groups were then anti-Muslim. They saw that the British Government was using the Muslims against India's political struggle and the Muslim were playing the Government's game. . . They (the Government) imported a number of Muslim officers from the United Provinces for the manning of the Intelligence Branch of the police. The result was that the Hindus of Bengal began to feel that the Muslims as such were against political freedom and against the Hindu Community.[১৩]

অতএব, মুসলমানের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষের মনোভাব যে এই সময়ের বাঙালী হিন্দুর মধ্যে আশ্রয়লাভ করল, এতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

ঠিক এই আবহাওয়ার মধ্যেই মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবরে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে উচ্চবিত্ত ভারতীয়

মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য আগা খাঁ ছিলেন দলের নেতা। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপরে এঁরা খুব জোর দেন। ঐ বছরের ডিসেম্বরে এঁদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষা-সম্মেলন। সম্মেলনের শেষেই জন্ম হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের। এই সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা সমর্থিত হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময়ে তার যে উদ্দেশ্য ছিল, জন্মমুহূর্তে লীগের উদ্দেশ্য ছিল তারই অনুরূপ : অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন করা এবং ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার আশ্রয়েই মুসলমানদের জন্য যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা। কিন্তু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কুড়ি বছরে দেশের রাজনৈতিক পট এত দ্রুত পাল্টে গেছে যে, ১৯০৬ খৃস্টাব্দে লীগের তুলনায় কংগ্রেসকে অধিকতর বৈপ্লবিক বা স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করাই স্বাভাবিক ছিল।

ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা এবং *স্বরাজ*-কামনার সঙ্গে ইংরেজ সরকার আপসরফা করতে বাধ্য হলেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা হল। মুসলিম লীগের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও এতে থাকল। কিন্তু সরকারী মনোনীত সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন বলে এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা প্রত্যাখ্যান করলেন। লীগ এবং নরমপন্থীদের সমর্থন ছিল অবশ্য মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের পক্ষেই।

বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের দ্রুত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। ডক্টর দেশাই বলছেন, ১৯১২ থেকে তাদের রাজনৈতিক চেতনা বেশ বেড়ে ওঠে।[১৪] স্মিথও দেখিয়েছেন যে, ১৯১২র দিকেই মুসলিম মধ্যবিত্ত বিশেষভাবে ইংরেজবিরোধী চেতনার পরিচয় দিতে থাকে। নবগঠিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে বাসনা জেগেছিল, ইংরেজ শাসনাধীনে এবং তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থায় তা বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারছিল না।[১৫] মধ্যবিত্তের চিত্তে তাই অস্বস্তি ও বিক্ষোভ হয়েছিল প্রবল। এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায় মওলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যে ১৯২২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর *আল-হিলাল* পত্রিকা (উর্দু) এই নতুন মনোভাবের প্রকাশেই কেবল নয়, প্রচার ও প্রসারেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই এটা মোটেও বিচিত্র নয় যে, তাঁর পত্রিকার প্রচারসংখ্যা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছিল আর প্রথম প্রকাশের তিন বছরের মধ্যেই সরকার সে-পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে বসেছিলেন[১৬]।

মুসলিম মধ্যবিত্তের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বল্কান যুদ্ধে (১৯১২) তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় মুসলিম-মানসে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তুরস্কের সুলতান ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের (সুন্নি সম্প্রদায়ের) ধর্মনেতা বলে বিবেচিত হতেন এবং একটি প্রধান ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শক্তির দ্বন্দ্বে মুসলমানের পক্ষে তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করাই ছিল স্বাভাবিক। তুরস্কের পক্ষে ভারতে জনমত-গঠনের ব্যাপারে মওলানা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত

আলীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ডা. আনসারীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তুরস্কে মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়েছিল (১৯২২)।

ইংরেজ সরকারের শুভবুদ্ধি ও সামগ্রিকভাবে বিদেশী শাসন-সম্পর্কে সন্দেহ ও বিক্ষোভের মনোভাব থেকেই ১৯১৩ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়। এই নতুন মনোভাব যে তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ — তখনো কংগ্রেসসেবী। ১৯১৩ খৃস্টাব্দের লীগ-অধিবেশনে তিনি যোগ দেন এবং মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে সেই প্রথমবার 'attainment of the system of self-government suitable to India'-কে লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। প্রবীণ, উচ্চবিত্ত ও ইংরেজ-আশ্রিত মুসলিম লীগ নেতারা কিন্তু এতটা স্বীকার করতে পারলেন না : আগা খাঁ ও আমীর আলী এবং তাঁদের সমর্থকেরা লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। এর পর থেকেই মুসলিম লীগ-প্রতিষ্ঠানে অভিজাত ও উচ্চবিত্তের তুলনায় বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৭]

প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে তুরস্কের যোগদানে ইংরেজদের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের আনুগত্যের মনোভাব আরো শিথিল হয়ে পড়ল। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করলেন সরকার, মওলানা আজাদকে প্রথমে কলকাতা থেকে বহিষ্কার ও পরে রাঁচীতে অন্তরীণ করা হয় ১৯১৬ খৃস্টাব্দে (মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে এঁরা কেউই মুক্তি পাননি)।[১৮] এই অবস্থায় ১৯১৬ খৃস্টাব্দে সম্ভাবনা জাগল ভারতবাসীর ব্যাপক ঐক্যের। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কেবল রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক কংগ্রেসীদের মিলন ঘটল না, লীগ-কংগ্রেস মৈত্রীও গড়ে উঠল। এ ক্ষেত্রে জিন্নাহ্‌র ভূমিকা উল্লেখ্যযোগ্য। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র নির্বাচন ও পরিষদে আসন সংরক্ষণের নীতি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন। ১৯১৮তে লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবেই মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলেন।[১৯]

ইংরেজের বিরুদ্ধে এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের সম্মুখে ইংরেজ-আশ্রিত মুসলমান নেতারা নিষ্ক্রিয় ছিলেন বা তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকালাপের অবসান হয়েছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে থেকেও সরকার সমর্থন লাভ করেছিলেন। এমনকি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদও ক্রমশ নরমপন্থা অবলম্বন করতে করতে সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সরকারের সমর্থনকারী নেতা হিসেবে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তুরস্কের ভাগ্য নিয়ে মুসলমানের মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়েছিল, খিলাফত আন্দোলনের সূচনা সেখান থেকেই — যদিও এর সংগঠিত প্রকাশ ঘটে আরো পরে, ১৯২০তে। খিলাফত আন্দোলনের এই অঙ্কুরাবস্থায় নওয়াব আলী চৌধুরী একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং নানারকম যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপন্ন করেন যে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করাই হচ্ছে মুসলমানের পক্ষে একাধারে কর্তব্য ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন। তাঁর এই অনুগত মনোভাবের জন্যে অচিরেই তিনি পুরস্কৃত হলেন। ১৯১৯ এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারে তিনজন বাঙালী মন্ত্রী নিযুক্ত হন : স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. সি. মিত্র আর মুসলমান প্রতিনিধিরূপে নওয়াব আলী চৌধুরী।[২০]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ইংরেজবিরোধী মনোভাব দেখা যায়, বাঙালী মুসলমান জননেতাদের কার্যাকলাপে তার কোন উল্লেখযোগ্য ছায়াপাত তখনো ঘটে নি, এটা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ভারতীয় মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত যারা — আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডা. আনসারী, হসরত মোহানী, হাকিম আজমল খান প্রভৃতি — তাঁরা সবাই উত্তর-ভারতের; মাওলানা আজাদ যদিও কলকাতায় বাস করতেন, তবু তাঁকেও বাঙালী বলবার উপায় নেই। এঁদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনপন্থী রাজনীতির অনুসারী।

বাঙালী মুসলমান জননেতাদের ভূমিকা লক্ষ্য করে সঙ্গতভাবেই একথা মনে হয় যে, তাঁরা তখন পশ্চাদ্‌মুখী হয়ে পড়েছিলেন এবং জনসাধারণের মনোভাবকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা এঁদের ছিল না; এঁরা সেই যুগের ঐতিহ্য বহন করে চলেছিলেন, যখন মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়নি, যখন বাঙালী মুসলমান বলতে এঁদের মতো কয়েকজন উচ্চবিত্তকেই বোঝাতো। তখন তাঁরা জনসাধারণকে পরিচালিত করার দাবি করতে পারতেন, কেননা অন্যেরা কিছুই বুঝতো না। মুসলিম মধ্যবিত্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এঁরা নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেন। নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো মধ্যবিত্ত মুসলমান তখনো দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু তার পথ প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন নেতা বলতে যাঁদের বোঝাতো, তাঁদের সঙ্গে — অনুগামী বলতে যাদেরকে কল্পনা করা হত, তাঁদের — দুস্তর ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে। তার প্রমাণ পাই ইংরেজদের প্রতি নেতাদের আনুগত্যে আর জনসাধারণ বিক্ষোভে। সাধারণ বাঙালী মুসলমানও যে সরকার-বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়েছিল, তার সুস্পষ্ট পরিচয় খিলাফত আন্দোলনে (১৯২০) তাঁদের যোগদানের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য কালের পরিধি অবশ্য শেষ হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে (১৯১৮)— খিলাফত আন্দোলনের দু বছর পূর্বে। মুসলিম জনসাধারণের অবস্থা তখন আরো বিপর্যস্ত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও — তাও তুরস্কের বিপক্ষে। নেতারা স্পষ্ট দু ভাগে বিভক্ত : সরকারের পক্ষে আর বিপক্ষে। অর্থনৈতিক সংকটও কম তীব্র নয়। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তির পথ সেদিন তার জানা ছিল না। ঐতিহ্যগর্বের মধ্যে বারবার সে-ও সান্ত্বনা খুঁজেছে, কিন্তু জীবনপথে চলার ইঙ্গিত পায়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্তু পট দ্রুত বদলে গেল। বাইরের শত্রু দমন করে সরকার ঘরের দিকে মন দিলেন এবং নিজের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার বিষয়ে দিলেন দৃঢ় মনোভাবের পরিচয়। বন্দী নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু লীগ-কংগ্রেসের বাধা-সত্ত্বেও মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনা (১৯১৯ খৃস্টাব্দের ভারত-শাসন-সংস্কার আইন) গৃহীত হল, দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন হল এবং প্রদেশসমূহে মুষ্টিমেয় দেশীয় রাজনীতিবিদকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হল। সরকারের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মনোভাবের বর্বর প্রকাশ ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯)। এই ঘটনার মধ্যে 'the helplessness of our position as British subjects in India'[২১] লক্ষ্য করে, প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জনসাধারণের চিত্তবিভ্রমের আর

সুযোগ রইল না। এই তীব্র দমননীতির মুখেও নিরস্ত্র জনসাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলল। ১৯২০এর খিলাফত আন্দোলনে তারই সূচনা। আলী ভ্রাতৃদ্বয় এ আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, কংগ্রেস এর সমর্থক, প্রদেশনির্বিশেষে সারা ভারতের মুসলমান এর অংশগ্রহণকারী। মুসলমানের পাল্টা সমর্থন প্রত্যাশা করে কংগ্রেস এবারে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের পরিকল্পনা করল। সে প্রত্যাশাও ব্যর্থ হয় নি। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) সারা ভারতব্যাপী প্রথম গণ-অভ্যুত্থান।[২২]

তথ্য-নির্দেশ

১ Smith 166

২ পূর্বে পৃ. ৮৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।

৩ Surendranath Banerjea, 218, Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom* (Calcutta, 1959), 4

৪ পূর্বে পৃ. ৮১-৮২ দ্রষ্টব্য।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ (দ্বি-স; কলিকাতা, ১৩৫৭), ৩৮২,৩৯৩-৯৪।

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমস্যা' ঐ, ৪৮০।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সদুপায' ঐ, ৫২৬।

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, [পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর] 'সভাপতির অভিভাষণ', ঐ, ৫০০-৫০১-২।

৯. Surendranath Banerjea, 231 'He was one of the very few Mohamedans who opposed the Partition of Bengal after it had become an accomplished and settled fact He was always an unflinching advocate of the union between Hindus and Mohamedans for political purposes and he regarded the Partition as a national calamity, in the sense that it would alienate Hindus and Mohamedans, interfere with the solidarity of Bengalee-speaking Population, and weaken their political influence At one time, on account of these views, great was his unpopularity among his co-religionists'

১০ Desai, 289

১১. Farquhar, 355-58, দ্রষ্টব্য।

১২. Surendranath Banerjea, 235-36

১৩ Abul Kalam Azad, 4-5

১৪ Desai, 355-56

১৫ Smith, 195 ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, 246

১৬. Abul Kalam Azad, 7

১৭. Smith, 246-47

১৮. Abul Kalam Azad, 8

১৯ Desai, 300-302

২০. Surendranath Banerjea, 338

২১ লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। মূলপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি দ্রষ্টব্য: *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৭।

২২. Desai, 308.

দ্বিতীয় ভাগ

সাহিত্য ও চিন্তাধারা

পঞ্চম অধ্যায়

মিশ্র ভাষারীতির কাব্য

কোন দেশের সাহিত্যে এমন তারিখ পাওয়া দুষ্কর, যেখানে এসে আমরা নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সূচনা নির্দেশ করতে পারি। তবু সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগ বিভাগ করা অত্যাবশ্যক। এই প্রয়োজনের তাগিদেই, বাংলা সাহিত্যের সহস্র বর্ষব্যাপী ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। কালের দিক দিয়ে এই বিভাগের সর্ববাদিসম্মত রূপ নির্ণীত হয় নি সত্য, তবু এটি স্বীকৃত হয়েছে যে, খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের নিদর্শন। এ ছাড়া রূপকথাশ্রেণীর রচনা এবং পরবর্তীকালে বিকশিত কোন কোন সাহিত্যধারার পূর্বসূচনা একালে হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটেছে। প্রথম দেড় শতকের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ আজও লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে বটে, কিন্তু তারপরই সৃষ্টিপ্রাচুর্যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী এ যুগের প্রধান সাহিত্যসৃষ্টির ধারা। চৈতন্যের প্রভাবে তাঁর এবং তাঁর কোন কোন শিষ্য-শিষ্যার জীবনী-রচনার দিক উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক মানুষ সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম স্থানলাভ করল। ফারসী ও হিন্দী-আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে মুসলমান কবিরা বাংলা-সাহিত্যের রুচিবদল করেছিলেন। অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের শাস্ত্র-বিষয়ক কাব্য এবং ইতিহাসের আবরণে নানারকম অবাস্তব বীরত্বকাহিনীও প্রচলিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগের সকল সাহিত্যসৃষ্টিরই মাধ্যম ছিল পদ্য — গদ্যরীতি তখনো বিকাশলাভ করে নি। বিষয়বস্তুর একঘেয়েমী ও আঙ্গিকের সীমাবদ্ধতা ছিল এর প্রধান অসম্পূর্ণতা। তাছাড়া, সাধারণভাবে মানুষের চেয়ে দেব-দেবীর মর্যাদাই সেখানে শ্রেয় বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন হল, এ প্রশ্নের মীমাংসা জটিলতর। কেউ কেউ ১৮০০ খৃস্টাব্দকে যুগান্তরের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। এ বছরে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনায় বাংলা গদ্যরীতির যে বিকাশসম্ভাবনা দেখা দিল, তা আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করল, একথা সত্য। কিন্তু যথার্থ আধুনিকতা — পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের প্রভাব, মানবমুখিতা, সমাজ-সচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মভাবতন্ময়তা প্রভৃতি দেখা দিল আরো পরে, ১৮৬০এর কাছাকাছি সময়ে। অন্যপক্ষে, ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর মধ্যযুগীয় কাব্যাদর্শও বিচলিত হয়েছিল। প্রথানুগত্য ও পরানুকরণের স্রোতে কাব্যের প্রাণবস্তু যায় হারিয়ে, দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবিড়ম্বনার ফলে প্রতিভাবান কবিরা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা-নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্যধারা অধোগতি লাভ করে। তাই একালে যথার্থ কাব্যের চাইতে কবিগান, খেউড়, তরজা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিরই প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। তারপর ১৮৬০ খৃস্টাব্দে বা তার কিছু আগে-

পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩), 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯), 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৫), 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যে আধুনিক কালের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটল।

এইসব দিক বিচার করে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আমরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তবর্তী ক্রান্তিকাল বলে গণ্য করতে পারি।[১] একালে মধ্যযুগের আদর্শ বহন করে কাব্যচর্চা করেছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, আবার আধুনিকতার পূর্বসূচনা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। চর্যাপদের কবিদের মতো, মানুষের সাধারণ জীবন-যাত্রা থেকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীক গ্রহণ করে প্রথমোক্ত কবি দুজন ধর্মের প্রগাঢ় আবেগকে প্রকাশ করেছেন, অন্যপক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরস্তোত্র কেবল কথার খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। ধর্মবোধের আবেগময় অভিব্যক্তির বদলে ঈশ্বর গুপ্ত মানুষকে নিয়েই তাঁর কাব্যের প্রধান অংশ সৃষ্টি করেছেন : তির্যক হাসি ও বিদ্রূপের কশার মাধ্যমে সমাজ-সমালোচনার ও স্বাদেশিকতা জাগাবার জন্য যে চেষ্টা তিনি করে গেলেন, তা অবিস্মরণীয়।

তবে এই ক্রান্তিকালের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের যথার্থ পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে কবিওয়ালা-শ্রেণীর সাহিত্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় এবং আরবী-ফারসী শব্দবহুল বাংলায় কাব্যরচনাকারী 'শায়ের'দের সাধনায়। মধ্যযুগ অপসৃত হবার আগেই এই দুই ধারার সূত্রপাত হয়েছিল এবং আধুনিক যুগের উন্মেষের পরও তার অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল, তবু এই ক্রান্তিকালই হচ্ছে এই ধারা দুটির যথার্থ বিকাশলাভের কাল।[২]

কবিওয়ালা-শ্রেণীর দুজন মুসলমান কবিকে আমরা জানি — মীর্জা হুসেন আলী ও সৈয়দ জাফর খাঁ।[৩] এঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বর্তমান ছিলেন মনে হয়। তরজার প্রবর্তক ছিলেন একজন মুসলমান, তাঁর নাম হোসেন খান।[৪] কিন্তু ক্রান্তিকালে বাঙালী মুসলমানের হাতে প্রকৃতপক্ষে যে ধারাটি পুষ্টিলাভ করে, তা হচ্ছে বিদেশী শব্দবহুল বাংলা কাব্য।

এই বিশেষ ভাষারীতির কাব্যগুলোকে গত এক শ' বছরে নানাভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনটিই সন্তোষজনক নয়। লঙের পুস্তক-তালিকায় এই ভাষাকে মুসলমানী ভাষা ও এই ভাষায় রচিত কাব্যকে মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] ব্লুমহার্ডও এই নাম অবলম্বন করেন।[৬] তারপর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন,[৭] ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়[৮] ও ডক্টর সুকুমার সেনের[৯] মতো পণ্ডিতজনেরা এই নামই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ভাষা বাঙালী মুসলমানের কথ্যভাষা হিসেবে কতদূর ব্যাপকতা লাভ করেছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। ১৭৭৮ এ হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেন যে, যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী-ফারসী বিশেষ্য মিশ্রিত করে কথা বলেন, তাঁরাই সবচেয়ে সুচারুভাবে বাংলা বলতে পারেন বলে স্বীকৃত।[১০] কিন্তু ১৮৫৫তে লঙ্ নিজেই বলেন যে, এ ভাষা মাঝি-মাল্লাদের মধ্যেই প্রচলিত, তবে নগরে তার কিছু কিছু প্রচলন হয়েছে।[১১] গ্রাম-

বাংলার মুসলমানদের ভাষার সঙ্গে তাই এর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উপরন্তু এ ভাষায় লেখা কাব্যগুলোকেও বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে ইসলামী বলা চলে না।

কলকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে বটতলার পুঁথি নামেও একে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। সেটাকে সুভাষিত করতে যেয়েই বোধহয় পুথিঁ-সাহিত্য কথাটির উদ্ভব হয়। পুঁথি-সাহিত্য বা পুথিসাহিত্য বলে একে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা চলে না। কেননা, আধুনিককালে বই বলতে আমরা যা বুঝি আগে পুঁথি বা পুঁথি বলতে তাই বোঝাতো। সুতরাং 'বইসাহিত্য' কথাটার মতো 'পুঁথিসাহিত্য' কথাটাও অর্থহীন। পুঁথি শব্দটাকে সংকীর্ণ অর্থে manuscript বলেও গণ্য করা হয় : এই প্রয়োগ সন্তোষজনক কিনা, সে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় যে, পুঁথি শব্দের এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারও আমাদেরকে পুঁথিসাহিত্য কথাটির অর্থগ্রহণে কোন সাহায্য করে না। কেননা, ছাপা হবার পরই এই কাব্যগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[১২]

ইদানীং এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে একে দোভাষী পুঁথি বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।[১৩] কিন্তু এই ভাষায় তো দুটি ভাষার নয়, বহু ভাষার (বাংলা, হিন্দী, ফারসী, আরবী ও তুর্কী) শব্দ এসে মিলেছে। যেখানে বাঙালী মুসলমান পরিবারে কথোপকথনের ক্ষেত্রে শতকরা পনেরো ভাগের বেশী আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার হয় না, সেখানে গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা'য় শতকরা প্রায় বত্রিশ ভাগ বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[১৪] সুতরাং বিদেশী শব্দবাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

এই ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে :[১৫]

১। আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের বাহুল্য। যেমন,

কেচ্চার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।[১৬]

এখানে এগারোটি শব্দের মধ্যে চারটি মাত্র বাংলা শব্দ, তার মধ্যে একটি ("আধা") উর্দু-হিন্দীতেও চলে। নীচের উদ্ধৃতিতে কোন বাংলা শব্দ নেই, বিস্ময়কর হলেও এমন উদাহরণ বিরল নয় :

ভেজ আয় রব মেরে দরুদ ছালাম।
আপনে পিয়ারে নবী পার ভেজ মুদাম।[১৭]

অথবা,

হুকুম তামিল কিয়া হাজের গোলাম।[১৮]

অনেক সময়ে প্রচলিত বাংলা শব্দের বদলেও অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে আকবত, আখের, আজিম, আন্দেশা, আফতাব, আব্‌দার, আসক, একিদা, এ্কিন, কদ, কুন্, খাহেশ, খিমা, খোসাল, গমগিন, গুমান, ছুরত, ছেহেলী, জশন, তাফেদার, তামাম, তারিফ তেগ, দীন, নেকি, নেজা, বদাত, বদী, বেহেজার, মছলত, মাজুর, মাহতাব, রওয়া, রাহু, লায়েক, সহদ, হকিকত, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিকতর ব্যবহৃত উর্দু-হিন্দী শব্দের মধ্যে পাই আওরত, আবি, আঁছু, এত্তা, এয়ছা, কব, কাহে, কেয়ছা, খাতের,

গোস্বা, ঘড়ি, জান, জীউ, তেরে, তক, তুঝে, তেরা, তেয়ছা, থোড়া, পুছে, বিচ, ভি, মাতারি, হোসমন্দ ইত্যাদি এবং দোছরা, তেছরা প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ।

২। আরবী-ফারসী শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার এবং হিন্দী ধাতুর ব্যবহার। যেমন,

হাত পাকড়িল আসি খোসালিত [< খুশহাল] মনে।[১৯]
গিরিল [< গির] কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে।[২০]
ওতারিয়া [< উতার] ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে।[২১]
জুলুম ভেজিল [< ভেজ] কেয়ছা আলম উপরে।[২২]

৩। বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ — অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে। যেমন,

খাতির : করেন খাতেরদারী বিবির খাতির।[২৩]
এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।[২৪]
জতেক পোছেন সাহা ভায়ের খাতিরে।[২৫]
তারে : হানিফা কাঁদিয়া বলে সমর্ত্তভান তরে।[২৬]
বিচ : হিন্দুস্তান দেশে এক দরিয়ার বিচে।[২৭]
বেহেস্তের বিচে সামা যাইয়া পউছিল।[২৮]
হুজুর : সাহজামান সুনে বাত কহে হুজুরেতে।[২৯]

৪। ফারসী বহুবচনের ব্যবহার :

বাহুড়িয়া মোকামেতে আইল এজিদান।[৩০]
(= এজিদ পক্ষীয় সৈন্যরা)

৫। পুংলিঙ্গে বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দপ্রয়োগ :

প্রিয়া = প্রিয় : যেন প্রিয়া বিনে পোড়ে হুতাসনে
প্রিয়াবিরহিনী রামা।[৩১]
বঞ্চিত করিলে প্রিয়া মোরে দিয়া দেখা।[৩২]
নামজাদী = নামজাদা : কত মর্দ নামজাদী ...।[৩৩]
উদাসিনী = উদাসী : আর কি আরামে রব ফকির হইয়া যায়,
উদাসিনী হৈয়া দিগে দিগ।[৩৪]
এই মতে সাহাজাদা কত গীত গায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে উদাসিনী প্রায়[৩৫]
জাহাজী জিজ্ঞাসা করে শোন মহাশয়।
রাজপাট ছাড়ি কেন হও উদাসিনী।[৩৬]
বালা = বালক : কহেন খোদায়তালা মহিমে পাঠাই বালা।[৩৭]
নাজুক অবলা বালা হাবসি জওান।[৩৮]

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পাই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান : যেমন, *ইউসুফ-জেলেখা, লায়লী-মজনু, বেনজীর-বদরে মনীর, হুসনাবানু-মনীর শামী (হাতেম তাই), গোলে বকাউলী-তাজুলমুলক, সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামাল* প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারার উপাখ্যানগুলোকে

সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর দুই ভাগ — ছদ্ম ঐতিহাসিক আর লৌকিক। প্রথম পর্যায়ে পড়ে *আমীর হামজা, জঙ্গনামা* প্রভৃতি কাব্য অর্থাৎ ইতিহাসের পটে মুসলিম বীরদের কাল্পনিক কাফের-দলন-কাহিনী। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই আমাদের দেশের পটভূমিকায় হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমান পীর-ফকীরদের প্রতিষ্ঠালাভের কথা, যেমন, *বনবিবির জহুরানামা, কালু গাজী-চম্পাবতী, লালমোন, সত্যপীরের পুঁথি* প্রভৃতি। তৃতীয় ধারায় পাই ইসলামের ধর্ম, ইতিহাস, নবী-আউলিয়ার জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ রচনা, যথা, 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'হাজার মসলা' প্রভৃতি।

ইসলাম-কেন্দ্রিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহের প্রকাশ, আর যা কিছু উদ্ভট ও অতিপ্রাকৃতিক, তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধানিবেদন, এই কাব্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষা ও ভাবঘটিত এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য আগেকার কাব্যেই দেখা দিয়েছিল, তবে এ যুগে যে তা প্রধান হয়ে ওঠে, একথা সঙ্গতভাবেই নির্দেশ করা যেতে পারে।

দুই

মধ্যযুগের কাব্যদর্শের থেকে একটু পৃথক এই কাব্যধারার উদ্ভব কেমন করে সম্ভবপর হল, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। পাঠান-আমলের মুসলিম নৃপতিরা যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন আর সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁদের সামন্তরা যেভাবে বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তার ফলে খুব সহজেই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। মুঘল আমলে কিন্তু সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় নি। হোসেন শাহী সুলতানদের মতো মুঘল শাসকের কেউই মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে ওঠেন নি — রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে এদেশে যাঁরা অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন, বিদেশী সংস্কৃতির ছাপটা তাঁদের মধ্যে বেশ লক্ষণীয় ছিল। তাছাড়া, নতুন রাজস্বব্যবস্থায় হিসেবপত্র রাখার বিধি হল ফারসী ভাষায়, তাই সরকারী কর্মচারী ও উচ্চাভিলাষী বাঙালীরা ফারসী শিখতে ও তার চর্চা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার উপর, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উত্তর-ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং আলোচ্য সময়ে আমাদের দেশেও তার প্রভাব দেখা দেয়। এই পরিবেশে বহু ফারসী ও হিন্দী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। যদিও চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এদেশের শাসনকার্যে ফারসী ভাষার ব্যবহারের ফলে বাংলায় অনেক ফারসী শব্দ গৃহীত হয় এবং বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসী চর্চা করেন, তবু ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সর্বপ্রথম দেশময় ব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।[৩৯] আর মুঘল দরবারই ছিল এর উৎসমুখ।

এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পর বহু জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মবেত্তা শিয়া দেশত্যাগ করে বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খান তো প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শিয়া শাসকবংশের পত্তন করেছিলেন, তাই দেশত্যাগী ইরানী শিয়ারা এখানে সাদরে গৃহীত হলেন আর দেশময় ছড়িয়ে গিয়ে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাবকে

আরো বিস্তৃত করে তুললেন।[৪০] ব্যবহারিক প্রয়োজনে হিন্দু সমাজেও এই প্রভাব আদরণীয় হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু-মানসে মুসলিম-আনীত ভাষা ও সংস্কৃতির সহজ স্বীকৃতির যে পরিচয় আমরা এখানে পাই, তা হিন্দু-মুসলমান ভাবধারায় নৈকট্যের পরিচায়ক, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। বাংলার মানুষ যাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মুসলমান যাঁরা বিদেশী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে এদেশে এসেছিলেন, বাংলার লৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেন নি। রক্তের সমন্বয় এই কাজ অনেকদূর এগিয়ে দেয়। বাঙালী মুসলমান যেমন নানারকম হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন, হিন্দুরাও তেমনি মসজিদ ও পীরের দরগাহে শিরনি দিতেন (এবং এখনো অনেকক্ষেত্রে দিয়ে থাকেন)।[৪১]

তবে হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির প্রভাবে মুসলিম-মানসে একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জেগেছিল। ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য অনেকেই ভেতর ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা আর দেশীয় সংস্কার মিলে লৌকিক দেবদেবীর মুসলমান প্রতিরূপ সৃষ্টি এবং হিন্দু দেবেদেবীর জায়গায় তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। মুঘল আমলে উত্তর-ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এবং ইরানী বাস্তুত্যাগীদের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় বহু ধর্মনেতা ও পীর ফকীর দেখা দেন। তাঁদের শিক্ষা প্রেরণা এবং পূর্ববর্তী পীর-মুর্শিদদের স্মৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে বাংলার মুসলমানকে প্ররোচনা দিল। তাই উগ্রতা কিংবা অলৌকিকতা অথবা বাস্তব লাভালাভ দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করায় যে প্রচেষ্টা ইতঃপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করল। ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ-অনুসরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের-দলন-কাহিনী, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয়বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীতা দেখা দিল। তবু তাঁরা হয়তো জানতেন যে, জেহাদী মনোভাবটাই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়, তাই সুকুমার অনুভূতির চাহিদা মেটাতে ধর্মের মোড়ক দেওয়া প্রণয় কাহিনীও রচিত হল। আর এসবের অধিকাংশের মূলই হচ্ছে ফারসী রচনা : অবশ্য তার অনেকগুলোই আবার বাংলায় এসেছিল উর্দু বা হিন্দীর মাধ্যমে।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাব দেখা দিয়েছিল, নগরে ও বন্দরেই তার প্রকাশ হয়েছিল তীব্রতম। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র ঢাকা, রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও হুগলী বন্দর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটা স্বাভাবিকও। বিদেশী লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের ফলে এসব জায়গার ভাষায় বিদেশী শব্দ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হতে শুরু করেছিল। হুগলী বন্দর দিয়ে আরব, ইরান ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের বাণিজ্য চলত : সেই উপলক্ষ্যে বিদেশী ধনিক ও বণিক সেখানে বাস করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, মুর্শিদাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশের আগে থেকেই হুগলী একটা শিয়া উপনিবেশ ও ফারসী সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।[৪২] তাই আশ্চর্য নয় যে, আমাদের আলোচ্য কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল এরই সন্নিহিত অঞ্চল থেকে।

নবাবী আমলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, এভাবে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, অলক্ষ্যে, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তা যখন পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেল, তখন দেখা গেল সে নবাবও নেই,

সে বাংলাও নেই। আর তাই বাংলা কাব্যেরও রূপান্তর না হয়ে পারল না।

কিন্তু পরিপূর্ণভাবে এই পরিবর্তনের প্রকাশ হবার আগেই তার পূর্বসূচনা হয়েছিল, এবং আশ্চার্যের বিষয়, হিন্দু কবির হাতে। চব্বিশ পরগনার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ খৃস্টাব্দে 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হবার পর কুরআন-পুরাণ হাতে অর্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পয়গম্বরমূর্তি ঈশ্বর এসে মুণ্ডচ্যুত দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর বন্ধুত্ব জন্মিয়ে দিলেন এবং তাঁদের মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে দিলেন, — এইই ছিল কাহিনীর সার। কৃষ্ণরামের ভাষা সাধারণত মধ্যযুগের বাংলার কবিভাষার চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, তবে পাত্রবিশেষের মুখে তিনি ব্যবহার করেছেন হিন্দী-ফারসী-মিশ্রিত বাংলা।[৪৩] যেমন, বড় খাঁর উক্তি :

ভাগ গিয়া [শালা] এবে কিয়া করে আব।
হোগা হারামজাদ খানে খারাব ॥
শোস্তে হো দক্ষিণ রায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী ॥

রামাই পণ্ডিতের লেখা বলে কথিত *শূন্যপুরাণে* ও এই ভাষার ব্যবহার আছে।[৪৪] বিদ্যাপতির *সত্যনারায়ণ পাঁচালী* তে,[৪৫] ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ ও *সত্যনারায়ণের ব্রতকথা'য়*[৪৬], রামপ্রাসাদের *বিদ্যাসুন্দর*-এ[৪৭] এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা কয়েকটি সত্যপীর-পাঁচালীতেও পাত্রভেদে সংলাপে মিশ্র বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। তবে এইসব কাব্যে হিন্দী-ফারসী মিশ্রিত বাংলার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাস্তবতাবোধের তাগিদে — কোথাও সৌন্দর্যসৃষ্টির অনুরোধে — এই কবিরা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন, এটাকে সম্পূর্ণ রচনায় ভাষারীতি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। মিশ্র ভাষার গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও তাই আমরা বলতে পারি যে, সমগ্র কাব্যে এই ভাষা ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব হুগলীর বালিয়া-হাফেজপুর নিবাসী ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) প্রাপ্য।

তিন

স্বলিখিত কাব্যসমূহ এবং সৈয়দ হামজা-প্রদত্ত পরিচিতি[৪৮] থেকে গরীবুল্লাহ্‌র সামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হুগলী (তখনকার বর্ধমান) জেলার বালিয়া পরগনার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পিতা শাহ্ দুন্‌দীর ('সাহা দুন্দি') প্রথম সন্তান ছিলেন কবি। শাহ্ দুন্‌দী ছিলেন আল্লাহ্‌র ফকীর এবং এই সূত্রে কবি নিজেকে ফকির আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, তাঁরা পীরের খানদান। কবি ছিলেন বড় খাঁ গাজীর ভক্ত এবং গাজী অনুগ্রহ করে গোপনে (স্বপ্নে?) তাঁকে সাক্ষাৎ দান করেন। এই বড় খাঁ গাজীই কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়েছেন।[৪৯]

গরীবুল্লাহ্‌র জীবন-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাবে তাঁর সময়-নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এমন কি, কি কি বই তিনি লিখেছেন, এ নিয়েও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। 'আমীর হামজা'র প্রথম পর্ব যে তাঁর লেখা এতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পর্বে সৈয়দ

হামজারা স্পষ্টোক্তি ছাড়াও এখনে তিনি পীর বড় খাঁ গাজী ও পিতা সাহা দুন্দির উল্লেখ করেছেন এবং 'ফকির গরীব', 'গরিব' ও 'গরীব ফকির' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ফকির মোহাম্মদ ও ঢাকার মুন্‌শী গরীবুল্লাহ্‌র নামে প্রচলিত 'ইউসুফ জেলেখা' ফকীর গরীবুল্লাহ্‌রই রচনা, কেননা এতে বড় খাঁ গাজীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৫০] আর ভণিতায়ও পাওয়া যায় 'ফকির গরীব', 'গরীব ফকির' ও 'অধীন ফকির'। শোষোক্ত ভণিতা সম্ভবত 'গরীব ফকির' এরই বিকৃতি। মোহাম্মদ এয়াকুবের নামে ভণিতা থাকলেও গরীবুল্লাহ্‌র মৌলিক ভণিতাও এতে আছে। 'অধীন ফকির' ও 'অধম ফকির' কেবল নয়, কবির মুর্শিদ ও পিতার স্পষ্ট পরিচয় এতে রয়েছে।[৫১] আবদুল গফুর সিদ্দিকী এয়াকুবের 'জঙ্গনামা' থেকে কবির যে পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন,[৫২] তার সঙ্গে গরীবুল্লাহ্‌র কবি-পরিচিতির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বালিয়া পরগনার অধিবাসী, উভয়েই সাহা দুন্দির প্রথম সন্তান এবং উভয়েই বড় খাঁ গাজীর মুরীদ। পার্থক্য কেবল এই যে, একজনের গ্রামের নাম জীরিকপুর, অন্যজনের হাফিজপুর। এই আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যে আমরা চমৎকৃত হতে পারি না, বরঞ্চ ডক্টর সুকুমার সেনের সিদ্ধান্ত[৫৩] — 'জঙ্গনামা' গরীবুল্লাহ্‌র রচনা, এয়াকুব পুঁথির লেখক মাত্র — সত্য বলে প্রতিভাত হয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ও কাব্যটিকে গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে মনে করেন; তাঁর মতে, এয়াকুবের ভণিতা প্রকাশকের কারসাজি মাত্র।[৫৪] এ বিষয়ে ডক্টর এনামুল হক একটি মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে, গরীবুল্লাহ্‌ 'জঙ্গনামা'র প্রথমাংশ লেখেন, এয়াকুব লেখেন শেষাংশ।[৫৫] এই অনুমানের বিরুদ্ধেও বলবার আছে। প্রথমত, একই কবির (গরীবুল্লাহ) একাধিক রচনা অসমাপ্ত থাকা একটু আশ্চর্যের বিষয়। দ্বিতীয়ত, অন্য কবির অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করতে যেয়ে অনুবর্তী কবিরা যে স্পষ্টভাষণ করে থাকেন (যেমন দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আলাওল এবং গরীবুল্লাহ্‌রই 'আমীর হামজা' সমাপ্ত করতে গিয়ে সৈয়দ হামজা বলেছেন), এখানে তেমন পরিষ্কার কোন মন্তব্য নেই। তৃতীয়ত, গরীবুল্লাহ্‌ যখন প্রথমাংশই লিখলেন, তখন বন্দনা-অংশে এয়াকুবের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে কেন? লক্ষণীয় যে, মোহাম্মদ এয়াকুবের আর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই দিক দিয়ে দেখলে এয়াকুবকে লিপিকর বলাই সমীচীন মনে হয়। অধুনা সৈয়দ হামজার নামে প্রচলিত 'সোনাভান' কাব্যে ভণিতা আছে 'অধীন গরীব' ও 'অধীন ফকির' বলে। এ ভণিতা যে হামজার নয়, গরীবুল্লাহ্‌র— তা আমরা দেখেছি। তাই বড় খাঁ ও সাহা দুন্দির উল্লেখ না থাকলেও একে আমরা গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে মনে করব। সৈয়দ হামজার নামে প্রচলিত হবার আগে থেকেই 'সোনাভান' অবশ্য ফকিরউদ্দীন বা ফকির মোহাম্মদের নামে প্রচলিত আছে —- সেখানে সমর্তভান হয়েছে সমৃতভানু।[৫৬] তাই আবদুল গফুর সিদ্দিকী[৫৭] ও ডক্টর সুকুমার সেন[৫৮] এটিকে ফকির মোহাম্মদের রচনা বলে মনে করেন, আব ডক্টর এনামুল হক এটিকে সৈয়দ হামজার রচনা বলে ধরেছেন।[৫৯] কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'সোনাভানে'র রচয়িতা গরীবুল্লাহ,[৬০] ভণিতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। ওয়াজেদ আলীর লেখা বলে প্রচলিত 'সত্যপীরের পুঁথি — মদন কামদেবের পালা'তে ভণিতা সর্বত্র আছে 'অধীন গরীব', 'অধীন ফকির' ও 'হীন ফকির' বলে, কাব্যের শেষে একবার মাত্র আছে "হীন ওয়াজেদ আলী কহে সবাকে সালাম"। আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন যে, ১২৮৬ সালে ওয়াজেদ

আলী এই কাব্য রচনা করেন,[৬১] কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। ওয়াজেদ আলী যে লিপিকর, এতে সন্দেহ নেই। কাব্যটি গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত করেছেন,[৬২] ভণিতা থেকে সেটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'ও উল্লিখিত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থকে গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৬৩]

গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যসমূহের প্রচলিত সংস্করণগুলোয় সাধারণত রচনাকাল পাওয়া যায় না। 'জঙ্গনামা'র একটি পাণ্ডুলিপির উপরে নির্ভর করে ডক্টর এনামুল হক বলেছেন যে, ১১০১ সালে চব্বিশ পরগনার কবি মোহাম্মদ এয়াকুব গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, গরীবুল্লাহ্ ও এয়াকুবের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল,[৬৪] — এ সাক্ষাৎকারের প্রমাণ অবশ্য তিনি দেন নি। কয়েকটি কারণে এই তারিখের যাথার্থ্য সন্দেহ না করে পারা যায় না। ১২০১ সালে গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা'র দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেন সৈয়দ হামজা। এই প্রসঙ্গে তিনি গরীবুল্লাহ্‌র অসমাপ্ত রচনার জন্যে লোকসাধারণের অনুভূতির কথা বিবৃত করেন :

যতদূর আছে তাঁর কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার।।
কেচ্ছায় পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে কবে বড়া গম।।
না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ।
গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু জানি।
গাঁথিনু কবিতা আমি আখেরী কাহিনী।

'জঙ্গনামা'র উক্ত তারিখ অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে বলতে হয় যে, একশ' বছর পরও একটা অসমাপ্ত কাব্যের জন্য লোকসমাজে এই আকুলি-বিকুলি ছিল, যা সৈয়দ হামজাকে ঐ কাব্য সম্পূর্ণ করার প্রেরণা দিয়েছিল। বাস্তবতার দিক দিয়ে এই ঘটনার দাবি বোধহয় খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়ত, গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের এমন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, যেখানে তাঁর কাব্যের কোনরকম রচনাকাল-জ্ঞাপক উক্তি আছে, অথবা যার লিপিকাল থেকে তাকে মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা যায়। তৃতীয়ত, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন, ভাষার দিক দিয়েও 'জঙ্গনামা' কাব্যকে আঠারো শতকের আগের রচনা বলে মনে করা যায় না।[৬৫]

'ইউসুফ জেলেখা'র উপসংহারে কবির নিম্নলিখিত উক্তি থেকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন যে, কাব্যটি ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের পরে রচিত হয় :

আল্লাতালা ছালামতে রাখিবে বাদশারে।
ছহি ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে।।
বজায় ছালামত রাখ রাজার দেওয়ানে।
সিকদার চোপদার ইজারাদার জনে।।

তিনি মনে করেন যে, এখানে দিল্লীর সম্রাট (বাদশা), নওয়াব-নাযিম (বাদশার উজির), ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর (রাজার দেওয়ান) প্রতি ইঙ্গিত আছে।[৬৬] এই পঙ্‌ক্তিগুলো থেকে

অন্য তারিখ নির্ণয় করাও সম্ভব। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, 'বাদশা' আরা 'রাজা' শব্দ দুটি এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আগের দুই চরণেই যখন কবি 'বাদশা' শব্দের ব্যবহার করেছেন, তৃতীয় চরণে এসে সেখানে 'রাজা' শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মনে হয় যে, এখানে রাজা বলতে ভূস্বামী অর্থাৎ বর্ধমানের রাজাদের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে এর রচনাকাল ১৭৫৩ খৃস্টাব্দের পরবর্তী হওয়াই সম্ভব : কারণ, ঐ বছরই বর্ধমান রাজবংশের তিলকচন্দ্র রায় মুঘল সম্রাট আহমদ শাহের কাছ থেকে রাজা খেতাব পান।[৬৭]

'আমীর হামজা'র প্রথম পর্বের দুটি পঙ্ক্তি গরীবুল্লাহ্‌র সময়নির্ধারণে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে :

গরীব কহেন সাহা নেজামের পায়।
কেতাব মাফিক এত্তা দূর হইল দায়।।

এই সাহা নেজাম কে ছিলেন? কেউ কেউ মনে করেন যে, ইনি স্বনামধন্য দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া।[৬৮] কিন্তু তাহলে — অথবা ইনি যদি কবির অন্য কোন পীর হতেন, তাহলেও — কবির অন্যান্য কাব্যে এঁর উল্লেখ পাওয়া যেত। এইজন্যেই মনে হয় যে, ইনি কবির পীরমুর্শিদ নন, বরঞ্চ দেশের শাসক হতে পারেন। এরপর সঙ্গতভাবেই আমাদের মনে পড়ে মীরজাফরের পুত্র নিজামউদ্‌দৌলার কথা — পিতার মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য (১৭৬৫-৬৬) যিনি বাংলায় নবাবী লাভ করেছিলেন। এই সময়ে প্রথম পর্ব 'আমীর হামজা' রচিত হয় এবং তার ত্রিশ বৎসর পর (১৭৯৪) সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করেন, যদিও তার দু'বছর আগেই তিনি রচনা শুরু করেছিলেন।

'ইউসুফ-জেলেখা' ও 'আমীর হামজা'র অনুমিত রচনাকাল মোটামুটি পরস্পর-সমর্থিত। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফকীর গরীবুল্লাহ্ কাব্যসাধনা করেছেন তার ফল হচ্ছে : (১) ইউসুফ জেলেখা, (২) আমীর হামজা (প্রথম পর্ব), (৩) জঙ্গনামা, (৪) সোনাভান ও (৫) সত্যপীরের পুঁথি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ছদ্ম-ঐতিহাসিক যুদ্ধকাহিনী এবং লৌকিক দেব বা পীরমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী — মিশ্রভাষারীতির তিনটি প্রধান ধারাই তিনি পুষ্ট করেছেন।

চার

ইউসুফ-জুলাইখার প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপাদান বাইবেল ও কুরআন শরীফ থেকে সংগৃহীত। কুরআন-কাহিনীর কাঠামোয় ধীরে ধীরে রক্তমাংস জুড়ে এই উপাখ্যান পরিণত ও পৃথক হয়ে ওঠে। সব চরিত্রেরই নামকরণ হয়, নানা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাযুক্ত হয় এবং মূল প্রণয়কাহিনী মিলনান্ত পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পরিবর্তন সাধনে কিংবা ইউসুফ নবীকে নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনাবর্ণনায় তুরস্ক-ইরানের কল্পনাপ্রবণ কবিমন বাধা অনুভব করে নি।

গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জেলেখা' কাব্যের বক্তা বদর পীর, শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি ফোরকান-অবলম্বনে এই প্রণয়কাহিনী নিবেদন করলেন

এবং পরিণামে বড় খাঁ আল্লাহ্‌র পথে ফকীর হয়ে যেতে চাইলেন। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, বদর পীরের জবানীতে কবি যে-কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন, তা কুরআন-অবলম্বনে নয়, ফারসী কাব্য-অবলম্বনে আর সেজন্যে কুরআন-কাহিনীর সঙ্গে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই এর বেশী। তাই কবি আল্লাহ্‌র দেহও কল্পনা করতে পেরেছেন, যা তাঁর মূল ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ইউসুফের জন্মের পূর্বে আল্লাহ্‌তালা

আপনার দেহের রূপ আপনি লইয়া।
ছুরত করেন পয়দা আপনি বলিয়া ॥
ছয় ভাগ রূপ আল্লা আলমে ভেজিল।
তার বিচে চারিভাগ ইউছফেরে দিল ॥

এভাবে কয়েকটি অনৈসর্গিক ব্যাপারও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ভাইদের হাতে ইউসুফের লাঞ্ছনায় ---

আছমান জমিন কান্দে সূর্য আর তারা কাঁদে
ফেরেস্তা ও কান্দে হুরপরী

এটা নিছক কবিত্বের কথা হতে পারে, কিন্তু ইয়াকুব নবীর সঙ্গে বাঘের বাক্যালাপ (যা কেবল তিনিই শুনতে পান), জীবরাইল কর্তৃক ইয়াকুব ও ইউসুফকে কেবল নয়, জেলেখাকেও স্বপ্নাদেশ দান, ইউসুফের প্রার্থনায় হৃতযৌবনা জেলেখার একমুহূর্তে পূর্বরূপপ্রাপ্তি প্রভৃতি এই অতি-প্রাকৃতিক ঘটনার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

আল্লাহ্‌র গরিমা ও ফকীরীর মাহাত্ম্যপ্রচার কবির উদ্দেশ্য বলেই যে এসব অনৈসর্গিক ঘটনা আরোপিত হয়েছে, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। হয়তো এই উদ্দেশ্য সফল হবে মনে করেই কবি আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে চিত্রিত করেন নি, বরঞ্চ দেখিয়েছেন যে, মানুষের অসঙ্গত ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এখানে কবি যতই মূলানুগ হোন না কেন, আমাদের কিন্ত মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীর কথা, ভক্তের সামান্য বিচ্যুতিই যাঁর শাস্তিদানের পক্ষে যথেষ্ট কাবণ।

অনৈসর্গিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধর্মীয় বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার লৌকিক প্রভাব এবং হিন্দু পারিপার্শ্বিকের ছাপ এতে যথেষ্ট আছে। যেমন, নায়িকার বর্ণনায়

বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার

বা ভুরু দুটি জোড়া যেন কামের কামান

হিন্দুপ্রভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর স্থানীয় বর্ণসংযোগের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট:

১ বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন।
২ ইউছফে ভুলাব মোরা ধূলাখেলা দিয়া।
৩ চিল যেন বাচ্চা নিলে ধাড়ি যায় উড়ে।
৪ সোনার পালঙ্কে বৈসে পান গুয়া খায়।
৫ এক হাতে শঙ্খ করি আর হাতে সোনা।
পরিতে পরিতে যায় যত নারী জনা ॥

লৌকিক প্রভাবের স্পষ্টতর পরিচয় পাই রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে

ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সংস্কৃত কাব্যনুসারী যে রূপবর্ণনার ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাই, গরীবুল্লাহ্ সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই নায়ক-নায়িকার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন। নায়কের সাজসজ্জা বা তাঁর মৃগয়ার বর্ণনায় বাংলা প্রণয়কাব্যে প্রচলিত রীতিরই অনুসৃতি দেখা যায়। এমন কি, এসব অংশে মধ্যযুগের সাধারণ কবিতাভাষাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এ ভাষাকে মিশ্ররীতির বলা চলে না। যেমন,

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।
ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত ॥
ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথ পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে ॥
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলাতে নারে সেই রূপ দেখি ॥
দুইখানি ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল ॥
বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুক্তার হার।
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার ॥

রূপবান ইউসুফকে দেখে মিশরের যুবতী-সমাজে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, সুন্দরকে দেখে বর্ধমানের নারী সমাজের চাঞ্চল্যের সঙ্গে তার ঐক্য আছে।

বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে *ইউসুফ জেলেখার* এই সাদৃশ্যে কবি হিসেবে গরীবুল্লাহ্র মৌলিকতার দাবি ক্ষুণ্ন হয় নি। কেননা, মধ্যযুগের সকল কবিই এই অর্থে প্রথানুগত। একই বিষয়বস্তু এবং একই ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করেও মধ্যযুগের প্রতিভাবান কবিরা যেমন শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, গরীবুল্লাহ্ও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ কৃতিত্ব প্রধানত প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের শেষভাগে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা জেলেখার প্রতি স্বভাবত আত্মসংযমী ইউসুফের প্রবল রূপমোহের অভিব্যক্তি তার চরিত্রের সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ন করে থাকলেও মানবীয় গুণ প্রকাশ করেছে।

তথ্যগত ছোটখাটো অসংগতি সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির প্রকাশে *ইউসুফ জেলেখা* গরীবুল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা-সাহিত্যের একটি উল্লেযোগ্য কাব্য বলে গণ্য হতে পারে। ইউসুফের প্রতি জেলেখার অনুরাগকে *অনল দেখিয়া যেন ধায় যে পতঙ্গ* বলাটা কিছু নয়, কিন্তু, *দেখিয়া বাঘিনী যে শিকারের রঙ্গ* উক্তিটিতে কবি নিঃসন্দেহে নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

হজরত মুহম্মদের (দঃ) পিতৃব্য আমীর হামজার যোদ্ধাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে কবিকল্পনা যেভাবে বিকশিত হয়, তার ফলে আমরা ফারসী-উর্দুতে আমীর হামজার বিরাটায়তন কাব্যকাহিনী পেয়েছি। তার অনুসরণে বাংলার *আমীর হামজা* রচিত হয়েছে, তবে গরীবুল্লাহ্-হামজা'র কাব্যটিই বাংলায় সর্বাধিক পরিচিত।

এই কাব্যে আমরা তরবারির সাহায্যে ইসলাম-প্রচাররত আমীর হামজাকে দেখতে পাই। কৌতুককর বিষয় এই যে, যে-সময়ে বিধর্মীদলনে তাঁর শৌর্যবীর্য বিকশিত হল, ইসলামের নবী তখনো জন্মান নি। প্রথম পর্বের শেষদিকে খোয়াজ খিজিরের কাছ থেকে রসুলুল্লাহ্র খবর পেয়ে আমীর হামজা বলে 'একিদায় আনিল ইমান'। এ সত্ত্বেও যেমন কবির কাছে, তেমনি পাঠকের কাছে, হামজার অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ ইসলাম-প্রচারের অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গ ও জিহাদরূপেই পরিগণিত হয়ে এসেছে।

আমীর হামজা কাব্যে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার বাহুল্য আছে। এটা যে এই ভাষারীতির কাব্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সেকথা আগেই বলেছি। এই কাব্যের পাত্রপাত্রীর তালিকায় দেও-পরীরা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। স্বপ্নে ও প্রকাশ্যে লোকান্তরিত নবীদের প্রবেশ ও প্রস্থান সচরাচর ঘটনা। *জঙ্গনামা* শ্রেণীর কাব্যে আবার, বিশেষ করে নায়ককে সাহায্য করার জন্যে, কাল্পনিক খোয়াজ খিজিরের আবির্ভাব হয়, এখানেও তা ঘটেছে। দেওরা যেমন মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে বিচরণ করতে থাকে তেমনি পরীতে-মানুষে বিবাহ হয়। মানুষের ঔরসে ও পরীর গর্ভে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, তেমনি দেও-পরীর মিলনে জন্ম হয় দ্রুতগতি অশ্বের। বিশ শত গজ দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নায়ককে জয়ী হতে হয়। ঘটনার স্থানকালও এখানে সুবিস্তৃত। এর উপরে মানুষের ভুলের জন্যে 'বেদিল' আল্লাহ্ শাস্তিদান করে সমস্যাকে জটিলতর ও সমাধানকে দীর্ঘতর সময়-সাপেক্ষ করে তোলেন।

এই অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে *আমীর হামজা* কাব্যের একটি ছদ্ম-ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। পারস্যের সাসানীয় বংশের নৃপতি কোবাদ-তনয় নওশেরওয়াঁ (খুসরৌ অনুশিরওয়া : রাজত্বকাল ৫৩১-৭৮ খৃ.) এখানে মদিনার রাজারূপে কল্পিত হয়েছেন। আবার, আরবের পরিবেশে, ছিরুপুর গ্রামের মোড়ল ছিরুপালের আবির্ভাব হয়েছে এবং আমীর হামজা 'বামন'দেরকে মুসলমান করে চলেছেন। লৌকিক প্রভাবের বড় নিদর্শন মুসলমান অর্থে *তুরুক* ও *নেড়ে* শব্দের ব্যবহার এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষায় *বীর হনুমান, রাক্ষস গন্ধর্ব রাবণের গড়* প্রভৃতির উল্লেখ। রূপবর্ণনায়ও পুরোপুরি দেশীয় রীতির অনুসরণ দেখা যায়। সুড়ঙ্গ পথে মেহেরনিগারের গৃহে আমীর হামজার গোপন অভিসার এবং কোতোয়াল কর্তৃক এই ঘটনার আবিষ্কার আমাদেরকে অনিবার্যভাবে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই জাতীয় কাহিনীর একটি প্রধান লক্ষণ রূপমুগ্ধতা — হামজা-চরিত্র দিয়ে সেটা উপলব্ধি করা যায়। মেহেরনিগারের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিবিনিময় তাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রণয়ের সূচনা করল এবং পরিণামে এই প্রণয় পরিণয়ে রূপান্তরিত হল। মেহেরের জন্যে হামজার হৃদয়াবেগ তীব্র; তবু পরিণয়ের কি পূর্বে কি পরে আত্মসংযমের কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। তাই লন্ধরের পরাজয়-উপলক্ষে গোস্তহাম-আয়োজিত নৃত্যগীতানুষ্ঠানে দুই বাঁদীর সৌন্দর্য দেখে তিনি *আসক* হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছিল। মেসেরে যুদ্ধ করতে যেয়ে আজীজকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনি যখন নাসিরকে রাজত্ব দিলেন, তখন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নাসির 'বেটি বেহা দিল তার আমীরের ঠাই'। আবার সহরস্তানে গিয়ে পরী-সম্রাট আরজকের কন্যা তারাকে 'দেখিয়া আমীর তারে হৈল বেআরাম' এবং 'আসক আগুন তার উঠিল জ্বলিয়া'। তারা পরীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় ও তাদের কন্যা কুরসির জন্মলাভ পর্যন্ত এই আগুন অনির্বাণ ছিল। কিন্তু তারপরই মেহেরনিগারকে মনে পড়ায় তিনি তাঁদেরকে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। নদীর প্রবাহ যেমন মূল খাতে বয়ে চলেও ছোট বড় শাখা নদীর সৃষ্টি করে নিজেকে প্রসারিত করে দেয়, তেমনি মেহেরনিগারকে একান্ত করে পাওয়ার

জন্যে হামজার যে অভিযান, তারই পথে বহু নারীসঙ্গ তিনি লাভ করলেন — তাতে তাঁর প্রেমের অমর্যাদা হয় নি বলেই কবির বিশ্বাস। এতে আশ্চার্য হবার কিছু নেই, কেননা, সে যুগে একনিষ্ঠা ছিল নিতান্তই নারীর কর্তব্য — পুরুষের নয়। তাই নির্বীর্য স্বামীর পত্নী জোহরা ছাড়া আর সব নারীচরিত্রই পতির প্রতি বিশ্বস্ত। আর জোহরা যে স্বামীর জীবদ্দশায় মকবেল হলব্বিকে বিবাহ করলেন, তার পশ্চাতে ইবরাহীম নবীর স্বপ্নাদেশ থাকায় ঘটনাটা ধর্মীয় কর্তব্যপালনের রূপ নিয়েছে — ফলে নারীসমাজের আদর্শে আঘাত লাগে নি। তবু আরজক সাহার মুখে যে-কথা আমরা শুনতে পাই, সেটা সে যুগের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয় :

আওরত বদজাত কভু ভালো নাহি বোঝে।
নেকজাত এক কভু হাজারের মাঝে।।

এই পর্বে আমরা যেসব প্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাঁরা হচ্ছেন আমীর হামজা, নওশেরওয়াঁ, বক্তেক উজির, বুজরচেহ্ মেহের, উমর উম্মিয়া, উমর মাদির, মকবেল হলব্বি ও মেহেরনিগার। কিন্তু সাধারণত এঁরা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নি। অর্থাৎ এঁরা যত না individual তার চাইতে অনেক বেশী typical। আর একই রকম ঘটনা ও মনোভাব ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে বলে ঘটনার মতো চরিত্রগুলোও একঘেয়েমীতে ম্লান হয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ্ মেহেরের বৈশিষ্ট্যই বরঞ্চ আমাদের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট করে।

আমীর হামজা কাব্যে এবং অন্যান্য জঙ্গনামায় ইসলামপ্রচারের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, তা কতখানি ইসলামের আদর্শসম্মত, এ প্রশ্ন সহজেই উথাপন করা চলে। সর্বত্র দেখা যায়, পরাজিত ব্যক্তি জীবনরক্ষার দায়ে ধর্মান্তরগ্রহণ করছে। কবি একবার তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, *তারা মনে ডরাইয়া, রহে মোছলমান হইয়া*। তরবারির সাহায্যেই এখানে রাজ্যের ও ধর্মের বিস্তার ঘটেছে, ধর্মমতের মাধুর্য ও ঔদার্যের জন্য নয়।

তবু কবি তৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল এমন একটি বীর চরিত্র গড়ে তোলা, যিনি এইভাবে ছলে-বলে-কৌশলে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ধর্মের মহিমা প্রচার করবেন।

ফারসী মূল অবলম্বনে রচিত গরীবুল্লাহ্‌র আরেকটি কাব্য হচ্ছে 'মোক্তাল হোসেন বা জঙ্গনামা'। এই কাব্যের বিষয়বস্তু কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়ারা বেশ ভালরকম শিল্পসৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে আরব, তুরস্ক ও বিশেষ করে ইরানে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে *তাজিয়ার* অভিনয়। কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে ফারসীতে সমৃদ্ধ মর্সিয়া-কাব্যও গড়ে উঠেছে।[৬৯] বোধহয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় কারবালা-কাহিনীর প্রথম কাব্য রচিত হয়।[৭০]

বিষয়বস্তুর গুণে গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে শিয়া-ভাবধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শিয়াদের রাজকীয় প্রবণতার কথা আমরা জানি বলেই, যখন পড়ি,

রছুল বলেন যদি পুছিলে আমারে।
আবুবকর বাদশা হবে মেরা পরে।।

তখন ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের জায়গায় এই বাদশাহীর সংবাদে একেবারে বিস্মিত হই না। হাসান-হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কে হজরত মুহম্মদের (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর মূল উৎস

কুরআন-শরীফ বলে নির্ণীত হয়েছে। তারপর কারবালার এই ট্রাজেডির ইতিহাস কবি শুরু করছেন সুদূর অতীত থেকে। ইবরাহীম নবী যখন আল্লাহ্‌র আদেশে ইসমাইলকে কুরবানী দিতে গেলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিরস্ত করে বললেন যে, ইসমাইলের বংশধরেরা, কারবালার ক্ষেত্রে যে আত্মত্যাগ করবেন, সেটাই তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে। কুরবানীর মূল ত্যাগের আদর্শ গেল বিলুপ্ত হয়ে — কেবল এক আত্মসচেতন স্রষ্টাকেই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি — নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সামান্যতম বিস্মৃতিতেই যিনি ক্রুদ্ধ হন এবং যাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে নিরপরাধকে বলিদানের প্রয়োজন হয়। অতএব, হাসান-হোসেনের মৃত্যু আদর্শ ও সত্যের জন্যে আত্মত্যাগ নয় — পূর্বপুরুষের অজ্ঞানতাপ্রসূত পাপের নিয়তিনির্ধারিত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। শুধু তাই নয়, কবিত্বের সঙ্গে পয়গম্বরপুত্রীর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেবার নেশা চেপে ফাতেমাকে যে পরম স্বার্থপর ও সপত্নীপুত্র-বিদ্বেষীরূপে অঙ্কন করেছেন, তার তাৎপর্য কবির কাছেও ধরা পড়ে নি। অলৌকিকতা কেবল নয়, অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বীরবিক্রম এ কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। যেমন, মুণ্ডচ্যুত বীরের 'মার মার' ধ্বনি উচ্চারণ কিংবা পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চান্ন গজ দীর্ঘ যোদ্ধাদের পরস্পরের শক্তি-পরীক্ষা পাঠককে রূপকথার জগতেই বন্দী করে রাখে।

কিন্তু এখানেও কবি বাংলাদেশের পরিবেশকে ভুলতে পারেন নি। তাই দামেস্ক শহরে 'মুখুর্যা কুলেতে জন্ম নাম চন্দ্রভান' এক ব্রাহ্মণকে আমরা দেখতে পাই, যার অন্তরের কামনা ছিল, হোসেনের কাছে কলেমা পড়ে মুসলমান হবেন। হোসেনের খণ্ডিত শির নিয়ে জেয়াদ তাঁর গৃহে রাত্রিযাপন করলেন। সেই ছিন্ন মস্তক প্রর্ত্যাপণ করতে অস্বীকার করে প্রভাতে ব্রাহ্মণী খাঁড়া নিয়ে আর ব্রাহ্মণী শালগ্রাম শিলা হাতে জেয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই কবি ব্রাহ্মণকে ইসলামভক্ত করে তুললেন — বাস্তবতার প্রশ্ন তাঁর মনেও এলো না। আর শুধু তাই নয়, তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতেও কোন সংকোচবোধ করলেন না। অলঙ্কার-ব্যবহারেও পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

হজরত আলীর বীরত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে শিয়ারা নানা উপাখ্যান সৃষ্টি করেছেন। শিয়া ঐতিহ্যমতে, বিবি ফাতেমার মৃত্যুর পর তিনি আরো বারোজন স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং মোট সতেরোটি পুত্র ও উনিশটি কন্যা লাভ করেন।[৭১] আলীর ঔরসে ও আম্বাজ-রানী হনুফার গর্ভে জাত মুহম্মদ ইব্‌নে আল-হানাফিয়া (অর্থাৎ হানাফী নারীর তনয় মুহম্মদ) পিতার তুল্য বীরত্ব অর্জন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁকে নিয়েও নানারকম কাল্পনিক উপাখ্যান রচিত হয়েছে ফারসী ও উর্দুতে, এবং তার অনুসরণে বাংলায়ও।

হানিফার ত্রয়োদশম যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে *সোনাভান* কাব্যে। টুঙ্গি শহরের বাদশা সোনাভানের সঙ্গে হানিফার যুদ্ধ ও পরাজয়, পরে হানিফার তিন স্ত্রীর নিকটে সোনাভানের পরাজয় এবং পত্নীদের দৌত্যে হানিফা-সোনাভান পরিণয় এই কাব্যের মূল ঘটনা। মানুষের সামান্য ত্রুটিতে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও তার জন্য শাস্তিদান, নানাপ্রকার স্বপ্নাদেশ, খোওয়াজ খিজিরের কেরামতি এবং আরো অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় কাহিনী আকীর্ণ। হানিফার বীরত্বপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কবি এই কাব্য রচনা করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পত্নীদের। তাঁরা আবার এতদূর পতিভক্ত যে, স্বামীর পুনর্বিবাহের

আয়োজনও করেন সোৎসাহে। হানিফার অচরণ অনেক সময়েই গ্রাম্যতার পরিচায়ক।

সোনাভান কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু দেবদেবীর ইসলাম-ভীতি। হজরত আলী বনাম শিবের সংঘর্ষে শিবের পরাজয় যে তাঁকে কতদূর আলী-ভীত ও সেই কারণে আলী-ভক্ত করে রেখেছে, তার প্রমাণ আছে সোনাভানের প্রতি শিব ও কালীর উক্তিতে। কবিকল্পনার বিচিত্র লীলা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পাবে! এই বালকোচিত কল্পনাতেই কবির সন্তুষ্টি! ইসলামের মহিমা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। যেমন করেই হোক না কেন, দেব-পূজারিনী তো বিশ্বাসীর জীবনসঙ্গিনী হলেন আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও তা বিশ্বাসীদের কান্ডারীকে ভয় করেন!

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে না হয়ে পারে না যে, কবিমানসে হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও হজরত আলীর অস্তিত্ব যেমন বাস্তব, অর্থাৎ তাঁদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে তিনি যেমন নিঃসন্দিহান, তেমনি শিবের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁর একটি অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে।

গরীবুল্লাহ্‌র অপর রচনার নাম *সত্যপীরের পুঁথি — মদন কামদেবের পালা*। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের একটি বড় উদাহরণ। এঁর শিরনি দেওয়ার প্রথা উভয় সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। *স্কন্দপুরাণে* সত্যনারায়ণের উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।[৭২] কেউ কেউ দাবি করেছেন যে বড়পীর হজরত আবদুল কাদির জিলানীর কাহিনীই এদেশে সত্যপীরের নামে প্রচলিত হয়েছে।[৭৩] কিন্তু *পীর বরহক* ও *সত্যপীর* নামসাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দাবির ভিত্তি যথেষ্ট জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত নয়। সত্যপীরকে ধর্মঠাকুরেরও পরিণতি বলা যায় না। ধর্মঠাকুরের কাহিনীগুলোর হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে ছায়াপাত ঘটেছে, তার বদলে সত্যপীব-উপাখ্যানগুলোয় ধর্মসমন্বয়েরই ইঙ্গিত পাই।[৭৪] আসলে সত্যপীর চরিত্রসৃষ্টিব পশ্চাতে লোকমানসের এই উপলব্ধি নিহিত ছিল যে, কলিযুগে প্রজার পাপের ফলে মুসলমানবেশে দেবতা মর্ত্যে আগমন করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসীকে পুরস্কৃত করছেন। মুসলমান-শাসনের পরিবেশ ও পীর-ফকীরদেব কেরামতির স্মৃতি সত্যপীরের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করেছিল, সন্দেহ নেই।

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ-কাহিনীগুলোকে তিনভাগে ভাগ কবা যেতে পারে। প্রথম ধারায় *স্কন্দপুরাণের* রেবাখণ্ডেকথিত কাহিনীটিই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়েছে। কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের *সত্যনারায়ণের কথা* এবং দ্বিজ রামভদ্রের *সত্যদেব-সংহিতা* এই ধারার কাব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর *সত্যনারায়ণ-পাঁচালী* একটু স্বতন্ত্র এবং উপাখ্যানপ্রধান। এখানে নানারকম কাহিনী অবতারণা করে নায়ক বা নায়িকার সমস্যা-সমাধানে সত্যপীরের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এর উদাহরণ, কৃষ্ণহরি দাসের 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি'।

গরীবুল্লাহ্‌র 'সত্যপীরের পুথি'তে নায়ক সুন্দরকে মৃত্যুর পর তিনবার জীবনদান করেছেন সত্যপীর। দুশ্চরিত্রা ভ্রাতৃবধূরা তাকে মন্ত্র পড়ে শুকপক্ষী করে দিয়েছে, সত্যপীর শ্বেতমক্ষিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, বৃক্ষ পবনগতি লাভ করেছে –– এ ধরনের অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা এতে প্রচুর আছে। এই সঙ্গে একটি প্রণয়কাহিনী (সুন্দর-বিমলার) যুক্ত হয়েছে। অন্যান্য সত্যপীর-পাঁচালীর তুলনায় আলোচ্য কাব্যে নূতনত্ব নেই। চরিত্রসমূহ

মানবীয় গুণবর্জিত। অতিশয়োক্তি ও অসংগতি যথেষ্ট আছে।

গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জেলেখা' রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী হিসেবে উল্লেখযোগ্য রচনা, তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু অন্যান্য কাব্যে সেই শক্তির পরিচয় বিতর্ক ও অনুসন্ধানের বিষয়। মিশ্রভাষার সাধারণ লক্ষণ ছাড়া তাঁর ভাষায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই, দু' একটি শব্দের ব্যবহার কবির অজ্ঞতার পরিচায়ক যেমন, 'সোনাভানে'

গাথিয়াছে পাথরেতে সোনা রূপার থাম তাতে
রতন কাঞ্চন দিয়া তায়

এখানে 'সোনা' ও 'কাঞ্চন' বলতে তিনি ভিন্ন বস্তু বুঝিয়েছেন। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, বিশেষ কোন কৃতিত্ব বা মৌলিকতার নিদর্শন সেখানে নেই। উপমা-উৎপ্রেক্ষায় চমৎকারিত্বের পরিচয় আছে কদাচিৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি গতানুগতিক। বিশেষ করে, তাঁর যুদ্ধকাহিনীর কাব্যগুলো সম্পর্কে সেই মন্তব্য করা চলে, ফিরদৌসীর 'শাহনামা'র সমালোচনায় ব্রাউন যা বলেছিলেন :

> But the similes employed are also, as it seems to me, unnecessarily monotonous, every hero appears as 'a fierce, war-seeking lion', 'a crocodile', 'a raging elephant' and the like, and when he moves swiftly, he moves 'like smoke' 'like dust' or 'like the wind'. [৭৫]

গরীবুল্লাহ্‌র প্রতিভা ছিল, পর্যাপ্ত শিক্ষা ছিল না। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য। তাই গরীবুল্লাহ্ জনপ্রিয় হলেন, কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারলেন না। তবে একটি বিশেষ কাব্যধারার পথকর্তা হিসেবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করবেন, এইটুকু আমাদের সান্ত্বনা।

পাঁচ

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যপ্রসঙ্গে গরীবুল্লাহ্‌র পর আমরা যাঁর নাম করতে পারি, তিনি সৈয়দ হামজা। কেবল কালের দিক দিয়ে নয়, রচনাশৈলীর উৎকর্ষের দিক দিয়েও গরীবুল্লাহ্‌র অনুসারীদের মধ্যে তিনিই দীপ্তিমান। আত্মপরিচয় দানের ব্যাপারে সৈয়দ হামজা কোনরকম কৃপণতা করেন নি, বিভিন্ন কাব্যে বেশ বিস্তারিত করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত খবরাখবর দেবার চেষ্টা করেছেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কবির জনৈক স্বগ্রামনিবাসী স্থানীয় কিংবদন্তীর উপরে ভিত্তি করে সৈয়দ হামজার জীবনী প্রকাশ করেছিলেন।[৭৬] এসব মিলিয়ে হামজার জীবনকাহিনী পুনর্গঠন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর।

সৈয়দ আবদুল কাদিরের পৌত্র ও মীর হিদায়তউল্লাহর পুত্র সৈয়দ হামজা পৈতৃক নিবাস হুগলী (তখনকার বর্ধমান) জেলার ভুরশূট পরগণার অন্তর্গত উদনা গ্রামে ১৭৩৩-৩৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে কবি প্রায় নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন, এই নাস্তিকতা দূর করার অভিপ্রায়ে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কবিকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়। আঠারো বছর বয়সে তিনি পরিণীত হয়েছিলেন। কবিতা, পাঁচালী ও হেঁয়ালী ছড়া রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। বেশ একটু পরিণত বয়সেই (৪৯) তিনি 'মধুমালতী' নামে একটি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অনতিবিলম্বে পিতৃবিয়োগ

হওয়ায় কাব্যরচনায় ছেদ পড়ে।। সম্ভবত ১১৭৭ বঙ্গাব্দে (১৭৭০-৭১খৃ.) তিনি বসন্তপুরে শিক্ষকতা করতে আসেন, ১১৯৯ ও ১২০৯ সালের বন্যায় পীড়িত হবার পর এখানে স্থায়ীভবে বসবাস করতে থাকেন। আনুমানিক ১৭৮৮তে তাঁর *মধুমালতী* রচনা সমাপ্ত হয়। এটি অবশ্য মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নয়। এরপর তিনি গরীবুল্লাহ্-রচিত *আমীর হামজা* কাব্যের শেষার্ধ রচনায় হাত দেন এবং তা সম্পূর্ণ করেন ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে। ১৭৯৮-তে রচনা করেন "জৈগুণের পুঁথি' এবং *হাতেম তাই* রচনা করেন ১৮০৪ খৃস্টাব্দে। শেষ তিনটি কাব্যই মিশ্র ভাষায় লেখা। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হবার সংবাদ সৈয়দ হামজা বোধহয় পেয়েছিলেন এবং আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হবে। *আমীর হামজা* কাব্যেব উপসংহারে তিনি বলেছেন:।

না করি বারণ কারে পুঁথি ছাপিবার।
না ছোটে ওজন যেন দোহাই আল্লার।।

মধুমালতীর কাহিনী যে মুলত ভারতীয় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতীয় ভাষা থেকে সে কাহিনী অবশ্য ফারসীতেও অনূদিত হয়েছিল।[৭৭] হামজা সম্ভবত ফারসী ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন-- নিশ্চিতভাবে অবশ্য কিছু বলা যাচ্ছে না। রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান হিসেবে *মধুমালতীর* কাহিনীকে সাধারণই বলব, এ কাহিনীর মধ্যে তেমন কোন জটিলতা নেই। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সমস্ত কাব্যের উপরে মোটা প্রলেপ লাগিয়ে গেছে। পরীদের সাময়িক লীলাখেলার ক্রীড়নক মনোহর ও মালতীর ক্ষণিক মিলনেই সমগ্র কাহিনীর মূল নিহিত। তারপর পঞ্চমুণ্ড দশচক্ষু দশহস্ত রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারকার্য রূপকথার অতীন্দ্রিয় জগতেই পাঠককে বন্দী করে রাখে। সবশেষে মধুমালতীর metamorphosis শুকপক্ষী হওয়া এবং পুনরপি রূপান্তরগ্রহণ--এক ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় জাগ্রত করে। সে যুগের পাঠকের কল্পনায় যে এই অতিপ্রাকৃত জগৎ বাস্তবের সকল সত্যতা নিয়ে বর্তমান ছিল, এতে সন্দেহ নেই : কিন্তু সমগ্র কাব্যে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তার সবকটিই অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি, নয় এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। ঘটনার স্বাধীন বিকাশ যেমন ঘটে নি, চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশও তেমন হয় নি।

অবশ্য এরই অন্তরালে সমাজের উপস্থিতি পাঠকের গোচরীভূত না হয়ে পারে না। সে সমাজ কেবল অতিপ্রাকৃত জগতের চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, বরঞ্চ অতিপ্রাকৃত পরিবেশের ঈপ্সিত পরিণামের সঙ্গে তার বিরোধও আছে। মনোহরের হাতে রাজ্যভার-অর্পণের সময়ে 'সমাজ করিয়া তবে বসিল রাজন', কিংবা প্রেমার প্রত্যাবর্তনে চিত্রসেন 'আনন্দিত হইল সে সমাজ সহিত' — এইসব অংশে সমাজ বলতে রাজ্যশাসনের সহায়ক ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে মালতী যখন মনোহরকে বলছে :

অকুণ্ডারী কন্যা আমি রাজার কুমারী।
কেমনে তোমার সঙ্গে আলিঙ্গন করি।।
একথা প্রকাশ হৈলে হবে বড় লাজ।...
সহজে হইবে তার কুলের খাকার।।

অথবা রূপমঞ্জরী যখন প্রেমাকে ধিক্কার দিচ্ছেন . 'কলঙ্ক করিলি মোর সংসার জুড়িয়া',

কিংবা তিনি যখন রাজা বিক্রমকে বলছেন, 'যোগ্য কন্যা যার ঘরে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাহি তারে, নিরবধি মনে মনস্তাপ' — তখন আমরা যা সমাজ ও সংসারের পরিচয় পাই, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজের চেহারাটা অন্যভাবেও দেখা যায়। পাত্রপাত্রীর আচরিত রীতিনীতি সম্পর্কে সৈয়দ হামজা বেশ সতর্ক ছিলেন। তাই পুত্রের জন্মে ব্রাহ্মণভোজন ও পারিতোষিক দান, জন্মপত্র-লিখন, পাঠশালায় শাস্ত্র-অধ্যায়ন ও বিবাহোৎসবের বর্ণনায় হিন্দু রীতিনীতির অনুসৃতি দেখি। অবশ্য এই সতর্কতা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের প্রচলন-অনুযায়ী কবি মনোহরের গলায় তাবিজ পরিয়েছেন ও বিবাহবাসরে আতরের আমদানী করেছেন।

চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, এখানে বিভিন্ন পাত্রপাত্রী কবির মনোগত আদর্শানুযায়ী এক একটি গুণের ভার বহন করে চলেছে — দোষগুণের সমন্বয়ে তাদের চরিত্র গড়ে ওঠে নি বা গুণাবলীর সমন্বয় তাদের চরিত্র থেকে উৎসারিত হয় নি। রচনারীতির দিক দিয়ে *মধুমালতী*তে স্বকীয়তার চেয়ে প্রথানুগত্যই বেশী লক্ষ্য করা যায়। রূপবর্ণনা ক্লাসিক পদ্ধতির। এই কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর ভাষা : এটি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নয়, মধ্যযুগীয় কাব্যের সাধারণ ভাষায় (যাকে মিশ্র ভাষারীতির কবিরা *সংস্কৃত* আখ্যা দিয়েছিলেন) এটি লেখা হয়েছে। অবশ্য হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। ফলে এখানে *মাঙ্গাইয়া লিয়া, দোন, আসক, লোগ, ছামান, মেওয়াজাত, নফর, বহিন, ওখাড়িয়া* প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। পুংলিঙ্গে *প্রিয়া* ও *উদাসিনী* শব্দের ব্যবহার মিশ্র ভাষারীতির প্রভাবের পরিচায়ক।

রসিকদের অনুরোধে গরীবুল্লাহ্-রচিত অসমাপ্ত *আমীর হামজা* সম্পূর্ণ করতে যেয়েই সৈয়দ হামজা মিশ্র ভাষারীতি গ্রহণ করেন এবং অচিরেই এই রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। হামজা-প্রণীত দ্বিতীয় পর্বে অবশ্য দেখা যায় যে আমীর হামজা ইবরাহীম নবীর দীন প্রচার করছেন। এই কাব্যের এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাব্যের সব চাইতে লক্ষযোগ্য বিষয় হচ্ছে passion-এর তীব্রতা। রণক্ষেত্রে, নৃত্যগীত-পেয়ালাবাজিতে এবং নারীর আসঙ্গলিপ্সায় একই মদোন্মত্ততার প্রকাশভেদ হয়েছে মাত্র। অস্বাভাবিক ঘটনাকে যদি অতীন্দ্রিয় বলে আখ্যা দেওয়া চলে, তবে বলতে হয় যে, এ কাব্যে অতীন্দ্রিয়তার পরিচয় আছে। আমীর হামজার জনৈক স্ত্রীর immaculate conception এবং হামজার নাম শুনেই রাবিয়া পানলপোসের আশৈশব প্রণয়াবেগের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। passion এর তীব্রতার সর্বাপেক্ষা প্রকাশ ঘটেছে আমীর হামজার কাছে তাঁর মাতৃসম নওশেরওয়াঁ-মহিষী আওরঙ্গিরের আত্মনিবেদন। এই জাতীয় কাব্যের অধিকাংশ পাত্রপাত্রী প্রথম দর্শনজাত প্রণয়েই অভ্যস্ত, তার বহু প্রমাণ এই কাব্যে মিলবে।

কাব্যের শেষদিকে হজরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ঘটেছে। নওশেরওয়াঁ জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ্ মেহেরের দুই চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। চল্লিশ দিনের শিশু মুহম্মদের (দঃ) পদরেণু চোখে মেখে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। গায়েবী আওয়াজ তাঁকে বলেছিল যে, তিনি যদি পৃথিবীর সকল মৃতের পুনর্জীবন প্রার্থনা করতেন — নবীর বরকতে — আল্লাহ্ তাও মঞ্জুর করতেন। কিন্তু সেই নবীই কি আল্লাহর

রোষদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেলেন? কাব্যের শেষে দেখি নিজের দন্তরুচির প্রশংসা করায় তাঁর *দানদান* শহীদ হল এবং আপন পিতৃব্যের শক্তিমত্তা সম্পর্কে তিনি অতিরিক্ত আস্থা প্রকাশ করায় আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর এই *কামের* 'মজুরী' হামজা লাভ করলেন শাহাদত বরণ করে — হেন্দিয়ার হাতে তাঁর মৃত্যু হল। হেন্দিয়া অবশ্য অনুতপ্ত হলেন, মুসলমান হলেন, — কিন্তু হামজা আর ফিরলেন না, কাব্যও সমাপ্ত হল।

মুহম্মদ ইবনে আল-হানাফিয়ার বীরত্বকাহিনী নিয়ে সৈয়দ হামজা রচনা করেন 'জৈগুণের পুঁথি'। এরেমের বাদশাহজাদী অসাধারণ বীর্যবতী রমণী জৈগুণের সঙ্গে হানিফার যুদ্ধবিগ্রহ এবং পরিণামে পরিণয় বর্ণনা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শক্তিপরীক্ষায় হানিফাকে পরাজিত করলেও তাঁর মাতা বিবি হনুফার কাছে পরাভয় মেনে জৈগুণ মুসলমান হন ও হানিফাকে বাগ্‌দান করেন। এরপর তাঁদের সম্মিলিত অভিযান একের পর অন্য রাজাকে পরাজিত ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে জৈগুণের পিতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। মধ্যে আবার পরীদের শাহজাদী কুয়াপরী হানিফাকে দেখে আসক্ত হয়ে তাঁকে অপহরণ করেন। জৈগুণ হানিফার উদ্ধারসাধন করে পিতা ও পিতৃব্যদেরকে পরাজিত করেন এবং শেষে তাঁদের শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

এই কাব্যের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের পরাক্রমের কাছে অনৈসলামিক শক্তির পরাজয় বর্ণনা। ইসলাম-প্রচারের যে পদ্ধতি এখানে কবি দেখিয়েছেন তা সম্পূর্ণতই তরবারির সাহায্যে — ধর্মমতের মাধুর্য বা ঔদার্যের জন্য নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে এই কেন্দ্রীভূত আবেগকেই কবি প্রকাশ করেছেন — চরিত্রসৃষ্টি বা কবিত্বপ্রকাশের সুযোগ নেন নি। কোন অমুসলমান চরিত্র যখন বাহুবলে পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সেই মহূর্ত থেকে তিনি যে কেবল ইসলামের অকৃত্রিম অনুরাগী রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন, তা নয় — এক নিমেষেই পূর্বের ধর্মমতের প্রতি তাঁর সীমাহীন বিদ্বেষ ও সেই ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাবোধও প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন ধর্মের প্রতি ভক্তির আতিশয্য তাঁর আর সকল চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। উদহরণস্বরূপ নও-মুসলমান জৈগুণ কর্তৃক পিতৃহননের প্রস্তাব স্মরণ করা যেতে পারে। এখানে তাঁর দ্বিধাহীনচিত্ততা যে নীতিবোধের পরিচয় দেয়, তা ইস্‌লাম ধর্মলব্ধ বলতে সকলেরই কুণ্ঠা জাগবে। এ এক ধরনের অন্ধ আবেগমাত্র, কিন্তু কবি একেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

কাব্যের মূল যাই হোক না কেন, বাংলায় একে রূপান্তরিত করার সময়ে কবি তাঁর সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কাব্যের অমুসলমান চরিত্রগুলি যে তাঁরই প্রতিবেশী রামশ্যামের রূপ নিয়ে দেখা দেবেন, তাতে আর বিচিত্র কি! তাই এরেমরাজের কাছে আলীর পরিচয় হচ্ছে,

দেউল দোহারা তুড়ে কৈল ছারখার।
না রাখিল আমল হিন্দুর দেবতার ॥

এবং দোমরাজকে উমর উম্মিয়া বলছেন,

দেওপূজা ক্ষমা দেহ ঝুটি মালা ছাড়।
একভাবে নবীর কলেমা মুখে পড় ॥
কাঁধে রশি ছেড়ে ঝুটি গলে রাখ মালা।

হিন্দু বলাইতে কেন কর এত জ্বালা ॥
আমার নবীর দীনে কোন লেঠা নাই।
সব ছাড়ি দাড়ি রাখ শুন মেরা ভাই ॥

এসব উক্তি অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মুখে অস্বাভাবিক নয়।

সমকালীন অরাজকতার কথাও সৈয়দ হামজার চিত্তে বেদনা জাগ্রত করেছিল। জিন্দাল বাদশাহ্‌র প্রতি হানিফার উপদেশে সেই অবস্থার অবসানে উন্নততর ভবিষ্যতের কামনা আছে :

শরা আদালত কাম রাখিবে বাহাল।
রায়েতের এনছাফ করিবে হামেহাল ॥
গরীব কাঙ্গাল লোকে করিবে মেহের।
রওয়া না রাখিবে বাত জালেম লোকের ॥
না করিবে জুলুম রায়েত লোক পর।

সৈয়দ হামজার *হাতেম তাই* উর্দু *আরায়েশ মহ্‌ফিল* কাব্যের অনুবাদ। সওদাগরজাদী হুসনাবানুর রূপমুগ্ধ মনীর শামীর বাসনাপূর্তির জন্য সাতটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে হাতেম তাইয়ের অভিযান এই কাব্যে মূল বর্ণনীয় বিষয়। নিঃস্বার্থ হাতেম যাত্রা করেছেন দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে : পথে আবার কারো অতৃপ্ত কামনা তাঁর হৃদয়ে বেদনা জাগ্রত করেছে। তখন তিনি মূল অনুসন্ধানকার্য স্থগিত রেখে আবার কখনো দুরূহ তিন প্রশ্নের জবাব এনে প্রেমিককে শান্ত করেছেন, কখনো দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে তার পুরস্কারস্বরূপ কোন প্রেমিকের সঙ্গে তার ঈপ্সিত নারীর মিলনসাধনের অধিকার লাভ করেছেন। তিনি নিজেও বিবাহ করেছেন একধিকবার, তাদের মধ্যে কেউ বা ভালুকের কন্যা, কেউ বা পরী। তাঁর যাত্রাপথে দৈত্যেরা পাহারা দেয়, পরীরা নৃত্যগীত করে, পশুপক্ষী কথা বলে। সাপের পেটে হাতেম অক্ষত থাকেন, কুমীরের উদর থেকে বেরিয়ে আসেন নিরাপদে, অবলীলাক্রমে পরাজিত করেন বিরাটাকার দৈত্যকে। পরীরাজ তাকে পুরস্কৃত করেন, মৃত্যুদূত তাঁর পাঁচ হাজার বছর আয়ুর কথা সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করেন, মৃত ব্যক্তি রূপধারণ করে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। বাস্তবের সঙ্গে এই কাব্যের যোগ নেই বললেই চলে — এ যেন বড়দের রূপকথা।

কবি অবশ্য এ কাহিনীকে ইতিহাসের সগোত্র মনে করেছেন। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন :

হামজা বলে এই বাতে আফছোছ হাজার।
এয়ছা মর্দ কেন না হইল দীনদার।

আবার,

হামজা বলে হাতেম হইলে দীনদার।
পয়গাম্বরি দর্জ্জা দিত পরওয়ার দেগার।।

এ সত্ত্বেও অমুসলমান হাতেমের আত্মত্যাগ-স্বীকারের ও নিঃস্বার্থ মানব-প্রেমের কাহিনী তিনি যেমন সাগ্রহে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, হাতেমও তেমনি বারবার আল্লাহ্‌র কাছে শোকরানা আদায় করেছেন।

গরীবুল্লাহ্‌র মতো হামজারও শ্রেষ্ঠরচনা তাঁর প্রণয়কাব্য। মনে হয় উভয় কবিরই স্বাভাবিক

প্রতিভা এই জাতীয় কাব্যরচনার অনুকূল ছিল। কিন্তু সমসাময়িক ফারসী যুদ্ধকাহিনী-কাব্যের জনপ্রিয়তায় বিভ্রান্ত হয়ে এঁরা 'জঙ্গনামা'-শ্রেণীর কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের শ্রোতারাও এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য কবিরা তাদের নিরুত্তাপ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন, তাদের মূঢ় কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেই বিশেষ মুহূর্তের, বিশেষ পরিমণ্ডলের, অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবিদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। কেবল যেখানে চিরন্তন সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাঁদের সেই প্রণয় কাব্যই হয়তো কালের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

ছয়

১৮০০ খৃস্টব্দে কলকাতার ফোর্ট উইলিযম কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা ও উর্দু উভয় সাহিত্যেরই সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। বাংলা ও উর্দু গদ্যরীতির গোড়াপত্তন এখানেই হয়। এই কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা বইগুলো যেমন বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করে, তেমনি এখানকার উর্দু গদ্য-গ্রন্থাদিও বোধ হয় মিশ্র ভাষারীতির কাব্যরচনায় প্রেরণা জাগায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং পরে নেওয়াল কিশোর প্রেস থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত উর্দু গদ্যগ্রন্থের সঙ্গে সমকালীন মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের বিষয়বস্তুগত ঐক্য তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ফারসী কাব্য *কিস্‌সা-ই-চাহার দরবেশের* উর্দু রূপান্তর সাধন করেন মীর আম্মান দেহলভী *বাগ ও বাহার* (১৮০১) নামে। বাংলায় মোহাম্মদ দানেশের *চাহার দরবেশ* পাই। উর্দু গদ্যে নেহাল-চন্দ্ লেখেন *মজহব-ই-ইশক*', মিশ্র ভাষারীতিতে পাই এরাদত আলীর *গোলে-বাকাওলী*'। মীর বাহাদুর আলী মুন্‌শী 'নাসির ও বেনজীর' লেখেন মীর হাসানের ফারসী 'সিহার-উল-বয়ান' অবলম্বনে, বাংলায় পাই কমরুদ্দীনের *বনজীর-বদরে-মুনির* এবং আজীমুল্লাহ্ খানের *বেনজীর*' ও *বদরে মনির*। মীর শের আলী আফসোসের উর্দু *আরায়েশ-ই-মহফিল*', বাংলায় সৈয়দ হামজার *হাতেম তাই*। হায়দরের *লায়লী-মজনু* এবং *গুলজার-ই-দানিশ* প্রভৃতির বাংলা রূপান্তরের সঙ্গেও আমরা পরিচিত।[৭৮] এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ সময়ে হিন্দু লেখকেরাও উর্দু বা হিন্দী কাব্যকাহিনী এবং ফারসী আখ্যায়িকার অনুবাদ করেছিলেন (সরাসরি অথবা উর্দু-হিন্দীর মাধ্যমে) — বাংলা গদ্যে ও ছন্দোবন্ধে। চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর *তোতা ইতিহাস* (১৮০৫), গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের *পারস্য ইতিহাস* (১৯৩৪), উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে বকাওলি ইতিহাস' (১৮৪৩), মহেশচন্দ্র মিত্রের *লায়লা-মজনু* (রচনা ১৮৫৩) এবং হরিমোহন কর্মকারের *ইসফ-জেলেখা* (১৮৫৫) এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমানেরা তখনো মিশ্র ভাষায় কাব্যসৃষ্টি করছেন — গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আরিফ নামক জনৈক কবি *লালমোহন* নামে একটি কাব্য রচনা করেন — কাব্যটি এখন সৈয়দ হামজার নামে চলে। এই কাব্যের একটি প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির লিপিকাল ১২৫৩ বঙ্গাব্দ এবং সম্ভবত প্রথম মুদ্রণের তারিখ ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ। ডক্টর সুকুমার সেন অনুমান করেন যে, কবি দক্ষিণ রাঢ়ের লোক ছিলেন।[৭৯]

সত্যপীর-পাঁচালীসমূহের যে তিনটি ধারার উল্লেখ করেছি,[৮০] আরিফের *লালমোহন*

তার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ এখানে সত্যপীর এসেছেন নায়ক-নায়িকার সঙ্কটকালের ত্রাণকর্তারূপে। এই কাব্যের নায়ক বাদশাহ্ "হোসেন শাহা" এবং নায়িকা উজীর দম্পত্তির একমাত্র সন্তান লালমোন বিবি। একদিন অতর্কিতে বিবস্ত্রা লালমোহনকে দেখে বাদশাহ্ আশেকে আকুল হলেন এবং বিবির প্রণয়ভিক্ষা করলেন। পরে সত্যপীরকে সাক্ষী করে তাঁরা পরিনীত হলেন। ফকীরবেশী সত্যপীরকে চিনতে না পেরে বাদশাহ্ তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ায় পীর অভিশাপ দিলেন। ফলে, তাঁদেরকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল। একবার বাদশাহ্র মস্তকচ্ছেদ হয়, ছিন্নমুণ্ড লালমোহনের উদ্দেশ্যে কাতর ক্রন্দন করলে তিনি পীরের অরাধনা করলেন, সত্যপীর আবার ধড়মুণ্ড জুড়ে দিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত শিরনি দিতে ভুলে যাওয়ায় এঁদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হল। বিদ্যাধরী মালিনী বাদশাহ্র রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁকে মেড়া বানিয়ে রাখল। পতিবিরহিণী পুরুষবেশী লালমোন মৃগাল-বাদশাহ্র কারাগারে বিনাপরাধে রুদ্ধ হলেন, ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে বাদশাহজাদী মাহতাবের পরিণয় হল। পরে সত্যপীরের ইচ্ছায় সকল জটিলতার অবসান হল : লালমোন-হোসেন শাহের মিলন ঘটল এবং হোসেন-মাহতাবের বিবাহ হয়ে গেল। শেষে সত্যপীরের শিরনি দিয়ে সকলে সুখে বাস করতে লাগলেন।

ভাষারীতির দিক দিয়ে কবির কোন স্বকীয়তা নেই, বাস্তবজীবনের সম্পর্করহিত কাব্যকাহিনী প্রাণহীন ও বিবর্ণ।

জয়নাল আবেদীনের 'আবু সামা' উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রাকশিত হয়ে থাকবে। ডক্টর সেন এর আনুমানিক প্রথম মুদ্রণের কাল স্থির করেছেন ১৮৫৭,[৮১] তবে লঙ-এর ক্যাটালগে (১৮৫৫) 'আবু সামা'র উল্লেখ আছে।[৮২] স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ পর্যন্ত অন্য কোন কবির লেখায় 'আবু সামা' কাব্যের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কাব্যটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি গুণহীন। শয়তানের চক্রান্তে হজরত ওমরের পুত্র আবু সামা বেগমা বুড়ীর কন্যা জনৈকা পিঞ্জিরার সঙ্গে মিলিত হন এবং পিঞ্জিরার গর্ভসঞ্চার হয়। বেগমা কাজীর কাছে নালিশ করলে বিচারে আবু সামাকে একশো দোররা মারবার আদেশ হয়। আশী দোররা মারার পর "বেহেস্তের বিচে সামা যাইয়া পউছিল"। অতঃপর তার সমাধির উপরে অবশিষ্ট বিশটি দোররা আঘাত করা হয়। এ কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মোহম্মদ দানেশ চারটি কাব্য রচনা করেন : 'গুলবে সনোয়ার', 'নূরুল ইমান', 'চাহার দরবেশ' ও 'হাতেম তাই'। প্রথম বইট ফারসী 'গুল-ব-সনৌবার' কাব্যের নেমচন্দ্-কৃত হিন্দী অনুবাদের তর্জমা, ছাপা হয়েছিল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে।[৮৩] 'নূরুল ইমান' (১৮৫৭) ধর্ম ও নীতি ঘটিত কাহিনীকাব্য।[৮৪] 'চাহার দরবেশ' ফারসী 'কিস্সা-ই-চাহার দরবেশে'র অনুবাদ, সম্ভবত উর্দুর মাধ্যমে। কাহিনীর উপক্রমণিকায় কবি বলেছেন যে, "আওলিয়ার সরদার" নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (১২৩৮-১৩২৫ খৃ) অসুস্থতাকালে তাঁর শিষ্য মীর খসরু প্রত্যহ গুরুকে ধারাবাহিকভাবে 'চাহারী দরবেশে'র কাহিনী বলে যান, পরে পীরের আদেশে তিনি এটিকে গ্রন্থাকৃতি দেন।

কেতাব করিল মর্দ্দ ফারসি জবানে।
ফারসি লোক যারা তার খুসি হালে শুনে।।

বাঙ্গালার লোক সবে নাহি জানে ভেদ।
যে কেহ শুনিল তার দেলে করে খেদ।।...
এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।
আফছোছ না করে যেন বাঙ্গালার লোক।।...
চলিত বাঙ্গালায় কেচ্ছা করিনু তৈয়ার।
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার।।
আসল বাঙ্গালা সবে বুঝিতে না পারে।
এ খাতেরে না লিখিলাম সোন বেরাদরে।।

অর্থাৎ মিশ্র ভাষারীতি কবির শ্রোতাদের বোধ্য, অবিমিশ্র বাংলা তাদের বোধগম্য হয় না।

চারজন প্রণয়ী তাদের বাঞ্ছিতা নারীর সন্ধানে বেরিয়ে ফকীর হয়ে গেছেন। ভগ্নহৃদয়ে দরবেশরা যখন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, তখন হজরত আলী বহির্ভূত হয়ে তাদেরকে ভবিষ্যতের আশা দিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছেন। এই আশায় উজ্জীবিত হয়ে দরবেশরা আবার প্রণয়িণীদের অনুসন্ধানে বের হলেন— এই-ই কাহিনীর চুম্বক।

আমি যাকে পরিবেশ-সচেতনতা বা লৌকিক প্রভাব বলেছি, তার একটি উদাহরণ এই কাব্য থেকে দেওয়া যায় :

হিন্দুস্থান দেশে এক দরিয়ার বিচে।
উটের উপরে এক বাগিচা করেছে।।
সেই বাগানেতে এক আছেন গোঁসাই।
তেমন হাকিম আর কোথা দেখি নাই।।
মাথাভরা জটা থাকে শিবের মন্দিরে।
ঠাকুরের ঘর কত আছে থরে থরে।।
বচ্ছরে বচ্ছরে সেই এই কাম করে।
শিবরাত্রে হৈলে পরে নেকালে বাহিরে।।

এই উপলক্ষে ঠাকুর এবং বুত (≐ বোত) পূজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

চাহার দরবেশে বিলম্বিত তালে প্রণয়াবেগ প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীতে গতানুগতিকতা থাকলেও রচনাভঙ্গীর সরসতার জন্যে শেষ পর্যন্ত পড়া চলে। এই কাব্যে কবির সামান্য আত্মপরিচয় আছে :

শিবপুর ঘর মেরা শুন হোসমন্দ।
রফিক মোল্লার আমি প্রথম ফরজন্দ।।

গরীবুল্লাহ্‌র নামে আরেকজন কবি কয়েকটি কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন। কবি ছিলেন ঢাকা শহরের নিকটবর্তী রহমতগঞ্জের অধিবাসী রফিক মোল্লার পুত্র। তাই এক ভাই লালবাগে বাদশাহ্‌র কেল্লায় বাস করতেন। কবির ওস্তাদের নাম নিয়ামতউল্লাহ্‌।

গরীবুল্লাহ্‌র *দেলারাম* হিন্দী কাব্য-অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী। এক হিন্দুস্তানী মিষ্টান্ন-বিক্রেতার পরমাসুন্দরী কন্যা ('হুরপরী বিদ্যাধরী পলায় লজ্জায়') ছিলেন দেলারাম। বাদশাহজাদা জামাল স্বপ্নে তাকে দেখে প্রায় উম্মাদ হয়ে যান, অনেক কষ্টের পর উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। শাহ্‌জাদার জবানীতে কবির উক্তি :

পীরিতি করিতে কেবা জাতি ঢুঁড়ে কার ॥

যে যার নয়নে লাগে যদি হয় হীন।
সেই ত আমার পক্ষে হয় যে কুলীন ॥

এখানে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিলেও, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পৃথিবী সম্পর্কে কিছুটা সঙ্কীর্ণ ধারণা তাঁর জন্মেছে, যার পরিচয় আছে বিভিন্ন উক্তিতে :

যে লোকেতে যত মাল দুনিয়ায় পায়।
তবু সেই ফাঁদ পাতে চিড়িমারের প্রায় ॥
এহি লালচ দুনিয়াতে লালচির না ছোটে।
মরণকালে মাল রেখে মরে মাথা কুটে ॥

তার *ঈমানদার নেকবিবির কেচ্ছা*তেও (অধুনা জয়নাল আবেদীনের নামে প্রচলিত) এ জাতীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় আছে। আত্মাবমাননা সত্ত্বেও নারীর পতিভক্তির মধ্যযুগীয় আদর্শের জয়গান এতে গাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিবি ফাতেমা সহ কয়েকজন পতিগতপ্রাণা নারীর স্বামী-আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই অংশের মূল *তম্বিয়তন্নেসা* নামক উর্দু কাব্য। এরপর কবির স্বরচিত "কলিকালের আওরতের বয়ান" সংযোজিত হয়েছে :

গরিবুল্লা কহে আমি কি কহিব আর।
কলিকালের আওরতের লিখি সমাচার ॥
ফিরিবারে যায় যদি পড়শীর ঘরে।
খছমের গিবত করে সবাকার তরে ॥
দুই চারি আওরত বসিয়া এক সাত।
রাষ্ট পাষ্ট করে তারা এই সব বাত।
কেহ বলে খছম মোরে জেওর দেয় নাই।
রোজগারের বিচে তার পড়িবেক ছাই ॥
কেহ বলে তবু সেহ পেয়ার করে তোরে।
আগুন লাগিল মেরা স্বামীর রোজাগরে ॥....
যার কামাই খায় তার করে তো গিবত।
এহাতক কলিকালে বেহায়া আওরত।।
ইহাদের জবানেতে নাহিক লাগাম।
বৈসে বৈসে খায় নাহি করে কাম।....
আর এক কথা কহি শুন সবে ভাই।
মনের কথা না কহিবে কবিলার ঠাই।।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করেও কবি কিন্তু তাঁদের নিন্দাভাষণে প্রবৃত্ত হন নি। আলোচ্য কবি তা করেছেন — কেননা, বাস্তবতার তাগিদ থেকে তিনি এই অংশ রচনা করেন নি, মহিলাদের নিন্দা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁর অপর রচনা *ইবলিস-নামা* অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

মিশ্র ভাষারীতির আরেকজন খ্যাতনামা কবি মোহাম্মদ খাতের অনেকগুলি কাব্যের প্রণেতা। কবির আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর পরগণার অধিবাসী সোন্দল মোল্লার পৌত্র ও মোহাম্মদ হেশামউদ্দীনের পুত্র। পিতৃবিয়োগের পর কবি শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে দারপরিগ্রহ করেন। *সাহানামা* রচনার সময় তিনি তিন

পুত্রের জনক।

কুতুবনের আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য *মৃগাবতী*- অবলম্বনে খাতের ঐ নামের কাব্য রচনা করেন।[৮৫] ঈসা নবীর কাছে সুলতান জমজমা কর্তৃক মৃত্যুযন্ত্রণা ও পরলোকদর্শনের অভিজ্ঞতা-বর্ণনা হচ্ছে তাঁর *সোলতান জমজমা* অর্থাৎ *পরলোক দর্শন* কাব্যের বিষয়বস্তু। উপসংহারে দেখা যায়, ঈসার প্রার্থনায় একশত বৎসর পর মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ হয়েছে। মৃত্যুসংক্রান্ত বর্ণনায় সৈয়দ নূরউদ্দীনের *দাকায়েকুল হাকায়েকে*'র[৮৬] সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। *লায়লা মজনু* ও *গুল ও হরমুজ* দুটি প্রণয়-উপাখ্যান এবং *তুতিনামা, আখবারুল ওজুদ, সওয়াল জওয়াব* ও *মেরাজনামা* নামে আরও কয়েকটি কাব্য তাঁর রচনা বলে জানা যায়। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে *ফিরদৌসীর শাহানামা'র* বঙ্গানুবাদ ও মিশ্র ভাষারীতির কাব্যসমূহের অন্যতম জনপ্রিয় রচনা *সাহানামা*। কাব্যটি সুদীর্ঘ — তবে উপভোগ্য। কল্পনাবিলাস, অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য, মানুষের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় এবং রমণীর বীর্যবত্তার জয়গান এতে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে *সাহানামায়* দুটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ স্থান পেয়েছে। সম্রাট তাহ্‌মাস্‌পের হাতে বন্দী দৈত্যরা মানুষকে শিক্ষাদান করবার শর্তে মুক্তিক্রয় করেছিল :

লেখাপড়া দুনিয়াতে দেউয়ের ছেওয়ায়।
কোনজন আগে নাহি জানিত কোথায় ॥
তহমস হইতে এই দুনিয়া মাঝার।
ইলেম আর জারী হৈল কত কারবার ॥

জীবনের শেষ মুহূর্তে সিকান্দর বাদশাহ্‌ আবে-হায়াতের অনুসন্ধান করে পান নি। সেই পানির তাৎপর্য কবি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন :

শুনিয়াছি আছে আবে-হায়াতের কূয়া।।
সেই ত কূয়ার পানি যে কেহ খাইবে।
বাঁচিবে হাশর তক্‌ নাহিক মরিবে।।

ইসহাক আল নিশাপুরির ফারসী *কাসাসুল আম্বিয়া* 'র গোলাম নবী ইবনে ইনায়েতুল্লাহ্‌ কৃত উর্দু অনুবাদ-অবলম্বনে খাতের *কাসাসুল অম্বিয়া* লেখেন। বইটি প্রকাশ পেয়েছিল কবির সঙ্গে প্রকাশক তাজুদ্দীন মোহাম্মদের নাম যুক্ত হয়ে।[৮৭]

মালে মোহাম্মদ লিখেছিলেন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান *ছয়ফলমুলুক বদিউজ্জামাল*, স্ত্রীলোকের প্রতি উপদেশমূলক *তাম্বিয়তন্নেছা* এবং শাস্ত্র-বিষয়ক রচনা *আহকামল জোমা*।[৮৮] আলাওলের কাহিনী কাব্যের মিশ্র ভাষারীতি-সংস্করণ *ছয়ফলমুলুক বদিউজ্জামালে*'র (১৮২৮) উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন :

এই পুঁথি সায়েব ছিল আগু জমানার।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কসেল্লা।
এ কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা ॥
রসিক লোকের দেখে বহুত কাকুতি।
বারাশত পঁয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুঁথি ॥

একালে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের বিকাশ যথেষ্ট হয়েছে — তাই অনেক পাঠকের পক্ষে আলাওলের ভাষাও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। মালে মোহাম্মদ ভাষাগত সারল্য এনেছেন, কিন্তু কাব্যটির আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেন নি।

জান মোহাম্মদের *হাজার মসলা* ইসলাম ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক এক সহস্র প্রশ্নোত্তরের সংকলন। আবদুল্লহ্ ইবনে সলিমের সহস্র প্রশ্নের হজরত মুহম্মদ (দঃ)- প্রদত্ত উত্তর আরবীতে সংকলিত হয়। সম্ভবত তার হিন্দী বা উর্দু অনুবাদ-অবলম্বনে জান মোহাম্মদ তাঁর রচনা সংকলন করেন।[৮৯] তাঁর অবলম্বিত রচনায় পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ থাকা অসম্ভব নয়।

সাহানামা র মতো আর একটি সুবৃহৎ জনপ্রিয় কাব্য হচ্ছে মফিজউদ্দীন আহমদের *কেচ্ছা আলেফ লায়লা*। ঢাকা জেলার ষোলই গড়পাড়া অঞ্চলেব অধিবাসী ইউসুফ ছিলেন কবির পিতা। বড় আকারের ন'শ পৃষ্ঠার এই বইটির অনেকগুলো সংস্করণ হওয়া কম বিস্ময়কর কর্তা নয়। বিশ্ববিশ্রুত *আলফ লায়লা-ওয়া-লায়লা* অর্থাৎ সহস্র রজনী ও এক রজনী — যা *আরব্যোপন্যাস* নামে পরিচিত, এটি তারই অনুবাদ। কাহিনীটি সর্বজনপরিচিত। স্ত্রীর ব্যভিচার দেখে শাহ্জামানের মনে হল :

গোলামেরে লইয়া বিবি করিতেছে মজা।
সরাব কাবাব খায় আর কত গেজা।।
আর কেন আপনাকে করহ নোকছান।
জাহানে আওরত যত সকলে সমান।।

ভ্রাতা শাহ্রিয়ারের প্রাসাদেও তার একই অভিজ্ঞতা ঘটল। দৈত্যের হাতে বন্দিনী সুন্দরীকে

যত হেফাজত করে সতি বানাইতে।
তত সেই ডোবে আর বদ খেয়ালেতে।।

তারপর শাহ্রিয়ার প্রতি রাত্রেই একটি করে যুবতীকে বিবাহ করে প্রাতে তার শিরশ্ছেদ করতে থাকলেন। তখন তাঁর উজীরকন্যা শাহেরজাদী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাদশাহকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তার ফলে বাদশাহ্ এই অন্যায় আচরণ বন্ধ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উজীর তাঁর মেয়েকে যে-সব গল্প করেন, যেমন, গাধা ও গরু এবং রাখালের কেচ্ছা, তাতে লৌকিক প্রভাবের নিদর্শন আছে। এর মধ্যে কোন কোন গল্পের সারকথা আবার এই যে, স্ত্রীকে বাধ্য রাখার জন্য লাঠিই মহৌষধ। নারীর প্রতি সীমাহীন অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ এই কাব্যে খুঁব স্পষ্ট করেই প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সমাজে এই ধরনের মানসিকতার তাৎপর্য খুব সহজেই বোঝা যায়। সান্ত্বনার কথা এই যে, কাব্যের শেষে শাহ্রিয়ারের এ বিদ্বেষমূলক মনোভাব অপসৃত হয়েছে :

আওরতের পরে দেল আছিল বেজার।
করিল উজিরজাদী সে দেল গোলজার।।

এরকম সুবৃহৎ কাব্যে আগাগোড়া কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শব্দালংকার ও অর্থালঙ্কার ব্যবহার করে সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টা কোথাও কোথাও সার্থক হয়েছে।

সূফী প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন আছে জোনাব আলী-অনূদিত 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'য়। শেখ নূরউদ্দিন হানিফিয়া-রচিত মূল ফারসী গ্রন্থের মোল্লা হোসেন আলী কৃত উর্দু অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এটি। মোট তেতাল্লিশ জন সূফী সাধকের জীবন ও কর্মধারার পরিচয় এতে

আছে ঃ এঁদের মধ্যে জাফর সাদেক, রাবিয়া বসরী, ফাজিল আয়াজ, ইবরাহীম ইবনে আদ্‌হাম, বশর হাফী, বায়জিদ বস্তামী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহ্‌মদ হামবল, জুনায়েদ বাগ্‌দাদী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছোট কবিতায় জোনাব আলী বাউলদের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন :

আজকাল দাগাবাজ ফকিরেরা ঢের।
ঠাঁই ঠাঁই যথা তথা হতেছে জাহের।।
শরিয়তের বরখেলাফ করিয়া বেড়ায়।
মারফতী ফকির আমি বলি সে-সবায়।।
মারফৎ পাইবে কিসে শরিয়ৎ ছাড়িলে।
কেতাব কোরানে যাহা না আছে দলিলে।।
ওয়াকিফ হইয়া হাল আওলিয়া লোকের।
লাঠি মার মাথে দাগাবাজ ফকিরের।।

জোনাব আলীর 'শহীদে কারবালা' (১৮৮২) মুহররমের ঘটনা নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্য।

একই বিষয় নিয়ে রচিত সাদ আলী ও আবদুল ওয়াহাবের 'সহিদে কারবালা' খুব জনপ্রিয় কাব্য। মনে হয় সাদ আলী এর রচনা আরম্ভ করেন, পরে আবদুল ওয়াহাব তা সমাপ্ত করেন। সাদ আলীর রচিত প্রথম অংশের পুনরুক্তি পাই ওয়াহাবের ভণিতায়। প্রচলিত কারবালা-কাহিনীর ঢঙে এই বইটিতেও এই উপাখ্যানের সূচনা দেখানো হয়েছে হজরত ইব্‌রাহীমের কুররবানীর ঘটনায়। প্রথম পর্বে ভূমিকাস্বরূপ অনেক প্রাসঙ্গিক কেচ্ছা-কাহিনী বলা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, গীতবাদ্যের চর্চাকে কবি 'গোনাহ্‌' বলে মনে করেছেন। হোসেনের বহুবিবাহ সমর্থনে যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তাও সে যুগের বিশ্বাস ও আচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক :

বিবি যে হইবে তাঁর যাইবে জান্নাতে।।
এ জন্যে বহুত বিবি নেকা তিনি করে।।
নব্বই বিবিকে নেকা করেন এমাম।

দ্বিতীয় পুর্বে মূল উপাখ্যানের সূত্রপাত। তৃতীয় পর্বে হোসেনের কারবালার উপস্থিতি এবং মৃত্যুবরণ। চতুর্থ পর্বে মুহম্মদ হানিফার আগমন এবং যুদ্ধজয়ের পরে "গেলেন হানিফা সাহা জেন্দা বেহেস্তেতে"। পরীস্থান থেকে আগত "পরীর ছরদার" হোসেন পক্ষে যুদ্ধ করতে এলে হোসেন নিষেধ করেন, হোসেনের খণ্ডিত মস্তকের কাছ থেকে আয়াত শুনে জনৈক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করেন, হোসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হজরত আদম ও অন্যান্য নবীর সমাবেশ ঘটে — এসব কথা বেশ বর্ণবহুল করে কবি বলেছেন। কবিদের রচনাশক্তি ছিল, কিন্তু কল্পনায় একঘেঁয়েমী ও চিন্তার সংকীর্ণতা কাব্যকে বৈচিত্র্যহীন করেছে।

রেজাউল্লাহ্‌ আমিরুদ্দীন ও আশরাফ আলীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুবৃহৎ 'কাসাসুল আম্বিয়া'র (১৮৬২) সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়। এটিও সেযুগের জনপ্রিয় সৃষ্টি। হজরত আদম থেকে আরম্ভ করে হজরত আলী পর্যন্ত নবী ও খলীফাদের জীবনবৃত্তান্ত ও অধ্যাত্মসাধনার পরিচয় এতে আছে। খাজা খিজিরের মতো legendary চরিত্রের সবিস্তার

বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এত বড় বইয়ের সর্বত্র কবিত্বশক্তির পরিচয় আশা করা যায় না। কবির ভক্তি ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের পরিচয় বরঞ্চ বেশী আছে। কোন কোন সুপরিচিত উপাখ্যান, যেমন, ইউসুফ-জেলেখার বৃত্তান্ত, কেবল সূত্রাকরে বিবৃত করা হয়েছে, বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয় নি : এটা কবির কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয়ও বটে।

শাস্ত্র-বিষয়ক কাব্যরচনা বৃদ্ধি পেয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে। কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর বলে এগুলোর স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হল না।[৯০]

সাত

বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যধারার সূচনা হয়েছিল। নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানী-শাসনের অভ্যুদয়ের কাল হচ্ছে এর পটভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীতেও এই ধারায় কাব্য রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা গতানুগতিক অনুসরণ ছাড়া কোন নূতনত্ব সম্পাদন করতে পারে নি।

সেই সর্বব্যাপী ভাঙনের যুগে আগেকার সাংস্কৃতিক ভিত্তিটাই ধ্বসে গিয়েছিল। নবাবী আমলে যে রুচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল, ভারচন্দ্রের কাব্যে তার ছাপ আছে। তবু, জীবনের স্পর্শ তার কাব্যে যেখানে লেগেছে, সেখানে শিল্পচাতুর্য না থাকলেও সোনা ফলেছে : যেমন, ঈশ্বরী পাটুনীর প্রার্থনায়, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"। কোম্পানী-আমলে জীবনে নিশ্চয়তাবোধের অভাবে মানুষ যখন পীড়িত, তখন সে বিকার আরো ব্যাপক হয়ে উঠল, রামপ্রসাদের মতো ভক্ত কবির রচনায়ও তার পরিচয় আছে। রামপ্রাসাদ ও কমলাকান্তের ভক্তি-সংগীতে জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই : তাঁদের কৃতিত্ব এই যে, সহজ জীবনধারা থেকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করে ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা লেখবার একটা সহজ পন্থ তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে সেকালের রুচিবোধের কবিতা লেখবার যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় আরো জনপ্রিয় কবিগান, আখড়াই, হাপ-আখড়াই, কবির লড়াই, খেউড়, তরজা প্রভৃতির মধ্যে। এ-সবের উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন :

> The political troubles of the 18th century and the social changes consequent thereupon naturally precluded any serene exercise of serious literature except perhaps in remote villages or in the comparatively secure and luxurious courts of noble patrons; . The time was not for thought : it wanted song and amusement; the Kabiwalas who could give them had soon become popular. ... The new public had neither the leisure, the capacity nor the willingness to study or appreciate any reproduction of the finer shades and graces of earlier poetry... This debasement was complete in the next generation when with the spread of western education and consequent revolution in taste, these songs had been banished totally from respectable sociey and descended to the lower classes who demanded a literature suited to their uneducated taste. This was the beginning of Kheud (খেউড়) and Hap-akhdai (হাফ-আখড়াই) in Kabiliterature. ... Not only in taste, but also

in theme, style and diction, Kabi-songs degenerated.[৩১]

দুঃখদৈন্যদুর্গতি সত্ত্বেও লোকসাধারণের রসপিপাসা তাই নির্মূল হয়ে যায় নি। সেই পিপাসানিবৃত্তির প্রয়াসেই মিশ্র ভাষারীতির কাব্যসৃষ্টি। যাঁদের জন্যে এইসব কাব্য রচিত হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন স্থূলরুচির রসিক। তাঁদের রসপিপাসার পরিতৃপ্তি ছাড়াও অন্য একটি মনোভাব এই কাব্যসৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতে যে মনোভাব থেকে জন্মলাভ করেছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য, সেই মনোভাবের সঙ্গে তার তুলনা চলে। অর্থাৎ নিজধর্মের শক্তির কাছে বহিঃশক্তির তুচ্ছতা প্রদর্শন তার উদ্দেশ্য। অবশ্য নিজধর্ম বলতে বাহ্যতঃ ইসলাম বোঝালেও, প্রকৃতপক্ষে কবির বিশ্বাসের ইসলাম বোঝায় — ইসলামের সত্যকার আদর্শ ও শিক্ষার সঙ্গে এই বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। আসলে মুসলিম শাসনকালে যাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরা আগেরকার ধর্মবিশ্বাস বা মত ত্যাগ করলেও সংস্কার বা মন বদলাতে পারেন নি। ফলে বাংলায় এসে ইসলামের একটি রূপান্তর ঘটেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। মুসলিম-মানস হিন্দু দেবদেবীদের আত্মসাৎ করে নেয়; মুসলমান পীর-ফকীরেরা নানা কেরামতি দেখিয়ে লোক-মানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; এভাবে মঙ্গলকাব্যের ছোটখাটো দেবদেবীর আসনে মুসলিম-মানস-সৃষ্ট চরিত্রগুলো স্থানলাভ করে। আবার, তুলনামূলকভাবে নিজ বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বীরচরিত্রও গড়ে ওঠে — যেমন হামজা, আলী ও হানিফা। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এদের প্রশস্তি আছে। অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস, তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের আগ্রহ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্যের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যধারার ঐক্য আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর তুলনায় মানুষের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার যে স্বীকৃতি আছে এবং বাঙালী সংসারের হাসি-অশ্রু-মিশ্রিত যে রূপটি সেখানে ধরা পড়েছে, সেই মানবস্বীকৃতি ও সমাজচিত্র এতে নেই। এখানেই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মিশ্র ভাষারীতির মৌলিক পার্থক্য এবং এখানেই প্রথমটির তুলনায় পরবর্তী কাব্যধারার দৈন্য।

এর অবশ্য কারণ ছিল। সেই দুঃখদুর্দশার দিনে মানুষের জীবনে কিছুটা আত্মবিশ্বাসহীনতা ও বাস্তববিমুখতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটলেই মানুষ শক্তিমানের কল্পনা করে নিজের সহায় হিসেবে। তাই কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবের তুচ্ছতা ঢাকার প্রচেষ্টায় কবির রচনায় সমকালীন সমাজ অবহেলিত হয়েছে।

কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্যই বা একে বলি কি করে! এই কল্পনার পেছনে তো সুপ্ত ও শিক্ষিত মনের অনুভূতি নেই — আছে অন্ধ সংস্কার আর ভ্রান্ত বিশ্বাস। তাই কবি যখন মনে করেছেন যে, তিনি ধর্মের মাহাত্ম্যগান করছেন, তখন তাঁর রচনায় ইসলামের শিক্ষা, নীতি ও ইতিহাস হয়েছে চরমভাবে বিকৃত। পাঠকের সামনে আদর্শ জীবনকে তুলে ধরতে চেয়ে তিনি যে জীবনধারাকে আশ্রয় করেছেন, তা 'মরীচিকার মতো মিথ্যা ও বুদ্বুদের মতো শূন্য'।

অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই কারণে পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকার সঙ্গেও এর মিল হয় নি। লোকগীতিকার উপজীব্য সাধারণ সহজ জীবনপ্রবাহের এক একটি তরঙ্গ — কবির স্বভাব-কবিত্ব, মানবমনের অনাড়ম্বর প্রকাশ তার বৈশিষ্ট্য। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে অলৌকিক শক্তিসমর্থিত ও অস্বাভাবিক জীবনধারার

বীরোচিত বিকাশ — তার কবিত্ব আভরণময়, রীতিনীতি নির্দেশিত। অনেকক্ষেত্রে কবি সে রীতি অনুসরণ করেন নি — কিন্তু তাও কৃত্রিমতার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নয় অথবা জীবনের সরল সৌন্দর্যের সন্ধান লাভ করে নয় — শক্তির দৈন্যই তার কারণ। তাই মিশ্র ভাষারীতির কাব্য মঙ্গলকাব্য ও লোকগীতিকার মতো সর্বজনীন হতে পারে নি — ভাবে সম্পূর্ণত ইসলামসম্মত না হয়েও অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে তার আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

বাস্তব পরিপার্শ্বের ছায়াপাত যে এই ধরনের কাব্যে ঘটেছে, তা আমরা জানি, সে প্রতিচ্ছায়া একদিকে দেখতে পাই নারী সম্বন্ধে অবিশ্বাস এবং পুরুষের তুলনায় তার আপেক্ষিক হীনতা ও সামাজিক ন্যূন অবস্থার প্রচার। এই ধরনের মনোভাব যেমন মধ্যযুগীয় পরিবেশের অনিবার্য ফল, তেমনি তার মূলে সেই রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের দিনে সংসারের সর্বাঙ্গীণ বিশৃঙ্খলা ও মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের অভাবও নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, এখানে আমরা স্বাধীন প্রণয় সম্পর্কে সমাজের আপত্তি দেখতে পাই। কবি শেষ পর্যন্ত সামাজিক বাধার বিরুদ্ধে স্বাধীন প্রণয়কে জয়যুক্ত করেছেন, এটা আনন্দের কথা। কিন্তু এই দুঃখবোধ সেই সঙ্গে না জেগে পারে না যে, প্রেম খুব একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক রূপ নিয়ে, গভীর আবেগ ও একনিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। ফলে — মধ্যযুগের পক্ষে যা স্বাভাবিক — প্রেম এখানে ইন্দ্রিয়বিলাসের নামান্তররূপেই দেখা দিয়েছে।

তৃতীয়ত, নানারকম সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় এসবের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই বাহ্যত যা শাস্ত্র-কথা, প্রকৃতপক্ষে তাও কাল্পনিক সংস্কার ও আচারের সমষ্টি — ধর্মবোধের মূল প্রেরণার সঙ্গে তার যোগ নেই। ধর্মকেও কবিরা গ্রহণ করেছেন আক্ষরিকভাবে — তার মূল অভিপ্রায়কে বোঝার কোন চেষ্টা করেন নি। তাই সব জোরটুকু আচার-অনুষ্ঠানের উপরেই পড়েছে, মূল শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি নয়। এই কারণেই কবির বৃহত্তর মানবীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জয়যুক্ত হয়েছে, এটি আক্ষেপের কথা।

তর্ক তোলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক রচনার কি অভাব ছিল? ছিল না হয়তো। কিন্তু তার মধ্যে যা কিছু মহৎ রচনা বলে স্বীকৃত, তা বৃহত্তর মানবরসে (human interest) সিঞ্চিত — যার ফলে সাধারণ মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন সেখানে ধ্বনিত না হয়ে পারে নি। আলোচ্য কাব্যসমূহে তার অভাবই বড় করে চোখে পড়ে। তাই এর আবেদন খুব ব্যাপক হতে পারে না।

আরেকটি কারণেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য মহৎ সাহিত্য বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। চিন্তার মতো রচনাভঙ্গীর দৈন্যও এই ধারার কাব্যে সুস্পষ্ট। এর প্রধান কারণ কবিদের শিক্ষার অভাব — আর সেই সঙ্গে কাব্যধারার গতানুগতিকতাও।

আট

এক কথায়, মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকে আমরা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিধারার নিদর্শন বলে গণ্য করতে পারি—সমাজজীবনের ক্ষয়ের চিহ্ন এতে স্পষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর আদিতে ভারতীয় সভ্যতার যে সঙ্কট দেখা গিয়েছিল, ডক্টর হারমান গোয়েৎজ

তার লক্ষণ নির্ণয় করেছেন।[৯২] এই আলোকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, মিশ্র ভাষারীতির কাব্য শুধু গতানুগতিক ও জৌলুসহীন নয়, ক্ষয়িষ্ণুতার আরো চিহ্ন এতে স্পষ্ট। যেমন :

১। বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার চেষ্টা। ডক্টর গোয়েৎজ বলেছেন যে, হয় নেশার মধ্যে, অথবা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যে বর্তমান থেকে পালিয়ে থাকার আশ্রয় মেলে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে স্রষ্টার প্রতি সমর্পিত চিত্ততার পরিচয় পাই। এই কাব্যধারায় যে-জীবনের প্রশংসা আছে, সেখানে ঐহিক কামনার চেয়ে পারমার্থিত আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই হয়ে উঠে। তাই এতে যেমন দেখা যায় দরবেশদের কাহিনীর প্রাধান্য, তেমনি প্রণয়কাব্য ও যুদ্ধকাহিনীর নায়ককেও দেখি অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান।

২। নারীসৌন্দর্যের স্তুতি যেমন আছে, তেমনি নারীর প্রতি আত্যান্তিক শ্রদ্ধাবোধেরও অভাব প্রকাশমান। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

৩। আদর্শবাদের অভাব। এই ধারার কাব্য-লেখকের বিশেষ আদর্শবোধের কোন পরিচয় নেই। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যেসব প্রাসঙ্গিক মতামত এতে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে, তা আমরা দেখেছি।

৪। সমকালীন জীবনের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এই ধারার কাব্যে স্থান পায় নি, এটা লক্ষণীয়। বিস্মৃত অতীতের কাল্পনিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা এতে আছে, নেই বর্তমান সম্পর্কে সজ্ঞান প্রতিক্রিয়া।

অথচ সেযুগের বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যে নেই, তা নয়। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* (১৭৫২)[৯৩] এবং গঙ্গারামের *মাহারাষ্টা পুরাণে* (১৭৫১)[৯৪] বর্গী হাঙ্গামার তথ্যপূর্ণ বিবৃতি আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত ছড়ায়ও এই হাঙ্গামার স্মৃতি আজো অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আলীবর্দী-সরফরাজ খাঁর দ্বন্দ্ব এবং পলাশীর যুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে অনেক ছড়া রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি অংশ উদ্ধৃত করি। প্রথমটি পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে :

কি হলো রে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়।।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীর জাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোরা খাটায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি।।[৯৫]

তারপর নন্দকুমারের ফাঁসি সম্পর্কে:

আজগবী এক আইন হয়েছে
কৌনচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাধিয়েছে।
হায় রে হায়, এ কি হলো, বামুনের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।।

এখানে যেমন নবাব ও নন্দকুমারের প্রতি ছড়াকারের সহানুভূতি ও সমর্থন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি রামপ্রসাদ মৈত্রের রচনায় ইংরেজ-শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদরূপে দেখার চেষ্টা আছে :

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী।
ছাড়িয়া আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্তি মোজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপি।।
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরাণা-কুঠী আদি।
গতামল সুবেদারী শুভ সন বাহাত্তরি
আংরেজ আমল তদবধি।।[৯৬]

কোম্পানী-আমলের সূচনায় দেবী সিংহের অত্যাচার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পথ প্রশস্ত করেছিল। এ বিষয় নিয়ে লেখেন রতিরাম দাস। তিনি বলেছেন :

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবী সিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার টিং।।
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল।
শিয়রে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।
মানীর সম্মান নাই, মানী জমিদার।
ছোট বড় নাহি সবে করে হাহাকার।। ...
শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।। ...
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে।।...
দেবী সিংহ পলাইল দিয়া গাও-ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ, কেউ বলে ঢাকা।।[৯৭]

সাধারণত: দেশের দুর্ভাগ্য বাংলা কাব্যে প্রজার পাপের ফলরূপেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেখি, রাজার পাপ সম্পর্কে স্পষ্টভাষণে কবির কুণ্ঠা নেই, তাছাড়া জনশক্তির উত্থানে ও অত্যাচারী শাসকের পরাজয়ে কবি প্রীত হয়েছেন।

ফকীর-বিদ্রোহ সম্পর্কে পঞ্চানন দাসের লেখা একটি কবিতা পাওয়া গেছে। প্রজা-বিদ্রোহে রতিরাম যেমন উল্লসিত, ফকীর-বিদ্রোহে পঞ্চানন তেমনি শঙ্কিত।

শুন সবে এক ভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বারনা।। ...
যেদিন যেখানে যারা করেন আখডা।
একেবারে শতাধিত বন্দুকের দেহড়া।।

সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া।। ...
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
গাছুরী বেপারী পালায় গাছে ছাড়্যা গুড়।।
নারী লোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথরে দেয় নড়।। ...
ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়।
লুটুরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়।।
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতী কাকুতি করি কি বলে বচন।। ...
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক।।[৯৮]

সমসাময়িক কালের প্রতি এই সজাগ মনোভাব কেন যে মুসলমান লেখকদের রচনায় ছায়া ফেলে নি, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। মিশ্র ভাষারীতির যে কাব্যে আমরা সমসাময়িক বৃত্তান্ত পাই, তা হচ্ছে জোনাব আলীর *শহীদে কারবালা* (১৮৮২)। প্রসঙ্গক্রমে সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সংস্কার-আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন তিনি :

আগে জমানার বীছে নবাবী আমলে।
ইংরাজের আমল না ছিল যেই কালে।।
সেইকালে বাজে লোক বাঙ্গালা দেশের।
ইসলামী তরিকা না ছিল তাহাদের।।
জানিত না দ্বীন আর ইসলামী ঈমান।
মুখে খালি ফলাইত সুন্নী মুসলমান।।
হিন্দুদের দেখে শুনে করিত সে কাম।
শেরেক বেদাতে ছিল ভরিয়া তামাম।।
হেনকালে আল্লা-পাক দয়াল খোদায়।
মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া দিল বাঙ্গালায়।।
সৈয়দ আহম্মদ শাহে মোজাদ্দেদ করি।
মিটাইল বাঙ্গালার শেরেক কুফরি।।[৯৯]

আপাদৃষ্টিতে কবিকে মনে হয় সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর মতানুগামী, কিন্তু *শহীদে কারবালায়* ইমামদের মৃত্যুতে তিনি যেভাবে শোক প্রকাশ করেছেন এবং *তাজকেরাতুল আওলিয়ায়* যেভাবে সূফী সাধকদের মহিমাকীর্তন করেছেন, তা সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর মতামতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় না। এর পূর্বে জনৈক আহমদ আলী তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা-সংবলিত পুস্তিকা মুহম্মদ ইসমাইল-সংকলিত *তকবিআত-উল-ইমানে'র* অনুবাদ করেন। মিশ্র ভাষারীতিতে লিখিত এই ছন্দেবদ্ধ অনুবাদটি *তকবিএতেল ইমান* নামে কলকাতা থেকে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১০০]

১৯০৯ খৃস্টাব্দে বটতলার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত *বাকিয়াত ছালেহাত* নামক

গদ্যগ্রন্থেও বেরিলভীর সংস্কার-আন্দোলন সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি পাই।[১০১]

তিতুমীরের সংগ্রামের বিবরণ *সমাচার দর্পণে* প্রকাশিত হয়েছিল। অংশটি কৌতূহলোদ্দীপক :

নবেম্বর, ১১। তিতুমীর নামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহী কর্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবী নামে খ্যাত হয় এবং তাহাদের অভিপ্রায় যে কেবল লুটপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত রণজিত সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়।

নবেম্বর, ২৭। বারাকপুর হইতে এক রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদম হইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহাদের প্রাতিকূল্য প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাঁহার অনুচর ৮০/৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।[১০২]

এ সম্পর্কে অজ্ঞাতনামা লেখক *নারকেলবাড়িয়ার জঙ্গ* নামে একটি কাব্য রচনা করেন, কিন্তু বইটি উদ্ধার করা যায় নি। তবে ছড়ার আকারে তিতুর সংগ্রামের কথা প্রচলিত হয়েছিল, তাতে অবশ্য তাঁর প্রশংসা নেই :

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তীতুমীর।
শরা-শরিয়ত তিনি করিলেন জাহির।।
পীর-পয়গম্বর কুতুব ওলি কিছুই তিনি মানিতেন না।
এবার সারলে ইংরেজ মামু, জানে রাখলে না।।[১০৩]

ছড়াকার মুসলমান ছিলেন, এমন অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। শরীয়তউল্লাহ্‌র ফারায়েজী আন্দোলন সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য পাই ছড়ারূপে, তার রচয়িতাও মুসলমান :

ও ভাই, আল্লা বল রে, রসুলের ভাবনা।
ফারাযীদের নামাজ পড়া হল এবার মানা।।[১০৪]

শরীয়তউল্লাহ্‌র আন্দোলন সম্পর্কে কিছু প্রতিক্রিয়া নমুনা পাই *সমাচার দর্পণে*। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দের ২২-এ এপ্রিলে প্রকাশিত 'জিলা ঢাকানিবাসি দুঃখি তাপিতগণস্য' স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে :

... সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর নামক এক জবন বাদশাহী লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ গোবরডাঙ্গা নিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর ২ হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংসকরণে প্রবৃত্ত হইলে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ সমেত নারিকেলবাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগ্য পুলিম নাজিরকে বধ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট মতে কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমীর জবন এককালীন নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক জবন বাদশাহি নওনচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সারা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটি দেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া

তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও হইয়া দেব দেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্ত:পাতি মলকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটিতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দত্তরায় অর্পিত হইয়াছে। ... আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্ত:পাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটিতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বন্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহিবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষীর ক্রটি কি আছ। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দলভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কিনা শ্রুত হই নাই ... । আমি বোধ করি সরিতুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমীর করিয়াছিল না। অতএব আমরা শ্রীল শ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দু ধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দলভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন।[১০৪]

ফারায়েজী আন্দোলন সংক্রান্ত দুটি ছন্দোবদ্ধ রচনা পাওয়া গেছে — দুটিই বিংশ শতাব্দীতে লেখা। নাজিমউদ্দিন জুম্মা'র [১০৫] লক্ষ্য হচ্ছে জুমার নামাজ সম্পর্কে ফারায়েজী মতামত বিশ্লেষণ করা। কবির বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশ দার-উল-ইসলাম নয়, অতএব এখানে জুমায় নামাজ অসিদ্ধ। যাঁরা এ দেশকে দার-উল-ইসলাম বলতে চান, কবির মতে, তাঁরা লোককে ধোঁকা দিচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে ফারায়েজী নেতাদের সঙ্গে বিপরীত মতাবলম্বী আলেমদের তর্কযুদ্ধের বর্ণনা আছে।

উজীর আলী আহ্মদের *মোসলেম রত্নহার* [১০৬] তৃতীয় দশকের লেখা বলে মনে হয়। শরীয়তউল্লাহ্, দুদুমিয়া ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জীবনকাহিনী এতে বিবৃত হয়েছে। লেখকের মতে, মক্কায় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে শরীয়তউল্লাহ্ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর নীলকর ও ক্রমে সরকারের সঙ্গে তাঁর ও দুদুমিয়ার বিরোধ-ইতিহাসও পর্যালোচনা

করেছেন। সংস্কার-আন্দোলনে পিতাপুত্রের সাফল্যের কথা বর্ণনা করে কবি বলেন :

মাওলানা দুদুমিয়া পৃথিবী ত্যজিল।
এতকাল মুসলমান একমতে ছিল।।
বারশ পাঁচচল্লিশ সালে হিন্দুস্থানী।
মাওলানা ক্রামত আলী আসে বঙ্গে শুনি।।
তিনি আসি জুমা ঈদ আদেশিয়া ছিল।
ভবিষ্যতে দুএকজন সেদিকে ঝুঁকিল।।
এইমাত্র ক্রামতালীর রায় হইল নাম।
পূর্ব্বেতে দুদু মিয়ার রায় আছিল তামাম।।
অধম উজির বলে বঙ্গের এই নীতি।
মোসলেম বিছে দলাদলির এইমাত্র ভিত্তি।।

বলা বাহুল্য, মওলানা কেরামত আলী ও মওলানা হাফেজ আহমদ প্রমুখ আলেম সম্পর্কে লেখক সরাসরি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিমুখতা তো আছেই। পীর বাদশা মিয়া খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কবি উল্লাস প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর অনুসরণে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা করেছেন। কবির কাছে তাই গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মাওলানা মুহম্মদ আলী আর পীর বাদশা মিয়া — সকলেই ন্যায়যোদ্ধার প্রতীক।

তামাক খাওয়া সম্পর্কে ওয়াহাবী-ফারায়েজীদের বাধানিষেধকে তামাসা করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪) লেখা হয় ১৮৮৭তে। গ্রন্থের নাম *তামাকের কথা*, লেখক মোকাদ্দাস আলী।[১০৬]

মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরীর একটি জীবনী লিখিত হয়েছিল মিশ্র ভাষারীতির পদ্যে। আবদুর রহিমের *আখলাকে আহাম্মদীয়া* নোয়াখালী থেকে ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১০৭] ইসমাইল খানের *শেজরা শরীফ* (১৯২১) হাফেজ আহ্মদের জীবন ও নীতির পরিচয়মূলক গ্রন্থ।[১০৮] মিশ্র ভাষারীতিতে আরেক আবদুর রহিম লেখেন *ঢাকার নবাবের পুথি* (১৯০৬)। এতে ঢাকার নবাবের বংশাবলী ও প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ও গভর্নর-জেনারেলের প্রশংসা আছে।[১০৯]

পুরোনো আদর্শে লেখা গ্রন্থাদির মধ্যে ইংরেজ-শাসনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাই মুহম্মদ মুকীমের *গুলে বকাওলী* (অষ্টাদশ শতাব্দী) ও ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর *রূপজালাল* (১৮৭৬)-এ।[১১০] তবে এ দুটির কোনটাই মিশ্র ভাষারীতির রচনা নয়। *মোসলেম রত্নহার* বইটিও মিশ্র ভাষারীতির নয় : তবে বিষয়বস্তুর অনুরোধে প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ এতে প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্বীকার করতেই হবে যে, সমসাময়িক ঘটনার পরিচয় হিসেবে এ অভিজ্ঞান খুবই অসম্পূর্ণ। হয়তো কবিরা আরো কিছু কিছু বইপত্র লিখেছেন এ সম্পর্কে, যা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের প্রত্যক্ষ যোগ থাকা সত্ত্বেও, বাংলা সাহিত্যে এর তেমন ছাপ পড়ে নি; কিন্তু এ বিষয়ে বইপত্র লেখা হয়েছিল অনেক। বাংলাদেশে এই আন্দোলন হয়তো প্রচারলাভ করেছিল কিছুটা উর্দু পুস্তিকার সাহায্যে আর তার চাইতেও বেশী হয়েছিল বোধ হয় উর্দু-ফারসী

ভাষাভিজ্ঞদের বাংলা বক্তৃতা বা ওয়াজের মাধ্যমে।

সিপাহী বিদ্রোহের ছাপ যে বাঙালী মুসলমানের রচনায় তেমন পড়ে নি, এ খুব বিস্ময়ের কথা নয়। যেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও রাজনারায়ণ বসুর মতো উচ্চশিক্ষিত দেশহিতৈষীর কাছেও এই অভ্যুত্থান তেমন উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় নি, সেখানে অল্পশিক্ষিত মুসলমানের নীরবতা স্বাভাবিক।

তবু, সব মিলিয়ে মনে হয় যে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম এক শ' বছর বাঙালী মুসলমানের এক মানসিক অবসাদের যুগ — বিশেষ করে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই। তার জীবনবোধ ও সমকাল সম্পর্কে চেতনা কৃত্রিমতা, গতানুগতিকতা ও ইহজীবন-বিমুখতার বালুরাশিতে হারিয়ে গেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. ডক্টর সুশীলকুমার দে — যিনি ১৮০০ খৃস্টাব্দকে মধ্যযুগের বিলয় ও আধুনিক যুগের সূচনার কাল হিসাবে গণ্য করেন, তিনিও বলেছেন : 'The death of Bharatchandra in 1760 marks the decay of the older current in literature The interregnum till the emergence of the new literature was broken chiefly, if not wholly, by the Kabiwalas, some of whom were men of undoubted powers.' Sushil Kumar De, *A History of Bengali Literature in the Ninteenth Century,* 1800-1825 (Calcutta, 1919), 2
এখানে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ও নতুন সাহিত্যের আবির্ভাবকালের মধ্যে একটি যুগ-সন্ধিকালের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

২. ঐ, 301 : 'The existence of Kabi-songs be traced to the, beginging of the 18th century, or even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830.'

৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (অষ্টম-স; কলিকাতা, ১৩৫৬), ৩৫৬।

৪ De 385 n

৫. J Long *A Descriptive Cataloge of Bengali Works* (Calcutta 1855) দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থে গ্রথিত।

৬. J F Blumhardt *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum* (London. 1885)

৭. দীনেশচন্দ্র সেন, ৪৪-৫।

৮ Suniti Kumar Chatterji, *Origin and Development of Bengali Language* (Calcutta 1927), 1, 210

৯. সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সহিত্য* (বর্ধমান, ১৩৫৮)।

১০. উদ্ধৃত, De. 277.

১১. Long ৪৬০।

১২ কলিকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে এই বিশেষ ভাষারীতির কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে আলাওল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় কবিদের (যাঁরা প্রচলিত বাংলায় লিখতেন) কাব্য মুদ্রিত হত বলে, অনেকে পুথিসাহিত্য বলতে তাঁদের রচনাবলীও গণ্য করেন। এক্ষেত্রে পুথিসাহিত্য নামটি আরো বিভ্রান্তিকর। এরূপ বিভ্রান্তির পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়, তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন *বাঙ্গলা পুঁথি সাহিত্য* নামক পুস্তিকা (ঢাকা, ১৯৫৫)। এতে মিশ্র ভাষারীতির দশটি কাব্যের পরিচয়-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ খানের *মকতুল হোসেন,* সৈয়দ হামজার *মধুমালতী,* আলাওলের *পদ্মাবতী* ও জয়েনউদ্দীনের *রসুলবিজয়* কাব্যের আলোচনা সংকলিত হয়েছে। অথচ ভাষারীতির এবং রচনাকালের দিক দিয়ে উভয় ধারার স্বাতন্ত্র্যের প্রতি কোন ইঙ্গিত করা হয় নি।

১৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, ১৯৫৬), ২১-৩২।

১৪. Chatterji 1, 211

১৫. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য,* ১৮৬-৭।

১৬. সাহা গরীবুল্লা ও ছৈয়দ, হামজা, *আমির হামজা* (কলিকাতা, ১৯৩৬), দ্বিতীয় বালাম।

১৭. মফিজউদ্দীন আহাম্মদ, *কেচ্ছা আলেফ লায়লা* (তৃ-স; কলিকাতা ১৩২৯), ১।

১৮. ঐ, ৩।

১৯. ঐ, ৯।

২০. গরীবুল্লা হামজা, *আমির হামজা,* প্রথম বালাম।

২১. ঐ, দ্বিতীয় বালাম।

২২. সৈয়দ হামজা, *হাতেম তাই* (ঢাকা, ১০৫৫), ১৮৯।

২৩ গরীবুল্লা-হামজা, *আমির হামজা*, দ্বিতীয় বালাম।
২৪. মোহাম্মদ দানেশ, *চাহার দরবেশ* (কলিকাতা, ১৯৪৭)।
২৫. মফিজউদ্দিন আহাম্মদ, ৭।
২৬. (গরীবুল্লাহ্) ফকির মোহাম্মদ, *সোনাভান* (ঢাকা, ১৯৪১)।
২৭ মোহাম্মদ দানেশ, পূর্বোক্ত।
২৮ জয়নাল আবেদীন, *আবু সামা* (ঢাকা, তা. বি.)।
২৯. মফিজউদ্দীন আহাম্মদ, ৭।
৩০ (গরীবুল্লাহ) মোহাম্মদ এয়াকুব, *মোক্তার হোছেন— জঙ্গনামা* (ঢাকা,১৯৪১), ১১৪।
৩১. ছৈয়দা হামজা, *কেচ্ছা মধুমালতী* (কলিকাতা, ১৩০১)।
৩২ (গরীবুল্লাহ) ফকির মোহাম্মদ, *ইউছফ জেলেখা* (কলিকাতা, ১৩৫৫)।
৩৩ (গরীবুল্লাহ) মোহাম্মদ এয়াকুব, *জঙ্গনামা*, ৯১।
৩৪. ঐ, ১৫।
৩৫ গরীবুল্লা, *দেলারাম* (কলিকাতা, ১৩৫৪), ৫।
৩৬ মোমিনউদ্দীন আহমদ, *তৃষ্ণাবতী বিবাগুরু* (কলিকাতা)।
৩৭. (গরীবুল্লাহ) মোহাম্মদ এয়াকুব, *জঙ্গনামা*, ৪৪।
৩৮ মফিজউদ্দীন আহাম্মদ, ৬।
৩৯ Chatterjee I 204
৪০ Sakar, 223-25
৪১ পূর্বে দ্রষ্টব্য। হিন্দু সমাজে যেসব পীর-ফকির সহজে স্থান করে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যপীর, পীর মছন্দলী (মোছরা পীর, (কালু) গাজী সাহেব, মোবারক গাজী, বনবিবি, জাফর খাঁ ও শাহ শফিউদ্দিন উল্লেখযোগ্য। প্রথম চারজনের প্রশস্তিমূলক কাব্য রচনা করেছেন যথাক্রমে ভারতচন্দ্র, সীতারাম দাস, কৃষ্ণরাম দাস ও অজ্ঞাত কবি। শেষোক্ত রচনাটি নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক *গাজী সাহেবের গান* নামে সংকলিত হয়েছে, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ত্রিংশ খন্ডে। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*।
৪৩. ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩; কবি কৃষ্ণরাম যে কেবল পীর গাজীর মুখেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নহে, তুরঙ্গ সহরের ঘাটোয়াল ও কোটালের মুখেও ঐ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।
৪৪. যেমন, 'কাঁহা জাতে হো খোনকার আঙ্গরাখা লাগায়ে গায়
শিরমে টোপি তেরা
হাতমে ছুরি তেরা
পাউষ দেকে পায়
হারাম কি উব
কাঁহা হাল্লাল করেগা
ইত বাবু রামাই গায়'।।
উদ্ধৃত সুকুমার সেন *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, (দ্বি-স; কলিকাতা, ১৯৪৮): ৪৯৯
৪৫. এ, ১ · ৮১০ দ্রষ্টব্য।
৪৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, ৩১০-৩১১, ৩৩৯-৪৭, ৪৪৪ দ্রষ্টব্য।
৪৭ রামপ্রসাদ সেন, *গ্রন্থাবলী* (তৃ-স: কলিকাতা, তা.বি.) ৩,৫,২৫,২৭-২৮,৩২,৪৪ দ্রষ্টব্য।
৪৮ গরীবুল্লা হামজা, *আমির হামজা*, দ্বিতীয় বালাম।
৪৯. বড় খাঁ গাজী নামে একটি ঐতিহাসিক চরিত্রে সন্ধান পাওয়া যায় — তিনি সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও পীর জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্র। পাড়ুয়ায় জাফর খাঁ গাজীর সমাধির পাশে বড় খাঁ এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রের সমাধি ব্লকম্যান দেখেছিলেন। (H Blochmann, 'Notes on some Arabic and Persian inscriptions in the Hugli District' JASB, 1870) দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহের অথবা

বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিবোজ শাহের (ঐ) আত্মীয় শাহ্ শফিউদ্দীন পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যে বাহিনী নিয়ে আসেন, জাফর খাঁ তার দলভুক্ত ছিলেন (H Blochmann, 'Notes on places of Historical interest in the District of Hugli', Proc ASB, 1870) এবং পরে হুগলীব বাজা ভূদেবের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে যেয়ে নিহত হন খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (D Money, 'An Account of the Temple of Triveni near Hughli', JASB, 1847) ; কথিত আছে যে, বড় খাঁ হুগলীব (?) বাজাকে পবাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন (L S S O'Malley and Monmohan Chakravarty, Hooghly 'Bengal District Gazetters', Calcutta, 1912-256)। গরীবুল্লাহব *জঙ্গনামা'য়* এয়াকুবের ভণিতায় জাফর (দপর) খাঁব প্রশস্তি আছে। তবে জাফর খাঁর পুত্র বড় খাঁ সঙ্গে লৌকিক বিশ্বাসের বড খাঁ গাজীব সম্পর্ক নির্ণয করা দুষ্কর। ডক্টর সুকুমাব সেন ইঙ্গিত কবেছেন যে, সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীই পববর্তী কালে বড় খাঁ গাজীতে পরিণত হয়েছেন (*ইসলামী বাংলা সাহিত্য*,১০৬)। সুফী খাঁ বা শাহ শফিউদ্দীন সম্পর্কে যে জনশ্রুতি আছে তাব উল্লেখ আমবা কবেছি। ব্লকম্যান তাঁর শেষোক্ত প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভারতীয় মুসলিম ধর্মসাধকদেব নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থসমূহে এঁব কোন উল্লেখ নেই। ইসমাইল গাজী সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, তিনি বসুলুল্লাহ্‌র বংশধব। আবব থেকে কতিপয সঙ্গীসাথী নিয়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীতে সুলতান বাববক শাহের দববারে আসেন। মান্দাবণেব বিদ্রোহী রাজাকে দমন কবার পর তিনি কামরূপ বাজাকে পরাজিত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রুদেব চক্রান্তে সুলতানেব আদেশে তাঁব শিবচ্ছেদ হয (১৪৭৪ খৃ·) এবং তাঁব মস্তক কাঁটাদুয়াবে (বংপুব) ও দেহ মাদাবনে (হুগলী) সমাধিস্থ হয়। (G H Damant, 'Notes on Shah Ismail Ghazi', *JASB*, 1874) কিন্তু এঁদেব সেঙ্গও লৌকিক বিশ্বাসেব বড খাঁ গাজীব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন কবা চলে না। শেখ ফয়জুল্লাহব *সত্যপীবের পুস্তকে* (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস*, ১ · ৮০৯ দ্র:) বড খাঁ গাজী, শাহ শফী ও ইসমাইল গাজীব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বেব উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় যে, দক্ষিণা রায়ের মতো তাঁব প্রতিদ্বন্দ্বী বড় খাঁ গাজীও সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র : তবে বড় খাঁ গাজীব নাম ও ইসমাইল গাজীর স্মৃতি তাঁকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সহাযতা কবে।

৫০. (গবীবুল্লাহ্) ফকির মোহাম্মদ, *ইউছফ জেলেখা* .
অধীন ফকিব কহে কেতাবেব বাত।
বড খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত।

৫১. (গবীবুল্লাহ) মোহাম্মদ এয়াকুব, *জঙ্গনামা* :
১ অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খান গাজী যাবে দিল মোলাকাত।
২ বাপ নাম সাহা দুন্দি আল্লার ফকিব।
ভাটিয়া সোলতান গাজী বড খান পীব।

৫২. আবদুল গফুর সিদ্দিকী *জঙ্গনামা*, সা-প-প', ১৩২৪।
৫৩ সুকুমাব সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস*, ১ · ৯১৬।
৫৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পুথিসাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্ শাহ', *মোহাম্মদী*, কার্তিক ১৩৬১.
৫৫. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৫৬), ২৯৪।
৫৬. ঢাকাব হামিদীয়া লাইব্রেরীব একটি সংস্করণে (২০ ১১ ৪১ ইং) রচনাকাল আছে ১১২৭ সাল, মাঘ মাস। এ তারিখ যথার্থ মনে করার কোন কাবণ নেই।
৫৭ আবদুল গফুব সিদ্দিকী, *মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*, *সা-প-প*। ২৩ : ১১২।
৫৮. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস*, ১ : ৯৩১।
৫৯ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ২৯৪।
৬০. শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত।
৬১. সিদ্দিকী, *মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, ২৩ : ১২০।
৬২. শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত।

৬৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ২৪।
৬৪. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ২২৪।
৬৫. Chatterjee, I 212
৬৬ শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত।
৬৭. J C K Peterson, *Burdwan*, 'Bengal District Gazetters' (Calcutta. 1919), 31
৬৮. Abdul Wali, 'A Bengali Book written in Persian Script' *JASB* N S, XXII (1925), 194
৬৯. Browne, Literary History of Persia, IV, 172-94
৭০. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *পুথি-পরিচিত* (ঢাকা, ১৯৫৮), ৩৮৬।
৭১. Browne, IV, 392
৭২. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), *স্কন্দপুরাণম*, (কলিকাতা, তা. বি) *অনুবাদকের বিজ্ঞাপন*।
৭৩. তসলিমউদ্দীন আহমদ, 'পীব, সত্যপীর, পীর ববহক, বড়পীর' *র-সা-প-প*, ১০ : ৪০।
৭৪ অম্বিকাচবণ ব্রহ্মচারী, 'সত্যপীরের পাঁচালী', *সা-প-প*,১৯ : ১২৯-৩৮।
৭৫. Browne, II, 142
৭৬. শেখ আবদুর বহমান, 'বঙ্গের আদি কবি সৈয়দা হামজ ও সাহিত্য-পরিষদ, *আল-এসলাম*, পৌষ মাস ১৩২৩।
৭৭. Charles Rieu, *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum* (London, 1881), II, 803, 698-99, 700
৭৮. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Rambabu Saksena, *History of Urdu Literature* (2nd edn, Allahabad, 1940) Ch XV
৭৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস*, ১ : ৮১০টী ও ৮১১।
৮০. পূর্বে পৃ ১২৬ দ্রষ্টব্য।
৮১. সুকুমাব সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস* ১ : ৯৩৪টী।
৮২. Long, 460।
৮৩. সুকুমাব সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, ১১৮।
৮৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস*, : ৯৩০।
৮৫. সুকুমাব সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, ৮।
৮৬. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৮৭. *BMC*, 1, 27.
৮৮. রচনা সমাপ্তিকাল ১২৬৩ বঙ্গাব্দ। সুকুমাব সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, ১৬১।
৮৯. *BMC* 1, 41
৯০ এই জাতীয় পুস্তকেব বিবরণ বৃটিশ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস ও ইম্পিরীয়াল লাইব্রেবী পুস্তকতালিকায় পাওয়া যাবে।
৯১ De, 307-9.
৯২ H Goetz, *The Crisis of Indian Civilisation in the Eighteenth and early Nineteenth Centuries* (Calcutta, 1928)
৯৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দান, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*; ১২-১৪।
৯৪. ব্যোমকেশ মুস্তফী, 'কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ', *সা-প-প*, ১৩ : ১৯৩-২৩৬।
৯৫. মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য, 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা', *সা-প-প* ১২ :৪২ ও ৪১।
৯৬. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ : ৪৯৬।
৯৭. যাদবেশ্বর তর্করত্ন, 'রঙ্গপুরের জাগের গান', *র-সা-প-প* ৩ : ১৭৮-১৮০।
৯৮. J M Ghosh, *Appendix*
৯৯ রেজাউল কবীম ও আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *কাব্য মালঞ্চ* (কলিকাতা, ১৯৪৫), ৩২।

১০০. *BMC*, I, 3.
১০১. আবদুল কাদির, 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ', *মাহে-নও*, ভাদ্র ১৩৬৫।
১০২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২ : ৩৭৯-৮০।
১০৩. কাদির, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
১০৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২ : ৩৭৮-৮০।
১০৫. আখ্যাপত্রহীন একটি কপি ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে।
১০৬. *BMC*, II,165
১০৭ ঐ II, 3
১০৮. ঐ III, 152
১০৯. ঐ II 3.
১১০. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের অনুবৃত্তি ও আধুনিকতার সূচনা

ক্রান্তিকালে উদ্ভূত নতুন সাহিত্যধারাব —মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের —পরিচয় পেলাম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। যাকে বলতে পারি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ধারা — বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যা বিচিত্র এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে বিদেশী শব্দের প্রয়োগ যাতে অপেক্ষাকৃত কম—তারও জের চলেছিল একালে। মধ্যযুগের এই অনুবৃত্তিকে আমরা দু ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি। প্রথমত, এক শ্রেণীর রচনা—যা আসলে মধ্যযুগেরই অন্তর্ভুক্ত— কেবল ইংরেজ-আমলে রচিত বলে তার উল্লেখ করা আমাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের পরও নানা কারণে অনেকে মধ্যযুগের আদর্শে কাব্যচর্চা করেছেন— যাঁদের বিস্তৃততর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর কাব্য রচয়িতারা মধ্যযুগীয় আদর্শকে বহন করেছেন অনেকটা অচেতনভাবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা রচনা-রীতিগত ভিন্নতর আদর্শের সন্ধান রাখতেন— তাই মধ্যযুগের ঐতিহ্য তাঁরা বহন করেছিলেন অনেকটা জ্ঞাতসারে।

দুই

প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে চট্টগ্রামের সৈয়দ নূরউদ্দীন ছিলেন অন্যতম। শাস্ত্র-কথা পর্যায়ের কতিপয় কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। ১১৯৭ বঙ্গাব্দে তাঁর *দাকায়েকুল হাকায়েক ও রুহনামা মউতনামা* লেখা হয়। ইমাম হাফিজউদ্দীন নফসী-রচিত আরবী *কনজুদ দাকায়িকে*'র অনুবাদ এই বইটিতে মৃত্যু-সম্পর্কিত নানারকম তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[১] এসব তথ্য সর্বদা কুরআন ও বিশ্বস্ত হাদীস থেকে গৃহীত নয়, বরঞ্চ কুরআন-হাদীসের ব্যাখাস্বরূপ সুফী সাধকেরা রূপক দিয়ে যেসব কথা বলেছেন, এর মধ্যে সেসবও সরল বিশ্বাসে সংকলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম গাজ্জালীর (মৃত্যু ১১১১ খৃঃ) একটি উক্তি[২] কুরআনের বাণী বলে অনুমিত হয়েছে :

হাদীসেতে রওায়েত করে এই মতে।
পীর না থাকিলে যাবে ইবলিসের সাথে।।
এই মতে লিখিয়াছে কোরাণ মাঝার।
যাহার নাহিক পীর ইবলিশ পীর তার।।

লৌকিক জীবনে স্বামীর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ প্রচার করেছেন কবি :

সব হৈতে পতি সেবা হয় বড় ধর্ম্ম।

আর এমনিতে সংসারের অনিত্যতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে খুব বেশী করে :

দিলে ২ সদাই ভাবহ নিরঞ্জন
অসার সংসার মাঝে না ভুলিও মোন ॥

হযরত মুসার প্রশ্নোত্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বলে অনুমিত জীবন ও জগৎ-সংক্রান্ত তত্ত্বকথার সংকলন আছে *মুসার সওয়ালে*। *কেয়ামতনামা বা রাহাতুল কুলুব* ও *হিতোপদেশ বা বুরহানুল আরেফীন* নামে আরো দুটি গ্রন্থ আছে।[৩] এ দুটিই অনুবাদ, কাব্যের নাম থেকে বিষয়বস্তুও অনুমান করা চলে।

কয়েকজন কবির রচিত প্রণয়-কাহিনীর উল্লেখ এখানে করতে হয়। সাকের মামুদ ১৭৮১-৮২তে *মধুমালা* রচনা করেছিলেন। একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা সৈয়দ হামজার *মধুমালতী* কাব্যের আলোচনা আগে করেছি। সাকের মামুদের কাব্যে সমসাময়িক কালে ফারসী ভাষা শিক্ষার পরিচয় আছে এবং বর্ধনকুঠি রাজপরিবার সম্পর্কিত অনেক তথ্য আছে।[৪] তাঁর ভাষা সরল ও ললিত।

সরুফের লেখা *দামিনীচরিত্রে*র উদ্ধার ও বিস্তৃত পরিচয়দান কৃতিত্ব ডক্টর সুকুমার সেনের প্রাপ্য।[৫] এর রচনাকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> সরুফের দামিনীচরিত্র অদ্যাবধি প্রাপ্ত বাঙ্গালা প্রণয়-গাথা কবিতার মধ্যে—সম্ভবত একটি ছাড়া—সবচেয়ে পুরনো। পুঁথির লিপিকাল না থাকিলেও তাহা মোটামুটি নির্ধারণ করা যায়। লিপিকর সেবকরাম মন্ডলের লেখা আর একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। সেটির লিপিকার ১২০৩ সাল। সুতরাং দামিনীচরিত্রেব পুঁথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক ধরিলে অন্যায় হইবে না। কবিতাটির রচনাকাল আরো আগে। সম্ভবত: অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।[৬]

দৈববশে দামিনীর সঙ্গে তার স্বামীর মিলন হয় নি। দীর্ঘকাল পরে বিদেশ-প্রত্যাগত বণিক স্বামী এল প্রণয়প্রার্থীর ছদ্মবেশে। এক বছর ধরে নানা ঋতুর দোহাই দিয়েও সে যখন দামিনীর মন টলাতে পারলনা, তখন আপন পরিচয় ব্যক্ত করল, তারপর যথারীতি মিলন ঘটল। দামিনী-চরিত্রে সরল ভাষায় হৃদয়াবেগের যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে। বরমাস্যাটি এর প্রধান আকর্ষণ।

চট্টগ্রামবাসী মুহম্মদ মুকীমের প্রথম কাব্য *গুলে বকাওলী*। এই কাব্যের প্রারম্ভে চট্টগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> উত্তরে পর্বতরাশি দক্ষিণে সাগর।
> স্বর্গপ্রায় স্থল নামে চাটিগা শহর।।
> ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গীর জাত।
> ইসমে ছুচান নিত্য পাদরী সাক্ষাৎ।
> চিরদিন ইংরেজ এথা মহীপাল।
> ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল।।[৭]

মীর কাসিমের কাছ থেকে ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রাম লাভ করেছিলেন বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সঙ্গে। জলদস্যুদের উপদ্রব থেকে সে শহরের লোকেরা সাময়িক রক্ষা পেয়েছিল কোম্পানী-আমলে-- উপরে সেই ঘটনার ইঙ্গিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর কোন কাব্যে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে বলে জানা নেই।

রোমান্টিক প্রণয়-কাব্য হিসেবে *গুলে বকাওলী* গুণহীন নয়। অপর কাব্য *ফায়দুল মুকতদী*তে (রচনা ১৭৭৩ খৃ:) কবির সামান্য আত্মপরিচয় আছে।[৮] মুসলমানদের নিত্যকর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশদান এই কাব্যের উদ্দেশ্য।

মুহম্মদ মিরণের *বাহার দানেশে*র (রচনা ১২৪৪; দ্বি-স ১২৫২) মূল এনায়েতউল্লাহ্‌র ফারসী কাব্য; এ বিষয় নিয়ে উর্দুতে ইসমাইল লেখেন *বাহার দানেশ* এবং হায়দার বখশ লেখেন *গুলজার-ই-দানিশ*। কাব্য-রচনার আদর্শ সম্পর্কে মনের ধরণা খুব স্পষ্টভাবে কবি প্রকাশ করেছেন।

কৃত্তিবাস কালিদাস ভারতচন্দ্র তায়।
কবিতার গুরু তারা পষ্ট আছে তায়।।
তারপর কত রচে কত মহাশয়।
দেখিলাম ঐ তিন তুল্য নাহি হয়।।

ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁর কাব্যে স্পষ্ট— রূপবর্ণনায়, অলংকার ব্যবহারে, কাহিনী-কথনেও। পৌরাণিক উল্লেখের প্রাচুর্য এই কাব্যে আছে। তোতার মুখে কোন অসামান্য রূপসীর পরিচয় পেয়ে এক বাদশাজাদা তাকে লাভ করবার জন্যে উন্মত্তবৎ হয়ে ওঠেন। তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্যে সভাসদেরা নারীর অসতীত্ব প্রতিপন্ন করে গল্প বলতে থাকলেন। সেই গল্পগুলি পাঠককে উপহার দিয়েছেন কবি এবং মাঝে মাঝে এঁদের সমর্থনে বলেছেন :

মুহম্মদ মিরণ বলে রমণী দেবতা ছলে
মনুষ্য ছলিতে কত দায়।
এবং নাবী জাতি ধ্যান জ্ঞান নাহি কভু ধীর।
স্থির নহে রহে যেন পদ্মপত্রে নীর।

এই পক্ষপাতমূলক মনোভাব সত্ত্বেও কাব্য উপভোগ্য হতে পেরেছে সুললিত ও সুমার্জিত ভাষা এবং সরল বাচনভঙ্গীর জন্যে।[৯]

অপেক্ষাকৃতত পরবর্তী কালের রচনা হলেও ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা গ্রামের অধিবাসী আবদুর রহিমের *গাজী কালু ও চম্পাবতী* আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লৌকিক প্রভাবে বাঙালী মুসলমানের ধর্মচেতনার যে নবরূপায়ণের কথা ইতোপূর্বে বলেছি, এই বাক্যটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কথাবস্তু সংক্ষেপে এই : বৈরাট নগরের রাজা সেকেন্দার শাহ্ বলিরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর কন্যা অজুপাকে লাভ করেন। অজুপা ইসলাম গ্রহণ করে যথারীতে রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত হন। তাঁর প্রথম জুলহাস শিকারে গিয়ে পাতালপুরীতে পৌছান এবং রাজ জঙ্গবাহাদুরের কন্যাকে বিবাহ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। রাণীর দ্বিতীয় পুত্রের নাম গাজী। এর সহচর কালুকে রাণী পেয়েছিলেন সমুদ্রে ভাসমান কাঠের সিন্দুকের মধ্যে। দুই ভাই স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ছিলেন, অকস্মাৎ গাজীর মনে হলো :

সকলি বিষের ভাণ্ড দেখিনু ভাবিয়া।
কেবা ফাঁদে পড়ে গিয়া জানিয়া শুনিয়া।।...
সংসারবাসীর মুন্ডে মারিয়াছি লাথি।
কণ্ঠ কাট তবু নাহি করিব রাজত্বি।

সেকান্দার শাহের কঠোর অত্যাচারকে ব্যর্থ করে[১০] গাজী অক্ষত থাকলেন এবং বিবাগী হয়ে দুই ভাই

ভ্রমিয়া অনেক দেশে বাংলাতে অবশেষে
বসিলেন সুন্দরবনেতে।

অতঃপর,

বনে যত বাঘ ছিল শিষ্য হইল কাছেতে গাজীর

কুমীররাও তাঁর সেবক হল এবং

গঙ্গা দুর্গা শিব জায়া তাহাকে করিত দয়া
মাসী তার গাজীর হইত।

পরীদের কৌশলে স্বল্পক্ষণের জন্যে গাজীর সঙ্গে ব্রাহ্মণনগরের রাজকণ্যা চম্পাবতীর সাক্ষাৎ এবং প্রণয় ঘটল। গাজীর পরিচয় পেয়ে চম্পাবতী ভাবলেন :

রাম রাম জাতি মোর গেল একেবারে।

কিন্তু যেই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটল, অমনি দুজনেই বিরহানলে দগ্ধ হতে থাকলেন। গাজীর অবস্থা দেখে কালু অসন্তুষ্ট হলেন :

কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির।
হিন্দু মুসলমানে সবে মেনে নেবে পীর।
কালু বলে সেহ হিন্দু তুমি ত যবন।
কেমনে তাহার সনে হইবে মিলন।
কালু বলে নারী দিয়া কিবা লভ্য হবে।
মায়ার জঞ্জাল আর গলাতে পড়িবে।।
কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হারাবে।
গাজী বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে ।।
কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার।
গাজী বলে যত মুর্ত্তি সকলি তাহার।।
চম্পাকে পাইবে কবে কালু শাহা বলে।
গাজী বলে দুই মন এক হৈয়া গেলে।।

তিন বছর তিন মাস অনুসন্ধানের পর চম্পাবতীর দেশে তাঁরা পৌছলেন। রাজা কন্যাদান করতে অস্বীকার করায় গাজী তাঁর বাঘ-সেনাদের নিয়ে এলেন। রাজার আত্মীয় বীর দক্ষিণা রায় গঙ্গার কাছে কুমির চাইতে গেলে গঙ্গা বললেন :

শুনহে দক্ষিণা রায় নাহি জান তুমি।
গাজী মোর ভগ্নিপুত্র তারে চিনি আমি।।
একই রক্তের মাংস নাহি হয় পর।
পুত্র হইতে দয়া অতি গাজী প্রতি মোর।।

শেষে রায়ের অনুনয়ে তিনি কুমীর এনে দিলেন। কুমীর-বাঘের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জয়ী গাজী রাজকন্যা লাভ করলেন। ফিরতি পথে জুলহাস ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলে একসঙ্গে ফিরে গেলেন পিত্রালয়ে।

মুসলমান পীর গাজীর সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা এই কাব্যের সবচাইতে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। চণ্ডী বলেন :

গাজী মোর ভগ্নীপুত্র তার আমি মাসী।
কার্ত্তিক গণেশ হইতে তারে ভালবাসি।।

আমরা বুঝতে পারি যে, কবি তাঁর নায়কের প্রতি কেবল মুসলিম জনসমষ্টির নয়, হিন্দু নরনারীরও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করতে চান। এ কারণেই এই ধরনের পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। এই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, চণ্ডী ও গঙ্গা প্রভৃতি দেবীও কবিমানসে যথার্থ বলে স্থান লাভ করেছেন।

গাজী কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি-তে আরেকটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যানের রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাহ্ শফীউদ্দীন নামক পীরের সঙ্গে পাণ্ডুয়ার রাজার যুদ্ধ হয়। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি পুষ্করিণী ছিল, মৃতদেহে যার পানি সিঞ্চন করলে তা পুনরায় জীবনধারণ করত। শফীউদ্দীন এই রহস্যের পরিচয় পেয়ে একটি গরু কোরবানী করে তার অংশবিশেষ ঐ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন। এতেই ঐ পুষ্করিণীর পানির মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং রাজার পরাজয় ঘটে।[১২] এখানে একই উপাখ্যান সংকলিত হয়েছে : কেবল পাণ্ডুয়ার রাজার পরিবর্তে ব্রাহ্মণনগরের রাজা মটুক রায়, পুষ্করিণীর পরিবর্তে মৃত্যুজীব কুয়া, শাহ্ শফীর পরিবর্তে গাজী এবং মানবসৈন্যের পরিবর্তে বাঘের দল — এই পার্থক্য। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার বাহুল্য আছে এই কাব্যে। তবে এক যুগের মুসলিম-মানসের পরিচয় বহন করে বলে এই কাব্যটির মূল্য আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়। রচনারীতি সাধারণ, তবে ভাষা সহজ, কোথাও কোথাও কবিত্বের স্পর্শ আছে; রুচিবিকৃতির সামান্য ছাপ সত্ত্বেও পাঠকের ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

তিন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (মৃত্যু ১৮৫৯ খৃ.) কবিতায় আধুনিক যুগের যে পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল— তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও তাঁর স্বাদেশিকতায় - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খৃ.) ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) সাধনায় তা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে এই আধুনিক কাব্যের সূত্রপাত হয় বলে গণ্য করা যায় । তবে এই কাব্যধারার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, নবীন কবিতার প্রধান স্রষ্টা মধুসূদনের উক্তি থেকে তার কারণ বোঝা যায় । তিনি লিখেছিলেন .

> Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking · and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.[১৩]

আধুনিক কবি বলে আমরা যাঁদেরকে চিহ্নিত করে থাকি, তাঁদের সবার মধ্যে সচেতনভাবে এই মনোভাব জাগ্রত ছিল কি না, এ নিয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে কিন্তু একথা স্বীকার করতে হয় যে, আধুনিক বাংলা কবিতার রসগ্রহণ করতে হলে 'কমবেশী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা'র সঙ্গে পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই যতদিন পর্যন্ত এই শিক্ষা ও ভাবধারা ব্যাপকতা লাভ করে নি, ততদিন আধুনিক কাব্যধারায় পূর্বসূচনা হওয়া সত্ত্বেও কবিগান, খেউড়, তরজা, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি ধারা দেশ থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি।

অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ এবং অমার্জিত রুচি হঠাৎ-নবাবদের পৃষ্টপোষকতায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিগান প্রচলিত ছিল.[১৪] তার আনুষঙ্গিক ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিধারার নিদর্শনগুলো অস্তিত্ব রক্ষা করে ছিল।

আধুনিক সাহিত্যের রসগ্রহণে ও সৃজনে যাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন. তাঁরা সকলেই ছিলেন আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু পরিবারের সন্তান। মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন যে বিলম্বিত হয়েছিল. তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।[১৫] ফলে, অভিজাত মহলে যেমন পুরানো কালের ফারসী-উর্দু চর্চার অনুবর্তন হয়েছিল, সাধারণ শ্রেনীব মুসলমান তেমনি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য রচনা ও পাঠ করে রসপিপাসা নিবৃত্ত করেছেন এবং কবিগান, জারিগান ও শারিগান প্রভৃতির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্ত কবিগান প্রভৃতি ক্রমশই বিকৃত হয়ে আসছিল। মিশ্র ভাষাবীতিব কাব্যও প্রতিভাবান কবির অভাবে ধীরে ধীরে অধোগতি লাভ করেছিল।

তাই আধুনিক ধারায় বাংলার কবিতা যখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, ঠিক সে সময়েই পুরোনো ধারায় তার চরম অবনতি ঘটেছিল। এই অবস্থায় বাংলা ভাষায় মুষ্টিমেয় মুসলমানদের মধ্যে মধ্যযুগের কাব্যদর্শ ফিরিয়ে আনবার একটি প্রচেষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। আধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাব শিক্ষা ও শক্তি এদের ছিল না। কবিগান প্রভৃতির রচয়িতাদের তুলনায় এঁদের রুচি সুস্থ ও উন্নত ছিল। মিশ্র ভাষারীতির গতানুগতিকতার মধ্যেও এঁরা নিজেদেরকে হারাতে চান নি। তাই হারানো ধারাকে—মধ্যযুগীয় কাব্যাদর্শকেই —এঁবা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

এই সময়েই বাঙালী মুসলমান লেককদের গদ্যরচরনার শুরু হয়। সেক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিলেন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা মধ্যযুগীয় আদর্শে কাব্যরচনা করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতদের রচিত পাঠ্যপুস্তকে এবং রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের মতো সচেতন শিল্পীর রচনায় বাংলা গদ্যেব পর্ণাঙ্গ রূপটি বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মুলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি বলে এই নবসৃষ্ট গদ্যকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁদের বিলম্ব হয়েছিল। এবারে আমরা কয়েকজন লেখকের উল্লেখ করব, যাঁরা কাব্যে মধ্যযুগের অনুবৃত্তি করেছিলেন আর যাঁরা গদ্য রচনার মাধ্যমে আধুনিকতার অনুসরণ করেছিলেন।

চার

এঁদের মধ্যে একজনের —খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর ('সামছুদ্দিন ছিদ্দিকী খোন্‌কার') পরিচয় আমরা জানতে পারি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র একটি প্রবন্ধ থেকে।[১৬] এঁর রচিত *ভাবলাভ* কাব্য (১৮৫৩) এবং গদ্যে লেখা *উচিত শ্রবণ। পারমার্থিক ভাব* (১৮৬০) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

শামসুদ্দীন সিদ্দিকী ছিলেন বর্ধমান জেলার সর্বমঙ্গলার অধিবাসী। তাঁর পিতা ও ভ্রাতা ছিলেন সুপরিচিত পীর, পিতার আদেশে কবি এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। কাব্যের বিষয়বস্তু অনেকখানি রূপকথাধর্মী; ভাষায় না হোক, ভাবে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যধারার প্রভাব

আছে। কাশ্মীরের রাজপুত্র সাইদ আহমদ ও মন্ত্রিতনয় নূর মুহম্মদ——। এই দুই আবাল্য সুহৃদের সঙ্গে জনৈক কুজের পরমাসুন্দরী স্ত্রী নূরজাহানের ত্রিভুজ প্রণয়কাহিনী এই কাব্যে বিবৃত হয়েছে। রাজপুত্র-নূরজাহানের প্রেম উপাখ্যানে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রভাব স্পষ্ট। পরী, পশুপক্ষী এবং যাদুকরীর ভূমিকা গৌণ নয়। ভারতচন্দ্রের কথার খেলাকে তিনি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, কোথাও কোথাও সফলও হয়েছেন। বৃহত্তর কোন সমাজচেতনা এ কাব্যে নেই : সমসাময়িক ঘটনা বলতে কেবল রাজপ্রশস্তিতে বর্ধমান-অধিপতি মহাতাবচন্দ্রের উল্লেখ। বন্দুক নিয়ে শিকারের বর্ণনা এবং *ল্যাম্প* শব্দের ব্যবহার কৌতূহলজনক :

ক্ষোভের আন্ধার মন জতো হয়ে ছিলো।
পিরিতেরি লম্প জেলে দীপ্তমান কৈলো।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং যাদুবিদ্যায় আস্থা এতে প্রকাশ পেয়েছে। পাত্র-পাত্রীর আচরিত রীতি-নীতিতে হিন্দু প্রভাবের পরিচয় আছে।

মর্ত্যের রাজপুত্র দেলারামের সঙ্গে আছে ইন্দ্রসভার নর্তকী সুরতজানের প্রণয় নিয়ে *সুরতজান* বলে আরেকটি কাব্যও তিনি লেখেন।

উচিৎ শ্রবণ। অর্থ্যাৎ পারমার্থিক ভাব (১৮৬০) বইটিতে ধর্ম ও নীতি-সংক্রান্ত উপদেশমালা সংকলিত হয়েছে। তাঁর গদ্যরচনার নিদর্শন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে:

> কখনো কখনো সকালে সঙ্কে অবকাশ মতে মনো আকিঞ্চন দ্বারায় মনোযোগ হইয়া অত্র পুস্তকের দুই এক গল্প যাহা পাঠ করিতে অল্প হয় দৃষ্ট করিলেই অতি অবশ্য কল্পতরু হইবার সম্ভাবনা রসনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই বাসনা পূর্ণ হয়, আর যাঁহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে নিরক্ষণ করিলেই অত্র পুস্তকের মধ্যে যেসকল বচন রচন হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে যতন করিলেই শারীরিক পত্তন ও পতনের মর্ম্ম ও নিরঞ্জন আরাধন ধর্ম্ম আর যেসকল উচিত কর্ম্ম তাহা সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে। [পৃ-দ-৪]

এই দীর্ঘায়িত ও অনুপ্রাসমন্ডিত বাক্যরীতি আমাদেরকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গণ্য-রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উচিত শ্রবণে গদ্যে-পদ্যে নানারকম নীতি-উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমাংশে ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য স্থান পেয়েছে। শেষাংশে সুফী অধ্যাত্মসাধনার কথা। *নাসুত, মলকুত জবরুত* ও *লাহুত* - সুফীসাধনার এই চার *মোকামে'র* পরিচয় দিয়ে বিশেষভাবে *লাহুতে'র* আলোচনা করেছেন। এখানে যে সাধনতত্ত্বের কথা তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে *যোগে'র* কিছু সাদৃশ্য আছে আর বাউলদের অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংস্রব দেখা যায়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী লেখক *উচিত শ্রবণে* কয়েকটি গান সংযোজন করেছেন, যা বাউল গানের সংঙ্গে তুলনীয়। যেমন, 'সাধু যদি হবি রে মন তত্ত্বকথা ভুলো নাকো'।

শামসুদ্দীন সিদ্দিকী হিন্দী ও ফারসী থেকে অনুবাদ করে দু একটি গান ও কবিতা তাঁর বইয়ে সন্নিবেশ করেছেন। স্বরচিত একটি গজল চমৎকার, সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি :

আমার প্রাণ প্রয়োসী সরদ শশী হাস্যবদনী।
দীর্ঘনাশি কুটিলকেশী মৃগ নয়নী॥

জিজ্ঞাসিল কে হে তুমি
কৈলাম অনুগত আমি
যাবে কোথা জিজ্ঞাসিল আবার কামিনী।।
বল্লেম তারে আদর করে,
যাব আমি তোমার ঘরে
বাঞ্ছা করি তোমার দ্বারে হৈতে দরওয়ানী।।
জিজ্ঞাসিল কি ধন পেলে
তাতে তুমি গেলে ভুলে
কে তোমায় দংসালে বল, কোথায় সাপিনী।।
বল্লেম তব বদন দেখে,
হারাইলাম আপন সুখে
দংসালে চাঁচর তোমার হয়ে নাগিনী।।
রবি শশী কিবা নিশি
কার মূল্য বলো বেশী
বল্লেম বেশী তোমার হাসি ঈষদহাসিনী।।

এখানে কবিত্বের যে সহজ স্ফূর্তি আছে, *ভাবলাভে* তা প্রকাশ পায়নি। গীতি কবিতার প্রতি কবির স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, কিন্তু পুরোনো আদর্শে কাহিনীকাব্য লিখতে গিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলে তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃত হত এবং আমরাও কিছু সার্থক গীতিকবিতা লাভ করতাম।

ভাবলাভ-শ্রেণীর আরেকটি কাব্য আবদর রহিম-রচিত *প্রেমলীলা*। কাব্যটির ভূমিকা গদ্যে লেখা : বাক্য সুদীর্ঘ, তবে বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার আছে। কবি ছিলেন হাওড়া জেলার অন্তর্গত সালখিয়া গ্রামের অধিবাসী এবং হানাফী মজহাবভুক্ত। ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত আরবী, ফারসী, ও বাংলা ভাষা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে। 'পুস্তক লিখিবার হেতু' প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং মিশ্র ভাষারীতির কাব্যসমূহের উল্লেখ করেছেন 'হেয় বাঙ্গালা' বলে, তবে গরীবুল্লাহ্‌র প্রশংসা তিনি করেছেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য তাঁর ভালই পড়া ছিল।

প্রেমলীলা সম্ভবত মীর হাসানের ফারসী *সিহার উল্ বয়ান* কাব্যের উর্দু রূপান্তরের স্বাধীন বঙ্গানুবাদ। মূলের সঙ্গে না মিলিয়ে অবশ্য অনুবাদের মৌলিকতার পরিমাপ করা কঠিন, তবু এই কাব্যে হিন্দু রীতিনীতির যে বিবরণ আছে ও সংস্কৃত সাহিত্যের যে উল্লেখ আছে তা আবদুর রহিমের নিজস্ব বলে মনে হয়। তাই রাজাকে জ্যোতিষী ও গণক ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিচ্ছেন- 'অতিথে করহ দান ব্রাহ্মণ পন্ডিতে'। রাজাকে বেনজিরের জন্ম সংবাদ জানাবার পর কৃঞ্চুকী ও দাসীদের আশীর্বাদবাণী অধিকতর লক্ষণীয় :

রাজ্য আর ধন তার হোক আজ্ঞাকারী।
সরস্বতী ত্যজে বিষ্ণু হোক তার নারী।।
কমলের বন ত্যজে আপে লক্ষ্মী সতী।
তার গৃহে নিরন্তর করে যেন স্থিতি।।

বেনজিরের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই আশীর্বাদবাণী আশ্চর্যজনক বৈ কি!

এর চেয়েও কৌতূকহলজনক বোধহয় এই কাব্যে বর্ণিত সমাজচিত্র— যা কিনা উনিশ শতকের বাংলাদেশেরই ছবি। রাজপুত্রের জন্মসংবাদে নগরীতে কি রকম আনন্দোচ্ছ্বাস হল, তার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি নৃত্যগীতবাদ্য, আলোকিত পথঘাট, ভোজের বাজি, সাপের খেলা ও যাত্রা অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে বলেছেন :

কবিদল কবি গায় শুনে পায় হাসি।
এ উহারে গাল দেয় তুলে মাতা মাসি।।
পাঁচালির দল গায়ে সুখেতে পাঁচালি।
হিজড়ারা আসি ফের দেয় করতালি।।
বাই নারী নেত্র ঠারি অঙ্গুলি হেলায়।
খেমটার নর্তকী আসি নিতম্ব দোলায়।।

উনিশ শতকের বাংলার যে-কোন বিশ্বস্ত সমাজেতিহাসে এই বিবরণ মিলবে ।[১৭] এটি যে কবিরই সামাজিক পরিবেষ্টনীর চিত্র, এতে কোন সংশয় থাকে না।

কাব্যরচনা করতে গিয়ে আবদর রহিম তাঁর কাব্যের অন্যত্রও সমসাময়িক পরিবেশ আরোপ করেছেন। রাজপুত্র বেনজিব ভ্রমণে বেরিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দেখেছিলেন ---রূপমুগ্ধা রমণী, সংসাবত্যাগী সন্ন্যাসী, অত্যাচারী রাজভৃত্য, ধনবান ব্যক্তি, মসজিদে কুরআন-পাঠরত মুসলমান, ব্যাধ, সূত্রধব, কুম্ভকার, শৌণ্ডিক, বারাঙ্গনা (কবি বেশ্যা ও কসবি বলে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন সম্ভবত তাদের ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে), ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, তন্তবায়, স্বর্ণকার, বস্ত্রব্যবসায়ী ঋষি আর 'ডাঁড় টানিতেছে বসি নির্বোধ, বাঙ্গালা।' এই শ্রেণীবিভাগ কবির সমকালের। বেনজিরের জন্যে অপেক্ষারতা বদরে মনির যেসব গ্রন্থ সমাবেশ করেছেন, সে সবই কবির প্রিয় গ্রন্থ — তাঁর সমসাময়িক রচনা।

বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ এবং বিভিন্ন বাগরাগিণীতে গেয় গীতের সমাবেশে কাব্যটি গুণান্বিত। এর রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষার শালীনতা ও বিশুদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, রজনী ও প্রভাতের বর্ণনা উদ্ধৃত করা চলে :

সূর্য্য গেল অস্তাচলে আইসে শর্ব্বরী।
রাত্রি হয় চন্দ্রোদয় পৃথ্বী আল করি।।
উদয় হইল নিশানাথ গগনেতে।
কুমুদ খুলিল আঁখি হাস্যবদনেতে।।
ব্যোমরূপ রাজ্যালয়ে তিমির হরিতে।
শশি তারা রূপ দীপ লাগিল জ্বলিতে।।
শীঘ্র করি বিভাবরী করিল গমন।
ইন্দু জাগি শ্রান্তি লাগি করিল শয়ন।।
নিদ্রাতে আছিল প্রাতে জাগিল ভাস্কর।
লুকায় ডরেতে দেখি নক্ষত্র তস্কর।
কুমুদ মুদিত হইল কমল স্ফুটিত।
পেচক বিষণ্ন হৈল চক্রবাক প্রীত।।

কবির বর্ণিতব্য বিষয় গতানুগতিক, কিন্তু ভাষার এই পরিমার্জিত দৃঢ়বদ্ধ রূপ কবির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। ভারতচন্দ্রের অনুসরণে বাকচাতুর্যের পরিচয় কবি দিয়েছেন, তবে রায় গুণাকরের বৈদগ্ধ্য তাঁর ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে গুরুর চেয়ে আবদর রহিমের রুচি পরিমার্জিত ছিল। বেনজির-বদরে মনিরের সম্ভোগ-বর্ণনায় ও আবদর রহিম আশ্চর্যজনক সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের আদর্শে লেখা কাব্যগুলোর মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান হিসেবে *প্রেমলীলা* বিশেষ স্থান পেতে পারে।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর (মৃত্যু ১৯০৩ খৃ.) *রূপজালাল* সুবৃহৎ গদ্য-পদ্য রচনা। পৈতৃক সূত্রে গ্রন্থকর্ত্রী ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হোমনাবাদের জমিদার ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে দু:খক্লিষ্ট ও ভগ্নহৃদয় হয়ে এই কাব্যরচনায় তিনি হাত দেন। সুখের বিষয়, তাঁর কাব্যে হতাশার সুর ধরা পড়ে নি। *রূপজালালের* ভূমিকায় গদ্যে ও পদ্যে ফয়জুন্নেসা তাঁর জীবনকাহিনী আমাদেরকে শুনিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> জনশ্রুতি আছে যে লেখিকার পিতামহ মোজাফ্ফর গাজি চতুর্ধুরী ঈদৃশ বিবেকী ছিলেন যে, বঙ্গভূমি ইংলন্ডীয়দিগের শাসনাধীন হইবার সময় তদধীনতা স্বীকারার্থ তাঁহাকে আহ্বান করাতে অস্বাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়: বিবেচনায় তিনি হীরক চুম্বন করিয়া শরীর ত্যাগ করেন। [পৃ ৭]

ফয়জুন্নেসার পিতা আহাম্মাদ আলি চতুর্ধুরী অবশ্য

> জজ কমিসনরাদি রাজপ্রতিনিধিদিগের সঙ্গে সমসখ্যভাবে হাস্য-কৌতুকাদি পূর্বক মৃগ বিহগাদি শিকার করিতেন। এবং উক্ত রাজপুরুষগণ সময় ২ প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ও উপযুক্ত প্রীতিকর আহারাদিতে প্রীত হইয়া তাঁহার রমণীয় প্রাসাদের শোভা সম্পাদন করিতেন।

এবং তাঁর পুত্রী অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থকর্ত্রী ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে *নবাব* উপাধি লাভ করে এই প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ করেন।

রূপজালালের বিষয়বস্তু শীমাইল-অধিপতি জামাল রাজার তনয় জালালের সঙ্গে সাধুতনয়া রাক্ষসপালিতা রূপবানুর প্রণয়, তবে *আরব্য উপন্যাসের* ছাঁচে গল্পের মধ্যে গল্প এবং *হাতেম তাইয়ের* ধরনে একটি ঘটনা শেষ হবার পূর্বেই সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনার সূচনায় কাহিনীর পট সুবিস্তৃত ও ঘটনাজাল জটিল হয়ে উঠেছে। রূপবানুর সন্ধানে যাত্রাপথে জালাল কেবল যে বহু ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছেন, তা নয়, হুরবানু নাম্নী জনৈকা রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণও করেছেন। কাহিনীর শেষে জালাল দুই পত্নী নিয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগলেন। তবে তার পূর্বে যে পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে, তা মর্ত্যে ও পাতালে, মৃত্তিকার উপরে ও সমুদ্রের গর্ভের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে এবং সে পথে দৈত্য ও গন্ধর্ব, রাক্ষস ও পরীরা ছায়াপাত করেছে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের মতো এখানেও খোওয়াজ খিজিরের আবির্ভাব দেখতে পাই। তিনি নায়ককে তিনটি *ইস্‌ম্* শিখিয়েছেন তার তাৎপর্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> প্রথম এছেম গুণ কহি বিস্তারিয়ে।
> পঠয়ে এছেম যদি নয়ন মুদিয়ে।।
> যথা ইচ্ছা হয় তথা পারয়ে যাইতে।

মানব দানব কেহ না পায় দেখিতে।। ....
দ্বিতীয় এছেম গুণ শুন দিয়ে মন।
ইহাকে পঠিলে হবে বিহঙ্গ নিধন।।
দ্বারহীন গৃহ যদি থাকয়ে তাহাকে।
ইছিম পঠিলে দ্বার হবে আচম্বিতে।।
তৃতীয় ইছিম গুণ করহ শ্রবণ।
শত্রু সঙ্গে করিবারে হয় যদি রণ।।
তৃণ করে নিয়ে যদি ইছিম পঠয়ে।
যে অস্ত্র হইতে ইচ্ছা করেতে মিলয়ে।। [১৮৪-৫]

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে লেখিকার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। হীরা মালিনীর আদর্শে তাঁর কাব্যেও মালিনী এবং দূতী আছে। দূতী

বয়সে প্রাচীনা তবু রসে রসবতী।
মনে অভিলাষ হতে কামের যুবতী।। [৬২]

আর মালিনী বলে,

শুনলো ভগিনী ! বলি তোমায়।
কি বলিব আমাকে না যুয়ায়।।
এই বসে মম রস নুকেছে।
ভরেতে তনুর তস শুকেছে।।
কত বা বয়স হয়েছে মোর।
আশী নব্বইতে হয় কি বুড়ো।। [১৩৭]

কেবল এই চরিত্রসৃষ্টিতে নয়, কাব্যের শেষে জালাল যখন দুই পত্নীসেবিত হন, তখনও আমাদের অনিবার্যভাবে ভবানন্দ মুজমদারের উপাখ্যান মনে পড়ে যায়।

ভাষায়, ছন্দে ও রীতিতে এই প্রভাব সম্যক পরিস্ফুট হয়েছে। হুরবানুর সঙ্গে বিবাহের পর জালালের আচরণ লক্ষ্য করে সখীরা বলছে :

স্বপত্নী সহিতে কেন রতি কর্ম নাই।।
দেখি একি বিপরীত !
দেখি একি বিপরীত, তাইত চিন্তিত, হেন রসবতী।
পেয়ে নবযুবা কেন না ভুঞ্জিলে রতি।।
তুমি কেমন নাগর !
তুমি কেমন নাগর, রসের নাগর, বুঝতে কিছু নারি।
রসপান নাহি কর পেযে নব নারী।।
শুন নাগর কানাই !
শুন নাগর কানাই, বলিব কি তাই, দুঃখে মরি২।
বিরহের দাবানলে দহে সে সুন্দরী।।
তিনি হন রাজবালা!
তিনি হন রাজবালা, পূর্ণ ষোল কর, রূপবতী বটে।

রূপে-গুণে হেন ধনী কপালেই ঘটে।। ...
আপনার মধু খাবে ইথে দোষ নয়।। [২০৯-১০]

গদ্যে তৎসম শব্দের প্রতি ফয়জুন্নেসার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ আছে। উৎসর্গ-পত্রটি সংস্কৃতে লেখা। 'ভাতিল নীরদপটে আশার দামিনী' (পৃ ৬৭) — অলঙ্কার ও শব্দসন্নিবেশ, দুদিক দিয়েই চরণটি চোখে পড়ে। সৌভাগ্যের কথা, এমন চরণ আরো আছে। দু একটি স্থানে শব্দ ভুল অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন 'রাগে মুগ্ধ হয়ে ভুপ কন্যা সঙহারিয়ে' (পৃ ১১৬)। লেখিকার একটি মন্তব্য — মধ্যযুগের সাহিত্যে যা খুবই সুলভ — আমার কাছে খুব কৌতুককর মনে হয়েছে :

ধূর্ত্ত কর্ম্ম যোগ্যা নারী কথারি কি ছল।
বাক্য ছলে জগৎ ভুলে মুনিও বিকল।। [৪১]

এই চরণ দুটি যিনি লিখেছেন, তিনি একজন নারী বলেই বিস্ময় ও কৌতূহল আমাদের জেগেছে।

পাঁচ

১৮২৪-এর মধ্যেই কলকাতায় বাঙালী মুসলমানের ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়।[১৮] পরবর্তী কালে এই ছাপাখানার সংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব ছাপাখানা থেকে অজস্র বইপত্র প্রকাশ পেতে থাকে। তার মধ্যে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের সংখ্যা প্রচার সর্বাধিক ছিল। তবে আরো গদ্য ও পদ্য-রচনা এবং গদ্য-পদ্য মিশ্রিত রচনাও বটতলার এইসব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। এইরকম দুটি গদ্য-রচনার পরিচয় দিই।

গোলাম হোসেনের *হাড়জ্বালানী* (১৮৬৪) নাট্যিক সংলাপ জাতীয় চটি বই। কলিকালের বধূ শাশুড়ির সঙ্গে কেমন দুর্ব্যবহার করে, তার চিত্র এতে আছে। শাশুড়ীকে সংসারের বোঝা মনে করে, সে তাকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করল। গৃহস্বামী স্ত্রীর অভিযোগ ও নিজের শাশুড়ীর পত্রের মর্ম বিশ্বাস করে মায়ের কথায় কর্ণপাত করল না এবং এই ব্যবস্থায় সম্মতি জানাল। নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধা মাতা ভিক্ষা করতে থাকলেন। লেখকের কোন সুস্থ মনোভাব বা সুষ্ঠু চিন্তা এতে প্রকাশ পায় নি। তিনি ব্যক্তিকে টাইপ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তার ফলে তাঁর সামাজিক চিত্র বিবর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন হয়েছে। বইটিতে কিছু মন্তব্য (লেখকের) ও আক্ষেপোক্তি (পাত্রপাত্রীর) আছে পদ্যে: কথোপকথন গদ্যে। এর নমুনা :

শাশুড়ী। ওগো বউ তুই যে আজ বড় চুপ করে বসে রয়েছিস কায-কর্ম্ম কি কিছুই নেই।
বউ। যাগ্যে বাবু পোড়ার ঘরকন্না থাকলেই কি না থাকলেই কি? [৩]
কত্তা। কোথা গেলে এসব সামিগ্র এনেছি তোল না এখন তুমিই তো গিন্নি আর কে।
গিন্নি। (মান ভরে) কারো ঘর করব নি, কারো কেঁথা পুড়লে বলবোও নি। [৯]

শেখ আজিমুদ্দীনের *কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে* (দ্বি-স; ১৮৬৮ অনুরূপ) ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এটিও গদ্য-পদ্য মিশ্রিত রচনা। আখ্যান বৃদ্ধের পুনরায় দারপরিগ্রহের শোচনীয় পরিণতি — তখনকার প্রহসন-রচনার জনপ্রিয় বিষয়।

এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট অধিক ধন ও স্বর্ণমুদ্রা রজত কাঞ্চন এবং মুক্তা পরলাদিতে গুঞ্জিতা, অলঙ্কারাদি অধিক, লৌহ সিন্দুকে পূর্ণিত ও বনাত, শাল-ভূমি ইত্যাদি উত্তম

> ২ অট্টালিকা দোতালা তেতালা থাকায় পবমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ আয়ুদ্বারা তাহার জীবদ্দশায় স্বপরিবারের লোকান্তর হওয়াতে বৃদ্ধ কত্তা একা ভৃত্যগণের সেবা দ্বারা কাল যাপন করিবায় উক্ত বৃদ্ধব্যক্তির বণিতার কাল হওয়া পর্যন্ত অতিশয় দু:খিতান্ত:করণে দিনপাত করেন ...। [৪]

এঁর পুনর্বিবাহের সংকল্প শুনে তাঁর বৈবাহিকের স্ত্রী বললেন :

> সে যা হউক অবাক হলাম। এ কি আশ্চর্য্য ! এ কি আশ্চর্য্য ! যমদূতে যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কিবল ভাঙ্গিতেই বাকি রাখিয়াছে, তাহার বিবাহ আকঙ্ক্ষা হইয়াছে, যেমন ব্যাঙ্গের গায় জ্বর ও কুম্ভীরের সান্নিপাত। আমি কল্য প্রাতে একবার বুড়ো ডাকরাকে দেখব। [৮]

কোন এক সুন্দরী বালিকার সঙ্গে পরিণয় হল বৃদ্ধের, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁর লোকান্তর হল এবং বিধবা সৌদামিনী এক সাধুর নন্দনকে বরণ করলেন।

এই দুটি বচনা থেকে আমরা কতকগুলো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বর্তমান জগতের সঙ্গে সম্পর্কলেশহীন, কিন্তু সমসাময়িক গদ্য রচনায় বাস্তব জগতের ছায়াপাত ঘটেছে। এর লেখকেরা সাধারণত উচ্চবর্গের লোক নন এবং খুব কাছাকাছি দৃষ্টিপাত করেই তাঁরা রচনার মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কোন সুস্থ মনোভাব তাঁদের রচনায় ফুটে ওঠে নি। ভাবগত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাস্তব প্রতিপার্শ্বের ছবি বলেই এগুলোর কিছু মূল্য আছে। ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, সাধুভাষার সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনে এঁরা লোকের মুখের ভাষাকে অকৃত্রিমভাবেই প্রকাশ করেছেন। তবে মার্জিত মনের পরিচয় নেই বলেই এই রচনাগুলি শিক্ষিত সমাজে আদৃত হয় নি।

ছয়

একালের বাউল গান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র ও অবকাশ এখানে নেই। তার জন্য বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে জনৈক গবেষক এই বিপুল পরিশ্রমসাপেক্ষে কর্মটি সম্পাদন করেছেন।[১৯] বাউল গানের ও বাউল মতবাদের এটিই একমাত্র ইতিহাস নয়, তবে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই প্রধানত এই বইটিকে কেন্দ্র করে বাউলদের সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা উত্থাপন করছি।

> বাউল ধর্ম একটি সমম্বয়মূলক ধর্ম। ইহার মূল সাধনপদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর শিবশক্তি-বাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব, সুফী দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়িয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশেষ ধর্মরূপে গঠিত হইয়াছে।[২০]

তাই সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাউলের ধর্মমতকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মতন্ত্রের —যেমন, ইসলাম, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের— অন্তর্ভূত করে দেখার চেষ্টা করা ভ্রান্তিকর মাত্র। হিন্দু সম্প্রদায় বাউলদেরকে তাঁদের সমাজ-বহির্ভূত জ্ঞান করেই *বাউল* (সংস্কৃত *বাতুল* শব্দজাত) নামে অভিহিত করেছেন এবং মুসলমান সমাজেও এঁদের নামকরণ

হয়েছে *বে-শরা ফকীর* বলে অর্থাৎ এঁরা মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও শরিয়ত-অনুযায়ী বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের পরিচয় দেন না। সুফী মতামতের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকে এঁদেরকে *মারফতী ফকীর* বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। বাউল মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশধারার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ডক্টর ভট্টাচার্য বলেন :

> সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহার সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির কাল বলিয়া আমরা ধরিতে পারি।... বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাউল গানের শেষ সূচিত হইয়াছে। ...শরিয়তবাদীদের চাপে ফকির সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে।[২১]

যথার্থভাবে বিচার করতে গেলে, বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারার বিকাশ প্রসঙ্গে বাউলদের মতবাদ-আলোচনা না করাই উচিত। কেননা, তাঁদের মতামত ও সাধনপদ্ধতি ইসলামের অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অংশে এই মতামত দেখা দিয়েছিল বা এক অংশকে তা স্পর্শ করেছিল, তাই এঁদের রচিত গানের আলোচনা একেবারে অবান্তর নয়।

বাংলার বাউল গান রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকীর (১৭৭৪-১৮৯০) যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর জীবনকাহিনীর যে উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে, তিনি কুষ্টিয়া জেলার কোন হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান। পুরী-যাত্রার পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত ও সহযাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে লালন সিরাজ নামে জনৈক মুসলমান ফকীর ও তাঁর স্ত্রীর পরিচর্যা লাভ করেন, সুস্থ হন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সিরাজ স্বয়ং ফকীর, অতএব সুফী ভাবধারাপ্রবণ ছিলেন; তাই তাঁর শিষ্য লালনও অচিরে বাউল মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তা স্বাভাবিক মনে হয়।

বাউল গানের একটি বড় অংশ এঁদের সাধনতত্ত্বঘটিত ক্রিয়াকর্মকে রূপকের ছলে বিবৃত করেছে। এদের সাধনা একান্তভাবেই দেহকে কেন্দ্র করে —তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে তার মিল আছে এখানেই। মায়াবাদী দর্শনের অনুসারীদের মতো বাউলেরাও নিখিল বিশ্বকে সত্য বলে স্বীকার করেন নি। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা স্রষ্টা বা পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার কামনাই প্রবলভাবে ব্যক্ত করেন। দেহই হচ্ছে এই মিলনের ক্ষেত্র। নরনারীর মধ্যে ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করে এঁরা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হতে চান।

লালনের গানে এই একান্ত গূহ্য সাধনতত্ত্বের কথা আছে :

অমাবস্যার চন্দ্র উদয়,
দেখতে যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো বসে।[২২]

এই অংশের ব্যাখ্যায় ডক্টর ভট্টাচার্যের সাহায্য নিলে আমরা দেখতে পাই :

> বাউলরা প্রকৃতির রজঃ-প্রবৃত্তির সময়কে *অমাবস্যা* বলে। ইহা ঘোর অন্ধকারাময় কামের সময়। কামের স্বরূপকে বাউলরা নিরবিচ্ছিন্ন দেহ-ভোগের অন্ধকারময় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। এই অমাবস্যার মধ্যেই তাহাদের *পূর্ণচন্দ্র* উদিত হয়। এই পূর্ণচন্দ্র

> *সহজ মানুষ,* বা *অধর মানুষ* ইনিই প্রেম-স্বরূপ। তাই *অমাবস্যা'কে* অনেকস্থলে তাহারা *কাম* বলিয়া বুঝিয়াছে এবং *পূর্ণিমাকে* প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই *অধর মানুষ* বা পরমাত্মা সহস্রারে অটল-রূপে বিরাজিত। ইনি এই যোগের সময় রস-রূপে প্রকৃতি দেহে ক্রীড়া করেন এবং পূর্ণভাবে মূলাধারে প্রকৃতির কারণ-বারিতে আবির্ভূত হন। এই আবির্ভাবকে তাহারা *পূর্ণিমার যোগ* বলে। ইহাই বাউলদের *অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্র উদয়*।[২৩]

ত্রিবেণী শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি জানিয়েছেন :

> প্রতিমাসে প্রকৃতির যে রজ:স্রাব হয়, তাহাকে বাউলরা ত্রিবেণীর ত্রিধারাবিশিষ্ট নদী-প্রবাহ-স্বরূপ কল্পনা করিয়াছে।[২৪]

যে জ্যোতির্ময় প্রেম বাউলদের অন্বিষ্ট, তিমির কামই তার সিংহদ্বার। কামকলার যথার্থ সময়ের অপেক্ষায় থেকে এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালাভের পরামর্শ এই গানটিতে লালন দিয়েছেন। অন্যত্র এই কথাই তিনি বলেছেন :

শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা।[২৫]

কিংবা,

ধররে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।[২৬]

এবং এই পথে গুরুর আবশ্যকতার গুরুত্বও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন :

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।[২৭]

নরনারীর দেহ সম্ভোগের মাধ্যমে দেহাতীত যে অদ্বয় চেতানায় উপনীত হবার চেষ্টা বাউলদের ধর্মে রয়েছে, তা আমাদেরকে আদিম মানবের ধর্মতত্ত্ব (Primitive religion) স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু গূহ্য সাধনতত্ত্বই বাউল মতবাদের বা বাউল গানের একমাত্র বিষয় নয়। সাধনপ্রণালীর বাইরে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে দিব্যদৃষ্টি বাউলদের আছে, যে সর্বসংস্কারমুক্তি ও সর্ববন্ধন-ছেদনের প্রচেষ্টা তাঁরা করেছেন, তাতে আমরা আনন্দ লাভ করি।

বাউলরা জগতের নিত্যতা স্বীকার করেন নি। তাই লালন বলেছেন :

তুমি কার বা কে তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন করো রে।[২৮]

এবং এই অনিত্য সংসার থেকে নিত্যলোকে যাবার জন্যে তাঁর অন্তরাত্মা সর্বদাই ক্রন্দন করছে :

পার করো, দয়াল আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে।।
মন-তরী তার ছ জন মাল্লায়
সদাই তারা কুকান্ড বাধায়
ডুবালো ঘাটায়
আজ আমারে।।[২৯]

তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে :

আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগর দোলায়।[৩০]

এবং নিত্যলোকে যাবার জন্যে তিনি আমাদেরকেও আহ্বান জানান :

আয় কে যাবি ওপারে।[৩১]

কিন্তু এ সত্ত্বেও মানব-জীবনকে এক অপূর্ব গৌরবে তিনি উদ্ভাসিত করেছেন। দেহকে কেন্দ্র করে তাঁদের সাধনা বলে নয়, মানুষের মধ্যে এক বিজন মহত্ত্বের সন্ধানলাভ তিনি করেছেন :

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তর, কিছুই নাই।
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।।[৩২]

মায়াবাদী দার্শনিকতার জন্যে নয়, নশ্বর মানবজীবনের এই মহিমাগানের জন্যেই বাউল গানকে কোন বিকৃতি স্পর্শ করে নি। মানব-জীবনকে তার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাউলরা গ্রহণ করেছেন এমন একটা সামগ্রিকতার মধ্যে, যার ফলে এই সর্বব্যাপী মানবিকতার কাছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম তুচ্ছ হয়ে গেছে। সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব ও সর্বমানবের মূলগত ঐক্যের প্রতি লালন তাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আজ্ঞা জগৎময়।[৩৩]

কথা কয়রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে।
খুঁজলে জনম ভর মেলে না। .....
রাম কি রহিম সে কোন জন,
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না।।
হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না।[৩৪]

ফকিরি করবি, ক্ষেপা, কোন্ রাগে।
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে।।
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ

হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন।
ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তা ভালে লাগে।।[৩৫]

সম্প্রদায়-ধর্মের নির্দেশিত অনন্তলোক বাউলের কাম্য নয়, এঁদের গণ্ডীবদ্ধ পথে চলে মুক্তি নেই, কারাবন্ধনেই নিজেকে জড়াতে হবে। প্রকৃত ধর্ম তো ও পথে নেই, আছে সেখানে, যেখানে সকল ভেদাভেদ বিস্মৃত হওয়া চলে। তাই লালন বলেন :

সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।। ...
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়,
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।।[৩৬]

তাই তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন :"

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই।[৩৭]

মানবধর্মের এই শ্রেষ্ঠ প্রকাশে লালন ফকীরের গান সমৃদ্ধ। এই জন্যে এবং ভাবপ্রকাশের সুনিপুণ ভঙ্গীর জন্যে লালন বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল কবিরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় চরণদ্বয় লালন ফকীরের রচনা।

লালনের গানে যে চিন্তাধারা বিকাশলাভ করেছে, তা সকল বাউল কবির রচনাতেই দেখা যায়। প্রত্যয়ের দিক দিয়ে এঁদের মধ্যে পার্থক্য নেই, স্বাতন্ত্র্য কেবল প্রকাশনৈপুণ্যের দিক দিয়ে। বাউল-মতবাদের বিশিষ্ট সাধক পাঞ্জ শাহ্ (১৮৫১-১৯৪১) একজন ভাল কবি, তবে কবিত্বের দিক দিয়ে পাগলা-কানাইয়ের (১৮২৪-৮৯) নাম লালনের পরেই উল্লেখযোগ্য।

পাগলা কানাইয়ের রচনাসংগ্রহ ও তার পরিচয় প্রদান করে সম্প্রতি একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯] লেখক পাগলা কানাইয়ের জীবনকাল স্থির করেছেন ১৮১০ থেকে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ বলে।[৪০] আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, সমসাময়িক লেখকের রচনা থেকে কানাইয়ের অভ্রান্ত জীবনকাল জানবার একটা সুযোগ হয়েছে। মুনশী মেহেরুল্লার *মেহেরুল এছলাম* বইয়ের একটি পাদটীকায় শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ লিখেছেন :

> জেলা যশোহরের অন্তর্গত ঝিনাইদহ মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরে বেড়াবাড়ী নামক পল্লী। এই বেড়বাড়ী কানাই বয়াতির (পাগলা কানাইয়ের) জন্মস্থান। ১২৯৬ সালের ২৮-এ আষাঢ় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।[৪১]

অতএব, ১৮২৪ থেকে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমরা নি:সন্দেহে তাঁর জীবনকালে বলে গণ্য করতে পারি। তিনি যশোর জেলার বেড়বাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, মুসলমান

পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, তাঁর অনেক অনুরাগী ছিলেন এবং বাউল কবি ও কবিয়াল হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

পাগলা কানাই সম্পর্কে ডক্টর মযহারুল ইসলামের মন্তব্য— 'তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়' এবং 'তিনি ধর্মপ্রবণ মুসলিম ছিলেন', তাঁর অন্য একটি উক্তির— কবি যে সূফী সাধক ছিলেন তা বলাই বাহুল্য'[৪২] সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। শুধু তাই নয়, প্রথম মন্তব্য দুটি পাগলা কানাইয়ের গানগুলোর মূল বক্তব্যের সঙ্গে সমঞ্জস নয়। কানাই ছিলেন বাউল কবি। বাউল মাত্রই যেমন সম্প্রদায়ধর্মের গন্ডী-বহির্ভূত, তিনিও তেমনি ইসলামের বিধিবদ্ধ জগতের বহির্লোকের অধিবাসী। এই কারণেই তাঁর মৃত্যুর পর কোন শরিয়তপন্থী আলেমকে কানাইয়ের জানাজা পড়তে আহ্বান করায় তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন।[৪৩]

কানাইয়ের গানে আল্লাহ্ ও রসুলের বন্দনা দেখে তাঁকে শরিয়তপন্থী মনে করার কারণ নেই। কেননা, সেই সঙ্গে আমরা নিরঞ্জন, বিষ্ণু, রাম ও গোরার প্রশস্তিমূলক পদও পাই। বাউল মতবাদের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পরলে এটি বিস্ময়কর মনে হয় না। বাউলদেব দেহকেন্দ্রিক দুরূহ সাধনতত্ত্বের কথা তিনি তাঁর গানে বলেছেন নানারকম রূপক দিয়ে এবং পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে। এখানে এরকম দুটি গান উদ্ধৃত করছি:

শূন্যের পর এক দেরাক্ত পয়দা দেখতে কি মজা
সেই দেরাক্তে বসত করে এসে চার রাজা।
মাসে মাসে ফুলটি ফোটে আজব তামাসা।।

পূর্ণিমার যোগেতে জোয়ার করে টলমল।
সামাল করে বেঁধে রেখো মন-পাখির বান্ধার।
আসমানে সেই গাছের শিকড় জমিন ডাল তার।।

সে গাছে বার মাসে তের ফুল সর্বলোকে কয়
পুরুষের ঋতু কোন দিবসে কয়ে দ্যাও আমায়।

পাগল কানাই বলে বল দেখি
কয় রোজেতে ফলের গঠন হয়।[৪৪]

এক আজব তামাশা দেখে এলাম
কালীদহের ঘাটে।
বার মাসে বার ফুল ফোটে,
যোগী যারা যোগে তারা বসে ঘাটে।।

আমি ফুল দেখে হয়েছি আকুল
তুলব বলে সেই ফুলের মূল
ডুব দিয়ে হল্যাম নামাকুল

ডোবে না ভেসে ওঠে।
কতজন সেই যে ঘাটে হয়েছে লটপটে।।

ঘাটে আছে নোনা পানি
আর ক'টা কুম্ভীরের ভয়।
দেখে আমার মনে সন্দেহ হয়,
যে জন ভাল ডুবারু হয়
ডুব দিয়ে ফুলের মূল তুলে নেয়
না করি কুম্ভীরের ভয়
কুম্ভীরেই সে করে জয়
আবার কতজন সেই যে ঘাটে
আসল মূল হারায়।।[৪৫]

পাছে মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে নিজের সত্তা হারায়, সেই ভয়ে কানাই স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, ঐহিক সুখ সত্য নয় :

ও মন দুনিয়াদারি এ ঝকমারি
মিথ্যা বসত সার।[৪৬]

এবং

ভেবে আসা যাওয়ার যন্ত্রণা
জানলে আর ভবে আসতাম না।[৪৭]

কিন্তু এ সংসারে মানুষ যখন এসে পড়েছে, তখন এ কারাগার থেকে মুক্তিসন্ধান করা তার কর্তব্য। কানাই সে পথও দেখিয়েছেন :

মুক্তি কিসে হবে গো জীবের ভক্তি বিহনে
ভক্তি হইছে অমূল্য ধন গুরুর কাছে লওগো জেনে।[৪৮]

গুরু বলতে তিনি মোল্লা-পুরুত বোঝেন নি — এ গুরু বাউলের দেহসাধনার নির্দেশক। কেননা, মোল্লা-মৌলভীদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ কানাই প্রচ্ছন্ন রাখেন নি :

ভাইরে ইমান আছে কারে
তোমরা দেখ বিচার করে
মুন্সী মৌলভী তারা ছোয়াল করে ফেরে
তারা বেঈমানি করে
বেদাত লোকে ধরে নিয়ে কাফেরানা করে
তারা নিজের তফিল ভয়ে
দুইটা পয়সার লালস করে পরে
নছিহত হবে কেমন করে।[৪৯]

পাগলা কানাই বলে, ভাইরে ভাই
কত রঙ্গ দেখলাম এ ভবে এসে দু চোখে।
যত করিলাম দেবধর্ম সকলি ফাঁকিজুকি
একটু ভাল কইতে হল, সার কেবল আল্লাকে ডাকি।[৫০]

সম্প্রদায়ধর্মের পথ এক নয় এবং এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে প্রীতির চোখে দেখেন না, কানাই তাও জানতেন। তাই তিনি বলছেন :

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত ঘরে আশ্রয়।। ...
মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউ বা সুন্নত করে।
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায়।[৫১]

সব ধর্মের মূলগত ঐক্য এবং সর্বমানবের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে যে মানবিকতার পথ তাঁরা উন্মুক্ত করেছিলেন, তা শ্রদ্ধেয়।

শেখ মদন বাউল তাঁর একটি সুপ্রসিদ্ধ গানে সম্প্রদায়ধর্মকে মানবধর্মের অন্তরায় বলে গণ্য করেছেন :

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা
পুরাণ কোরান তসবি মালা,
ভেখ-পথই তো প্রধান জ্বালা,
কাইন্দ্যা মদন মরে খেদে।।[৫২]

লালন ফকীর ও পাগলা কানাই ছাড়া, মুসলমান পরিবারে জাত যেসব বাউল কবিকে আমরা পেয়েছি — পাঞ্জ শাহ্, তিনু ফকীর, মেছের শাহ্, এরফান শাহ্, রশীদ ও খেজমত প্রভৃতি — এঁদের সকলের রচনায় মোটামুটি এই প্রীতিধর্মের ও মানবিকতার সুর প্রধান হয়ে উঠেছে।

সাত

একালের বাঙালী মুসমান সাময়িক পত্রিকা-প্রকাশেও ব্রতী হয়েছিলেন। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার কথা জানা গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হল *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। কলকাতার কলিঙ্গা লেন থেকে শেখ আলীমুল্লাহ্ এটি প্রকাশ করেন ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৭ই মার্চে। ফারসী ও বাংলা ভাষায় এই পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করত। পত্রিকাটি যে অন্তত পরবর্তী জানুয়ারী মাস পর্যন্ত চলেছিল, তার নিশ্চিত প্রমাণ পাই *সমাচার দর্পণের* মন্তব্য থেকে (২১ জানুয়ারী ১৮৩২)।[৫৩] খুব সম্ভব, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রথম তরঙ্গস্পর্শে হিন্দু সমাজের যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, আলীমুল্লাহ্ তার বিরোধী ছিলেন।[৫৪]

১৮৪৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, ফারসী এবং উর্দু বা হিন্দুস্তানী ভাষার সাপ্তাহিক *জগদুদ্দীপক ভাস্কর* আত্মপ্রকাশ করে। এর অনুষ্ঠানপত্রের প্রচারক ছিলেন ফরীদউদ্দীন খাঁ এবং প্রকাশক ছিলেন মৌলভী নাসিরউদ্দীন (বৈঠকখানা স্ট্রীট, কলকাতা)।

পত্রিকার পরিকল্পনাকে 'really a bold one' বলে প্রশংসা করে Calcutta Review (January-June 1846) লেখেন :

> ... His Persian is too much Arabicized, his Urdu too much Persianized, and his Bengali too much Sanskritized, to be easily, if at all, intelligible to the great mass of readers. this, however, the natural fault of a man of erudition, will, we must hope, obtain its due correction from experience [৫৫]

দুর্ভাগ্যের বিষয়, কাগজটি দেড় মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।[৫৬] দেবনাথ মজুমদার জানিয়েছেন যে, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মৌলভী রজব আলী।[৫৭] কিন্তু তিনি এর প্রকাশকাল বলেছেন ১৮৪৭, আবার ১৮৪৬-এ মৌলভী আলীর সম্পাদনায় দ্বিভাষিক *জ্ঞানদীপিকার* নাম করেছেন, পরিচয় দেন নি।[৫৮]

১৮৬১ খৃস্টাব্দে ফরিদপুরে জেলার বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর আলাহেদাদ খাঁ পাক্ষিক *ফরিদপুর দর্পণ* প্রকাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে একটি বিজ্ঞাপন দেন। পত্রটি শেষ পর্যন্ত প্রাকশিত হয় কি না জানা যায় নি।[৫৯]

তথ্য-নির্দেশ

১. আহ্‌মদ শরীফ (সম্পাদিত), *পুথি-পরিচিত*, ২১১।

২. উদ্ধৃত, Gibb, 150 : '—the disciple [Murid] must of necessity have recourse to a director, [Shaikh, or an Persian, *Pir*] to guide him aright For the way of faith is obscure, but the devil's ways are many and patent, and he who has no Shaikh to guide him will be led by the devil into his ways '

৩ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ২৯০-৯১, আহমদ শরীফ, *পুথি পরিচিতি*, ৭৯-৮০, ২১৭।

৪. কালীকান্ত বিশ্বাস, 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', *র-সা-প-প*, ১৩১৮।

৫. সুকুমার সেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একটি গাথা-কবিতা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক পৌষ ১৩৫২।

৬ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ : ৯৪৭।

৭. আহ্‌মদ শরীফ, *পুঁথি পরিচিতি*, ৯৪-১০৪।

৮ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, ২৮৭।

৯. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'কবি মহম্মদ মিরণ ও তাঁহার বাহার দানেশ', *বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা*, ২ ৮-১৭।

১০. দৌলত উজীর বাহরাম খান তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খানের উপর হোসেন শাহ্ কৃত অত্যাচারের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে এই বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তুলনীয় : আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), দৌলত উজীর বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* (ঢাকা, ১৯৫৭), পৃ ৮-৯।

১১. তুলনীয় : সৈয়দ হামজা (গরীবুল্লাহ্), *সোনাভান* হানিফার প্রতি বুড়ীর উক্তি :

তুমি মোসলমান হইলে তারা তো ব্রাহ্মণ।
তেরা সাথে সাদী হবে একথা কেমন।

১২ H Blochman, 'Notes on places of Historical interest in the District of Hugli', Proc ASB 1870

১৩. গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্র। উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *শর্মিষ্ঠা নাটক* (তৃ-স; কলিকাতা, ১৩৫৫)।।

১৪ De 383 'after 1830, Kabi-poetry languished in the hands of the less inspired successors of Haru, Nitai and Ram Basu It continued even upto 1880 to be a very popular form of entertainment but it rapidly declined if not in quantity, but in quality'

১৫ পূর্বে ৩৮-৪০ ও ৮৭ দ্রষ্টব্য।

১৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক*, *ছাত্রী সংঘ বার্ষিকী* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৩৫৭।

১৭. তুলনীয় : শিবনাথ শাস্ত্রী, ৪১-৪২, ৫৫-৫৮।

১৮. 'সন ১৮২৪ সালে যে ২ কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ' প্রকাশিত হয় *সমাচার দর্পণে*, ২২ জানুয়ারী ১৮২৫-এ। এতে 'মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানা'র উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ : ৭৬)

১৯ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (কলিকাতা, ১৩৬৪)।

২০. ঐ, ১ : ১২৬।

২১. ঐ, ১ : ১৩১-৩২। তুলনীয় : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *হারামণি* (কলিকাতা, ১৩৩৭) ১ : 'বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে।' ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়, তারপর দেড়'শ বছর ধরে যে নৈরাজ্য চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, এই সমন্বয়পন্থী ধর্মমতের উদ্ভব এত আগে হতে পারে না।

২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২ : ৪৬।

২৩. ঐ, ১ : ৩৯১।
২৪. ঐ, ১ : ৩৭৩।
২৫ ঐ, ২ , ৮।
২৬. ঐ, ২ : ৭০।
২৭ ঐ, ২ : ৫৯। মনসুরউদ্দীন, ৪২-৪৩।
২৮ ঐ, ২ . ২৪।
২৯ ঐ, ২ : ৩৭। তুলনীয় রামপ্রসাদ সেন, *রামপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী*, গান সংখ্যা ২ : 'মা আমায় ঘুবাবে কত। কলুব চোখ-ঢাকা বলদেব মত।'
৩০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২ : ১৬।
৩১ ঐ, ২ · ৩৮। তুলনীয় : ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, *গীতবিতান* (নতুন-স; কলিকাতা ১৩৬৭)।
৩২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২ : ১৫।
৩৩. ঐ, ২ ২৯। ১৭৮ · ওগো তোবা যে যাবি পারে।
৩৪. ঐ, ২ ৩৫।
৩৫ ঐ, ২ ৭৮।
৩৬. ঐ, ২ ১২৩।
৩৭. ঐ, ২ ৮২।
৩৮. ঐ, ২ . ৭৩।
৩৯ মযহারুল ইসলাম, *কবি পাগলা কানাই* (বাজশাহী, ১৯৫৯)
৪০ ঐ, ২ ও ১৮।
৪১ মোহাম্মদ মেহরুল্লা, *মেহেরুল এছলাম* (প্রকাশকাল ও স্থান অজ্ঞাত), ৬২টি।
৪২. মযহারুল ইসলাম, ২১, ২২ ও ৩২।
৪৩ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, *মেহেরুল এছলাম* ৬২টি।
৪৪ মযহারুল ইসলাম, ১১৩-১৪।
৪৫ ঐ, ১১৮।
৪৬ ঐ, ৬৯।
৪৭. ঐ, ৫৬।
৪৮. ঐ, ১১৪।
৪৯. ঐ ১৭০।
৫০. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *বঙ্গসাহিত্য পবিচয়* (কলিকাতা, ১৯১৪), ২ : ১৮৯৬।
৫১ মনসুরউদ্দীন, ৭৩।
৫২. আবদুল কাদিব ও রেজাউল কবীম (সম্পাদিত) *কাব্য-মালঞ্চ*, ৪৫।
৫৩. ব্রজেন্দ্রনাথ, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২ : ১৮৬।
৫৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ১ (কলিকাতা, ১৩৪৬) : ৫৫ দ্রষ্টব্য।
৫৫ উদ্ধৃত, ঐ, ১ : ১৪৪।
৫৬. ঐ, ১ : ১৪৪। লঙেব মতে, পত্রিকাটির আয়ু ছিল একমাস (Long ... ৪৪৫) আর Calcutta Review (July-December 1850) বলেন, এর মাত্র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রচাবিত হয়েছিল।
৫৭. কেদাবনাথ মজুমদার, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*, ১ (ময়মনসিংহ, ১৯১৭) : ১০৯।
৫৮. ঐ, ৪৩৯।
৫৯. ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ১ : ২৭১।

সপ্তম অধ্যায়

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের অবদানের ধারা আমরা মোটামুটি লক্ষ্য করেছি। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের *রত্নবতী* এক্ষেত্রে একটি নতুন পদক্ষেপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলা গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের যে প্রধান ধারাটি পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসাধনা স্রোতস্বিনীটি তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল। খণ্ড কবিতা, মহাকাব্য গীতিকাব্য. উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি মাধ্যম অবলম্বন করে এঁরা বাংলা সাহিত্যের সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন কৃতী সাহিত্যব্রতীদের পাশাপাশি।

কালের হিসেবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধনায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব, পরে হলেও, খুব দেরীতে হয়নি। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* প্রকাশের এক যুগের মধ্যেই মশাররফ হোসেনের *রত্নবতী* প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল ধরে যে মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল, ষষ্ঠ দশক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য রূপে তারই ফল দেখা যায়। *আলালের ঘরের দুলালে*র পেছনে রয়েছে ১৮২১ খৃস্টাব্দে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু-চরিত্রের আলোচনা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) স্বদেশ-হিতৈষণার পশ্চাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) স্বাদেশিকতা নি:সন্দেহে কার্যকরী ছিল। মাইকেল, মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) মানস হিন্দু কলেজের পরিবেশের ফল। কাজেই, পাশ্চাত্য প্রভাব ও দেশীয় পরিবেশ, এই দুইয়ের যোগফল হল সিপাহী বিপ্লবোত্তর বাংলা সাহিত্য।

এই মানসিক উৎকর্ষ ও প্রস্তুতী বাঙালী মুসলমান সমাজে অপেক্ষিত ছিল। বাঙালী মুসলমানের সামাজিক আলোড়ন এসেছিল ভিন্ন পথে, স্বতন্ত্ররূপে। আমাদের সমাজের রুদ্ধদ্বারকক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবেশপথ ছিল না বললে মিথ্যা হয় না। ধর্মজীবন সংস্কারের যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, তাও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয় সপ্তম-অষ্টম দশক থেকে--- তার ফল হাতে হাতে পাবার কথা নয়। তাই অষ্টম দশক থেকে যে সাহিত্য আমাদের হাতে সৃষ্টি হল, তা কোন পূর্ববর্তী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়— তা অনেকখানি অতীতে সম্পর্করহিত। এই জন্যে এই সাহিত্যকর্ম সমসাময়িক অমুসলমান লেখকদের মহৎ সৃষ্টির তুলনায় হীনপ্রভ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। একালের মুসলমান লেখকদের মধ্যে যে বিদ্যাসাগরের পৌরুষ, মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা দেখা যায় নি, তার সংগত কারণ আমাদের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যাবে। তাই একালের বাঙালী মুসলমান লেখকেরা ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, কিন্তু মহৎ শিল্পস্রষ্টারূপে দেখা দিলেন না।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। পূর্ববর্তী সামাজিক আন্দোলনসমূহের প্রভাব বাঙালী মুসলমান লেখকদের উপর তেমনভাবে পড়ে নি। সমসাময়িক পরিবেশের ছায়াপাত তাঁদের রচনায় ঘটেছে এবং সেকালের নানারকম আন্দোলনের দ্বারাও তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। পূর্ববর্তী সংস্কার-আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে তাঁরা অচেতন ছিলেন না, তবু তার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের রচনায় আমরা দেখি না। বরঞ্চ, সাধারণভাবে, তার থেকে স্বতন্ত্র— এমন কি বিরোধী- ভাবধারার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সৈয়দ আহমদ বেরিলভী- প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলনের মনোভাবটি সুফী ভাবধারার বিরোধী, পীরবাদের পরিপন্থী। কিন্তু মোজাম্মেল হক, মনিরুজ্জমান এসলামবাদী ও শেখ ফজলুল করিমের মতো লেখকেরা সুফী-সাধকদের মাহাত্ম্য ঘোষণায় মুখর হয়েছেন। সৈয়দ আহমদ তিতুমীর-হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* বা হামিদ আলীর *কাসেমবধ কাব্য* লেখা যেত না। এমন কি, ধর্মবোধের প্রসারতা ঘটানো যেসব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানেও সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মশাররফ হোসেনের *মৌলুদ শরীফ* বা জমিরুদ্দীনের *আসল-বাঙ্গালা গজল* প্রভৃতি গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। কেরামত আলী জৌনপুরীর ভাব-আন্দোলনের প্রভাব হয়তো তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাবরোধে কার্যকরী হয়ে থাকবে।

তবে আলীগড়-আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানের এককালের শৌর্য-বীর্যের মাহাত্ম্যগান, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে একাত্মবোধ (এটা অবশ্য আফগানীর প্যান-ইসলামাবাদের প্রেরণালব্ধ), মুসলমানদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ববোধ একালের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেও দেখা যায়। ইতিহাসের উপাদান নিয়ে যেসব কাব্য ও গদ্য একালে রচিত হয়েছে, তা সাধারণত ঘটনার আদর্শায়িত রূপায়ণ।

একালের মুসলমান লেখকদের সাহিত্যকর্মকে অনেকটা অতীতের সম্পর্করহিত বলেছি। অতীতের সঙ্গে যোগ একেবারেই যে নেই, তা নয়। রচনারীতির দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য ও কাব্যরচয়িতাদের অনেকের বিশেষ করে, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেনের প্রভাবকে এরা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর দিকে গিয়ে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষত *মকতুল হোসেন* , *জঙ্গনামা*, *কাসাসুল আম্বিয়া*, *শাহ্‌নামা*, *তাজকিরাতুল আউলিয়া* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রভাব খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে।

দুই

এ যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে (আমি মুসলমান লেখকদের কথা বলছি) মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) নি:সন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। রচনার আধিক্য ও প্রতিভার গৌরবে তিনি বাংলার সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় আমরা পঁচিশটি প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো আরো অনেক রচনা লাভ করেছি। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়েও এগুলো বিচিত্র। এর মধ্যে- উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনচরিত, ধর্মবিষয়ক রচনা, সবই আছে।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে মশাররফ হোসেনের জন্ম হয়। তাঁর ওয়ালেদ মীর মোয়াজ্জম হোসেন বিষয়সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়, কুষ্টিয়ার ইংরেজী-বাংলা স্কুলে, পদমদীর নবাব-স্কুলে ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলকাতায় পিতৃবন্ধু নাসির হোসেনের গৃহে অবস্থানকালে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা লতীফ-উন-নেসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হয় নাদির হোসেনের দ্বিতীয়া কন্যা আজীজ-উন্-নেসার সঙ্গে (১৮৬৫)। এ বিবাহ সুখের হয় নি। আট বৎসর পর তিনি বিবি কুলসুমকে বিবাহ করেন (১৮৭৩)। 'মশাররফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদে কাজ করিয়াছিলেন'। ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১৯-এ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মশাররফ হোসেনের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় এবং কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার-সম্পাদিত *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* (১৮৬৩-৭৪)। তাঁর দীর্ঘকালের সাহিত্যজীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে (১৮৬৯-১৮৯৯) শিল্পসৃষ্টিই মুখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯০০-১৯১০) প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্মচেতনা।

তাঁর প্রথম বই *রত্নবতী* (১৮৬৯) রচনা হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। নামপত্রে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলে বিজ্ঞাপিতে হলেও উপন্যাসের লক্ষণ এতে নেই। এটি একটি রূপকথাজাতীয় উপাখ্যান, কিন্তু প্লট এবং ভাষা, দুদিক দিয়েই লেখাটি বড় দুর্বল। ধন বড়, না বিদ্যা বড়, এই নিয়ে গুজরাট নগরের রাজপুত্র সুকুমারের সঙ্গে মন্ত্রিতনয় সুমন্তের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয় এবং তার মীমাংসার জন্যে তাঁরা এক অচেনা দেশে গিয়ে পৌঁছোন। নানা ঘটনাজালে জড়িয়ে গিয়ে সুকুমার রাজগৃহে বন্দী হন। পরে সুমন্তের কৌশলে তিনি মুক্তি এবং সেই সঙ্গে রাজকন্যা রত্নবতীকে লাভ করেন। পুরস্কারস্বরূপ সুমন্ত সে দেশের মন্ত্রিকন্যাকে স্ত্রীরূপে পান।

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের মতো অতিপ্রাকৃতিক উপাদান এখানেও প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাই দেখি, এক সরোবরের পানি ছিটিয়ে দিলে মানুষ কপীরূপ ধারণ করে, আরেক সরোবরের পানিতে সে পূর্বরূপ ফিরে পায়। অঙ্গুরীয় হয়ে ওঠে অভীষ্টদাত্রী। কাল ও স্থানগত পটভূমি বলেও রচনাটিতে কিছু পাই না — যা কিনা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য। রচনারীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তৎসম শব্দের আধিক্য :

> একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইলেন।

ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় *রত্নবতী*র একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক বইটির প্রশংসা করেন নি, শেষে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কোন হিন্দু লেখক মুসলমানের ছদ্মনামে এটি রচনা করেছেন।[২] সমালোচনাটির মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও শেষ বাক্যে এসে চমক না লেগে পারে না। তখনো — যাকে বলা হয়, সাধু বাংলা ভাষা— সেই ভাষায় বাঙালী মুসলমান লেখকেরা বিশেষ আত্মপ্রকাশ করেন নি বলে এক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ ছিল অপ্রত্যাশিত। তাই মশাররফ হোসেনের নামের অন্তরালে হিন্দু লেখক

আত্মগোপন করে আছেন বলে ধরে নেওয়া হল। এই মনোভাবের অপনোদন করতে মশাররফ হোসেন সমর্থ হয়েছিলেন,— বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর এ কীর্তি নগণ্য নয়।

বসন্তকুমারী নাটক (১৮৭৩) মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় রচনা। এই নাটক প্রকাশের অল্পকাল পূর্বেও সংস্কৃত নাটকের রীতিতে নাট্যরচনার যে রেওয়াজ আমাদের দেশে পচলিত ছিল, *বসন্তকুমারী*তে তারই অনুসৃতি দেখতে পাই। নাটকের সূচনায় প্রস্তাবনার সংযোজনে এবং নট ও নটির কথোপকথনে তিনি সেই ধারাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবনার কৌতূহলোদ্দীপক অংশ উদ্ধৃত করি :

নট। আজকাল ভদ্র সমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে! তোমায় আজ একটি নতুন নাট্যাভিনয় কোরতে হবে।

নটী। আজকাল নব্য সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু সকল বজ্ঞজনমন্ডিত সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ কথা নয়।

নট। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ করা হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী। বসন্তকুমারী!!! কার রচিত ?

নট। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন রচিত।

নটী। ছি ছি !! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।

নট। কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? হাজার হোক মুসলমান।

নট। অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।

নটী। নাথ ! ক্ষমা কোরবেন। আপনাদের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকের অভিনয় করে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন। সভাস্থ মহোদয়গণের চিত্তরঞ্জন করা দূরে থাক বরং তাদের বিরক্তিই হবে।

যে মনোভাব থেকে *ক্যালকাটা রিভিউ*র সমালোচক *রত্নবতী*কে মুসলমানের লেখা বলে মনে করতে পারেন নি, সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাই নটীর উক্তিতে। উপরিউক্ত অংশটি তাই আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। *রত্নবতী* উপন্যাসে এবং *বসন্তকুমারী* নাটকে সমসাময়িক স্থান, কাল ও পাত্রপাত্রীর কোন ছাপ নেই। কিন্তু বাস্তব প্রতিবেশ সম্পর্কে মশাররফ হোসেন যে অচেতন ছিলেন না, তার প্রমাণ এখানে পাই। শুধু তাই নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় লেখক বিশেষ আগ্রহশীল, অথচ তাঁর সমকালীন মুসলমান সমাজে প্রধানত স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনারই লালন পালন চলছিল।

বসন্তকুমারী তিন অঙ্কের নাটক, মোট এগারোটি রঙ্গভূমি বা দৃশ্য আছে। প্রস্তাবনার গানটিসহ মোট আটটি গান এতে সংকলিত হয়েছে। কাহিনী সংক্ষেপে এই : সপত্নীপুত্র নরেন্দ্রের কাছে প্রণয়নিবেদন করে ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইন্দ্রপুরের রাণী রেবতীর চিত্তে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। রাজা বীরেন্দ্রসিংহের কাছে নরেন্দ্রের নামে মিথ্যে অভিযোগ করে তিনি তার প্রাণদন্ড ঘটালেন। নরেন্দ্রের স্ত্রী বসন্তকুমারী স্বামীর সহগমন করলেন। শেষ মুহূর্তে সমুদয় অবগত হয়ে বীরেন্দ্রসিংহ রেবতীকে হত্যা করে স্বয়ং মৃত্যুবরণ করলেন।

নাম-চরিত্র বসন্তকুমারীকে নায়িকা বলে অনুমান করা স্বাভাবিক হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন রেবতী। সংস্কৃত রীতি-অনুযায়ী রেবতীর রূপযৌবনের যে বর্ণনা নাটকে আছে এবং তার যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এতে পাই, তার সঙ্গে তার বয়সের (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ রঙ্গভূমিতে বিমলা বলছে যে, রেবতী ১৪ পেরোয় নি) অবশ্য মিল নেই। চরিত্রগুলি মোটামুটি সু-অঙ্কিত, বসন্তকুমারী একটু প্রাণহীন। পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার মধ্যে মধ্যে আছে, তবে তাতে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

তাঁর তৃতীয় রচনা *গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু* (১৮৭৩) বসন্তকুমারী'র আগেই ছাপা বেরিয়েছিল। *বঙ্গদর্শনে* এর সমালোচনায় লেখা হয় :

> গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখতে পারে না।
>
> ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ— একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মশাররফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।[৩]

এই সমালোচনার কথিত বাংলা ভাষা সম্পর্কে অভিজাত মুসলমানদের মনোভাব লক্ষণীয়। এই কারণেই, মুসলমানের লেখা বাংলা রচনামাত্রই অমুসলমান পাঠক ও সমালোচকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হত। মশাররফ হোসেনের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থটি রচনা হিসেবে অকিঞ্চিৎকর, এক স্থানে লর্ড মেয়োর প্রশস্তি আছে।

একই বছরে তাঁর *জমিদার দর্পণ* নাটকটি প্রকাশিত হয় (১৮৭৩)। এটির মূলে যে দীনবন্ধুর *নীল দর্পণ* নাটকের (১৮৬০) প্রভাব কার্যকরী ছিল, তা যেমন এর নামকরণ, তেমনি ঘটনাবিন্যাসেও সুস্পষ্ট। দীনবন্ধুর নাট্যরচনার উদ্দেশ্য যেমন নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র পরিস্ফুট করে তোলে, মশাররফ হোসেনের উদ্দেশ্য তেমনি জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করা। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ঘটনাটি সত্যমূলক।

প্রসঙ্গক্রমে উনিশ শতকের বাংলার হঠাৎ-নবাবদের সম্পর্কে সশ্লেষ উক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে :

> সূত্র [ধর]। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরের কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে।... বলব কি জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।... এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরুচালের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদের কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুটিয়ে ঘিরে বসে থাকে।... এরা দুই দল।

নট। দল আবার কেমন ?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

জমীদার দর্পণ তিন অঙ্কের নাটক। দুশ্চরিত্র জমিদার হায়ওয়ান আলীর লালসার অগ্নিতে জনৈক রায়তের পত্নী নূরুন্নেহারের অনিচ্ছুক আত্মাহুতি দানই নাটকটির মূল ঘটনা। জমিদারের স্বেচ্ছাচার ও অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে আমিরনের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

> মাটির হাকিম মেরে ফেল্লে তুমি কি কর্ব্বে ? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস কর্ত্তে পার্ব্বে না? নালিশ কল্লে এই হবে, এক দিনে তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা সে কি না কর্ত্তে পারে?

আপন ক্ষমতামদমত্ত জমিদার কিন্তু স্বেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি সত্ত্বেও ইংরেজ আইনকে ভয় করেন :

> ওহে আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না কর্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এককাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষ-দাঁত ভাঙ্গা !... আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করিছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুইটি আর কমন লর মার প্যাঁচ বোঝে।

ইংরেজ শাসনব্যবস্থার, বিশেষ করে তার বিচার বিভাগের অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন নাট্যকার এখানে করতে চেয়েছেন, তা আমাদের উনিশ শতকী পরিবেশের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিল। দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বিপন্ন নুরুন্নেহারও কাতর আবেদন জানিয়েছে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে :

> শুনেছি যে মহারানী সকলের ওপরে বড়, ঐ সাএবদের ওপরেও বড়, আমবা যেমন তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তাঁর প্রজা। তিনি কি এর বিচার কর্ব্বেন না? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা ! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এই দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি তা জান্তে পাচ্ছো না ? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা ? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না?

উনিশ শতকের অনেক বাঙ্গালি লেখকের এবং সমাজকর্মীর মতো মশাররফ হোসেনও অন্যায় অত্যাচার দেখে শঙ্কিত হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন, প্রতিবাদের প্রেরণা অনুভব করেছেন। কিন্তু এইসব অন্যায়-অত্যাচারকে অসংলগ্ন ঘটনা বলে মনে করেছেন — এসব যে একটা বিশেষ সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল, এ উপলব্ধি তাঁদের চিত্তে জাগেনি। চিন্তাধারার এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁদের বেদনাবোধের যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

এই বেদনাবোধের প্রকাশে এবং তার চাইতেও যা বড় কথা — সম্পূর্ণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনে মশাররফ হোসেন আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করেন। সমসাময়িক জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা এটিই তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। মুসলমান জমিদার মুসলমান প্রজার উপরেই কেবল অত্যাচার করেছেন, তা নয়, আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছে হরিদাস বৈরাগী আর তিতু মোল্লা — দুই সম্প্রদায়ের দুই ধর্মপ্রাণ চরিত্র। জীবনের অভিজ্ঞতায় মশাররফ হোসেন দেখেছিলেন যে, এই ধরনের চরিত্র ধর্মের কথা বলে কিরকম ভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে। সেই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এখানে ঘটেছে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই নাটকটির সমালোচনা বেশ চিত্তাকর্ষক। *জমীদার দর্পণ* নাটকের রচনানৈপুণ্যের আংশিক প্রশংসা করে সমালোচক বলেছেন যে, জমিদারদেব সঙ্গে প্রজাদের আচরণ অনেক সময়ই সমর্থনযোগ্য নয়। পাছে প্রজারা উচ্ছৃঙ্খল কার্যে প্ররোচিত হয়, সেই আশঙ্কায় সমালোচক এর প্রচার বন্ধ করার পরামর্শ দেন।[৪] শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধি ও পবিবেশের প্রভাব সাহিত্য-সমালোচককে কিভাবে বিভ্রান্ত করে, এই সমালোচনাটি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নাটক হিসেবে *জমিদার দর্পণ* ত্রুটিমুক্ত নয়। *নীল-দর্পণের* অনুকৃতি খুবই স্পষ্ট। সঙ্গীতের আধিক্য বিরক্তিকর। চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপে কিছু দক্ষতা আছে। কিন্তু মূলগত অভিপ্রায়ের জন্যেই নাটকটি মূল্যবান। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক হিতসাধনের উদ্দেশ্য (যা নব্য লেখকের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন [৫]) নিয়ে লেখা নাটক বলে এর প্রশংসা আমরা করতে পারি। কিন্তু *বঙ্গদর্শন* সে কারণেই বেদনা অনুভব করেছেন।

গো-জীবন (১৮৮৮) প্রবন্ধটি মশাররফ হোসেনের একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় দেয়। ইতোপূর্বে তাঁব অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেছি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনের জন্য তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ এ প্রবন্ধ-রচনার প্রেরণা দিয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ নির্মূল করবার উপায়স্বরূপ তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, মুসলমানদের উচিত গোমাংস-ভক্ষণ ত্যাগ করা। অল্পকাল পূর্বে দয়ানন্দ সরস্বতীর গোহত্যা নিবারণী আন্দোলন (১৮৮২) হয়তো সমস্যাটি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তোলে।

> আমি মোসল্মান — গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ি গো-বৎস্যের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব, স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাবদেশে গোপন করিব ?…
>
> আর একটি কথা। এই বঙ্গ রাজ্যে হিন্দু-মোসল্মান উভয় জাতি প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক — সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?
>
> কালে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু হিন্দু-মোসল্মানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।…
>
> জানিবেন ভারতে হিন্দু-মোসল্মান একত্র হইয়া একযোগে কোন কার্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। একপক্ষ শতবর্ষ মাথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবে না।… [১-১৯]

গো-জীবন প্রবন্ধ রচনার জন্যে রক্ষণশীল মুসলমানের ক্ষোভ জাগ্রত হওয়া অকারণ না হতে পারে, কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধন সম্পর্কে মশাররফ হোসেন যেসব মন্তব্য করেছেন, তা যুক্তি ও বাস্তববুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত। তবে

ইংরেজ শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের প্রকাশ এতেও ঘটেছে :

এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ সিংহ ইহার শাসনকর্ত্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই — ভয়েরও কোন কারণ নেই। সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে।

এই বিশ্বাস, এই আস্থা মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত নয় — বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উদীয়মান মধ্যবিত্ত মাত্রই এই আশ্বাস সযত্নে লালন করেছেন।

গো-জীবন-এর প্রথম প্রস্তাব 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' *আহমদী*[৬]পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলে *আখবারে এসলামীয়া* পত্রে তার প্রতিবাদ বের হয়। প্রতিবাদকারীর মতে মূল প্রবন্ধলেখক 'মুসলমান নহেন'। এই উক্তির সমর্থনে আরো রচনা পত্রস্থ হয় এবং টাঙ্গাইলের সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী শফীউদ্দীনের বাসগৃহে ধর্মসভা অনুষ্ঠান করে লেখককে 'কাফের' স্থির করা হয় এবং তাঁর স্ত্রী তালাক হবার ফতওয়া দেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ মশাররফ হোসেন এঁদেরকে আদালতে অভিযুক্ত করেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মামলা-মোকদ্দমা, বাদ-প্রতিবাদের এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে পণ্ডিত রেয়াজ অলদীন আহ্‌মদ মশহাদীর *অগ্নি-কুক্কুট*। এই সমুদয় ঘটনা থেকে আমরা বুঝিতে পারি যে, রক্ষণশীল মুসলমানদের সামাজিক বৃত্ত থেকে দূরে সরে যাওয়া মশাররফ হোসেনের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে পড়ল।

উদাসীন পথিকের মনের কথায় (১৮৯০) লেখকের পারিবারিক ইতিহাসের কিছু উপাদান আছে। আবেগের প্রাবল্যে অতিশয়োক্তির যে প্রবণতা মশাররফ হোসেনের রচনাবলীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার একটি উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি এতে আছে। জনক-জননীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর পিতা বিলাস-ব্যসনে কালক্ষয় করতেন এবং নর্তকী ও বাঈজীদের নৃত্যগীতে অতিরিক্ত আসক্ত ছিলেন, একথা উল্লেখ করার পরও তিনি বলেছেন যে, 'মীর সাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জল রত্ন'। আর তাঁর গর্ভধারিনী 'দৌলতননেসা পবিত্রা মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী'। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো নারী 'মুসলমান রমণী-মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাইলাম না' — এমন কি, হজরত মুহম্মদের (দঃ) স্ত্রী-কন্যা, মুঘল সম্রাজ্ঞী ও সাহিত্যের নায়িকাদের তুলনায়ও তিনি শ্রেষ্ঠ, একথা লেখক বলেছেন। এই উক্তিতে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা ও সাহসের পরিচয় থাকলেও তাঁর ঔচিত্যবোধের অভাব পীড়াদায়ক।

উদাসীন পথিকের মনের কথায় ব্যক্তিগত পটভূমিটি সুবিস্তৃত হলেও একমাত্র নয়। পারিবারিক ইতিহাস, বাস্তব ঘটনা এবং উপন্যাসের একটা মিশ্রিত রূপ এতে ধরা পড়েছে। কুষ্টিয়া-অঞ্চলে নীলকরের অবাধ অত্যাচারের চিত্র উদঘাটন করাই ছিল মশাররফ হোসেনের লক্ষ্য। নীলকরদের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর ভূমিকা সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন :

স্বার্থই অনর্থের মূল, স্বার্থই দুর্দশার সোপান, জগতে স্বার্থই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোক দিয়েই স্বদেশীয়ের সর্বস্বান্ত করিতেছেন। [১২]

দেশের লোকের এক ক্ষুদ্রাংশ যেমন নীলকরের করতলগত, তেমনি এর অধিকাংশ নানাভাবে বিভক্ত, এই বিভেদ দূর করার কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। প্যারীসুন্দরী লেখকের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেই বলেছেন :

> প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই। [১২]

কেনীর মুখ দিয়েও আমাদের অনৈক্যের প্রতি শ্লেষসূচক ঈঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু লেখক দেখে প্রীত হয়েছেন যে, নীল-আন্দোলন বাঙালীর এই দুর্নাম আংশিক হলেও — দূর করতে পেরেছে। তিনি যখন বর্ণনা করেন,

> হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না। ...হিন্দু-মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সার বাঁধিয়া পথে বাহির হইল।...সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। [১৪৩-৫]

— তখন এই বর্ণনার পেছনে লেখকের যে আবেগ সক্রিয় ছিল, তার স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীনবন্ধুর মতো তিনিও নীল আন্দোলনকে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী নীলকরের কার্যাবলীর প্রতিবাদ-রূপে দেখেছেন। ইংরেজ সরকার যে স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে নীলচাষের উদ্যোগ করেন এবং সমগ্র অন্যায়-অত্যাচার যে তার ফল, সেটা এঁরা অনুভব করেন নি। তাছাড়া, সামগ্রিকভাবে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার মাহাত্ম্য এঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই মশাররফ হোসেন লিখেছেন :

> মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে, পূর্ণ কলেবরে, পূর্ণচন্দ্ররূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার আর্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছে। মহামতী লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নীলকর দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জন্য... মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। [১৩৯-৪০]
>
> নীলকর আমাদের রাজা নহে। তাহারাও প্রজা, আমরাও প্রজা, — রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? [১৫৭]

উদীয়মান মধ্যবিত্তের পক্ষে এই আস্থা প্রকাশ করা স্বাভাবিক এবং পরবর্তীকালে এই আশাভঙ্গের সুতীব্র বেদনাও তাকে মর্মে অনুভব করতে হয়।

ইংরেজ-শাসনব্যবস্থার প্রতি এই স্বাভাবিক বিশ্বাস সত্ত্বেও *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-কামনা আছে, তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়। কেবল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা নয়, কেবল ঐক্যমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা নয়, মাতৃভূমিকে যথার্থ ভালবাসার প্রেরণা এতে আছে :

> 'হোম' যে কি জিনিষ, 'হোম' কথাটি যে কত মিষ্টি তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙালী, আমাদের 'হোম'কে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানি না।... আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমুদয়

জগৎ আমাদের হোম। কনস্ট্যান্টিনোপল কি আমাদের নহে? সেন্ট পিটার্সবর্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশে যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।

এ তো লাক কথার এক কথা, এ কথায় উত্তর নাই। আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি।--- এ জগতে আমার কেহই নাই, সে কথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা রখিবার স্থান নাই। ইহার পরেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পাঠক ! হোমের জন্য পথিকের প্রাণ কাঁদে। [৭১-৭২]

এই কথাগুলো যে বিশেষ করে দেশীয় মুসলমানদেব উদ্দেশ্যে বলা, সতর্ক পাঠকের কাছে তা অনায়াসে ধরা পড়ে। সেকালে দুনিয়ার চাইতে আখেরাতের ভাবনায় মুসলমানেরা বেশী চিন্তিত ছিলেন, বর্তমানের চাইতে অতীত তাঁদের প্রিয় ছিল, ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ সত্যি সত্যি আমাদের মাতৃভূমি কি না, এ সন্দেহও অনেকের মধ্যে জেগেছিল। মশাররফ হোসেনের সতর্কবাণী তাই তাঁর সজাগ মানসিকতার পরিচায়ক।

উদাসীন পথিকের মনের কথায় সত্য ও কল্পনার মিশ্র উপাদানে সৃষ্ট এমন একটি সাহিত্যরূপ ধরা পড়েছে, যা আমাদের পবিচিত আঙ্গিক সমূহের কোন একটির অঙ্গীভূত করা চলে না। হয়তো লেখকের মানসিকতা ইতিহাস-রচনার অনুকূল ছিল না, উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যথেষ্ট নির্লিপ্ততা রক্ষা করাও তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনারীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট ও আত্মগত উক্তি এতে যথেষ্ট আছে। উপভোগ্য ব্যঙ্গোক্তি আছে :

সাহেব অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চম্পট দিলেন না — প্রস্থান করিলেন না — রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না — আত্মরক্ষা করিলেন।

তবে realistic deails দিতে গিয়ে মশাররফ হোসেন কোথাও কোথাও রুচিগত শৈথিল্য প্রকাশ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ শৈথিল্য অমার্জনীয় মনে হয়, যেমন কেনীর-অসুস্থতাব বিবরণ (পৃ-১৯৩-৯৪)। এই ত্রুটি ব্যতিরেকে রচনাটি উপভোগ্য।

তবে নীল-আন্দোলনের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে মশাররফ হোসেন কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রকৃত ঘটনাকালে তাঁর পিতা --- যাঁর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা উপরে উল্লেখ করেছি — ছিলেন নীলকরের পক্ষে। চাষীদের নেতা ছিলেন তাঁদেরই আত্মীয়, কিন্তু ইনি লেখকের পিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা করেছেন। ফলে, অনুগত পুত্র ও বিবেকী লেখকের চিন্তা একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয় নি। আন্দোলনের প্রশংসা করেও তাঁদেরকে সমর্থন করার যুক্তি খুঁজেছেন।

তাঁর সুবিখ্যাত *বিষাদ-সিন্ধুর* তিনটি পর্ব প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯০ খৃস্টাব্দে। কারবালার বিষাদান্ত ঘটনা এই গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়। গ্রন্থাকার বলেছেন, 'পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া বিষাদ-সিন্ধু বিরচিত হইল।' মশাররফ হোসেন আরবী-ফারসী জানতেন কিনা, তাব স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাই না। *মকতুল হোসেন*, *জঙ্গনামা* ও *শহীদে কারবালা* প্রভৃতি মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার যে কাল্পনিক বিবৃতি আছে, *বিষাদ-সিন্ধু-তে* আমরা তারই পরিচয় পাই। সম্ভবত মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকেই তিনি অনুসরণ করেছিলেন এবং তার একটি সাধু গদ্যরূপ পাঠকদেরকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাহলেও লেখকের মানসিকতার বিশেষ পরিচয় বইটিতে ধরা পড়েছে। শিয়া মতাবলম্বী ফারসী কাব্য-রচিয়তাদের কাছে যেমন, তেমনি মিশ্র ভাষারীতির কবিদের কাছেও এই কাহিনী-কথনের অন্তরালবর্তী আবেগ তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ ছিল। এজিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, হাসান-হোসেনের প্রতি প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁদের হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছে। মশাররফ হোসেন কিন্তু ধর্মবুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উপাখ্যান রচনা করতে বলেন নি ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তো নয়ই। কারবালা কাহিনীর মধ্যে নিয়তি-নিপীড়িত মানবভাগ্যের যে করুণ লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করে মাইকেল মধুসূদন এই বিষয় নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন[১] ধর্মনিরপেক্ষ সেই প্রবল মানবীয় চেতনাই মশাররফ হোসেনকে *বিষাদ-সিন্ধু* রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বমাত্র, একথা ঐতিহাসিক সত্য মশাররফ হোসেনের রচনায় এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ এজিদের অনিবার্য রূপতৃষ্ণার উদভ্রান্তকারী শক্তি সম্পর্কে মাবিযার মহিষীর জবানীতে লেখক বলেছেন :

> এজিদ যে ফাঁদে পড়িয়াছে, সে ফাঁদে জগতের অনেক ভাল লোক বাঁধা পড়িয়াছেন। শত শত মুনি-ঋষি, ঈশ্বরভক্ত কত শত মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাশক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষ এই ফাঁদে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আসক্তি, প্রেম ও ভালবাসার কথা ধর্মপুস্তকেও রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, মানুষের মনেই ভালবাসার জন্ম, ইহাকে শিক্ষা দিতে হয় না, দেখাদেখিও কেহ শিক্ষা করে না, ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে, বাদশা নমদার! ইহাতে নূতন কিছুই নাই। আপনি যদি মনোযোগ দিয়া শুনেন, তবে আমি এই প্রণয় প্রসঙ্গ অনেক শুনাইতে পারি, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতও পারি। জগতে শত শত ভালবাসার জন্ম হইয়াছে, অনেকেই ভালবাসিয়াছে, তাহাদের কীর্তিকলাপ আজ পর্য্যন্ত কেন, জগৎ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানব-হৃদয়ে সমভাবে অঙ্কিত থাকিবে। বলিবেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা চাই। ভালবাসারূপ সমুদ্র যখন হৃদয়াকাশে মানসচন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন আর পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। পিতা, মাতা, সংসার, ধর্ম, এমন কি ঈশ্বরকেও মনে থাকে কিনা সন্দেহ। ইহাতে এজিদের দোষ কি বলুন দেখি? এই নৈসর্গিক কার্য নিবারণ করিতে এজিদের কি ক্ষমতা আছে? যাহাই বলুন মহারাজ! ভালবাসার ক্ষমতা অসীম। [৫-৬]

সর্ববন্ধন-ছেদন ভালবাসার এই অপরিসীম ক্ষমতাকে মশাররফ হোসেন সামাজিক মনের দ্বারা চালিত হয়ে নিন্দা করেন নি, শিল্পীমনকে জাগ্রত রেখে সবিস্ময়ে অবলোকন করেছেন। এই প্রেমের মধ্যে তিনি দেখেছেন নিয়তির অদৃশ্য হস্তের খেলা। তাই রূপতৃষ্ণার দু:সহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এজিদ যে রোষবহ্নির সূত্রপাত করেছে, তাতেই একে একে প্রেরিত পুরুষের প্রায় সকল বংশধর সানুচর আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। এজিদ যেমন, তেমনি তার প্রণয়ও এই সর্বনাশী ঘটনার উপলক্ষ মাত্র।

> ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা এই ট্রাজেডিকে গভীরতা দান করেছে। যেদিন, প্রভু মোহাম্মদ প্রধান শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে উপনিবেশ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বর্গীয় প্রধান দূত জেব্রাইল আসিয়া তাঁহার নিকট পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

সেদিন সকলেই অনাগত ঘটনাপ্রবাহের বিষাদান্ত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হলেন। তারপর থেকে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা এড়িয়ে যাবার কত চেষ্টাই না হয়েছে! কিন্তু মাবিয়ার স্ত্রীসংসর্গত্যাগ ও পুত্রনিধনের সংকল্পের মতোই একে একে সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। অদৃষ্টের নাগপাশ থেকে হাসান ও হোসেনের মুক্তিলাভ-প্রচেষ্টার কী করুণ ইতিহাসই না পাঠকের সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে! কিন্তু এই চেষ্টার পথে প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁদেরকে টেনে নিয়ে গেছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আবার যে মুহূর্তে শত্রুজিৎ এজিদ সাফল্যের বরমাল্য লাভ করেছে, সেই মহূর্তে সর্বনাশী নিয়তি তাকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে চলেছে। তারপর এজিদের পতন। এই পতনের জন্য দায়ী হানিফা আবার তখন আত্মসংযমে অক্ষম হওয়ায় নিয়তি-নির্ধারিত দণ্ড লাভ করেছেন। *বিষাদ-সিন্ধুর* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের এই অদৃষ্টলাঞ্ছিত মূর্তির আলেখ্য পুরুষকারের এই শোচনীয় পরিণামের কাহিনী ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মানবভাগ্যের এই আবেগময় রূপায়ণের জন্যই *বিষাদ-সিন্ধু* মূল্যবান। রচনারীতির পরিপাট্য, কাহিনীর নাটকীয়তা, ঘটনার চমৎকারিত্ব ও চরিত্রচিত্রণের যে পরিচয় প্রথম পর্বে আছে, পরবর্তী পর্ব দুটিতে তা অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছে। তবু, মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর মধ্য এটি যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ঘটনার গতি রুদ্ধ করে আত্মগত ভাবনার সংযোজন মশাররফ হোসেনের গদ্যরচনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই কৌশল তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেছেন, বলে মনে হয়, তবে বঙ্কিমের তুলনায় মশাররফ হোসেনের এই উক্তি দৈর্ঘ্যে ও সংখ্যায় বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র স্বল্প কথায় যা বলেছেন, তার চেয়ে বুঝিয়েছেন অনেক বেশী : সতর্ক পাঠকমনে তাঁর অনুক্ত বক্তব্যও স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। মশাররফ হোসেন তাঁর ছোট বক্তব্য বেশী কথায় বলেছেন এবং কিছুই বলতে বাদ রাখেন নি। *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* এবং *গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে* এ ধরনের অনেক উক্তি আছে, *বিষাদ-সিন্ধুতেই* পাই সর্বাধিক।[১০] মশাররফ হোসেনের চিন্তাভাবনা এসবক্ষেত্রে প্রায় প্রগলভতায় রূপান্তরিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না — যদিও কখনো কখনো তা উপভোগ্য হয়।

বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক অনেক কথা বলেছেন। সমসাময়িক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে এমনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হচ্ছে বন্দীদশায় মাবিয়ার প্রধানমন্ত্রী হামানের উক্তি :

> রাজার অভাব হইলে রাজ্য পাওয়া যায়, রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই তাহার নির্বাপণ হয়, উপযুক্ত দাবি বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দমনীয় জেদও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়।... কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও সে মহামূল্য রত্ন আর হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা- সূর্য একবার অস্তমিত হইলে তাহার পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা !... রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রজার — বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ

থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য থাকে, একতা বন্ধনে আস্থা থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্য বিরোধী যদি কেহ থাকে, জাতিভেদ হিংসা ঈর্ষা এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্য বিরোধী যদি কেহ থাকে, বিদ্যার চর্চা থাকে, আর সর্বোপরি ঈশ্বরভক্তি থাকে, তবে যুগ-যুগান্তরের হউক, শতাব্দী পরেই হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতেই হউক, কোন কালেই হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতা-গগনে স্বাধীনতা-সূর্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে। [৪৪৮-৪৯]

গভীর আশায় উজ্জীবিত হয়ে মশাররফ হোসেন এই কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু কেবল আশাবাদ নয়, এখানে তাঁর পরিচ্ছন্ন ও অগ্রসর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। 'রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা' — এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো শিক্ষা তিনি বাইরে থেকে লাভ করতে পারেন নি — এই বোধ তাঁর পক্ষে অনেকখানি অনুভূতিলভ্য এবং তা বড় কম কথা নয়। *সাম্য* (১৮৮০) বইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এই ধরনের ধারণা প্রকাশ করেছিলেন,[১১] কিন্তু তিনি নিজেই আবার এই বইটিকে অযথার্থ বলে বাতিল করে দেন। মশাররফ হোসেন যে আবার স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন দেখেছেন, তা তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবজাত হতে পারে (১৮৭৫ এ শিশিরকুমার ঘোষের ইন্ডিয়ান লীগ, ১৮৭৬এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-সভা এবং ১৮৮৫তে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়)। কিন্তু এই স্বাধীনতালাভের উপায়স্বরূপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে প্রীতিসঞ্চার ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপরে তিনি যে জোর দিয়েছেন, তা সেকালের অনেক সমাজহিতৈষীর চেতনায় এতখানি গুরুত্ব লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু এই চেতনাকে মশাররফ হোসেন শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারেননি। *গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে* (১৮৯৯) তাঁর চিন্তাধারার রূপান্তর আরম্ভ হয়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের অন্যান্য গ্রন্থ — *এর উপায় কি ?* প্রহসন (১৮৭৬), *সঙ্গীত লহরী* (১৮৮৭), *বেহুলা গীতাভিনয়* (১৮৮৯) ও *পঞ্চনারী পদ্য* (১৮৯৯) — বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। *সঙ্গীত-লহরী* থেকে *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায়* চারটি গান সংকলিত হয়েছে।[১২] তার মধ্যে দুটি বাউল ভাবের, একটি *বিষাদ-সিন্ধুর* শেষোক্ত উদ্ধৃতির প্রায় প্রতিধ্বনি :

ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল।
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল।।
মৃত্যুজীব জাগিতেছে গঙ্গাবাজীর বোলে।
ভারতসভা জাতিসভা হচ্ছে দলে দলে রে।।
নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান।
ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে।।

দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা এখানে হয়তো আছে, তার চেয়ে বেশী আছে তাঁর আন্তরিক কামনাকে বাস্তবে রূপায়িত দেখার আকাঙ্ক্ষা।

সাহিত্যিক-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু মশাররফ হোসেনের মনোভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। সেখানে তিনি উগ্র স্বাতন্ত্র্যপন্থী মুসলমান। *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* থেকে তাঁর চিন্তাধারার পর্বান্তর ঘটেছে। জীবনের ঐশ্বর্য নয়, বিকৃতিকেই তিনি এখানে বড় করে

দেখেছেন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজেই তার শিকার হয়েছেন।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী — রচনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দপ্তরের* (১৮৭৫) প্রেরণা থাকলেও রচনারীতির দিক দিয়ে দুটি সগোত্র নয়। কমলাকান্তের প্রবন্ধ ও নক্‌শাগুলিতে জীবন-সমালোচনার পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর আছে : তার বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্যরসের প্রেরণা, চিন্তার খোরাক ও কল্পনার বিলাস — সবই জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে আহরিত। গাজী মিয়াঁ একটি সম্পূর্ণাবয়ব কাহিনী বলতে চেয়েছেন : জীবনের সামগ্রিক রূপটি তিনি তুলে ধরেন নি — সমালোচকের চোখে তার ত্রুটি, তার অসম্পূর্ণতা, তার গ্লানিময় দিকটি উদঘাটিত করেছেন। সমাজ-সমালোচনা হিসেবে মশাররফ হোসেনের রচনা বিচার্য; জীবনের গভীরতর উপলব্ধি ও রূপায়ণের সামগ্রীকতার দিক দিয়ে, স্বতোৎসারিত দার্শনিকতায়, প্রকাশের অত্যুজ্জ্বল ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মশাররফ হোসেনের ঋণ অন্যভাবে আছে। সপ্তদশ নথিতে মনিবিবির মৃত্যুর দৃশ্য *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে (১৮৭৫) বর্ণিত শৈবলিনীর নবকযন্ত্রণার দৃশ্যের (ষষ্ঠ খন্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : 'যোগবল না Psychic force') প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তথাকথিত অভিজাত সমাজে কতদূর নৈতিক অধ:পতন ও সামাজিক দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, *গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে* মশাররফ হোসেন তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ ও অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে কুঞ্জনিকেতনের বেগম পয়জারুন্নেসার অন্তরঙ্গতার একটি কাহিনী এবং জমদ্বার গ্রামের জমিদার সোনাবিবি ও তাঁর 'বেয়ান' মনিবিবির পারস্পরিক শত্রুতা নিয়ে আরেকটি কাহিনী গড়ে উঠেছে।

গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে যে সমাজ-সমালোচনা আছে, তা নিরপেক্ষ নয়। গ্রন্থের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী বাস্তব জগতের মানুষ, লেখকের ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ তাঁদের চরিত্রকে উজ্জ্বলতা বা কালিমা দান করেছে। ফলে কোন সুস্থ মনোভাবের পরিচয় এতে নেই।[১৩] পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে তিনি নিজেও পঙ্কমুক্ত হতে পারেননি। তবে মধ্যে মধ্যে উপভোগ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে, যদিও তার নিদর্শন খুব বেশী নেই। অরাজকপুরের জমিদার সবলোট আলীর লাম্পট্যের বিবরণ এমনি বিদ্রূপ ও হাস্যরসে কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। নারীসঙ্গলিপ্সু জমিদার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে লোক পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন :

> দরজার নিকট যাইয়া অর্দ্ধ শরীর পর্য্যন্ত দরজার বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন — কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন — 'দেখ ত বেটা কি পাজি ! রাত্র প্রভাত হয়ে যায় কোন খোঁজ খবর নাই। এরা নিজেব লাভ নিয়েই ব্যস্ত; আমার দিকে আর কেউ ফিরে চায় না।'
>
> দূরে ভেড়ুয়া খাঁ গৃহ-দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল — 'হুজুর ! সে এল না। তার জ্বর হয়েছে।'
>
> 'তোর খালা কি বলিল ?'
>
> 'না, সেও আজ আসতে পারে না। তার জামাই, দুই ছেলে নিয়ে, সন্ধ্যার সময় এসেছে।'
>
> 'তারপর উপায় ?'

'উপায় আর কি ? শেষে নসার মার কাছে গিয়েছিলাম। সেও এল না, বল্লে শরীর খারাপ।'

সবলোট আলী রাগতভাবে বলিলেন, 'যা, বেটা তোর মাকে ডেকে নিয়ে আন।'
ভেড়ুয়া খাঁর ত্রস্ত পদে গমন। এদিকে দরওয়াজা বন্ধ। [৩২]

এখানে জমিদারের অপরাধের জন্য পাঠকমন যত বিদ্রোহী হয়, তার চেয়ে বেশী কৌতুক অনুভব করে তাঁর হতাশায় এবং তাঁর দুষ্কৃতির সহায়কদের বিপন্ন অবস্থায়।

এরকম আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হাকিম ভেলানাথ এসেছেন পয়জারুন্নেসার গৃহে। মহিলাটি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে হাকিম বলছেন :

আমি আজ এত সুখী হয়েছি যে মুখে প্রকাশের সাধ্য নাই। মুসলমান মধ্যে এরূপ ইন্‌লাইটেন, এত উন্নত মন, উন্নত চিন্তা, উন্নত আশা, উন্নত চক্ষু, উন্নত হৃদয়, উন্নত বক্ষ আমি কখন দেখি নাই। ধন্য শিক্ষা, ধন্য সাহস, শত সহস্র ধন্যবাদ, হাজার থাঙ্ক, হাজার হাজার কোরনিস, হাজার হাজার নমস্কার আপনার চরণ যুগলে। ধন্য ধন্য মেহমুডেন লডী ! এত উন্নত ! ধন্য ধন্য পাড়াগাঁয়ের পর্দ্দানসীন জানানা ! এত উন্নত ! [৩৮]

পরিস্থিতির grotesque রূপটি সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও পর্দার পেছনে লেখকের বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গীও আমাদের কল্পনায় ধরা দিতে বিলম্ব করে না।

গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে লেখকের নারী-স্বাধীনতা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই রচনায় অপর লক্ষণীয় বিষয় তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয়। তাঁর হিন্দু-চরিত্র যেমন বলছেন,

ভায়া। নেড়ে জাত আমার চক্ষের শূল। আমার ক্ষমতা থাকলে বাঙ্গালা দেশ থেকে সব মুসলমানগুলকে তাড়িয়ে দিতাম।

তেমনি মুসলমান চরিত্রও হিন্দুদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করছেন মনে মনে। নামাজের সময় গান-বাজনা বন্ধ করার আবেদন নিয়ে যেসব মুসলমান ঋতুরাজবাবুর কাছে এসেছিল, তাঁদেরকে তিনি বললেন :

আমার কাছারির সময় একেবারে সমুদায় নামাজ সেরে নিলেই হয়। তবে বাকি রইল এক রবিবার, আচ্ছা ! সে দিনের জন্য না হয় একরূপ বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারি।

এর প্রত্যুত্তরে যখন গানের আসরের উপরে হামলা হল, তখন দেখা গেল ধর্ম্মের সম্মান-রক্ষার চাইতে এই উপলক্ষে আসরে উপস্থিত মহিলাদের সম্মানহানি করাটাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

হিন্দু-মুসলমান এই বিরোধচিত্রের পাশাপাশি ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে :

গাজী মিয়া বলিতেছেন, তাই ইংরেজ আমাদের রাজা।...ইংরেজ চক্ষে অবিচার, অত্যাচার স্থান পায় না।...ইংরেজ রাজা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করুন, সমগ্র ধরার আধিপত্য লাভ করুন কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি।

মশাররফ হোসেন যাদের অনুগৃহীত ছিলেন — যেমন, নবাব আবদুল লতিফ (এঁকে তিনি *বসন্তকুমারী নাটক* উৎসর্গ করেছিলেন) বা দেলদুয়ারের গজনভীরা — তাঁদের চরিত্রে এই

ইংরেজ-বশ্যতা প্রবল ছিল। তাঁদের সান্নিধ্য মশাররফ হোসেনের এই ইংরেজ রাজ-প্রীতির উদ্বোধনে সহায়তা করেছিল, এমন অনুমান স্বাভাবিক মনে হয়।

অথচ পূর্ববর্তী বৎসরে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে মশাররফ হোসেন যা বলেছেন, তা স্বতন্ত্র মনোভাবের পরিচায়ক :

> ...*হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ* কি লইয়া বিবাদ ? কিসের জন্য বিবাদ ? সামান্য চৌকিদারের চক্ষু রাঙ্গানী পর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান একইভাবে থতমত, অগ্রের পদ পশ্চাতে স্থাপিত। লাল পাগড়ি নয়নে পড়িলেই ভয়ে আড়ষ্ট। দারোগার নাম শুনিলে হয়ত পেটের ভাত চালে পরিণত। গোরা পল্টনের নামে প্রায় জ্ঞানহত। বঙ্গে সাহস ও বলবীর্য্যে উভয় জাতিই প্রায় সমান। এ অবস্থায় বিবাদ-বিসম্বাদ, মনান্তর কথাটা, খোসগল্পের এক অঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যায়?...হিন্দু-মুসলমান উভয়ে ব্রিটিশ সিংহের পদ-প্রসাদ ভিখারী। উভয়েই নত শিরে, ভক্তি সহকারে চির আজ্ঞাকারী।...
>
> যেমন ভ্রাতার বিবাদ, আত্মীয় স্বজনে কলহ, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে মেয়েলী ঝগড়া। যেমন এ পাড়ায় দলাদলি, হরিসভা ব্রাহ্মসভায় বচসা। যেমন সাহিত্য সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্ম্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনোমালিন্য যেমন শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব, লিবারেল কানযারভেটিভে মনান্তর। বিচারগৃহে বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষের মোক্তারদলের কর্কশভাব, রোষের লক্ষণ। যেরূপ চিরভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর সামান্য কোন কথায় মনোভঙ্গ — অভিমানের সমাবেশ।
>
> এই ত বিবাদ ! তুমি কলাপাতার যে দিক পরিশুদ্ধ জ্ঞান কর, আমি সেদিক ঘৃণা করি। আমি তোমার তক্তাপোষের নিকট যেই গিয়াছি, অমনি তোমার হুকোর জল কি যেন হইয়াছে।...
>
> কথাতেই কথা আইসে। আমাদের মধ্যে আজকাল একদল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন। ইহারা রাজ-প্রসাদভোগী নূতন চাকুরিয়া। ইহাদের আক্ষেপ এই যে কাচারীময় সকলেই হিন্দু। উপার্জন উন্নতি আমাদের একেবারেই নাই। সকলেই আপন আপন জাতীয় টান টানিয়া থাকেন। কথা মিথ্যা নহে ![১৮]

মশাররফ হোসেন এখানে বিস্ময়কর মুক্ত দৃষ্টি ও বাস্তব-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ রাজনৈতিক নয়, প্রধানত অর্থনৈতিক এবং অংশত সামাজিক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে হিন্দু কর্মচারী ছাড়া মুসলমান জমিদার ও সংবাদপত্র পরিচালকদের চলে না। সুতরাং এভাবে পরস্পরসমর্থিত দুই সম্প্রদায়ে মৌলিক বিরোধের সুযোগ নেই। তাই আত্যন্তিক কামনা করেছেন যে, এই কল্পিত বিরোধ যেন আমরা বিস্মৃত হই।

সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মশাররফ হোসেনের এই মনোভাবের রূপান্তর কেন ঘটল, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। সমসাময়িক কালে মুসলিম বাংলার নবজাগরণের আন্দোলন তাঁর উপরে হয়তো প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু সেটা একমাত্র কারণ হতে পারে না। বাংলাদেশে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার উন্মেষ হয় অনেক আগেই : ১৮৬৩তে কলকাতায় মেহোমেডান লিটারারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা তার দিগ্‌দর্শন। ব্যক্তিগত জীবনে মশাররফ হোসেন যখন এই সমিতির কর্ণধার নবাব লতিফের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে রয়েছেন,

তখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের কথা বলেন নি — বরঞ্চ মিলনকামনার প্রকাশের এক শ্রেণীর মুসলমানকে ক্ষুব্ধ করতে পশ্চাৎপদ হন নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তিনি ধর্মজীবনের মাহত্ম্যগান করলেন এবং হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপরে জোর দিলেন। মশাররফ হোসেনের প্রথম জীবন নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কেটেছে — এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তাঁর *আমার জীবনী* ও *বিবি কুলসুমে* আছে। পরিণত বয়সে গত জীবন সম্পর্কে গ্লানিবোধ তাঁকে ধর্মাশ্রয়ী করতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে , এ সময় তিনি ধর্মীয় প্রচার-সভায় যোগ দিচ্ছেন এবং বক্তৃতা করে ধর্মীয় আবেগকে জাগাতে চাইছেন।[১৫]

তবে দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে আমরা লক্ষ্য করতে পারব যে, ধর্মচর্চা নয়, ধর্মীয় আবেগের সস্তা ও জনপ্রিয় রূপায়ণই মশাররফ হোসেনের লক্ষ্য। এখানে তিনি ফিরে গেছেন মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের জগতে — লেখক হিসেবে এ পরিণতি শোচনীয়। এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অচেতন ছিলেন তা মনে হয় না। *বিবি খোদেজার বিবাহের* ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, 'সমাজের চৌদ্দ আনা লোকের' (যারা অল্পশিক্ষিত এবং পুঁথি সাহিত্যের রসগ্রহণ করে থাকেন, তাদের) জন্যে তিনি এই কাব্য রচনা করেছেন। শেষ জীবনের সমস্ত রচনাই এই শ্রেণীর পাঠককে মনে রেখে লেখা। অতএব, ভাবে, ভাষায় আঙ্গিকে কিছুমাত্র সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন নি। এসব রচনা বহুল প্রচারিত হয়ে লেখকের ইচ্ছাপূরণ করেছে। এ পর্যায়ের রচনাবলীর অন্যতম লক্ষণ হিন্দু সম্পর্কে প্রবল বিতৃষ্ণার প্রকাশ। এর মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখবার অক্ষমতা; ব্যবহারিক জীবনে কোন কোন হিন্দুর কাছে প্রতারিত হয়ে তিনি সমস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে সাধারণভাবে বিরাগ পোষণ করেছেন।

এ পর্যায়ে *মৌলুদ শরীফ*[১৬] (১৯০৫) বোধ হয় সর্বপ্রথম রচনা। মৌলুদ শরীফের বঙ্গানুবাদ ছন্দোবদ্ধ, টীকা গদ্যে লেখা। হযরতের জীবনকাহিনী এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এতে সংকলিত হয়েছে। অলৌকিক ঘটনাবলীতে আস্থার পরিচয় সর্বত্র আছে। বেহেশতের বর্ণনায় তিনি খুব বর্ণাঢ্য করে শরাবন তহুরার স্রোত এবং অপূর্ব যুবতী নারীর সমাবেশের কথা বলেছেন। তারপর আরেক ভরসা দিয়েছেন :

দাঁড়ী গোঁপ না উঠিবে
জরা ভাব না রহিবে
স্থায়ীভাবে রহিবে যৌবন।

এই বর্ণনা আধুনিক মনের কাছে রুচিকর বলে প্রতিভাত হবে না। তবে, ধর্মসভায় যাঁদের উদ্দেশ্যে এই রচনা লেখক পাঠ করতেন, সেই ধর্মভীরু ও অশিক্ষিত লোকের কাছে এর আবেদন হয়তো ছিল — রূপক বলে এই বর্ণনা ব্যাখ্যা করলে তাঁদের কাছে এর মূল্য থাকত না।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় রচনা *বিবি খোদেজার বিবাহে* (১৯০৫) খোদেজাকে যতদূর সম্ভব কুমারী নায়িকার গৌরবদানের চেষ্টা আছে। খোদেজা তাই বলেছেন :

বিধবা হয়েছি কবে কিছু মনে নাই।
লোকে বলে ছিল স্বামী আমি দেখি নাই।।

ইতিহাসের এ ধরনের বিকৃতি এ-জাতীয় রচনার সর্বত্র পাওয়া যাবে। *তৌরাতে* হজরত

মুহম্মদের (দঃ) দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা আছে, একথা তিনি বলেছেন, আর হজরতের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় অনেক দিয়েছেন।

হজরত ওমরের ধর্মজীবনলাভ (১৯০৫) রচনা হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। ভাষা ও ছন্দের শৈথিল্য ধর্মের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পেয়েছে। এর পরে তিনি লেখেন *হজরত বেলালের জবিনী* (১৯০৫) ও *হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ* (১৯০৫)।

মদিনার গৌরব (১৯০৬) ছন্দোবদ্ধ রচনা। কোরেশদের অত্যাচারে মক্কা থেকে হজরত সানুচর হিজরত করে এলেন মদিনায়। সেখানে তিনি বিবি আয়েশাকে বিবাহ করলেন এবং হজরত আলীর সঙ্গে ফাতেমার পরিণয় দান করলেন। এই দুই ঘটনার জন্যে এবং মদিনায় ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি হল বলে মদিনার গৌরব। এই হচ্ছে কাব্যের বিষয়বস্তু। অল্পপরিসর রচনাটিতে কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে আকস্মিক এক আধটি চরণে, যেমন, 'অন্তরের অন্ধকার হয়েছে অন্তর' [পৃ ৪]। অন্যত্র গতানুগতিক ভাবের প্রাণহীন প্রলম্বন মাত্র। রচনারীতির শৈথিল্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নমুনা :

খ্রীষ্টের ছয় শত বাইশ সনের
বিশে জুন তারিখের শেষাংশ রাত্রের।
হজরত ছাড়িয়া মক্কা যান মদিনায়,
বাঙ্গালা হিসাবে জৈষ্ঠ মাস কহা যায়। [৮৪]

অন্য একটি বর্ণনার ভঙ্গীও খুব রুচিকর নয় :

আরবের স্বাভাবিক জলবায়ু গুণে
বালিকারা খাড়া হয় আসিয়া যৌবনে।
তাহাতেও হজরত সাত বছরের
পাত্রীকে (আয়েশাকে) বিবাহ করা ভাবিয়া দোষের।
তাই সে সময় বিয়ে হয় না মক্কায়,
কিন্তু কথা স্থির জানিত সবায়। [১১৬]

সবচাইতে কৌতুকের হচ্ছে অনাবশ্যকভাবে হিন্দু সমাজের প্রতি শ্লেষোক্তি। মক্কায় কাফেরদের সভায় বৃদ্ধবেশী শয়তান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছে :

এক দেশ আছে ভাই নাম হিন্দুস্থান,
দেবদেবী ভক্ত তারা হিন্দু সন্তান।
আমার (ই) স্বজ্জাতি তারা আমার (ই) বংশধর,
উজ্জ্বল করেছে তারা গৌরব দেশের।
হিন্দুস্থানে নানাস্থানে দেবপূজা হয়,
বড় সুশ্রী করে তারা প্রতিমা গড়ায়।
ছেলেপিলে হইয়াছে তবু সে যুবতী।
মন টলে যায় গলে দেখিলে মূরতি। [৫৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমানদের সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যের নামে এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে।

মোস্লেম-বীরত্বে ও (১৯০৮) একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধে মুসলমানেরা যে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন, তাই এতে পয়ার ছন্দে, মধ্যে মধ্যে গদ্যে বর্ণিত হয়েছে। 'অগ্রে পাঠ্য' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন :

> শান্তিপ্রিয় মুসলমান কি কারণে তরবারি হস্তে করিয়াছিলেন, বীরত্বের সহিত বিধর্ম্মীর মুণ্ডুপাত করিয়া বিজয় নিশান উড়াইয়া ছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেখাইতে 'মোস্লেম-বীরত্ব' প্রকাশ হইল।

এই ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী এবং এর অন্তরালবর্তী ধর্মীয় আবেগের প্রশংসা করলেও রচনাটির দুর্বলতার কথা অস্বীকার করা যায় না।

> খৃষ্টের ছয় শত তেইশ সনের
> নবেম্বর মাসে এল খবর যুদ্ধের।

এই ধরনের বহু চরণকে কবিতা বলে স্বীকার করা যেমন কঠিন, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি তীব্র বিরাগকেও ধর্মসম্মত মনোবৃত্তি বলে গ্রাহ্য করা দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদীদের সম্পর্কে তাঁর উক্তি স্মরণ করা যায়। শত্রুর প্রতি হজরতের ক্ষমাপ্রদর্শনের চিত্র বারবার প্রদর্শিত হয়েছে বটে, কিন্তু লেখকেব যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা এই যে, বিধর্মীকে ক্ষমা করে লাভ নেই — সুযোগ পেলেই তাবা যন্ত্রণা দেবে। শিল্পীমনের পক্ষে এই মানসিক আবহাওয়া যে অনুকূল নয়, তা বলাই বাহুল্য।

ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে রচিত হলে *এসলামের জয়* (১৯০৮) গ্রন্থে কল্পনার স্থান অনেকখানি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে বর্ণাঢ্য বর্ণনা, কাল্পনিক সংলাপ ও চরিত্র-চিত্রণের প্রচেষ্টা এতে দেখা যায় — প্রসঙ্গত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এবং বর্ণনাধীন বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাসময় আত্মগত উক্তি সংকলন করেছেন। মদিনায় অবস্থানকালে হজরত মুহম্মদের (দ:) জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এর 'প্রথম শাখা'য দশটি 'মুকুলে' কথিত হয়েছে। 'দ্বিতীয় শাখা'য় তেরোটি 'মুকুলে' বিবৃত হয়েছে মক্কাবিজয় এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ। বইটিতে লেখক মন্থর ও সুবিস্তৃত বর্ণনার সাহায্যে শ্লথ ঘটনাবলীকে একত্র করেছেন, এক্ষেত্রে ভাষার আবেগময়তাই তাঁর রীতিগত সাফল্য। ধর্মীয় আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ এতে আছে — যদিও তা কোথাও কোথাও অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ও অশ্রদ্ধার পরিচায়ক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন, তা মূল্যবান। যেমন,

> জন্মভূমি কাহার না আদরের ? মানুষের ত কথাই নাই, — পশুপক্ষী কীট পতঙ্গগণও জন্ম স্থানের মায়া মমতা বোঝে, — আদর ও যত্ন করে। কোন শাস্ত্রে বলিতেছে জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী।...
>
> হায়রে জন্মভূমি ! জন্মভূমির দৃশ্য নয়ন-মন : প্রীতিকর। বসবাসে আনন্দে সুখোচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের শান্তি। যাহার প্রীতিপদ স্থান, মহা পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, ধূলিময়লা আবর্জনা — প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান।... মাতৃদ্রোহী সন্তানের পক্ষে নহে। স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়ঃ।...নিজ জীবন রক্ষা করিতে স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন যাহারা

পরহস্তে তুলিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে ? পবিত্র জন্মভূমি অপরের পাদুকাতলে দলিত হইবে, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে, গলায় রজ্জু দিয়া বাঁদর নাচন নাচাইয়া লইয়া বেড়াইবে, ইহা কোন্ প্রাণে সহ্য হইবে ?

ধর্মাবেগপ্রধান আরো দুটি বই তিনি লেখেন : *হজরত ইউসুফ* (১৯০৮) এবং *খোৎবা*। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের এই পর্বে পাঠ্যপুস্তকজাতীয় একটি বইও — *মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা* (প্রথম ভাগ ১৯০৩ : দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৮) প্রকাশ করেন। *বাজীমাত* (১৯০৮) সমাজ সমালোচনা-মূলক পদ্যরচনা।[১৭] *গাজী মিয়াঁর বস্তানীর* ধারাটিই এখানে ফিরে এসেছে আরো স্থূল হয়ে। এক স্বৈরিণী ভূম্যধিকারিণীর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। নন্দনগ্রামে সেরাজদ্দীর সঙ্গে এঁর অসামাজিক সম্পর্ক যখন বেশ গড়ে উঠেছে, এমন সময় হিন্দু কর্মচারীদের কৌশলে সেরাজদ্দী বিপদগ্রস্ত হয় এবং পরিণামে এই মহিলাকে বিস্মৃত হতে না পেরে আত্মহত্যা করে। মশাররফ হোসেন খুব মনোযোগ দিয়ে বইটি লেখেন নি, তার প্রমাণ, প্রথমার্ধে যে চরিত্রটি সেরাজদ্দী নামে পরিচিত হয়েছে, শেষার্ধে তাকেই তিনি বলেছেন মনিরদ্দী। স্থূলতার চরম প্রমাণ হিন্দুবেশী মনিরদ্দীর সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবার উপায়ে :

চক্ষে পড়ে শরীরের কোন এক স্থান,
দেখে কহে নহে এই হিন্দুর সন্তান।

হিন্দুদের সম্পর্কে লেখকের ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন থাকে নি। তিনি যখন বলেন :

হিন্দু আমলা কারসাজি খেলে তারা ভেল্কিবাজী
চক্ষে ধাঁধাঁ সবারই লাগায়,
একমাত্র মুসলমান তবু ফেটে যায় প্রাণ
দেখ তারে কেমনে ভাগায়।

কিংবা তাঁর হিন্দু চরিত্র যখন বলেন,

নেড়ের গায়ের গন্ধ গেলে নাসিকায়,
অন্নাসন অন্ন পেট হতে উঠে যায়।

তখন তাঁর মনে কোন বাস্তব ঘটনার স্মৃতি থাকা অসম্ভব নয়। তবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এখন তাঁকে কেবল বিব্রত ও পীড়িত করে না, বরঞ্চ পক্ষাবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। তাই তিনি বলেন :

১ বিশ্বাসঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
যেই পাত খায় ফোঁড়ে এমনি পাতক।
২ তারা যে হিন্দুর পুত্র সংসারের পোকা।
৩ সাজাইতে মিথ্যা কথা হিন্দু বাহাদুর।

জীবনের শেষভাগে মশাররফ হোসেন দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন : *আমার জীবনী* (১৯০৮-১০) এবং *বিবি কুলসুম* (১৯১০)। প্রথমটিতে বারো খণ্ডে প্রথম বিবাহ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাহিনী বলা হয়েছে। বংশপরিচয়, নিজের অধ:পতন এবং প্রথম প্রণয়বৃত্তান্তের আবেগময় রূপায়ণ এতে আছে। ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে শ্লেষোক্তি এবং

পর্দা-প্রথার সমর্থন তাঁর সংকীর্ণ চিন্তার পরিচয় দেয়। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যপাঠে তিনি যে আনন্দ বোধ করতেন, সেকথা এখানে বলেছেন। স্বভাবসিদ্ধ অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও বইটি উপভোগ্য। 'আমার জীবনীর জীবনী' *বিবি কুলসুমে* নিজের অধ:পতন-চিত্রের আরেকটু সবিস্তার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় বিবাহের পরও তাঁর চারিত্রিক শৈথিল্য যে একেবারে দূর হয় নি, সে পরিচয় এই বইতেই আছে। তবে কুলসুমের মতো প্রেমময়ী পত্নীর আশ্রয়ে তাঁর উৎকেন্দ্রিক জীবনে অনেকখানি শ্রী ফিরে আসে এবং তিনি স্ত্রীর প্রেরণায় সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন ও সাফল্য লাভ করেন। কুলসুমের মৃত্যু হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে। এরপর মশাররফ হোসেন মাত্র দু বছর জীবিত ছিলেন (মৃত্যু ১৯ নভেম্বর, ১৯১১)।

১৮৪৭ খৃস্টাব্দে মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় *আজীজন নেহার* নামে একটি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে চুঁচূড়া হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়'।[১৮] তাছাড়া, প্রথমে লাহিনীপাড়া থেকে ও পরে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক *হিতকরী* (প্রথম প্রকাশ ১৮৯০) পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন।[১৯]

মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার যে মূলগত পরিবর্তনের পরিচয় আমরা পাই, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে প্রথম জীবনের হিন্দু-মুসলমান মিলন-কামনা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করলেন, তার জন্যে অনেকখানি দায়ী — আমরা যদি বলি — সমসাময়িক পরিবেশের অনুদারতা, তাহলে খুব ভুল হয় না। যেকালে এঁরা সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হলেন, সেকালেই হিন্দু পুনর্জাগরণ বাংলার সাহিত্য ও সমাজে আত্মপ্রকাশ করল। তার একটি দিক ছিল হিন্দু ও মুসলমানের — সমন্বয়-ধারার নয় — বিরোধ-স্মৃতির চর্চা করা, যার অপরিহার্য ফল হিন্দুমানসে মুসলিম-বিদ্বেষের সূচনা। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং সেই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রভাবে মুসলিম-মানসে জাগল হিন্দুর শুভবুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা। অতএব, মিলন-কমনা আর কিছুতেই সাহিত্যে ও সমাজে খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। মশাররফ হোসেনের মনোভাবের পরিবর্তনের পেছনে এই অনুদার পরিবেশের দান যে অনেকখানি, সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেবল তাঁর নয়, সেকালের সব লেখকই যে এই অবস্থার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেটা সুখকর হয় নি। তবে মশাররফ হোসেনের গৌরব এখানে যে তাঁর যা কিছু রচনা সাহিত্যপদবাচ্য, তা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত।

তিন

মুহম্মদ কাজেম আল কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দে (১২৬৪ বঙ্গাব্দে) ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম হয় এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫২ খৃস্টাব্দে। এত দীর্ঘায়ুলাভের সৌভাগ্য কম লেখকের ঘটে। কবির এরকম দীর্ঘজীবন পাঠকের পক্ষেও সৌভাগ্যজনক হয়ে ওঠে যদি যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাও পরিবর্তনশীল সাহিত্যাদর্শকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর কবির রচনা তার সকল জৌলুস হারিয়ে গতানুগতিকতার ভারে ম্লান হয়ে পড়ল — যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের

ক্ষেত্রে হয়েছিল। কায়কোবাদ এখানে রবীন্দ্রনাথের সগোত্র হতে পারেন নি — তার অন্যতম কারণ এই যে, সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সবসময়ে এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। আরেকটি কারণ, তাঁর শিক্ষা তাঁকে সাহায্য করে নি।

অথচ যে অকৃত্রিম আবেগ কবির মূল সম্পদ, কায়কোবাদের তাই ছিল সহজাত। অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন আপন অন্তরে। তারই স্বাক্ষর নিয়ে তাঁর প্রথম কবিতার বই *বিরহবিলাপ* (১৮৭০) প্রকাশিত হয় কবির বারো-তেরো বছর বয়সে।[২৩] কবির অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা কী কাব্যমূর্তি এতে লাভ করেছিল, তা বলবার উপায় নেই। তবে এরই সংলগ্ন আরেকটি কবিতার বই আমরা পাই তার নাম *কুসুম-কানন* (১৮৭৩)। মোট তেত্রিশটি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। পরাধীনতার জন্য কবির বেদনাবোধ ধ্বনিত হয়েছে 'ভাবতের বর্তমান অবস্থা দর্শনে কোন এক বঙ্গমহিলার বিলাপ' কবিতায় :

ভারতবাসীরা, দাসত্ব শৃঙ্খল,
দিয়াছে সাধেতে আপন গলায়,
কাঁদিলে এখন, হইবে কি ফল
করমের লেখা, কে কোথা এড়ায়।...
তোদের কি,
মান অপমান, নাহি কিছু ভয়,
রে পরম পাপি, কাপুরুষগণ!
বুঝিছে তোদের, সাধ্য কিছু নয়,
কেবল পারিস ধরিতে চরণ। [২০]

এই হীনমন্য পরাধীন ভারতবাসী আবার হিন্দু ও মুসলমানরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে অনধিকার অহংকার করে থাকেন, তা দেখে কবি ক্ষুণ্ন হয়েছেন এবং পুনরায় এঁদেরকে ধিক্কার দিয়েছেন 'জাগরে' কবিতায় :

এ ভারতভূমি হয়েছে কানন,
নাই আর হেথা কোন লোকজন।
সকলি নিয়েছে কৃতান্ত করাল
আছে সুধু কিছু বন্য পশুপাল
ভাল মন্দ যার, নাহি বুদ্ধিজ্ঞান
ভাই ভাই মিলি, করিছে সমর
এরা দুই জাতি, হিন্দু মুসলমান
একটি উল্লুক, একটি বানর। [৪৭-৪৮]

কিন্তু কেবল ধিক্কার দিলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না, তাই কবি 'জাগরণ সঙ্গীত' শুনিয়েছেন :

হে ভারতবাসী, জাগ একবার
কতকাল রবে ঘুমাইয়া আর [৪৯]

এসব ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের কবিতা তাঁকে যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা সহজেই বুঝি।

এমন কি, রঙ্গলালেরও সুস্পষ্ট অনুসৃতি আছে 'চিতোরের যুদ্ধ-সময়ে রাজপুত সেনাপতির উৎসাহ বাক্য' কবিতায় :

যবন-শোণিতে আজি ভারত ভাসাব।
দেখাব ভারত-বল
করি ম্লেচ্ছ রসাতল
একটী যবনে রাখি, ফিরিয়া না যাব।
ক্ষত্রিয়-বিজয়-ধ্বজা জগতে উড়াব। [৫৫]

প্রচলিত রীতির আনুগত্য ছাড়া কায়কোবাদের পক্ষে এই কবিতা-রচনার কোন হেতু নেই।

বৈধব্য-যন্ত্রণাও কায়কোবাদের কবিতার বিষয় হয়েছে, কিন্তু সেখানে দেখি পরাধীনতার গ্লানিবোধ তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে। 'নিশীথ সময়ে একটি পাখির রব শুনিয়া কোন এক বঙ্গবিধবার উক্তি' কবিতায় আছে :

পামর, পিশাচ, অধম, পাতকী,
কে আছে জগতে, হিন্দু সমতুল?
কি আর কহিব, নাহি সরে বাণী
তারাই মোদের, এ দুঃখের মূল।
দাসত্ব যাদের কণ্ঠের ভূষণ
তারা কি মোদের যাতনা দূরিবে ?
গোলামী করিয়া পাদুকা বহিয়া
যে অধম জাতি, জীবন যাপিবে।
তাহাদের কাজ নয়লো ভগিনি! [৭৯]

কায়কোবাদের অন্যতম প্রিয় বিষয় প্রেম সম্পর্কে কয়েকটি কবিতায় কবি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। গিরিবালা দেবী নাম্নী জনৈকা হিন্দু বালিকার সঙ্গে কবির বাল্যপ্রেমের যে কাহিনী সুপ্রচলিত এবং কবির রচনাদির দ্বারা সমর্থিত, সেই ঘটনা এসব কবিতা রচনায় অনুপেরণা দিয়ে থাকবে। হয়তো এই কারণেই প্রেমের ব্যর্থতা, হতাশা ও দীর্ঘশ্বাস এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন, 'ভালবাসা কিছু নহে' কবিতায় তিনি বলেছেন :

ভালবাসা কিছু নহে, শুধু এক নাম,
কেবল ছলনা মাত্র, সাধিতে স্বকাম।
তাই বলি শুন সবে, উপদেশচয়
এ জগতে কারো সহ ক'র না প্রণয়।

প্রেম-কাহিনীতে নাট্যরস আরোপের চেষ্টা দেখা যায় 'প্রণয়-পরিণাম' কবিতায় — এই ধারায় পরে কাহিনীকাব্যগুলি রচিত হয়।

যুবক কবির জাগতিক অনুভূতির প্রগাঢ়তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক চেতানারও প্রকাশ আছে 'ঈশ্বর প্রেমিকের গীতাবলী'তে।

*অশ্রুমালায়*ও (১৮৯৫) এমনই ঘটেছে। সংকলনের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে রয়েছে প্রেমের কবিতা। প্রেমানুভূতির প্রগাঢ়তা এসব কবিতায় বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবনময়ী' কবিতায় তিনি প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বলেছেন :

বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাঝে!
তোমারি সৌন্দর্য দেখি!...
চাইনে স্বর্গের সুখ
যদি গো তোমারে পাই! [৭২-৭৩]

প্রেমের কাছে সম্প্রদায়ধর্মের গণ্ডীবদ্ধতাকে তিনি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত :

দূর হ'ক জাতিধর্ম্ম হ'ক কানাকানি। [১০৮]

কিন্তু যেসব কবিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তীব্রতা লাভ করেছে, সেখানে তিনি এই প্রেমকেও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। 'মানবজীবন' কবিতায় তিনি বলেছেন :

তুচ্ছ রমণীর প্রেমে হৃদয় পাগল!...
রমণীর প্রেম-মন্ত্রে ভুলিয়া সকল,
ভাই ভগ্নী পরিজনে এসেছি ত্যাজিয়া [১৩]

'সায়াহ্ন' কবিতায় পাই :

এ ক্ষুদ্র জীবন লয়ে কেন এত আশা,
জান না কি এ জগত নিশার স্বপন!
মায়া মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা! [১৭]

কায়কোবাদের কবিতায় আমরা প্রায়ই এই দ্বৈতভাব লক্ষ্য করি : একদিকে জীবনের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা পারিচালিত হয়ে জীবনকে অস্বীকার করবার প্রচেষ্টা।

অবশ্য প্রেমকেও তিনি আদর্শায়িত করে দেখেছেন :

কেমনে সে প্রেম আমি বুঝাইব হায়!
বুঝে না এ প্রেম-তত্ত্ব মানব-সন্তান,
সাধনার ভিত্তি ইহা সৃষ্টির জীবন,
আমিত্বের রূপান্তর আত্ম বলিদান,
ব্রহ্মাণ্ডের মূল গ্রন্থি, মাধ্য আকর্ষণ। [১৭]

এই প্রেম-তত্ত্ব অনেকটা সুফী ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাউলদের চিন্তার সঙ্গেও এখানে মিল আছে। 'আমি কে' কবিতায় তিনি প্রশ্ন করছেন :

আমি কি তোমারে ছাড়া?
তুমি কি ব্রাহ্মাণ্ড ভরা?
কোথা তবে তুমি আমি ? — কত ব্যবধান ? [১৮]

স্রষ্টাকে মানবনিরপেক্ষ করে তিনি এখানে দেখেন নি। এই জন্যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ বিস্মৃত হয়ে তিনি মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন।

এ সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্যে তিনি বিশেষ বেদনাবোধ করেছেন। তাদের অতীত গৌরবের তুলনায় বর্তমান পতনের জন্যে দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে :

যাদের প্রতাপে কাঁপিত অবনী,
বিজলীর বেগে নাচিত ধমনী,
ছিল যারা ভবে নৃপকুল মণি,

আজি সে মোস্লেম কি ছার বেশে,
তুচ্ছ এক মুষ্টি অন্নের লাগিয়া,
দ্বারে দ্বারে হের বেড়ায় কাঁদিয়া,
গোলামী করিয়া পাদুকা বহিয়া
যাপিছে জীবন দারুণ ক্লেশে। [১৪১]

পরাধীনতার গ্লানিবোধও কোন কোন কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।

গীতিকবিতার সংকলন হিসেবে কায়কোবাদের *অশ্রুমালা* সে যুগে বেশ আদৃত হয়েছিল সংগতভাবেই। লিরিক-আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ এতে ঘটেছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকাশনৈপুণ্য।

এখানেই কায়কোবাদের গীতিকবিতা-রচনার প্রথম পালাটি সাঙ্গ হয়েছে। এরপর তিনি মহাকাব্য-রচনার চেষ্টা করেন, যার ফলে আমরা পাই *মহাশ্মশান কাব্য* (১৯০৪)। এই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য মুসলমানদের এককালের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া :

আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্যসংবলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণও অদ্বীতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ যেখানে যে কীর্ত্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।[২১]

ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে কবি আলতাফ হুসেন হালী (১৮৩৭-১৯১৪) তাঁর বিখ্যাত *মুসদ্দস* রচনা করেছিলেন (১৮৭৯)। অবশ্য *মুসদ্দসের* রচনানৈপুণ্য ও জনপ্রিয়তা লাভ *করা মহাশ্মশানের* পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাহলেও পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে এঁদের মানসিকতার যে মিল দেখা যায়, তা বংলা সাহিত্যে আলীগড়-আন্দোলনের প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়।

আলীগড় আন্দোলনের আরেকটি লক্ষণ — ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আপসের প্রবণতা — কায়কোবাদের মানসে ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও শর্তহীন সমর্থনের রূপ নিয়েছে। তিনি বলছেন :

যুদ্ধ জয়ের কিছুকাল পরেই মহাবীর আহমদ সাহ আবদালী নিজ দেশে চলিয়া যান, ঠিক সময়ে —সেই সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে ভারতীয় মুসলমানদের সৌভাগ্যবশত:ই ইংরেজগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি পতনের চেষ্টা করিয়াছিল...। ...ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরে অপার করুণা বলিয়াই ভারতে ইংরেজগণের আগমন হইয়াছিল।[২২]

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে এই কাব্যটি রচিত হয়। ভারতে হিন্দু রাজ্য পুনঃস্থাপনের সঙ্কল্প নিয়ে উদীয়মান মারাঠা শক্তির সঙ্গে আফগান আহমদ শাহ্ আবদালীর সহায়তায় রোহিলা-অধিপতি নজীবউদ্দৌল্লার শক্তিপরীক্ষার মধ্যে অনেকগুলো প্রণয়-কাহিনী স্থান

করে নিয়েছে। কী প্রণয় কাহিনীর বর্ণনায়, কী যুদ্ধের পরিণাম-বিবৃতিতে কায়কোবাদ মধুসূদনের অনুকরণে নিয়তির প্রবল পরাক্রমের কথা বলেছেন। সংগ্রামের তীব্রতা এবং উভয়পক্ষের বীর্যবত্তার পরিচয়দান-প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে সচেতনভাবেই পক্ষাবলম্বন করেন নি। বরঞ্চ, অমর ও হিরণবালার প্রেমোপাখ্যানের মাধ্যমে সম্প্রদায়ভেদে মানুষের মূল আবেগের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। হিরণের উক্তি —

যে জাতি হও না তুমি ক্ষতি কি তাহাতে ?
আমার এ ভালবাসা অটুট থাকিবে।
কেননা জাতিকে আমি ভাল তো বাসিনি।
আমি যে বেসেছি ভাল অমর তোমারে।...
মোদের উভয় আত্মা হয়েছে মিলিত
পরস্পর, প্রেম বশে উভয়ের সনে,
ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নেই জাতি কিংবা নামে। [৬০১-২]

— কায়কোবাদের বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি-প্রণোদিত মনোভাবের পরিচয় দেয়। তাছাড়া, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ তিনি আত্যন্তিক মূল্যবান বলে মনে করতে পারেন নি। কেননা,

> এই যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আহমদ শাহ্ দোরানী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাঁহাদের ছিল না। [৮০৩]

অতএব, প্রাক্‌ভাষণ সত্ত্বেও কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* ভারতীয় মুসলিম শক্তির বীর্যবত্তার এমন বিবরণ হতে পারে নি, যা থেকে কবির সমসাময়িক কালের মুসলমানেরা প্রেরণা পেতে পারতেন। এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই দুটি বীর গোষ্ঠী আদিম জিঘাংসা নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এর পশ্চাতে নিয়তির লীলাই একমাত্র লক্ষণীয় মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-ভিত্তিক রোমান্সগুলো বা রমেশ দত্তের উপন্যাস হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে বাঙালী হিন্দু পাঠকের মনে যে সচেতনতা এনে দিয়েছে, কোন সম্প্রদায়ের বাঙালী পাঠকের জন্যেই কায়কোবাদ তা করতে পারেন নি। হালীর তুলনায়ও কায়কোবাদের ব্যর্থতা এখানে। তাঁর ইতিহাসচেতনা সৃষ্টিধর্মী ছিল না।

দুঃখের বিষয়, রচনারীতির ক্ষেত্রেও কায়কোবাদ সমালোচকের প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেন নি। মদুসূদনের কাব্য অনুকরণের শক্তি তাঁর ছিল না, তাই তিনি মধুসূদনের অনুসারী নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁর আদর্শ কবি বলে গ্রহণ করেছিলেন। *মহাশ্মশান* আকারে নবীন সেনের *ত্রয়ীর* (১৮৮৬-৯৬) চেয়ে বড় হলেও প্রকারে *ত্রয়ীর* চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এতে নাই : কবির রোমান্টিক প্রবণতা অনাবশ্যক প্রেমকাহিনী-সন্নিবেশের কারণ। সংলাপ দুর্বল, বর্ণনা পুনরুক্তিদোষে আক্রান্ত। সবচেয়ে বড় কথা, কায়কোবাদ যখন মহাকাব্য লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে মাহকাব্যের যুগের

অবসান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিকাব্যের নবরূপায়ণের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে দিক্‌নির্দেশ ছিল, কায়কোবাদ তা বুঝতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে তিনি ঈর্ষা করতেন, তাই রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেন নি।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের *বলাকা* (১৯১৬) ও *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) প্রকাশিত হবার পাঁচ বৎসর পর কায়কোবাদ *শিব-মন্দির* (১৯২১) লিখলেন উনিশ শতক রীতিতে। ভূমিকায় নিজের প্রাচীনপন্থী মনোভাবের সগর্ব স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন :

> আমি জানি বঙ্গবাণীর সাহিত্য-মন্দিরে আজকাল অনেক নূতন দল জুটিয়াছেন, আমি সে দলের নহি। আমি পুরাতন দলের লোক। আমাদের দলের নবীন, হেম, মধুসূদন, দীনেশ, অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ চলিয়া গিয়াছেন। আমিও এখন যাওয়ার পথে। নূতন দলের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই।… অধোপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎসাহিত্যের আলোচনা। নিপুন কবি তাঁহার কাব্যে যেসব পুণ্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত পুণ্যের জীবন্ত ছবি থাকিলে সমাজ তাহারই আদর্শ সম্মখে রাখিয়া উন্নতির দিকে শনৈ: শনৈ: অগ্রসর হইয়া থাকে, অ-কবি রচিত পাপের পূতিগন্ধময় নিকৃষ্ট চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধ:পতনের দিকে টানিয়া নেয়।… এই কাব্যখানাতে আমি পাপ পূণ্যের সঙ্কট দেখাইয়া পাপের পতন দেখাইয়াছি।

শিব-মন্দির সত্য ঘটনামূলক কাব্য। দেওয়ান সুদীরচন্দ্রের প্ররোচনায় জমিদার নুরুদ্দীন হায়দর পিতৃব্যপুত্র সদরুদ্দীনকে তার যথাসর্বস্ব থেকে বঞ্চিত করে। পরে অনুতপ্ত হয়ে ভ্রাতার সন্ধানে গমন করলে নূরুদ্দীনের সম্পত্তি সুধীরচন্দ্রই ভোগদখল করতে থাকে। সুধীরের ষড়যন্ত্রে আলাউদ্দীন নিহত হয় এবং তার সংসারেও অনিবার্য ধ্বংস নেমে আসে। এই সঙ্গে আরো কয়েকটি চরিত্র এবং কায়কোবাদের সাধারণ প্রবণতা-অনুযায়ী শাখা-কাহিনী যুক্ত হয়ে মূল উপাখ্যানকে পল্লবিত করেছে। রচনারীতির শৈথিল্য আছে, উপাখ্যানটিও এমন কিছু মনোহর নয়। এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য — কায়কোবাদের অন্যান্য কাব্যেও যা দেখা গেছে — মুসলিম যুবকের সঙ্গে হিন্দুকন্যার প্রণয় এবং তার ট্র্যাজিক পরিণামের কাহিনী। এই প্রসঙ্গে ভূমিকায় প্রেম সম্পর্কে কবি-কথিত তত্ত্বকথা স্মরণযোগ্য :

> প্রেম স্বর্গীয় জিনিস, সে কখনও ভেদ-নীতি মানে না, জাতি বিচার করে না…। জগদীশ্বর স্বয়ং প্রেমময়, তাহার প্রেম লইয়াই হজরত মোহাম্মদ (দ:) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন…। প্রেমিক যাঁহারা, তাঁহারা ধন-রত্ন, জাতি-বর্ণ কিছুই চাহে না, চাহে কেবল আত্মার মিলন।…নিজের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া পরের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ার নামই আত্মার মিলন।… এই প্রেমেই স্বর্গের সোপান। ইহার উপরেই বিধাতার বিশ্ব-রাজ্য স্থাপিত, ঈশ্বরকে পাইতে হইলেও এই প্রেমই চাই।
>
> [১৯০-১১০]

সতর্ক পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, এখানে কায়কোবাদ সুফীবাদীদের প্রতিধ্বনী করেছেন। সুফীরা প্রেমকে জেনেছেন সার সত্য বলে। তাঁরা সব সময়েই জাগতিক বা মানবিক প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমপন্থার সোপান বলে গণ্য করেছেন এবং ঈশ্বরকে দেখেছেন প্রেমময় রূপে। ইউসুফ-জুলাইখা, লায়লা-মজনু বা শিরিঁ-ফরহাদের প্রণয়কাহিনী মানবিক প্রণয়ের

রূপ না নিয়ে হয়েছে রূপক। ফারসী কাব্যানুসারী ও সুফী ভাবধারা-প্রভাবান্বিত উর্দু ও হিন্দী কাব্যে এবং তার বাংলা অনুবাদে এই তত্ত্বাদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে। কায়কোবাদ — এবং তাঁর পরবর্তী কোন কোন লেখক — এই তত্ত্বকে আশ্রয় করে, অন্তত স্বীকার করে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন।

অমিয় ধারা (১৯২৩) কাব্যে এই ধরনের সুফীমতের স্থান আছে। এটি একটি গীতিকবিতার সংগ্রহ, তেতাল্লিশটি আধ্যাত্মিক কবিতা, আঠারোটি প্রেমের কবিতা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে লেখা বিশটি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক কবিতায় সুফী ভাবধারার ছোঁয়া আছে। বাউল ভাবের কবিতাও আছে। সুফীমত ও বাউল ভাবধারার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে, এগুলোকে মূলত একই ভাবধারাভুক্ত কবিতা বলে চিহ্নিত করা যায়। 'তার দুয়ারে' কবিতায় দেখি, কবি স্রষ্টাকে — বাউলের ভাষায় — 'অধর ধরা'কে খুঁজছেন :

প্রাণ চাহিছে সদা যারে।
আমি এসেছি আজ তার দুয়ারে!
আমি নেচে গেয়ে তার পাছে পাছে
ছুটে বেড়াই দিবানিশি!
ধরি ধরি করি তারে
বায়ুর সনে যায় সে মিশি!

এ ধরনের রচনায় রামপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় :

আমায় আর কাঁদাবে কত
আমি সংসার-চক্রে ঘুরে বেড়াই
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।

এবং
আজ পেয়েছি খবর আমি আসবে আমার রসরাজ
প্রাণটি আমার লুটিয়ে দিব যে পথে সে আসবে আজ।

কিংবা
আর কেন তুই করিস দেরী, ঐ বেজেছে দীনের ভেরী
কে কে যাবি আমার সাথে
আয় ছুটে আয়
ওরে ভোলা।

প্রেম-বিষয়ক কবিতা অধিকাংশই বিরহমূলক এবং পাত্র বা পাত্রীর অন্যত্র বিবাহ সংঘটিত হওয়ার মধ্যেই এই বিরহের মূল নিহিত। প্রত্যাখ্যান এবং ভুল বোঝার বেদনাও আছে।

বিবিধ-বিষয়ক কবিতাবলীতে কখনো কখনো তিনি ইসলামের অতীত গৌরব স্মরণ করেছেন এবং প্রতিতুলনায় বর্তমান অধঃপতনের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। যেমন, 'উত্থান সঙ্গীত' কবিতায় :

সবাই জাগিল বিশ্বে
মোস্লেম জাগিবে কবে ?
যে জাতি একদা ছিল
উত্থানের শীর্ষ দেশে

এ জাতির এ দুর্দ্দশা
হায়রে হইল কিসে ?
কোন পাপে তাহাদের
এ ঘোর পতন হল
সে গৌরব সে প্রতিভা
কি দোষে ঘুচিয়া গেল ?

ইসলামের অতীত-গৌরব-স্মরণার্থে রচিত ইতিহাস ও কাব্যের, বিশেষ করে উর্দু ইতিহাস ও কাব্যের প্রভাবে মুসলমানের পক্ষে বাংলাদেশ — এমন কি গোটা ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে স্বীকার করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। পুনর্জাগরণবাদী হিন্দু লেখকেরা ভারতবর্ষ বা বাংলা বলতে হিন্দু ভারতবর্ষ ও মুসলিম-বর্জিত বাংলাদেশ বুঝতেন, পুনর্জাগরণবাদী মুসলমানদের চেতনায়ও তেমনি এ দেশের চাইতে আরব ইরান নিকট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এদেশের ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সাথে মুসলমানের কতটুকু যোগ স্বীকার্য, এ প্রশ্নও সমাজে উত্থাপিত হয়েছিল। সুখের বিষয়, ইসলামের অতীতের মাহাত্ম্যগান করেও এই বিভ্রান্তি থেকে কায়কোবাদ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এই কাব্যে তাই বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রশস্তিমূলক কবিতা দেখা যায়। বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে এই সজাগ মানসিকতাই তাঁকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় উদ্বুদ্ধ করেছে :

এস ভাই হিন্দু, এস মুসলমান
আমরা দু ভাই ভারত সন্তান
এস আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গো মায়ের চরণ দু'টি।...
ধর্ম্মক্ষেত্রে মোরা যদিও পৃথক
কর্ম্মক্ষেত্রে ভাই সবি একাত্মক
তবে কেন ভাই দ্বেষারেষি করে
জননীর বুকে মারিস ছোরা।

মুসলমানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও হিন্দু-মুসলমানের কামনা কায়কোবাদের চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানের পুরাকাহিনী যে কায়কোবাদের কাছে কত মূল্যবান, তার প্রমাণ তাঁর *মহরম শরিফ* কাব্য (১৯৩২)। এই কাব্য রচনার মূল কারণ প্রচলিত মুহররম কাহিনীসমূহের অনৈতিহাসিকতা সম্পর্কে কবির ক্ষোভ। নিজের কাব্যের দীর্ঘ ভূমিকা রচনায় কায়কোবাদ অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেই সব ভূমিকায় কাব্য ও অন্যান্য জাগতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামতের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকত। এই কাব্যের 'কৈফিয়ৎ' শীর্ষক ভূমিকায় এবং 'প্রকাশকের নিবেদনে' তিনি জোনাব আলী (*শতহীদে কারবালা*), মীর মশাররফ হোসেন (*বিষাদ সিন্ধু*), মহম্মদ হামিদ আলী (*কাসেমবধ কাব্য*), ফজলুর রহিম চৌধুরী (*মহররম চিত্র*), মোজাম্মেল হক (*মোসলেম ভারতে* প্রকাশিত কবিতা) ও নজরুল ইসলামের (*মহররম, অগ্নিবীণা*) বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সত্য অপলাপের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এঁদের সংগৃহীত তথ্যের অনৈতিহাসিকতার নিন্দা তিনি করেছেন একে মুসলমান হিসেবে, তার

উপরে কবি হিসেবে। কেননা তিনি মনে করেন যে, অলীক ঘটনার আরোপে পবিত্র ধর্মের মর্যদাহানি হয়েছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্য ঘটনার পরিবর্তন সাধনের অধিকার কবিদের নেই।[২৩]

এই পিউরিট্যানিক আদর্শবোধের জন্যে কায়কোবাদের *মহররম শরীফ* উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়াছেন যে, রূপমোহ নয়, ক্ষমতালাভের তৃষ্ণাই এজিদকে প্ররোচনা দিয়েছিল হাসান ও হোসেনকে হত্যা করতে। ঘটনার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ পৃষ্ঠায়ই তিনি দীর্ঘ পাদটীকা সন্নিবেশ করে ইতিহাসের মর্যাদা রেখেছেন, কিন্তু কাব্যের গৌরব রক্ষা করেন নি। কাব্য হিসেবে এটি উচ্চমানের নয়, পরানুকরণ ও অভিব্যক্তির গতানুগতিকতা একে পীড়িত করেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। *পলাশির যুদ্ধ* (১৮৭৫) কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন পলাশী-ক্ষেত্র সম্পর্কে বলছেন :

এই কি পলাশি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেইখানে, — কি বলিব — বলিব কেমনে!
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্তন
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে!
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দ'নয়নে,—
যেইখানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে
যেইখানে চিররুচি স্বাধনিতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে
দেখিবে সে রণক্ষেত্র, তবে হে কল্পনে।[২৪]

এর অনুকরণে *মহাশ্মশানে* কায়কোবাদ একবার লিখলেন :

এই কি সে দিল্লী? — হায় এই সে নগরী ?
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নিখিল ধরণী?...
এই কি সে দিল্লী ? — হায় এই সে নগরী ?
যাহার প্রতাপে শৌর্য্যে কাঁপিত অবনী?...
যেইস্থানে সাজাহান আনন্দিত প্রাণে
মাতিয়া উঠিত ঈদ গুলাবী উৎসবে... [৩৮৮-৪০১]

আবার লিখলেন (এবারে *পানিপথ* সম্পর্কে) :

এই সেই স্থান ? — সেই ভীষণ শ্মশান ?
যেই স্থানে লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান
দিয়াছিলা ধর্ম্মযুদ্ধে আপনার প্রাণ ?... [৭২৯]

এই ধারায় *মহররম শরিফে* কবি প্রথমে বলছেন কুফার কথা :

এই কি সে কুফা? হায় যে কুফা নগরে
মহাত্মা মোর্ত্তজা আলী হয়েছিলো হত
গুপ্ত ঘাতকের হস্তে ?... [২৬]

তারপর মদিনার উল্লেখ :

এই কি মদিনা সেই? এই সে নগরী?
মোস্তফার লীলা ক্ষেত্র, যার পুণ্য স্মৃতি… [৬১]

কারবালা-প্রসঙ্গে :

এই কি কারবলা সেই ? এই সেই স্থান ?
এই সেই মহামরু ?…
যেইস্থানে, কি বলিব, বুক ফেটে যায়…
দিয়াছিলা ধর্ম্মযুদ্ধে আপনার প্রাণ ?… [২৫০-১]

কারবালা-প্রান্তর থেকে অনতিদূরে ফোরাত নদী দেখে :

এই সেই এফ্রাটিস? — এই সে তটিনী ?
যাহার একটি বিন্দু জলের লাগিয়া… [২৫৪]

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই জাতীয় mannerism কাব্যের রসাস্বাদনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে।

শ্মশানভস্ম কাব্যে (১৯৩৮) কবির শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। *শিব-মন্দিরের* মতো এটিও উনিশ শতকী কাহিনী-কাব্যের ধারায় রচিত যাকে কবি কাব্যোপন্যাস বলতে চেয়েছেন। একটি ত্রিভুজ প্রণয়-কাহিনীকে নানারকম জটিলতা দান করার চেষ্টা কবি করেছেন, কিন্তু মানব-চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি বলে চরিত্রগুলোকে অঙ্কন করেছেন বাহ্যমূর্তিতে। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভবও হয়েছে। যেমন লন্ডন শহরের ও বিলেতি সমাজের যে কাল্পনিক চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে, তা কবির পরোক্ষ ধারণার সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক।

প্রেমের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ নলিনীমোহনের চরিত্র কায়কোবাদের আদর্শ প্রেমিকের নিদর্শন। সে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আধ্যাত্মিকতায় মুক্তি খুঁজেছে, কিন্তু সেখানেও প্রণয়িনীর চিন্তা তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। হেমলতাও প্রেমিক ও স্বামীর প্রতি সমর্পিতচিত্ত বলে তার শত অপরাধ ক্ষমা করেছে। হিমাংশুর প্রেমে নিষ্ঠার অভাব এবং অমিয়ার বাসনা-কামনার উদ্দামতা কায়কোবাদকে বিরূপ হতে প্ররোচিত করেছে।

হিন্দু সমাজ থেকে এই কাব্যের পাত্রপাত্রী চয়নের সার্থকতা কি, তা বোঝা যায় না।

শিল্পী হিসেবে কায়কোবাদের অকৃত্রিম আবেগ যথার্থ প্রকাশ লাভ করতে পারে নি তাঁর সংযমের অভাবে, পরিবর্তনশীল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যোগসূত্রহীনতার ফলে এবং শিক্ষার সীমাবদ্ধতার জন্য। তাঁর চিন্তাধারায় আপাতবিরোধ দেখা যায় দু'ভাবে · পরাধীনতার জন্যে বেদনাবোধ এবং ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধে, আর জগতের প্রতি সুগভীর আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবণতায়। প্রথমোক্ত বিরোধ উনিশ শতকের অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যেই আমরা দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র এর বড় উদাহরণ। দেশপ্রেমের যথার্থ এবং মুসলমানের পতনের জন্যে বেদনাবোধ কায়কোবাদের সমাজসচেতন মনের পরিচায়ক। তিনি যে সাম্প্রদায়িক যুগেও আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন, এবং মুসলমান সমাজে প্রায় অস্বীকৃত স্বাধীন প্রণয়ের জয়গান করেছেন, তা তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তকে সকলের গোচরীভূত করেছে। এই অগ্রসর

চিন্তার জন্যে তিনি উত্তরপুরুষদের শ্রদ্ধা দাবি করবেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে রইবেন প্রধানত তাঁর গীতিকবিতার জন্যে।

চার

মীর মশাররফ হোসেনের মতো শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকও (১৮৬০-১৯৩৩) গদ্য ও কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব হয় শতাব্দীর নবম দশকে সম্ভবত গীতিকবিতার সংগ্রহ *কুসুমাঞ্জলি* (১৮৮১) নিয়ে।[২৫] এরপর তিনি *অপূর্ব দর্শন* (১৮৮৫) নামে একটি ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্য রচনা করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আখ্যায়িকা কাব্য-রচনার যে ধারার সূত্রপাত হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তা বেশ বেগবতী হয়ে ওঠে। মোজাম্মেল হকের কাব্যটি এই ধারার অন্তর্গত। বঙ্গেশ্বর বাখর খাঁ তাঁর পুত্র দিল্লীর অধিপতি কায়কোবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কূটবুদ্ধি মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে কায়কোবাদ পিতাকে নত হয়ে সম্রাটের প্রতি (অর্থাৎ তাঁর প্রতি) অভিবাদন করার আদেশ দেন। এমনি সময় দৈববাণী হয়ে মূঢ় সম্রাটের চৈতন্য হয় : পিতাপুত্রে মিলন এবং নিজামউদ্দীনের পলায়ন ও আত্মহত্যায় কাব্যটির পরিসমাপ্তি। খুব মনোহর না হলেও কাব্যটি গুণহীন নয়। বিশেষ করে, ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে নতুন কবিকর্মীর কৃতিত্ব অবিসংবাদী।

গভীর ত্রিযামা, ধরা ঘুমে অচেতন,
নীরব প্রকৃতি-বালা, মেদিনী গগন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন নীরবতা ব্রতে
ব্রতী, আহা বিশ্ব যেন শান্তিনিকেতন।
দিবাভাগে উঠেছিলো যেই স্থান হতে
ঘোর কোলাহল ব্যাপি বিশাল গগন
এবে নাই, প্রকৃতির এ দৃশ্য কেমন
চমৎকার, অভিনয় চিত্ত-বিনোদন।

মোজাম্মেল হকের গৃহীত উপাখ্যানটি অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক হলে কাব্যটি ব্যাপকতর পরিচিতি লাভ করতে পারত।

মোজাম্মেল হকের জীবনে গভীর সুফী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঠিক কোন্ সূত্রে এই ভাবধারার প্রভাব তাঁর উপরে পড়ে, তা বলা দুষ্কর। তিনি যে কোন বিশেষ শাখার সুফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তা নয়। তবে সামগ্রিকভাবে সুফী সাধকদের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ভারতবর্ষীয় সাধকদের মধ্যে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী ছিলেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেব — যাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর গদ্য রচনায় তাই বিশেষভাবে অলৌকিক জগতকেই তিনি পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ *মহর্ষি মনসুর* (১৮৯৬)[২৬] এই প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। 'একখানি উর্দু পুস্তিকার মর্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য' নিয়ে *আনাল হক* বাণীর উদ্গাতা পারস্যের সুবিখ্যাত সাধক হোসেন মনসুরের এই জবিনীটি তিনি রচনা করেন। সুন্দর,

আবেগময় ও ফেনিল ভাষায় মোজাম্মেল হক মনসুরের আলৌকিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষবৎ বিবরণ দিয়েছেন। মনসুরের *আনাল হক* মন্ত্রোচ্চারণের হেতুবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ভারতীয় মুসলমান সাধকবৃন্দের শিরোভূষণ ও তত্ত্বজ্ঞানের সমুজ্জ্বল সূর্য স্বরূপ মহিমার্ণব সিদ্ধপুরুষ হজরত খাজা কুতুবউদ্দীন, বখতিয়ার কাকী সাহেবের কথা, সুতরাং বিশ্বস্ত, মূল্যবান ও সারগর্ভ' প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেন, যে মনসুরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা (রাবিয়া) নির্জনে ঈশ্বরোপাসনা করতেন এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাঁর কাছে 'ঐহিক প্রেমামৃতপূর্ণ এক সুদৃশ্য পানপাত্র হস্তে লইয়া তথায় শুভাগমন কবিতেন এবং পুণ্যবতী রমণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক অর্পণ করিতেন।' একদিন মনসুব গোপনে ভগ্নীর অনুসরণ করে এই দৃশ্য দেখতে পান এবং ঐ অমৃত পান করতে চান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনসুরের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর ভগ্নী সেই প্রেম-মদিরার অতি সামান্য অংশ তাঁকে দান করেন। পান করা মাত্রই ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ হয়ে মনসুর *আনাল হক* উচ্চারণ করতে লাগলেন।

মূল গ্রন্থাদিতে এসব কথা হয়তো রূপকের ছলে বলা হয়েছিল, অন্তত এই বিবরণের মূলসূত্র ঘটনাটিকে রূপকরূপে গ্রহণ করার ইঙ্গিতই আমাদেরকে দেয়। মোজাম্মেল হকের রচনা অবশ্য এই রূপকথা সম্পর্কে কোনরকম সচেতনতার পরিচয়বাহী নয়। বন্দী অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে কারাগার থেকে মনসুরের গৃহে প্রত্যাগমন, তাঁর করস্পর্শে বন্দীব শৃঙ্খলমোচন, তাঁর দৃষ্টিপাতে কারাগারগাত্রে সুবৃহৎ গবাক্ষের সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনায় ঈশ্বরপ্রেম-মদিরা গ্রহণের মতোই অসাধারণ ও কার্যকারণ সম্পর্কবিহীন অলৌকিক আচরণের গৌরব গান তিনি করেছেন। এর চরম বিকাশ হয়েছে মনসুরের প্রাণদণ্ডের পর যখন তাঁর দেহের প্রতিটি খণ্ড গভীর আবেগের সঙ্গে *আনাল হক* মন্ত্র উচ্চারণ করতে থেকেছে।

বইটির ধ্বনিময় ভাষা ও আবেগপ্রধান প্রকাশভঙ্গী এর প্রধান আকর্ষণ। গ্রন্থের শেষে নিয়তির দুর্দমনীয় প্রতাপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উদ্ধার করলে এই রচনারীতির সম্যক পরিচয় মিলবে :

> এক্ষণে বলুন দেখি পাঠক! এ জগতে সর্বাপেক্ষা বলবান কি? উত্তর — নিয়তি লিপি অবিচল অনিবার্য। সে লিপির লিখন খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। একদিন অল্লাহ্‌তালা অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন — প্রস্তরাঙ্কিতবৎ জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে — বিন্দু পরিমাণে তাহার নড়চড় হইবার নহে। সসাগরা পৃথিবীর প্রচণ্ডবিক্রম সার্বভৌম নরপতি ও দীন-হীন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, পরমধার্মিক নিত্য-জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ ও পরস্বাপহারী সদা-কদাচারী দুর্দান্ত দস্যু, অগাধ-মনীষাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও হিতাহিত-বোধহীন নিরক্ষর মূর্খ, দিব্য লাবণ্যপরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্ম বৃদ্ধ, নব-যৌবনগরবিনী রূপবতী কামিনী ও রূপযৌবনবিগতা পলিতকেশা প্রবীণা, পবিত্র-সলিল-স্নাত প্রিয়দর্শন বালক ও উদ্যোতোম্মুখী শুদ্ধমতি সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন। — সকলেই সুখে-দুঃখে নিয়ত নিয়তির পূজা করিয়া থাকে। তাই পুনঃ বলিতেছি, বিশ্বসংসারে নিয়তির সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ কেহই নহেন।

বাস্তবক্ষেত্রের দুঃখদুর্দশার একটি সন্তোষজনক সান্ত্বনা যে এই নিয়তিবাদ থেকে লভ্য ছিল, একথা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু অদৃষ্টবাদ এবং আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান ধারণা হয়তো

এই নিয়তিবাদকে প্রণোদিত করেছিল। কিন্তু পরাজয়ী মনোবৃত্তি এবং নিষ্ক্রিয়তা যে নিয়তিবাদেরই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল, একথা অস্বীকার করা যায় না।

জাগতিক সক্রিয়তার বৃত্ত থেকে অনেক দূরবর্তী অধ্যাত্মসাধনার বিস্ময়কর ইতিহাস এবারে মোজাম্মেল হক বিবৃত করলেন *তাপস-জীবনীতে* (১৯০০)। এতে হজরত আবদুল কাদের জিলানী[২৭], ইমাম জাফর সাদেক, ইব্রাহিম আদহাম বলখী, তপস্বী ফাজিল আয়াজ, তপস্বী বশর হাফী ও তপস্বী আবু হেফ্‌সের জীবনকাহিনী সংকলিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জীবনী যুক্ত হয় এবং পুস্তকের নতুন নামকরণ হয় *তাপস কাহিনী* (১৯১৪)।

সংকলিত জীবনীগুলোর সব কটিতেই অসাধারণ, অবাস্তব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। মোজাম্মেল হক এর সকল তথ্যেই আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, তপস্বীদের সাধনপ্রণালীর মাহাত্ম্য গান করলেও সাধারণ মানুষ এই জীবনধারার অনুসারী হোক, এমন ইচ্ছা তাঁর কোথাও প্রকাশ পায় নি। এত অতিমানবীয় শক্তির সামর্থ্যকে তিনি বিস্ফারিত লোচনে প্রত্যক্ষ করেছেন, বিস্ময়ে হতব্যাখ্যা হয়েছেন, কিন্তু ভয়বিহ্বলতায় এই উচ্চমার্গে পদার্পণ করতে চান নি। ফলে, এক জাতীয় রূপকথারূপে এটি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্ণিত ঘটনার অন্তরালবর্তী কোন কোন সদুপদেশ, কিছু নীতিজ্ঞান পাঠকের জীবনাদর্শকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, তার বেশী নয়। কেননা, পরিশেষে সকলের চিত্তে এই সিদ্ধান্তই জাগে যে, এঁরা অসাধারণ মহাপুরুষ আমাদের পক্ষে এঁদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভবপর নয়— সে চেষ্টা করেও লাভ নেই।

প্রেম-হার (১৮৯৮) মোজাম্মেল হকের প্রথম গীতিকবিতার সংগ্রহ। একুশটি কবিতার এই নীতিদীর্ঘ সংকলনটি ইতোপূর্বে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নি, এটি বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা। আখ্যাপত্রে এবং বিভিন্ন কবিতার শুরুতে ওয়াট, শেক্সপীয়র মিল্টন, ক্রশ, সাকলিং, স্কট, ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ, কীট্‌স ও লংফেলোর কবিতার উদ্ধৃতি আছে, *শাহনামা, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ফুলহার, কালচক্র, মিত্রবিলাপ,* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং বাহাদুর শাহ্‌র একটি গজলের মর্মানুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিদেশী কাব্যের সঙ্গে এই পরিচয় ছাড়াও, *প্রেম-হারে* বিহারীলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবির অকৃত্রিম লিরিক অনুভূতি এবং দেহ সম্পর্কে অসঙ্কোচ তাঁর কবিতাকে মৌলিক ভাব ও বিশেষ দীপ্তি দান করেছে, দেহসচেতনতা যে সমসাময়িককালে আপত্তিকর বিবেচিত হতে পারে মোজাম্মেল হক তা জানতেন। ভূমিকায় প্রকাশকের জবানীতে সে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তবু কবি নিজের ভাবাবেগকে বিচলিত হতে দেন নি, এখানে তাঁর কৃতিত্ব। সে-আবেগের প্রকাশ গুণহীন নয়। যেমন:

এস বুকে চন্দ্রাননে, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে
ভুঞ্জি স্বর্গসুখ।
বাঁধ ভুজ-লতা পাশে, তোষ প্রিয় প্রিয়-ভাষে
দূরে যাক বিরহের জ্বালা,যত দুখ।
তুমি লো আমার ধনি ত্রিদিব-সুন্দরী,
ছার সে কল্পনা-বালা বিদ্যাধরী পরী!

আর কে সুন্দরী আছে,
লাগে লো তোমার কাছে'
অনন্ত-যৌবনা শচী তুমি লো আমার।
প্রণয়ের প্রতিকৃতি সংসারের সার।।

উপমা-প্রয়োগে হিন্দু পুরাণের ব্যবহার করতে কবির কোন কুণ্ঠা নেই।

ফেরদৌসী-চরিত (১৮৯৮) প্রকাশিত হয় *তাপস-জীবনী* প্রকাশের পূর্বে। এটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত *শাহ্‌নামার* (১৯০৯) ভূমিকা হিসেবে পঠিতব্য। দশম-একাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ফারসী কাব্যস্রষ্টা ফিরদৌসীর জীবনকাহিনীর এমন রসময় অভিব্যক্তি আর দেখা যায় না। ফিরদৌসীর *শাহ্‌নামাকে* ইতিহাসের মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। *শাহ্‌নামা* কাব্য, তাই অনেকখানি কল্পনার সৃষ্টি। সেখানে প্রবল অনৈতিহাসিকতা আছে। যেমন, সেকান্দার শাহ্‌কে (আলেকজান্ডার) কল্পনা করা হয়েছে সম্রাট প্রথম দারার (ড্যারিয়াস) সন্তান বলে এবং এই অধিকার বলেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বিতীয় দারার কাছ থেকে তিনি রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, এধরনের একটা কৈফিয়ৎ আছে।[২০] ফিরদৌসীর রচনার সঙ্গে মোজাম্মেল হকের বইটির সম্পর্ক তিনি অবতরণিকায় বলে দিয়েছেন :

…এই গ্রন্থ প্রাচীন পারস্য-সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত — আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে গ্রথিত।… আমি মূলাংশের মর্ম গ্রহণ পূর্বক স্বাধীনভাবে অনুবাদ করিয়া যাইব মাত্র।

স্বাধীন হলেও অনুবাদটি মূলানুগ বলেই সমালোচকরা মতপ্রকাশ করেছিলেন। 'কেয়ুমোর্ষ প্রথম বাদশাহ্‌র কাহিনী থেকে শুরু করে 'সোহরাবের বিরুদ্ধে [রুস্তমের] যুদ্ধযাত্রা' (পরিণামে তহ্‌মিনার মৃত্যু) পর্যন্ত উপাখ্যান তিনি বাংলা গদ্যে বিবৃত করেছিলেন। সুফী সাধকদের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, অপ্রাকৃত জীবনযাত্রার প্রতি মোজাম্মেল হকের একটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে। দৈনন্দিন জীবন বা যে জীবনের রহস্য সহজে উদ্‌ঘাটন করা যায়, সেই জীবন তাঁকে অতখানি আকর্ষণ করে নি — যতটা এই রহস্যপূর্ণ আবেগময় জীবন তাকে প্রলুব্ধ করেছে। *শাহ্‌নামা* রচনায় তাঁর উৎসাহের মূলেও এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। এই পুরাণ কাহিনীর জগত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনবৃত্ত থেকে অনেক দূরবর্তী : জীবনের বীরত্বপূর্ণ বিকাশ এখানে ঘটেছে। প্রেমে ও প্রতিহিংসায়, যুদ্ধে ও মৈত্রীতে, বলে ও বীর্যে, কৌশলে ও সম্পদে এই জগত অসাধারণ। মোজাম্মেল হকের রচনায় এই জগত তার সকল আড়ম্বর ও আকর্ষণ নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যধারার সঙ্গে এইখানে গদ্য-সাহিত্যের সংযোগ লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। মিশ্র ভাষারীতির দুটি সর্বজনপ্রিয় কাব্য— *জঙ্গনামা* ও *শাহনামা*—মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হকের হাতে *বিষাদ-সিন্ধু* ও *শাহ্‌নামার* রূপলাভ করেছে। *মহর্ষি মনসুর* ও *তাপস-জীবনী* যে *তাজকিরাতুল* আউলিয়ার গদ্যরূপ, একথা পাঠককে বলে দিতে হয় না।

শাহ্‌নামার পূর্বে প্রকাশিত *হজরত মোহাম্মদ* কাব্যেও [১৯০৩] মিশ্র-ভাষারীতির কাব্যজগতের ছায়াপাত ঘটেছে। তাই, বিবি খাদিজার বর্ণনায় কবি বলেছেন, 'রূপে অনুপমা যেন মুর্তিমতী রতি' [পৃ১৩৭] এবং হজরত মুহম্মদকে বারংবার 'প্রভু' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'এ কি কথা আজি হায় সা'রার বদনে!' [১০] যেমন মধুসূদনকে স্মরণ করিয়ে

দেয়, তেমনি কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক বৈষ্ণব পদ মনে পড়ে. যখন দেখি

কুমার যাবেন গোঠে স্মরিয়া হালিমা
প্রত্যুষ সময়ে সুখ-শয্যা পরিহরি
গমনের আয়োজন লাগিলা করিতে। [১০]

তারপর, হজরতের বিবাহ-সভায়

সুচারু চামর কেহ হেলায় যতনে
সুধীরে বীজন করে, কোন জন রঙ্গভরে
ভরিয়া সোনার পাত্র সুরভি সিঞ্চনে,
মোহন মৃদঙ্গ বাজে চিত্ত-বিনোদন সাজে
নাচে নর্ত্তকীর দল ভঙ্গিমার সনে।
সহ তাল-মন-লয়, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
উৎসবের একশেষে, বর্ণিব কেমনে।

স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইসলামের যে পিউরিট্যানিক সংস্কার-আন্দোলন হয়েছে, তা মশাররফ হোসেন-মোজাম্মেল হককে স্পর্শ করে নি, তাঁদের কবিকল্পনার স্রোতে বাধা সৃষ্টি করে নি। অবশ্য হজরত মুহম্মদের (দ:) জীবনকাহিনী নিয়ে সাধু ভাষায় কাব্যরচনার গৌরব মোজাম্মেল হক দাবী করতে পারেন। রচনাটি তাঁর পরিণত শক্তির সৃষ্টি, সুতরাং কাব্যিক সৌন্দর্য এর আছে — ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কার প্রয়োগে।

জাতীয় ফোয়ারা কাব্যে (১৯১২) বোধহয় প্রথমবারের জন্যে তিনি সমসাময়িক সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন। স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা সংকলিত হওয়ায় কাব্যটির প্রথম সংস্করণ সরকার বাজেয়াপ্ত করলে 'দোষাবহ'-বিবেচিত কবিতা পরিত্যাগ করে ছ মাস পর নতুন সংস্করণ প্রচারিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে শেষ-উনিশ ও আদি-বিশ শতকের মুসলিম সমাজনেতাদের সঙ্গে এবং ধর্মজীবনকেন্দ্রিক পুনর্জাগরণবাদী লেখকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, এ কাব্যে তার ছায়াপাত ঘটেছে। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'অনারেবল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'কে। বিভিন্ন কবিতায় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্, ধনবাড়ীর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ও করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর প্রশস্তি আছে। 'জাতীয় সঙ্গীত' কবিতায় মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন :

আলস্য-শয়ন করি পরিহার
জাগ উঠ খোল নয়ন দ্বয়
আর কত কাল অজ্ঞান তিমিরে
ডুবিয়া জীবন করিবে ক্ষয়!
আর কত কাল হেয় হয়ে ভবে
ভুঞ্জিবে অহেরে দুর্দ্দশা ঘোর
সহিয়া দীনতা অনল-যাতনা
ফেলিয়া নিয়ত নয়ন-লোর।

হিন্দুর উন্নতি দেখে কবি আশ্বস্ত হয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে তার অনুকরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন 'হরিসে বিষাদ' কবিতায় :

সার্দ্ধ শত বর্ষ চক্ষের উপর
অই কর দরশন,
হিন্দু ভ্রাতৃগণ আনন্দে কেমন,
সহ ধন মান সংসার-জীবন
স্বদেশে বিদেশে করিছে ক্ষেপণ
হেরে বিমোহিত মন।
এ দেখেও কি হে সুপথে আসিতে
ধায় না — মজে না চিত্ত ?
হয় না শিক্ষা অশিব নাশিতে ?
লাঞ্ছনা দূরিতে, স্বহিত সাধিতে ?
তমোকূপ হতে আলোকে উঠিতে ?
নহ কি গো হরষিত ?

তাঁর পরবর্তী রচনা *মাওলানা-পরিচয়* (১৯১৪) যদিও 'কমার-উল ওলামা জনাব মাওলানা শাহ সুফী মহাম্মদ আবুবকর সাহেবের' জীবনকথা, তবু তা অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়। এতে সমকালীন ঘটনাবলী এবং সে সম্পর্কে মোজাম্মেল হকের মতামতের উল্লেখ পাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

স্বদেশী আন্দোলন উল্লম্ফনের দিনে যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষণ না ঘটে, যাহাতে বাজভক্ত মুসলমান সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অপ্রীতিকর কোনও কার্যের সংস্রবে না থাকে, জনাব মাওলানা সাহেব তদ্বিষয়ে বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়া রাজভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। [পৃ ৩২-৩৩]

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বঙ্গভঙ্গ রহিত করার আন্দোলন তাঁর সমর্থন পায় নি এবং যদিও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি তাঁর কাম্য, সে কেবল সামাজিক শান্তির জন্যে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের অভিপ্রায়ে নয়। কেননা, যা সবচেয়ে বড় কথা, 'সদাশয় সরকারের' প্রতি 'রাজভক্ত' থাকতে হবে — তার উহ্য কারণ হচ্ছে, এইভাবে সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় মুসলমানেরা জাগতিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে।[২৯]

প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এর মাধ্যমে 'জাতীয় অভাব-অভিযোগ বা অপর কোনও সামাজিক কথা সদাশয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা এবং সমাজের সাহানুভূতি লাভ' করা যায়। প্যান ইসলামবাদ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট আবেগে এ বইতে প্রতিফলিত হয়েছে বল্কান যুদ্ধ-প্রসঙ্গে। পীর আবুবকর এক দিনে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তুরস্কের সুলতানকে পাঠিয়েছিলেন, একথা মোজাম্মেল হক সগর্বে উল্লেখ করেছেন।

এরপর আবার কিছুকালের জন্যে মোজাম্মেল হক আধ্যাত্মিক জগতে প্রস্থান করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ফসল *খাজাময়ীনউদ্দীন চিশ্‌তী* (১৯১৮)। 'ভারতের ধর্ম-গগনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র' 'তাপস-প্রবরের' এই জীবনীটি 'কয়েকখানি উর্দু গ্রন্থ অবলম্বনে' (এবং প্রকাশকের অনুরোধে) লিখিত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এটি *মহির্ষি মনসুর* ও *তাপস-জীবনী*র সগোত্র হলেও রচনারীতির দিক দিয়ে অনেক হীনপ্রভ। অলৌকিক ঘটনায়

জীবনীগ্রন্থটি এতই আকীর্ণ যে পাঠকমনে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের চাইতে বর্ণিতব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিক। হজরত মুহম্মদের (দ:) পবিত্র সমাধি থেকে আদেশ এবং দাড়িম্বফলে পথের পরিচয় লাভ করে মঈনউদ্দীন আজমীরে আসেন। তাঁর চিহ্নিত গণ্ডীর মধ্যে পদক্ষেপ করা মাত্রই শত্রুপক্ষ সংজ্ঞা হারিয়েছে। একটি পেয়ালার মধ্যে আনা-সাগরের সমুদয় পানি ভরে নিয়ে সাগর শূন্য করেছেন, আবার পেয়ালা উপুড় করে দেওয়ায় সাগর পূর্ণ হয়েছে। অলৌকিক শক্তি লাভ করে তাঁর পাদুকাও ধন্য হয়েছে। কিন্তু মোজাম্মেল হক একটি ভুল করেছেন। তিনি যখন রাজমাতার দ্বারা পৃথ্বীরাজকে মঈনউদ্দীনের আকৃতি বর্ণনা করে উভয়ের বৈরিতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তখন পরোক্ষে যে তিনি হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন, তাঁর মুগ্ধাবস্থা তা উপলব্ধি করতে দেয় নি।

জীবনচরিত-রচনার ক্ষেত্রে বস্তুধর্মিতার শাসনে পীড়িত হবাব আশঙ্কায় হয়তো মোজাম্মেল হক *দরাফ খান গাজী* [১৯১৯] রচনা করেন। এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে তিনি যা বলেছেন, তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> ভিন্নজাতীয় লেখকের তুলিকায় আমাদের বাদশাহ্-নবাব, আমীর-ওমরাহ্, সাধু-দরবেশ এবং সাধারণ মুসলমান-চরিত্র অকারণে মসীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মোসলেম মনস্বী পুরুষ, যাঁহাদের মাহাত্ম্য-মহিমার উপরে খোদকারী ফলাইবার উপায় নাই, যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র-গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সর্ব্বলোকের ভক্তি-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কেহ কেহ নিজেদের দিকে টানিয়া আনিয়া ইনি হিন্দুকুলোদ্ভুত, উনি মুসলমান হইয়াও দেবদেবীর পরম ভক্ত, তিনি দেবতার প্রসাদ নিত্য খাইতেন, ইত্যাকার অসঙ্গত উক্তি করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভেব সহিত নিজেদের সহৃদয়তা দেখাইয়া থাকেন। আমরা বলি, তাঁহাদের সেইরূপ সহৃদয়তা — সেইরূপ অযৌক্তিক স্তুতিবাদ করাটাও মুসলমান-চরিত্র কলঙ্কারোপ করা — শাদাকে কালো করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।
>
> উল্লিখিতরূপ খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ত্রিবেণী-বিজয়ী ধর্ম্মপ্রাণ তাপস মহাত্মা জাফর খান গাজীকে গঙ্গাভুক্ত মুসলমান এবং একটি গঙ্গার স্তব তাঁহারই রচিত বলিয়া আনন্দপ্রকাশ করেন। *দরাফ খাঁ* নামে একখানি উপন্যাসে এ বিষয়ে চূড়ান্ত গবেষণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।...
>
> কলিকাতার নূর লাইব্রেরীর স্থাপয়িতা... মযীনউদ্দীন হোসায়ন, বি.এ. 'দরাফ খাঁ' পাঠে মর্ম্মাহত হইয়া তেজস্বী তাপস জাফর খাঁন গাজীর প্রকৃত জীবনী-সংশ্লিষ্ট একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন।... আমাদের এখানিও উপন্যাস, তবে ইতিহাসের সত্য সংস্রবটুকু রক্ষা করিতে আমরা যত্ন করিয়াছি।...

হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান চরিত্রের রূপান্তর ক্ষুণ্ন হয়ে মোজাম্মেল হক উপন্যাসটি রচনা করেন। কিন্তু এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে নি। ইতিহাসের সত্য[৬০] — রাজা মান নৃপতির (উপন্যাসে রাজা মুকুট রায়ের) সঙ্গে যুদ্ধে জাফর খাঁর জয়লাভ ও রাজার সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ এবং পরিণত বয়সে হুগলীর রাজা ভূদেবের (উপন্যাসে ভূদিয়ার রাজার) সঙ্গে যুদ্ধে জাফর খাঁর মৃত্যুবরণ সংযোজিত হয়েছে একেবারে উপন্যাসের

শেষে। প্রথমাংশে সবটুকুই কবিকল্পনা। সে-যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশটুকু ফুটিয়ে তোলার জন্যে তাঁর কোন প্রয়াস দেখা যায় না। ত্রিবেণীতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত জাফর খান গাজী ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে মুগ্ধ হয়ে 'বালবিধবা সচ্চরিত্রা বামাসুন্দরী' তার বান্ধবী ব্রাহ্মণ গণপতি মিশ্রের চতুর্দশী সুন্দরী তনয়া লীলাবতীকে বিবরণ দিতেই লীলাবতী অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট পুরুষের উদ্দেশ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। ঘটনাক্রমে প্রেমাবশে অজ্ঞান হয়ে লীলাবতী নদীতে ডুবে যাচ্ছিল, কিন্তু গাজীর সহচর মোস্তফা খান বোখারী তাকে উদ্ধার করলেন। মুসলমান যুবকের বক্ষ আশ্রয় করে জীবনলাভের জন্যে লীলার কলঙ্ক রটে। তখন কলঙ্কভঞ্জনের জন্যে লীলা কর্তৃক মোস্তফাকে পত্রপ্রেরণ, হিন্দুনারীবিবাহে মোস্তফার অসম্মতি, ধর্মবিষয়ক আলোচনায় মোস্তফার কাছে মিশ্রের পরাজয়। এরপর আর কোন বাধা রইল না। লীলা লালন্নেসা হয়ে মোস্তফাকে লাভ করল; বান্ধবীর আকর্ষণে বামা বাহারন্নেসা হয়ে খাজা আবদুল আলির ঘর আলো করল। প্রতিবেশী বাদল দাসও ইসলাম গ্রহণ করল। মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি দেখে রাজা মুকুট রায়ের নেতৃত্বে হিন্দু রাজন্যেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন। পরিণামে মুকুট রায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর প্রস্তাবে জাফর খান গ্রহণ করলেন রাজকন্যা চম্পাবতীকে।

উপন্যাস হিসেবে এটি তেমন সার্থক রচনা নয়। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসও ভাল হওয়া সম্ভব — কিন্তু লেখক যদি উদ্দেশ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তবে রচনাটির শিল্পকর্ম ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

মোজাম্মেল হকের সৃষ্ট আধ্যাত্মিক জগত মিশ্র ভাষারীতির কাব্যবৃত্তের খুব সন্নিকটে, একথা বলেছি। তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, এর অব্যবহিত পরই তিনি লিখলেন *হাতেম তাই* (১৯১৯)। হাতেম তাইয়ের কাহিনী জনপ্রিয় এবং শিক্ষাপ্রদ বলে তিনি এর নবরূপায়ণে প্রবৃত্ত হন। *শাহনামা* এবং *হজরত মোহাম্মদ* কাব্যের মতো এরও একটিমাত্র খণ্ড প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে। এক্ষেত্রে হোসনে বানুর *দ্বিতীয় সওয়ালের* উত্তরদানের পরেই রচনা শেষ হয়েছে। মোজাম্মেল হকের রচনায় এখন একটু ক্লান্তি এসেছে মনে হয়। প্রথম যুগের গদ্যের সেই বাঁধুনী ও উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। দুটি উদাহরণ দিই। ইমনের রাজা তাই (হাতেমের জনক) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> এমনি তাঁহার সুবিচার ও দব্‌দবা রবারবা ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে বাঘ-বকরী এক সাথে চরিয়া বেড়াইত, কেহ কাহারেও হিংসা করিত না। [১]

দরবেশবেশী তস্কর সম্পর্কে 'হোসনে বানু মনে মনে ভাবিতেছেন'

> বারবার চড়াই তুমি খেয়ে যাও ধান
> এইবার চড়াই তোমার বধিব পরাণ। [৩৮]

আনন্দের কথা, এই কিমাশ্চর্য-জগতের মোহ আরো একবার তিনি কাটাতে পেরেছেন। শেষ পর্যায়ের দুটি বই এর সাক্ষ্য। একটি জীবনচরিত, কোন মহাত্মা তপসের নয় — 'মহীশূর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি টীপু সুলতানের জীবনকাহিনী'। অন্যটি তাঁর একমাত্র 'সমাজ চিত্র'। 'টীপু সুলতানের'র (১৯৩১) মুখবন্ধে তিনি বলেছেন :

> বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিয়া টীপু চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতো টীপু ধর্ম্মান্ধ ছিলেন, হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার

> করিতেন এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। কিন্তু একথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা দুইজন মনীষী লেখকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন।

কিন্তু সাদীর সেই বিখ্যাত বয়েতের মতো, নিজের হাতই তাঁকে প্রতারিত করেছে। মনীষী লেখকেরা যাই বলুক না কেন, মোজাম্মেল হক কি বলেন, শোনা যাক :

> ইহার পর হইতে টীপুর জীবনের একটি প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল দীন-ইসলাম প্রচার। তিনি ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের মহিমাকীর্ত্তন এবং তৎসহ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বহু আলেমকে প্রেরণ করিলেন। স্থলবিশেষে বলপ্রয়োগ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে বহু হিন্দু ইসলাম কবুল করিয়াছিল, আবার অনেক স্বধর্ম্মরক্ষার্থে আত্মনাশও করিয়াছিল।
>
> [২৬-২৭]

টীপুর সংগ্রামের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই টীপুর রাজ্যলিপ্সাই তাঁর পতনের কারণ বলেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি আরো বলেছেন, 'টীপু গিয়াছেন,—কিন্তু নিজদোষে একটি মুসলমান রাজত্বের অস্তিত্ব লোপ করিয়া গিয়াছেন' [১১৫]। তাঁর এই ভ্রান্তির কারণ কি ? ঐতিহাসিক মালমসলার অভাব নয়, তাঁর চেয়ে *টীপু সুলতান* নাটক (কলিকাতা, ১৯৪৪) রচয়িতা মহেন্দ্র গুপ্তের হাতে মালমশলা বেশী ছিল বলে মনে হয় না। অভাব ইতিহাস-চেতনার। তার চেয়ে বড় কারণ বোধহয়, ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্যবোধ এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বদলে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির প্রভাব।

মুসলমান পল্লীসমাজের চিত্র হিসেবে *জোহরা* (১৯৩৫) উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য দাবী আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব এতে আছে, কিন্তু রচনাভঙ্গীতে অতটা নয়, বরঞ্চ নীতিবাদের ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ প্রত্যক্ষ। উপাখ্যানের শেষে লেখক দেখিয়েছেন, 'পাপের পতন, পুণ্যের জয় হইল'। অসৎপথগামীরা শাস্তি পেয়েছে, সুপন্থীরা সুখী হয়েছে ! চরিত্র-চিত্রণের বেলায় এই নীতিবোধ কিন্তু তাঁর ঔপন্যাসিকোচিত নির্লিপ্ততার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। তাই, তাঁর পাত্রপাত্রীরা সকলেই গভীর বর্ণে রঞ্জিত — হয় ভালো, নয় মন্দ। অন্তরের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করে মানবচরিত্রের রহস্য-উদঘাটন — সাদায়-কালোয় মিশ্রিত প্রবৃত্তির প্রকাশ — তিনি করেন নি। তবু সেকালে আমাদের সমাজের একটা প্যাটার্ণ এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সেজন্যে এর মূল্য আছে।

মোজাম্মেল হক দুটি সাহিত্যপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *লহরী* (১৯০০) — 'নানাবিষয়িণী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা' — শান্তিপুর (নদীয়া) থেকে প্রকশিত হত। পত্রিকাটি সম্পর্কে রক্ষণশীল *ইসলাম প্রচারক* পত্রের সমালোচনা — 'লহরীর কবিতাগুলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী। দুঃখের বিষয়, মুসলমানদিগের কবিতা ইহাতে অল্পই দৃষ্ট হইতেছে'[৩১] — পত্রিকাটির একটি চরিত্র নির্দেশ করে। কিন্তু এর দ্বারা একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মুসলমানদের সমস্যা বা স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে পত্রিকাটি অচেতন ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত এর একটিমাত্র সংখ্যা দেখছি 'মহামান্য তুরস্ক সুলতানের পঞ্চবিংশ বর্ষ শুভ রাজত্ব উপলক্ষে' প্রচারিত হয়েছিল এবং মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী 'স্তাম্বল' (অর্থাৎ ইস্তাম্বুল) শিরোনামায় কবিতা

লিখেছিলেন। সেকালে মুসলিম বাংলায় প্যান ইসলামবাদের প্রভাবের এটি একটি উৎকৃষ্ট পরিচয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভদ্র 'ঘৃণ্য কে?' কবিতায় মুসলমানের প্রতি হিন্দুর সংকীর্ণ মনোভাবের নিন্দা করেছেন :

যবনে তাহারা দেখিলে নয়নে
ছুঁও না ছুঁও না বদনে বলি
অতি সাবধানে ডিঙ্গি মারি ধীরে
যায় সাত হাত তফাতে চলি।[৩২]

এবং শ্রীছক্কনলাল ঘোষ 'জেবউন্নেসা' কবিতায় বিদুষী মুঘলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মোসলেম ভারত (১৯২০-২১) পত্রিকার সম্পাদক মোজাম্মেল হক বলে বিজ্ঞাপিত হলেও বোধ হয় তার আর আসল পরিচালক ছিলেন তাঁর পুত্র মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক।[৩৩] উচ্চমানের সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে এই স্বল্পায়ু পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে পত্রিকাটির যোগই এর বিশেষ গৌরবের কারণ।

পাঁচ

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান নাট্যকার পাই মাত্র তিনজন : মীর মশাররফ হোসেন, আবদুল করিম ও কাদের আলী। মশাররফ হোসেনের নাট্যরচনার পরিচয় দিয়েছি। আবদুল করিম লেখেন *জগৎমোহিনী* নাটক (১৮৭৫) আর কাদের আলী রচনা করেন *মোহিনী প্রেমপাশ* নাটক (১৮৮১)।

মশাররফ হোসেনের নাটক *বসন্তকুমারীর* মতো আবদুল করিমের *জগৎমোহিনী* যে-কোন কালের ও যে-কোন স্থানের উপাখ্যান হতে পারত। এর রূপকথাধর্মী কাহিনীটি এমন কিছু মনোহর নয়। *বসন্তকুমারীর* মতো এর পাত্রপাত্রীরা রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মশাররফ হোসেনের নাটকটির তুলনায় এর বড় দুর্বলতা এই যে, কাহিনীর গতিপরিবর্তন হয়েছে নিতান্ত বাইরের ঘটনার সংঘাতে : রেবতীর উদ্দাম প্রবৃত্তির মতো অন্তর-নিঃসৃত কোন আবেগ একে নিয়ন্ত্রিত করে নি। এইজন্যে জগৎমোহনী বা চন্দ্রকান্তের মতো প্রধান চরিত্রসমূহ এখানে ছোট হয়ে পড়েছে বৃন্দে বা পাঁচীর মতো অপ্রধান চরিত্রের কাছে।

রাজা, মন্ত্রী, বয়স্য ইত্যাদি চরিত্রের প্রবর্তনায় সংস্কৃত নাটকের প্যাটার্ণের অনুসৃতি আছে। তা সত্ত্বেও এই চরিত্রগুলোতে নাট্যকারের সমসাময়িক বিত্তশালী ভূস্বামীদের আদল আছে। রাজা কালীকান্তের সঙ্গে মধুসূদনের *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০) প্রহসনের ভক্ত প্রসাদের তাই মিল লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে নারীর প্রতি লোলুপতায়। নাট্যকার বেশ কৌশলের সঙ্গে রাজার এই প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন রাজা দূতীর কথোপকথনের মাধ্যমে :

রাজা। কেমন দেখলি ? দেখতে কেমন ?
পাঁচী। মহারাজ ! দেখার কথা আর বলব কি, ছোট মেয়েটি বড়ই সুন্দর, আমাদের বিলাস (রাজকন্যা) অপেক্ষাও সুন্দরী।

রাজা। (স্বগত) সর্বনাশ ! বেটী বলে কি, (প্রকাশ্যে) বয়স কত ?

পাঁচী। আজ্ঞে, আমাদের বিলাসের বয়স হতে কিছু বেশী হবে।

রাজা। (স্বগত) বেটী বিলাসের নাম আর ছাড়ে না (প্রকাশে) তোকে সে কথা বলিনি, দেখতে কেমন, কথাবার্তা কেমন, চলন কিরূপ, জাত কি, ব্যবসায় কি, তাই বলছি।

পাঁচী। মহারাজ ! আমিও ত তাই বলছি। দেখতে শুনতে ঠিক আমাদের বিলাসের মত, বরং বিলাস অপেক্ষাও দেখতে সুন্দর, বযসও কিছু বেশী, বোধ হয়, যেন, তিনি আর বিলাস ঠিক পিঠাপিঠি দুই বোন।

রাজা। রাম রাম ! এ বেটি ত ভালই কাণ্ড করতে লাগিল, ইহাকে ভেঙ্গে না বলিলেও ত বুঝতে পারে না। (প্রকাশে) পাঁচী ! তোকে বলছি কি,যে তুই নাকি ঘটাইতে পারিস ?

পাঁচী। মহারাজ ! এতক্ষণ ভেঙ্গে বল্লেই তো আমার চিন্তা দূর হত। আমি আর একখানা ভেবেছিলাম, সে আমার কতক্ষণের কায।

এ রকম পরোক্ষভাবে সমকালীন সমাজের ছায়াপাত ঘটলেও সমগ্র নাটকটিতে সাধারণভাবে বাস্তব-স্বীকৃতি নেই। রূপলোলুপতার পৌনঃপৌনিকতা এর নাট্যরসকে বিঘ্নিত করেছে। সাধুভাষা সৃষ্টিতে লেখকের সচেতন প্রচেষ্টা সংলাপকে কখনো কখনো কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করে তুলেছে, তার উপর অনাবশ্যক পাদটীকা ভারাক্রান্ত করেছে।

মোহিনী প্রেমপাশ উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জমিদারের পারিবারিক চিত্র রূপহীন স্বামীর প্রতি পরমাসুন্দরী স্ত্রীর অনাসক্তি নাটকের মূল সমস্যা। অন্য পুরুষের প্রতি নায়িকার ক্ষণিক রূপমোহ ঘটনা প্রবাহে একমাত্র আবর্ত সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গক্রমে অনঙ্গ ও মোহিনীর সংলাপ কৌতূহলজনক।

অনঙ্গ। ইংরাজদের বেশ নিয়ম ! ভাই, ওদের স্ত্রী-পুরুষের মত না হলে বিয়ে হয় না।

মোহিনী। আহা ওদের বড় খাশা নিয়ম। হায় ! আমরা যদি ইংরাজ হতেম তাহলে আমাদের আর এ কষ্ট সইতে হত না।

অনঙ্গ। এই জন্যে তো কত পুরুষ কত মেয়ে খৃষ্টান হয়ে গ্যাল।

সমকালীন সমাজ-চিত্র বলে *মোহিনী প্রেমপাশের* মূল্য আছে। প্রেমজ বিবাহ-ব্যবস্থার সমর্থনে এবং ধর্মসম্পর্কের মধ্যে মানবিক অনুভূতির স্থাননির্দেশে নাট্যকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। তবে এ নাটকে কোন প্রণয়চিত্র নেই। রঞ্জনের প্রতি মোহিনীর আকর্ষণ বিকার মাত্র। শৈবলিনীর নরক-দেখার মতো মোহিনীও স্বপ্ন দেখেছে ভয়াবহ পীড়নের এবং তারপরেই স্বামীর প্রতি তার নিষ্ঠা দেখা দিয়েছে।

সংলাপের ভাষা কথ্য এবং স্বাভাবিক। সেকেলে রসিকতার কিছু নিদর্শন এই নাটকে আছে, যা শ্লাঘার যোগ্য নয়। লেখকের রুচিদোষের পরিচয় বলে গ্রহণ না করে সেগুলোকে সেযুগের নিম্নরুচির পরিচয় বলেই গ্রহণ করা উচিত। যেমন, সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ইঙ্গিত করে ঠাট্টা বা ক্ষোভপ্রকাশ এ নাটকে একাধিকবার ঘটেছে।

জগৎমোহিনীর তুলনা *মোহিনী প্রেমপাশে* বাস্তব-সচেতনতা অধিক। তবে লক্ষণীয় যে কাদের আলীও পাত্রপাত্রী চয়ন করেছেন হিন্দু সমাজ থেকে — সমকালীন মুসলমানদের জীবনযাত্রা থেকে কোন প্রেরণাই লাভ করেন নি।

ছয়

নওসের আলী খাঁ ইউসফজীর পৈতৃক নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায়, পেশা ছিল সাব ডেপুটিগিরি; *শৈশব-কুসুম* ও *মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত* কাব্য ছাড়া তিনি লেখেন *উচ্চ বাংলা শিক্ষা-বিধি* ও *দলিল রেজিস্টারি শিক্ষা* নামেই যার পরিচয়।[৩৪] কিন্তু যথার্থ চিন্তাশক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন *বঙ্গীয় মুসলমান* (১৮৯০) গ্রন্থে।

সূচনায় বাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে এদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। বাঙালী মুসলমান সমাজে তিনি পাঁচটি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পান। প্রথমত, আলালের ঘরের দুলাল-শ্রেণী, হঠাৎ-বড়লোক হবার অহঙ্কারে মত্ত। দ্বিতীয়ত, কৃষক শ্রেণী। এদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার অভাব তো অত্যন্ত প্রকট, তার উপরে পেশাগত শিক্ষার — কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। পরিবারে লোকবৃদ্ধির ফলে জীবনের সমস্যা যেমন জটিলতর হয়ে উঠেছে, তেমনি আবার জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের ফলে স্তূপীকৃত সমস্যার সমাধানের উপায় হচ্ছে না। তৃতীয়ত, ব্যবসায়ী শ্রেণী; মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা ঠিক ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সংযোজিত মূলধন নিয়োগের চেষ্টা নেই দেখে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। চতুর্থত, চাকুরীজীবীরা। পঞ্চমত, ভূম্যধিকারীরা। এঁরা কেবল অর্থবলেই বড় হয়েছেন, বিদ্যাবুদ্ধির বলে বড় হবার কোন চেষ্টা এঁদের নেই।

সামাজিক অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি প্রথমেই মুসলমান সমাজে শিক্ষার অভাবের জন্যে আক্ষেপ করেছেন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দের বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায় :

প্রতি হাজারে	লেখাপড়া শিখছে	লেখাপড়া করতে পারে	মূর্খ
হিন্দু	৩৯	৭৯	৮৯২
মুসলমান	২৮	৪৫	৯৩৭

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখ্যা করে নওসের আলী খাঁ বলেন :

> ৫০০শত বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দু জাতিকে পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মুসলমান রাজত্বের সময়ে হিন্দুগণ আরবী পারসী শিক্ষা করিত। অতএব ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে হিন্দুগণ পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত থাকায় অনায়াসে পারসীর পরিবর্তে ইংরেজী বুলিও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন…। [৩১]

কিন্তু শুধু এই মানসিক কারণে যে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষালাভ করতে পারলেন না, তা নয়, এর পেছনে অসুবিধাও নিহিত ছিল :

মুসলমান বালকদিগের যেখানে ৫টি ভাষা (আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা) শিক্ষা করিতে হয়, সেখানে হিন্দু বালকদিগকে মাত্র ২টি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কাজেই মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু বালকদের সহিত সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। [৩৪]

স্কুলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয়। হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় মুসলমানদের বাংলা *জ্ঞান* কম, নেই বললেও চলে। ফলে তাদের অসুবিধা হয়। স্কুল-কলেজে একে নামাজের ছুটি নেই, তার উপরে পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। এসবও শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাদের অনুৎসাহের কারণ। এই প্রসঙ্গে নওসের আলী বলেছেন যে, পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে প্রভৃতি শব্দে খুব যায় আসে না, কিন্তু ইংরেজ লেখকেরা মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসকে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছেন, সেটা ভয়ঙ্কর। এর ফলে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে মুসলমান ছেলেদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

এ সত্ত্বেও লেখক প্রেরণা দিয়েছেন যেন মুসলমান পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। সোল্লাসে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ১৮৫১ খৃস্টাব্দে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা মুসলমানের চতুর্গুণ ছিল, কিন্তু গত দশবৎসরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দারিদ্র্য যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে তেমনি অন্যত্র মুসলমানদের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ হয়ে রয়েছে।

মুসলিম মহিলাসমাজের কথা বলতে যেয়ে তিনি প্রথমে তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারহীনতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্ধৃত তথ্যে দেখা যায় প্রতি দশ হাজার মুসলমান মেয়ের মধ্যে দশজন সামান্য শিক্ষিতা, সাত জন শিক্ষারতা। শিক্ষার অধিকারের মতো, সামাজিক মঙ্গলজনক অন্যান্য অধিকার মেয়েদের লাভ করা প্রয়োজন, একথা তিনি বলেছেন :

যদিও আমি আজকাল নব্যধরনের স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী নহি তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাদের প্রকৃত অধিকার সকল লাভ করিতে পারেন, এসলাম ধর্ম্মানুমোদিত স্বত্ত্বসমূহ তাহারা লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। [৪৪]

মুসলমান সমাজের সামাজিক ত্রুটির উল্লেখ-প্রসঙ্গে নওসের আলী বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন :

বঙ্গীয় মুসলমানদের সমাজের আর কালিমা বহু বিবাহ। ...বহু বিবাহরূপ কুফল বহু সন্তানোৎপত্তি, গৃহবিবাদ, উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা। [৪৬-৪৭]

অল্প কয়েকটি কথায় তীব্রভাবে এর প্রতিক্রিয়া তিনি বর্ণনা করেছেন। অনুকরণে পোশাক-পরিচ্ছদ করার নিন্দা করেছেন তিনি এবং সভয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, মুসলমান সমাজে 'ধীরে ধীরে পানদোষ প্রবেশ করিতেছে'।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ-প্রসঙ্গে তিনি মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন : এদেশের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাহিই প্রধান; এই দুই জাতির উন্নতি ও অবনতির উপরে এদেশে মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, ফলত হিন্দু-মুসলমানে অসম্মিলন কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা বর্তমান সময়ে

হিন্দু ও মুসলমানে যে ভাব দেখিতেছি, তাহাকে সম্মিলনের ভাব বলা যায় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি কামনা করলেও ধর্মজীবনকে তিনি ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম আদর্শে পুনর্গঠিত করার পক্ষপাতী। আমাদের ধর্মীয় অবস্থার সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা, ইসলামের উপরে পৌত্তলিক প্রভাব — যার ফলে মাদার, গাজী, পাঁচ পীর, শীতলা, শাহ্ সাহেব প্রভৃতি নানা রকম পীর ও মুসলমানপূজ্য দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছে। মাজারে শিরনি দেওয়া এবং ফতেহা পাঠ তিনি সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ আহমদ বেরিলভী, সৈয়দ মুহম্মদ আলী, বিলায়েত আলী, কেরামত আলী ও জয়নুল আবেদীনের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। এঁরা সকলে — যাকে আমরা বলে থাকি — সুবিখ্যাত 'ওয়াহাবী'। সৈয়দ আহ্মদ-পন্থীদের পিউরিট্যানিক মনোভাবের দ্বারা নওসের আলী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, একথা খুব স্পষ্ট। কিন্তু ধর্মসংস্কারক্ষেত্রে রক্ষণশীল হলেও সামাজিক সমস্যার আলোচনায় তিনি উদারনৈতিক মতাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। তাই আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে এতখানি জোর দিয়েছেন এবং মাতৃভাষায় ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদ করার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু তাই নয়, একই ধর্মাবলম্বী জনসমষ্টির মধ্যেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি তাঁর চোখ স্পষ্ট ধরা পড়েছে — এই শ্রেণীসম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন।

শৈশব-কুসুম (১৮৯৫) সতেরোটি কবিতার সমষ্টি। রচনারীতিতে নৈপুণ্যের পরিচয় অতটা নেই, যতখানি আছে দেশপ্রেমের আবেগ এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা। উদাহরণস্বরূপ দুটি অংশ আছে উদ্ধৃত করি :

ভারতের কথা সখে ! ভুলো না কখন
ভুলিও না জননীর মলিন বদন
স্মরি জননীর মুখ
ফাটে যেন তব বুক
স্বদেশে বিদেশে থাকি করিও যতন
জনম ভূমির হিত করিতে সাধন

['বন্ধুর বিদায় দিনে']

হিন্দু আর মুসলমান
যেন সবে এক প্রাণ
হেন শুভ দিনে মরি পুলকে পূরিত
মিশিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত।।

['শিক্ষাবিস্তার']

সাত

নওসের আলী খান ইউসফজীর আত্মীয় ও স্বগ্রামবাসী আবদুল হামিদ খান ইউসফজী ছিলেন পাক্ষিক *আহমদী* পত্রিকার (প্রকাশ : ১৮৮৬) সম্পাদক। করিমন্নেসা খানম চৌধুরাণীর আনুকূল্যে এটি টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হত। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যে পত্রিকাটি আমাদের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট আসন লাভ করবে। হিন্দু-

মুসলমানের মিলন-কামনায় বাঙালী মুসলমানের দিক থেকে সাময়িকপত্র প্রকাশের যে-সকল আয়োজন হয়েছিল *আহমদী* তার মধ্যে প্রথম।[৩৫]

উদাসী (১৯০০) আবদুল হামিদের সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। এতে তিনটি কাব্য-কাহিনী সংকলিত হয়েছে : 'উদাসী', 'কিরণপ্রভা' ও 'অরুণভাতি'। শেষোক্ত কাব্য দুটি সম্ভবত স্বতন্ত্র আকারেও প্রচারিত হয়েছিল। তিনটি কাব্য-কাহিণীরই বিষয়বস্তু প্রেম। অস্পষ্ট ভাব ও অকারণ আবেগের উচ্ছাস এর বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে কবি অবশ্য প্রেমকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় :

কি বা সার আছে বল অনিত্য প্রণয়ে,
পূর্ণ যাহা নহে কভু, স্বর্গীয় বিনয়ে
কে রে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান,
হায় রে ! মরুক সেই অধম অজ্ঞান।...
বিশেষ অবলা-হৃদি চপলতাময়
না থাকে কখনো স্থির, না থাকে প্রত্যয়।...
হায় রে যুবতী-ফাঁসে ফাঁসাইয়া হৃদি
খোওয়াইবে ধর্মধন, ঝুরি নিরবধি।
ডুবিনু অগাধ পাপে, না ভাবিয়ে শেষ
তুচ্ছ মানবীর প্রেমে, মজিনু বিশেষ।
তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে
ভুলিয়া রহিনু আমি জগত-ঈশ্বরে।। [৮৩ ৯২]

প্রেমের মতো ইহজীবনকে কবি অনিত্য বলে দেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাহিনীকাব্যের যে ধাবা প্রচলিত হয়েছিল — *যোগেশ বা উদাসী* [*হামিট*] কাব্য যার ফল— আবদুল হামিদের কাব্যটি সেই শাখার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এই পরিবারের আরেক জন, নুরর রহমান খান ইউসফজয়ীও কিছু কিছু লিখতেন। তাঁব একটি প্রবন্ধ — ধর্মজীবনের আদর্শ' কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছিল।[৩৬]

এই পর্যায়ে ওবায়েদুল হকের *পদ্যমালা* (চেতলা, ১৮৭৬) এবং রাম-নারায়ণ দাসের সহযোগে মঈনুদ্দীন আহমদ-রচিত *কবিতা-কুসুমাঙ্কুর* (ঢাকা, ১৮৭৬) বই দুটির নাম করা যেতে পারে। মোহাম্মদ আবেদীনের *ধর্মচারিণী* (কলিকাতা, ১৮৭৫) ছিল নীতিকবিতার সংকলন।[৩৭]

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরীর *জীবনচরিত* (বরিশাল, ১৮৮৯)[৩৮] বাঙালী মুসলমানের লেখা প্রথম আত্মজীবনীর মর্যাদা দাবি করতে পারে। বাঙালী মুসলমান-রচিত প্রথম যুগের প্রবন্ধের বই হিসেবে আবদুল লতিফের *মানবসংস্কারক* (মেদিনীপুর, ১৮৭৮) গ্রন্থটির নাম স্মরণযোগ্য।[৩৯]

তথ্য-নির্দেশ

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মীর মশাররফ হোসেন* (দ্বি-স: কলিকাতা ১৩৫০), ৬।

২ Calcutta Review, no 99, 235

৩. 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন', *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০।

৪. 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন', *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১২৮০।

৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় খণ্ড *বঙ্কিম-রচনাবলী* (কলিকাতা, ১৩৬১), ২, ২৭২।

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ২ (কলিকাতা, ১৩৫৯) : ৪৯ 'আহমদী (পাক্ষিক) : শ্রাবণ ১২৯৩। ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে করিমন্নেছা খানম চৌধুরাণীর আনুকূল্যে প্রকাশিত। সম্পাদক — আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী।'

৭ টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক — মৌলভী নইমুদ্দীন।

৮ অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের পত্র। উদ্ধৃত, নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধু-স্মৃতি* (দ্বি-স, কলিকাতা, ১৩৬৯), ৬১১।

১০ যেমন, ২৪৫ 'হায় রে পাতকী অর্থ ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জ্জন, বিনাশ — এ সকলই তোমার জন্য; সকল অনর্থের মূল কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি ! কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম ! রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবা-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত ---- মহাব্যস্ত — প্রাণ ওষ্ঠাগত !'

তুলনীয়, *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, ৬০ : রে টাকা ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পরের জন্য, পরের প্রয়োজনীয় মাথার জন্য জলে ঝাঁপ সম্মুখ শত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষবিস্তার, লাঠির তলে মস্তকদান ! রে টাকা! তোর জন্যই কেনীর বিলাত পরিত্যাগ, তোর জন্যই নীলের ব্যবসা, জমিদারীর পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার — পিশাচি ! তোর জন্য আজ এই বাঙ্গালী যুদ্ধ। পরিণাম ফল ভবিষ্যৎগর্ভে। জয় পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি, জয় পক্ষেও তুমি। তোমারই জয়, জগতে তোমারই জয়।'

১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সাম্য*, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২ : ৩৮০-৮৬।

১২. ব্রজেন্দ্রনাথ, *মীর মশাররফ হোসেন*, ১৯-২২।

১৩ মুনীর চৌধুরী, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯ দ্রষ্টব্য।

১৪ মীর মশাররফ হোসেন, 'সৎপ্রসঙ্গ', 'কোহিনূর', ভাদ্র ১৩০৫।

১৫. *ইসলাম-প্রচারক*, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২।

১৬ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন তাঁর *আসল বাঙ্গলা গজল* (নবম-স; কলিকাতা, ১৩২০) বইতে উল্লেখ করেছেন যে, '১৩০৭ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখ কুষ্টিয়ার নিকটস্থ ছেউড়িয়ার সভায় সুবিখ্যাত সুলেখক জনাব মীর মশাররফ হোসেন তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন।' পরবর্তীকালে *মৌলুদ শরীফের* (পঞ্চম-স; কলিকাতা, ১৩২৪) সঙ্গে 'আরবী উর্দু বাঙ্গালা জুময়া ও ঈদের খোতবা' যুক্ত হয়।

১৭. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, *রাজীমাত*, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫।

১৮ ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ২ : ৫৮-৫৯।

১৯. ২ : ৫৮-৫৯।

২০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ২৪৬।

২১. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান কাব্য* (চ-স; ঢাকা, ১৯৪০), 'দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা' (১৯১৭), ১।০।

২২. ঐ, 'তৃতীয় সংস্কারণের ভূমিকা', ১।০- ।/০।

২৩. 'কৈফিয়ৎ'-এ অপ্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করেছেন। কায়কোবাদের মতে, ববীন্দ্র প্রতিভার অসম্পূর্ণতা তাঁর মহাকাব্য বচনার শক্তির অভাব।

২৪. নবীনচন্দ্র সেন, পলাশীর যুদ্ধ (নতুন-স; কলিকাতা ১৯৫৩), ৫৭।

২৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈযদ আলী আহসান, ২৬৯ : 'মোজাম্মেল হকের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাবমিট বা উদাসীন'। নাম দৃষ্টে মনে হয় গ্রন্থটি ইংবেজী থেকে বাংলায় তর্জমা।' বইটির প্রকাশকাল দেওয়া নেই। কাব্যটির উল্লেখও অন্যত্র পাই না। এই মন্তব্য সম্পর্কে তাই সংশয় বয়ে যাচ্ছে।

২৬. তৃতীয় সংস্কবণ (১৩২৩) থেকে 'ভূপ্রদক্ষিণ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখব সেন, ব্যাবিস্টার মহাশয কর্তৃক লিখিত ভূমিকা-ভূযিত'।

২৭. মোজাম্মেল হক পবে এঁর জীবনকাহিনী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ কবেন *বড়পীর চরিত* নামে।

২৮ Browne, 1, 118.

২৯. *কোহিনূর* পত্রিকায় (পৌষ ১৩২৮) প্রকাশিত 'অভিযেকানন্দ' কবিতায় তাঁব এই রাজভক্তির প্রকাশ আছে।

'আজি এ ভারতভূমে কি সুখ হিল্লোল বয়,
হর্ষ মুখরিত কিবা মেদিনী গগন।. .
জয় বৃটেনেব জয়, জয় রাজ্যেশ্বব
অযুত অযুত কণ্ঠে উঠে নিবন্তর।'

৩০ D Money 'An Account of the Temple Triveni near Hugli" *JASB* 1847 H Blochmann 'Notes on some Arabic and Persian Inscriptions in the Hugi District' *JASB* 1870

৩১. *ইসলাম-প্রচারক*, নভেম্বর ১৯০০।

৩২. *লহবী*, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৭।

৩৩. মুজাফ্‌ফব আহ্‌মদ, কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা)' (কলিকাতা, ১৯৫৯) এবং অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত *কল্লোল-যুগ* (চ-স, কলিকাতা, ১৩৬৬) দ্রষ্টব্য।

৩৪. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ বায়, *সাহিত্য পঞ্জিকা* (কলিকাতা, ১৩২৩), ১০৫।

৩৫ ব্রজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িকপত্র*, ২ : ৪৯ : 'আহমদীব অসাম্প্রদাযিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা'।

৩৬ সুপবিচিত ছিল। ১২৯৬ সালে ইহার নাম *আহমদী ও নববত্ন* পাইতেছি। পরে *কোহিনূব* পত্রিকায প্রকাশিত (অগ্রহাযণ, ১৩২২)।

৩৭ IOL 11 iv 106 117 98

৩৮ BMC 11 19

৩৯. BMC, 1 1

অষ্টম অধ্যায়

তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনা

পাতাশ্চাত্ত্যের প্রতি আনুগত্যের মনোভাবকে স্যার সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারার একটা মূল উপকরণ বললে ভুল হবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজ-শাসন মেনে নিতে উপদেশ দিয়েছিলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন বললে ভুল হবে, বলা উচিত, আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ পুনঃসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহ্মদের মতো চিরাগ আলী, সালাহ্উদ্দীন খুদা বখ্শ এবং আরো কোন কোন চিন্তাশীল লেখকের রচনায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ খুব স্পষ্ট দেখা যায়। খুদা বখ্শ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বলছেন :

> The mind of man is no inert receptacle of knowledge, but absorbs and incorporates into its own constitution the ideas which it receives. It would be the merest affectation to contend that religious and social systems, bequeathed to us thirteen hundred years ago should now be adopted in their entirety without the slightest change or alteration This is exactly the battlefield on which for the last fifty years a relentless war has been waged in India between the party of light and hope, and the party which is wedded to the old order of things.[১]

এই যুদ্ধে তাঁর পক্ষপাত খুব স্পষ্ট এবং এই আলো আর আশা যে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র পশ্চিম মহাদেশ থেকে আসবে, এ ব্যাপারেও তাঁর কোন সংশয় নেই।

আমীর আলী চেষ্টা করলেন ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এই আশা এবং আলো খুঁজে পেতে। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সানুরাগ মনোভাব সেদিন খৃস্টান মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আত্মরক্ষার অস্ত্র যুগিয়েছিল। স্যার সৈয়দ আবার আলতাফ হোসেন হালীকে (১৮৩৭-১৯১৪) *'মুসদ্দস'* (১৮৭৯ খৃ.) রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন।[২] *'মুসদ্দসে'*র মূল সুর ইসলামের শৌর্যবীর্যের জয়গান এবং সেই তুলনায় তার বর্তমান অধোগতি সম্পর্কে আক্ষেপ করা। জাকাউল্লাহ্ (১৮৩২-১৯১০) এবং শিবলী নোমানীও (১৮৩৭-১৯১৪) ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাহাত্ম্যগানে মুখর হন।

ইংরেজ-শাসনকে মেনে নিয়ে আধুনিক জগতের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ সমাজনেতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দের মতো ব্যাপক প্রভাব এঁদের কারোই ছিল না। কেবল রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনায়, পত্রিকা-পরিচালনায় এবং সর্বোপরি সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যসৃষ্টি প্রেরণাদানে সৈয়দের ভূমিকা আশ্চর্যজনকভাবে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ছিল।

বাংলাদেশের সমাজনেতাদের সঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্যের যোগ খুবই ক্ষীণ। তার একটা কারণ এই যে, বাংলার সমাজনেতারা আলোচনা, ভাষণ ও রচনার ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করেন নি। আলীগড় আন্দোলনের ঢেউ প্রাদেশিক সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশকে আঘাত করেছিল বলে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে এখানেও ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কিত রচনাবলী প্রকাশ পেতে খুব বিলম্ব হয়নি।

অবশ্য স্থানীয় পরিবেশ এই ঘটনার মূলে অনেকখানি সক্রিয় ছিল। ব্রাহ্মসমাজকে নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র বলেছি। রামমোহন ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অনেকটা এই প্রভাবেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো আচারনিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমানের প্রশংসা করেছিলেন।[৩] কেশবচন্দ্র যেমন খৃস্টানুরাগী ছিলেন, তেমনি ইসলামের মর্মকথা অধ্যয়নের জন্য তিনি গিরিশচন্দ্র সেনকে (১৮৩৪-১৯১০) নিযুক্ত করেছিলেন। তাই গিরিশ চন্দ্র সেনই প্রথমে কুরআন-হাদীসের বাংলা তরজমা করেন এবং হজরত মুহম্মদের (দঃ) ও সুফীপন্থী পীরদের জীবনচরিত রচনা করেন।[৪] কৃষ্ণকুমার মিত্রের *'মুহম্মদ চরিত'* (১৮৮৬) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা।

বাংলাভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত রচনাবলীর মূলে খৃস্টান মিশনারীদের বিরূপ প্রচারণাও অনেকখানি কাজ করেছিল। খৃস্ট ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ সবটুকু যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পবিচালিত হয়েছিল, তা নয়। ইসলামের বিরুদ্ধেও তাঁরা বেশ শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়েছিলেন-বক্তৃতা এবং আলোচনার মাধ্যমে। ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে- বিশেষ করে কতকগুলো বইপত্র তাঁরা রচনা করেন, যেমন, *Prophet's Testimoney of Christ Muhammedan Ceremonies Ges Reasons for not being a Musalman* ইত্যাদি।[৫] মিশ্র ভাষারীতির বাংলা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় সেই ভাষায়ও তাঁরা কোন কোন বই পত্র লেখেন নি।[৬] সাধু ভাষায় তাঁদের রচনার নমুনা জে. লঙ প্রণীত *'মুহম্মদের জীবনচরিত্র'* (১৮৫৫)।[৭] এতে হজরত মুহম্মদকে মৃগীরোগী, কুরআন-রচয়িতা, কামুক ও সাংসারিক সুখান্বেষী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। হজরত মুহম্মদের পত্নীদের সম্পর্কেও অশ্রদ্ধাবাচক উক্তি আছে। পাদরী জি.এইচ রাউসের 'ফোরকান' (দ্বি-স: ১৮৮৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তিকায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ঐশী রচনা নয়।[৮]

কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তখনো এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এ সবের জবাব দিতে পারতেন।[৮ক] আলীগড় আন্দোলনের প্রেরণায় ইসলাম সম্পর্কে রচনাদি আরো পরে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে—তাও উর্দু ও ইংরেজিতে। অতএব বাঙালী মুসলমানের কাছে তা খুব ব্যাপকভাবে পৌছতে পারে নি। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া শুরু? হল। একে, হিন্দুধর্মের সাহচর্য ও অন্যান্য প্রভাবের ফলে বাংলার প্রচলিত ইসলাম ধর্মে নানা বিকৃতি প্রবেশ লাভ করেছিল, তার উপরে এই ভাঙ্গন আরেক সমস্যারূপে দেখা দিল। তাই গিরিশ সেনের মতো মুসলমানের রচনাদি ইসলামকে জানতে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল সত্য, কিন্তু মনে হয় যে, ইসলামের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সুফী আধ্যাত্মতত্ত্বকে তিনি সমার্থক মনে করতেন। তাই কুরআন-হাদিসের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে *'তাজকিরাতুল আউলিয়া'*র তরজমাও তিনি করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষার আলো যখন বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রবেশ করবার উপক্রম করে,

সে সময়ে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা তাঁদের মধ্যে জাগল। আলীগড়-আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব এঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জাকাউল্লাহ্ ও নোমানীর মতো এঁরাও ইসলামের গৌরবকে মানোমুগ্ধকররূপে উপস্থিত করেছিলেন এবং হালীর মতো বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। তত্ত্ব ও তথ্যমূলক যেসব রচনা এঁরা সৃষ্টি করলেন, তার মূল অভিপ্রায় এই যে, অতীত আদর্শ ও গৌরবের স্মৃতি যেন বর্তমান পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারলাভের প্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে জাগিয়ে দেন। লক্ষণীয় এই যে, খুদা বখ্শ বা চিরাগ আলীর মতো পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে এরা অভিনন্দন জানাতে পারেননি।

ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা ছাড়াও দেশীয় সমস্যা ও রাজনীতি একালের বাঙালী মুসলমানদের আলোচ্য হয়েছে। শিক্ষাবিস্তারের দিকে বেশ একটা ঝোঁক সকলের মধ্যে দেখা যায়। নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে সকলে ভাবতে শুরু? করেছেন, যদিও তার মাত্রা নিয়ে মতভেদ আছে। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যকে বেশ বড় করে দেখার চেষ্টা চলছে, তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা সম্পর্কে পৃথক থাকবে কিনা এ নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়।

দুই

মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে এবং ইসলাম সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহিমকে (১৮৫৯-১৯৩১) একজন পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মুহম্মদপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি লালিত হন টাকীর উদারহৃদয় ব্রাহ্ম জমিদার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাধামাধব বসুর গৃহে এবং শিক্ষালাভ করেন টাকীর মধ্য বাংলা বিদ্যালয়ে ও কলকাতায় সিটি স্কুলে। অসুস্থতাবশত এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে অপারগ হওয়ায় তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য-আহরণ এবং বাংলা ভাষায় তার প্রচারের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী ছিলেন তাঁর আত্মীয়, কলকাতার ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মৌলভী মেয়ারাজউদ্দিন আহ্মদ।

মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে আবদুর রহিম তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *'হজরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি'* (ফাল্গুন, ১২৯৪। ১৮৮৭ খৃঃ) রচনা করেন। তাঁর আগে আর কোন বাঙালী মুসলমান হজরতের জীবনচরিত রচনা করেন নি। এই বইতে তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। *'প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও ফারসী গ্রন্থ'* ছাড়াও স্যার সৈয়দ আহ্মদ ও সৈয়দ আমীর আলীর রচনা থেকে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামতের আলোচনা করেন। পরবর্তী সংস্কারসমূহের কৃত-পরিবর্ধনে যাঁদের রচনাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (হুজ্জতউল্লাহেল বালেগা'র উর্দু অনুবাদ), স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, চিরাগ আলী, শিবলী নোমানী, মাওলানা মুহম্মদ আলী এবং টি.ডব্লিউ. আর্ণল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ করে নির্ভর করেছেন নোমানীর '*সিরাতুন্নবী*'র ওপরে এবং

তাঁর *'আল ফারক'* ও *'আল কালাম'* থেকেও অনেক মতামত গ্রহণ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত গ্রন্থাবলীর তালিকা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পরি যে, ইসলাম জগতে যেসব ভাব-আন্দোলন ঘটেছিল, তার সঙ্গে আবদুর রহিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সেই পরিবর্তনশীল ভাবধারা তাঁকে আন্দোলিত করেছিল। তাই *'জীবনচরিতে'* তাঁকে যেমন ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতার সন্ধান করতে দেখি, তেমনি যুক্তিধর্মী চিন্তার প্রয়াস এতে লক্ষ্য করা যায়।

যে পরিবেশে তিনি জীবনচরিতটি রচনা করেছিলেন, তাতে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবন সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না। আব্দুর রহিম তা করেন নি, কিন্তু এগুলো নির্বিবাদে স্বীকার করতেও সক্ষম হন নি। তিনি এর মীমাংসা এই ভাবে করেন যে, যেখানে প্রচলিত মতামত উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে টীকা সন্নিবেশ করে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, সুবিখ্যাত সুরা ফিলের অনুবাদ করে এবং এই সুরায় কথিত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি টীকায় বলেছেন:

> কেহ কেহ বলেন যে,বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া আবরাহার সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। পক্ষীর কঙ্কর নিক্ষেপ বিষয়ে সুরা ফিলে যে বর্ণনা আছে, তাহা রূপক বর্ণনা। [৭৮টী]

লেখক স্পষ্ট করে না বললেও, আমরা বুঝতে পারি যে, এই মত তিনিও সমর্থন করেন।

অন্যত্র তিনি আরো স্পষ্টভাষী। কথিত আছে যে, হজরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মমাত্র তাঁর স্কন্ধে *'মোহর-নবুয়ত'* বা প্রেরিত পুরুষের অভিজ্ঞান দেখা গিয়েছিল। আবদুর রহিম এটিকে *'গল্প'* বলে অভিহিত করেছেন, তাঁর মতে, হজরতের স্কন্ধে যে বর্ধিত মাংসপিণ্ড ছিল তাকে কেন্দ্র করেই *'পরবর্তী আলেমগণ উহা কল্পনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন'* (৮৮ টী) জনশ্রুতি এই যে, হজরতের জন্মরাত্রে সমুদয় পৃথিবী কম্পিত হয়, কাবাগৃহের প্রধান দেবমূর্তি ভূমিস্যাৎ হয়ে যায়, পারস্যের রাজপ্রাসাদের চূড়া ভগ্ন হয়, জোরাস্টারবাদীদের পূজা বহ্নি নির্বাপিত হয় এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটে। আবদুর রহিম স্পষ্ট বলেছেন যে, *'এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিস নাই'*[৮৯টী]। *'কুমারের ভারপ্রাপ্ত হালিমা বিবি অনেক অমানুষিক ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাহা লিখিত হইল না'* বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, হজরতের আগমনে তাঁর গৃহে যেসব বৈষয়িক উন্নতি ঘটে বলে কিংবদন্তী আছে, সেগুলোর অনুকূলে *'অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিস পাওয়া যায় না'*, একথা যোগ করেছেন [৯৪টী] বহির নামক খৃস্টান সন্ন্যাসী হজরতের নবুয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেন বলে যে প্রসিদ্ধি আছে, সে সম্বন্ধেও তিনি *'সহি হাদিসের অভাব'* লক্ষ্য করেছেন [১০৫টী]। হজরতের বক্ষবিদারণ তাঁর কাছে রূপক বর্ণনা, কেননা, 'ইহা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়' [৯৫-৯৬টী]। মেরাজকে তিনি বাস্তব অর্থে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নি, 'ঘুম ও জাগ্রতের মধ্য অবস্থায় অর্থাৎ *'যোগাবেশ'* অবস্থায়' এই ভ্রমণ সম্পন্ন হয় বলে মনে করেন [২৩০-৩১টী]।

এই ধরনের কান্ডজ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় হজরত ঈসার জন্মরহস্য সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, কুরআন ও হাদিসের ইঙ্গিত অনুযায়ী, প্রথম মানবসৃষ্টির পর থেকে পিতার ঔরসে ও মাতৃগর্ভেই মানুষের জন্ম হয়ে

চলেছে। কুরআনে যখন ঈর্ষা সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ নেই, তখন তিনি যে এই একই প্রক্রিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এটা মনে করাই সঙ্গত।

স্রষ্টার প্রতি সমর্পিতচিত্ত হবার প্রসঙ্গে আবদুর রহিম সুফী সাধকদের সাধনপ্রণালীর উল্লেখ করেছেন। মহর্ষি মনসুরের আত্মত্যাগের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু লেখক বলতে ভোলেন নি যে, 'এরূপ আদর্শ ইসলাম-অনুমোদিত নয়' (৯০৮টী)। সুফী সাধকদের ঈশ্বরপ্রেমের সমুচিত প্রশংসা করেও তিনি একথা মনে না করে পারেন নি যে, সংসার-ত্যাগের যে আদর্শ তাঁদের জীবনে গৃহীত হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হয় নি (৯০৯টী)।

বলা বাহুল্য যে, ভক্ত ও বিশ্বাসী মনের পক্ষে যুক্তিবাদের যে সীমাবদ্ধতা আছে, লেখকের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য ছিল। কেননা সকল ব্যাপারে প্রশ্ন করা ও যুক্তি প্রয়োগ করা এই জাতীয় মনের প্রবণতার বিরোধী। অনেক স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়েই এঁদের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভবপর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যখন নতুন নতুন বিস্ময় রচনা করছিল, আবদুর রহিম তখন এই গ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রভাবে সেযুগে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল। *জীবনচরিতে* এরই সমান্তরাল চেষ্টা দেখা যায়। ঐশীবাণীর প্রমাণ উপস্থিত করার জন্যে তিনি '*তড়িৎ বার্তাবহ*' '*তারহীন টেলিগ্রাফ*', '*টেলিফোন*', '*গ্রামোফোন*' প্রভৃতির আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন যে, এগুলো সম্ভব হলে ঐশীবাণী অসম্ভব হবে কেন? আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং সৌরজগতের রহস্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বীকার করতেই হবে যে, বিজ্ঞান সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান লেখকের ছিল না। সে জ্ঞান থাক বা না থাক, এই প্রচেষ্টা যে অনেকখানি অপ্রয়োজনীয় ও অসার্থক সেকথা মনে না হয়ে পারে না।

হজরতের বিরুদ্ধে তরবারীর বলে ইসলাম প্রচার এবং বহুবিবাহের যেসব অভিযোগ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা উত্থাপন করেছেন, সকল মুসলমান ঐতিহাসিকের মতো তিনিও তা খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে ইসলামই নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছে (দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পরিতেছদ)। প্রসঙ্গান্তরে তিনি একথাও বলেছেন যে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়নীতির আদর্শের কাছে বলশেভিকবাদের '*ভোগনীতির সাম্য*' ম্লান হয়ে যায় (৯৪০টী)।

যুক্তিধর্মী হবার প্রচেষ্টা ছাড়া *জীবনচরিতের* লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর ভাষা সম্পদ, ক্লাসিকাল গদ্যরীতির ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট :

> একদা মহাতপা হজরত মুহম্মদ রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসের মধ্য নিশীথে সেই গিরিকন্দরের নির্জনতায় ধ্যানমগ্নাবস্তাপন্ন; জীবজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার স্নেহালিঙ্গনে অভিভূত; লোকালয়ে, মরু?প্রান্তরে ও পর্বতশিখরে নিস্তব্ধতা যেন আপন পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, এমন সময়ে সাগর-কল্লোলের ন্যায় এক গম্ভীর নিনাদে সেই মাহতুপার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল; তিনি পুনরায় সেই শব্দের জন্য ঊর্ধ্বকর্ণ হইলেন — আবার সেই ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। সহসা সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে তাঁহার হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া গেল, সর্বশরীর ভীষণ ঝটিকাম্পিত কদলীদলের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সুতরাং দ্বিতীয়বারের সে শব্দের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

মহাত্মা নির্বাকে, ভয়কম্পিত কলেবরে গিরিগুহার অভ্যন্তরে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময় সহসা এক অপার্থিব জ্যোতি ঃ বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র গিরিকন্দর আলোকিত করিয়া তুলিল। মহামনা হজরত মহম্মদ সেই আকস্মিক জ্যোতিঃরাশি দর্শন করিয়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট ও বাকনিস্পত্তিরহিত ও স্বেদনিক্ত কলেবর হইয়া গেলেন। তখন সেই জ্যোতিঃরাশির মধ্য হইতে এক বিরাট পুরুষ (জেব্রিল) আবির্ভূত হইয়া হজরত মহম্মদকে বলিলেন, 'হে মহম্মদ ! আল্লাহতায়ালা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহার নিয়োজিত ধর্মপ্রচারক,আমি তাঁহার দূত রুহোল আমিন (জেব্রিল)।' [১৪১-৪২]

এই তৎসম শব্দপ্রধান ধ্বনিময় গদ্যরচনা আবদুর রহিমের কেবল নয়, সেকালের অধিকাংশ মুসলমান লেখকের অভিপ্রেত ছিল।

আবদুর রহিম ও মেয়ারাজউদ্দিনের সঙ্গে আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদির যোগসূত্র স্থাপিত হতে খুব বিলম্ব হয় নি। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহ্মদ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলে তাঁর সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ ঘটে। এই সময়ে বাঙালী মুসলমানদের ধর্মান্তরগ্রহণের সমস্যা এঁদেরকে চিহ্নিত করে তোলে। এঁরা উপলব্ধি করেন যে, এই ভাঙন রোধ করতে হলে বাংলা ভাষায় ইসলামের স্বরূপ প্রকাশ করে গ্রন্থরচনা করা দরকার। তখন এঁরা স্থির করেন যে, বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সারকথা বাংলা ভাষায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবেন। মেয়ারাজউদ্দিন মূল বইপত্র সংগ্রহ করে তার সারকথা বাংলা ভাষায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবেন। মেয়ারাজ-উদ্দিন মূল বইপত্র সংগ্রহ করতেন, আবদুর রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন অনুবাদ করতেন। কর্মব্যস্ততার জন্যে পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্মদ মাশহাদি এই গ্রন্থ রচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। *এসলাম তত্ত্ব* নামে এই পরিকল্পিত বইটির দুটি খন্ড প্রকাশিত হয় ১২৯৫ ও ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁরা যেসব পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ইমাম গাজ্জালীর *এহিয়া উল উলম*, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র *হুজ্জতুল্লাহেল বালেগা*, সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর *নেচার ও নেচারিয়া* , চিরাগ আলীর *জিহাদ* ও *Reforms Under Moslem Rule*. গিবনের *Decline and Fall of Roman Empire* এবং *কার্লাইলের Hero and Hero-worship* ও *Hero as Prophet* এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই বইতে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে *'নাস্তিকতা', 'এসলাম', 'বিশ্বাস'* ও *'কোরান শরীফ'*।*

আবদুর রহিম এরপর লেখেন *ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ* (১৮৯০), *ইসলাম* ১৮৯৬), *নামাজ তত্ত্ব* (১৮৯৮) ও *হজ বিধি* (১৯০৩)। *নামাজ তত্ত্বে* তিনি বলেছেন:

পূর্বকালীন মুসলমানদিগের ন্যায় মনের ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমরা এখন নামাজ পড়ি না বলিয়াই আমাদের এই দুরবস্থা। আল্লাহতালার উপর ভরসা করিয়া নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে,যদি আমরা পূর্বোল্লিখিত নিয়মে নামাজ পড়ি এবং সমুদয় কার্যে কোরান শরিফের আদেশ প্রতিপালিত এবং পয়গম্বর (দরুদ) সাহেবের অনুকরণ করি, তাহা হইলে অমাদের এরূপ দুর্দশা কখনই থাকিবে না, আমরা আবার সেই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদিগের ন্যায় পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইব। [১৭৫]

> *'ইসলাম ইতিবৃত্ত'* (১৯১০) রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষত যে জাতি এক সময়ে ইতিহাসের জন্মদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল আজ সে জাতি নিজের পূর্বপুরুষদের নাম পর্যন্ত অবগত নহে, ইহা কি বাস্তবিক দুঃখের বিষয় নহে ?...
>
> ...প্রেরিত মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর ৬৩২ খৃঃ অব্দ হইতে ৭১০ অব্দ পর্যন্ত মুসলমান রাজত্ব উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এইরূপ উন্নতি ইতিহাসে কোন জাতীয় জীবনে সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমানগণ কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম ও রাজ্য এসিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত প্রদেশসমূহে এবং ইউরোপের কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরবের উচ্চ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ধর্ম ও রাজ্য বিস্তারের অদম্য শক্তির মুখে পতিত হইয়া পারস্যরাজ খসরু রাজ্য শাসনাধীনে আসিল, ভারতবর্ষ বিজিত হইল, সুরিয়া রাজ্যে তাঁহাদের শাসনদন্ড প্রতিষ্ঠিত হইল, আফ্রিকার উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ফেরোয়াদের বিজিত প্রদেশ তাঁহাদের করতলগত হইলে এবং তাঁহাদের অর্ণবপোতসমূহ ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করিল। [/০-।/০]

এইখানে আবদুর রহিমের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন চিন্তাধারা পাশাপাশি মিশিয়ে দেখলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটা সূত্র নিশ্চয় পাওয়া যাবে। *'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'* প্রবন্ধে বঙ্গিমচন্দ্র বলেছেন :

> বাঙ্গালার ইতিহাস চাই ...নহিলে বাঙ্গালী কখনো মানুষ হইবে না।... নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে ? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।[১০]

১৮৮০ খৃস্টাব্দের দিকে বঙ্গিমচন্দ্র ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। একটা খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করে বিষয়সূচী তিনি তৈরী করেন এইভাবে:

> Character of the Ancient Hindoo, maritime power and habits, external commerce, manners and customs (Women and window marriage), date of Authors. Wealth of Ancient India, Government military power, Arab expedition. Arab Geographers. historical and miscellaneous [১১]

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবলেন বাঙালীর কথা, লিখতে চাইলেন তাদের বর্তমান ভূখন্ডের এবং আরব মুসলমানদেরকে সেখানে দেখতে পেলেন বহিঃশত্রু আক্রমণকাবীরূপে। আবদুর রহিম ভাবলেন বাঙালী মুসলমানের কথা, লিখতে চাইলেন মুসলমানের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী এবং ভারতীয় হিন্দুদেরকে দেখতে পেলেন সংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকরূপে, যে অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে মুসলমানেরা তাঁদেরকে উদ্ধার করলেন অথবা যে অন্ধকারের ওপর সত্যধর্মের আলোক জয়ী হল। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কেবল স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরবিরোধীও। একজন ভারত থেকে আরবকে দেখলেন : অন্যজন আরব থেকে ভারতকে। ফলে বঙ্কিম অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় বলতে মুসলমানবর্জিত দেশ ও হিন্দুকে বুঝলেন, আবদুর রহিম বা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন অন্যেরাও ইসলামী বলতে বুঝলেন অভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতবর্ষের

তুলনায় আরব-তুরস্ককে নিজস্ব বলে ভাবতে শিখলেন। ফলে, এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের একাত্মবোধ করার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে এল।

দু-খন্ড *ইসলাম ইতিবৃত্তে* আবদুর রহিম বর্ণনা করেন হজরত আবুবকরের শাসনকালীন ঘটনাসমূহ। পরিকল্পনানুযায়ী বইটির অন্যান্য খন্ড আর প্রকাশ লাভ করতে পারে নি। পরে প্রধানত: ধর্মজীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ব্যাখ্যা করে অনেকগুলো পুস্তক বা পুস্তিকা তিনি রচনা করেন : *নামাজ-শিক্ষা* (১৯১৭), *ইসলাম নীতি* (১৯২৫-২৭), *কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী* (১৯২৬), *রোজা তত্ত্ব* (১৯২৮) ও *খোৎবা* (১৯৩২)। নামেই এগুলোর পরিচয় মিলবে।

বিদেশী রচনা থেকে উপকরণ নিয়ে তিনি দুটি উপন্যাস রচনা করেন : *আলহামরা* ও *প্রণয়যাত্রী* (১৮৯২)। প্রথমটি আমি দেখি নি— ১৩২২-এর *সাহিত্য পঞ্জিকায়* এর উল্লেখ আছে, প্রকাশকাল দেওয়া নেই।[১২] *প্রণয়যাত্রী* ওয়াশিংটন আরভিংয়ের *Tales of Alhamra* গ্রন্থের '*Pilgrim of love*' গল্পের ছায়াবলম্বনে লেখা। পুরোনো স্টাইলে লেখা হলেও উপাখ্যানটিকে লেখক মনোহররূপে উপস্থিত করেছেন : তবে বাস্তবতার সীমা রক্ষা করেন নি বলে একে উপন্যাস বলা যায় না।

সংবাদিকরূপে আবদুর রহিমের পরিচিতি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসারতা লাভ করেছিল। *এসলাম-তত্ত্ব* রচনায় প্রবৃত্ত হয়েই সম্ভবত এর লেখকদের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনা জাগে। এরই ফলে '*সুধাকর*' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার আবির্ভাব হয় ১২৯৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (১৮৮৯)। আবদুর রহিম এর সম্পাদক ছিলেন।[১৩] রেয়াজউদ্দীন আহমদও এই পত্র সম্পাদনা করেছিলেন,[১৪] তবে কার সম্পাদনায় কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত *সুধাকর* প্রকাশলাভ করে, তা বলা কঠিন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় '*মিহির*' নামে একটি '*বিবিধ বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা*' প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক ছাড়া, পন্ডিত মাশহাদি ও মোজাম্মেল হক এর অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের দিকে *সুধাকর* ও *মিহির* মিলিত হয়ে সাপ্তাহিক *মিহির ও সুধাকর* রূপে শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় প্রায় দশ বৎসর ধরে প্রকাশলাভ করে। এর যে দু একটি সংখ্যা আমরা দেখেছি, তাতে ইংরেজ সরকারের প্রতি প্রবল ভক্তির প্রকাশ এবং মুসলমানদের সমস্যাগুলোকে স্পষ্ট করে উপস্থিত করার প্রয়াস দেখা যায়। নমুনা হিসেবে একটু উদ্ধৃত করি। সংবাদ :

> সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতে আমাদের বৃটিশ রাজের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, এখন দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ বাহিনীর সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ...কিন্তু বিশ্বজয়ী বৃটিশ বাহিনীর অনল প্রতাপে ভারতীয় বিদ্রোহীগণ যেমন সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল আমাদের ভরসা যে এবার সেইরূপ সমরকুশল বহুদর্শী রণপন্ডিতগণের সৈন্যচালনায় অচিরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্রোহবহ্নি নির্বাপিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইবে।[১৫]

প্রেরিত পত্র :

> কি কারণে মুসলমানজাতি রাজভাষা শিখতে এত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যাত্নিক হওয়া প্রত্যক মুসলমানের কর্তব্য, তবে

আমার অতি ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বিবেচিত হইল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে, কৃতবিদ্যগণ পরিহাস না করিলেই আপনাকে বাধিত জ্ঞান করিব।

১। রাজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্মের বিরুদ্ধ কার্য্যরূপ কুসংস্কার মনে করা, ২। অভিভাবকের অবহেলা ও অদূরদর্শিতা, ৩। অর্থের অনটন, ৪। রাজভাষা শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মকার্য্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ধ প্রদর্শন করা, ৫। হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, ৬। গভর্ণমেন্টের উৎসাহের অভাব, ৭। বিলাসিতা, ৮। শ্রমবিমুখতা, ৯। শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর অল্পতা, ১০। কর্মচারী নিয়োগের ভার হিন্দুদের হস্তে ন্যস্ত থাকা।...[১৬]

সম্পাদকীয় ('আমাদের নিম্নশিক্ষার সংস্কার') :

...যেস্থলে হিন্দুদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরেজী এ দুইটি মাত্র ভাষাশিক্ষা করিবার প্রয়োজন, ...সেই স্থলে বঙ্গীয় মুসলমাদিগকে পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না। ধর্মভাষা আরবী, তৎসহ পারসী এবং উর্দু, এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙ্গালা।[১৭]

সম্পাদকীয়তে এই অভিযোগও করা হয়েছে যে, হিন্দু লেখকদের রচিত বই পড়ে মুসলমান ছেলেরা জাতীয় আদর্শ শিক্ষার সুযোগ পায় না, বরঞ্চ এতে তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে।

মিহির ও সুধাকর প্রকাশের পশ্চাতে করটিয়ার খান পন্নী পরিবারের, কুসুমপুরের জমিদার মুহম্মদ ইবরাহীমের, জলপাইগুড়ির জমিদার রহিমুন্নেসার এবং সর্বোপরি বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরীর অর্থসাহায্য ছিল। পরে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্ এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা দেন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলার এই উচ্চবিত্ত মুসলমানদের রাজনীতিই এই পত্রিকার মূলনীতিকে প্রভাবান্বিত করবে। তখন পর্যন্ত এঁদের রাজনীতির সাধারণ লক্ষণই ছিল, ইংরেজ সরকারের স্নেহদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করা, হিন্দু-মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের উপরে জোর দেওয়া এবং *'আবেদন-নিবেদনের থালা'* বহন করে মুসলমানের জন্যে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা অর্জন করা। সামাজিক ক্ষেত্রে *মিহির ও সুধাকর* রক্ষণশীল ছিল বলে মনে হয় না। এতে প্রকাশিত নাটকাভিনয়ের সমালোচনা তাই রক্ষণশীল *ইসলাম প্রচারক*কে বিরূপ মন্তব্য করতে প্ররোচিত করে।[১৮]

১৯০৪ খৃস্টাব্দে আবদুর রহিম *মিহির ও সুধাকরের* সম্পাদক ত্যাগ করেন। তাঁর আত্মীয় সৈয়দ ওসমান আলী (লেখক শেখ ওসমান আলী বি. এল. নন) সম্পাদনায় অল্পকাল চলার পর *মিহির ও সুধাকর* একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ইতোপূর্বে, ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় মাসিক *হাফেজ* আত্মপ্রকাশ করে । প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত *'আভাসে'* সম্পাদক বলেছেন :

বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংসসাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ...হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও

ধর্মভক্তিকাহিনী এবং পবিত্র ধর্ম পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই [আল্লাহ্] আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।

সাহিত্যপত্রিকারূপে — যাকে আমরা সম্ভ্রান্ত বলে থাকি — *হাফেজ* ছিল তাই। এর নিয়মিত লেখক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন (প্রথম সংখ্যা থেকে *শাহ্নামার* কাহিনী অবলম্বনে তাঁর *তহমিনা* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে), মোজাম্মেল হক (*শাহ্নামা*), কায়কোবাদ, সেখ ওসমান আলী, মহম্মদ বদিয়ল আলম এবং সম্পাদক স্বয়ং। ফজলে রব্বি খাঁর *হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালার* বঙ্গানুবাদ আবদুর রহিম এতে প্রকাশ করেন। লক্ষণীয় এই যে, মুসলমানদের পক্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া উচিত, এই মর্মে প্রকাশিত প্রবন্ধ হাফেজে পত্রস্থ হয়েছে।[১৭] আবদুর রহিম পরে *মোসলেম প্রতিভা* বলে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।

মিহির ও সুধাকর বন্ধ হয়ে গেলে আবদুর রহিম আরেকটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের আয়োজন করেন। একাজে তাঁর প্রধান সাহায়ক হলেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেব।

মিহির ও সুধাকর বন্ধ হওয়ার পর বঙ্গীয় মোছলেম-সমাজে জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব হইয়া পড়ে, এবং তদ্ধেতু জাতীয় অভাব-অভিযোগ বা অপর কোনও সামাজিক কথা সদাশয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা এবং সমাজের সহানুভূতি লাভ করিবার উপায় ছিল না।...অবশেষে সেই দারুণ অভাবের কথা জনাব মাওলানা আবুবকর সাহেবের কর্ণগোচর করা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে সমাজহিতৈষী মাননীয় মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি. এল. উকিল সাহেব, সৎ-সাহিত্যিক মুন্সী শেখ আবদুর রহিম ও অপর কতিপয় সমাজসেবকের প্রযত্নে ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে আঞ্জুমানে ওয়ায়জিনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভা...একখানি জাতীয় সংবাদপত্র প্রচার করা সর্বাগ্রে কর্তব্য স্থির করেন। তিনি (পীর আবুবকর) সহর্ষে সেই সঙ্কল্প অনুমোদন করেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হয়েন। তাঁহার সেই সম্মতির ফল আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র এই মোসলেম হিতৈষী।[১৮]

কথিত আছে, ঐ সভার সংগৃহীত অর্থের দ্বারাই *মোসলেম হিতৈষীর* তহবিল গঠিত হয়। দীর্ঘকাল চলার পর আকস্মিক দুর্ঘটনায় *মোসলেম হিতৈষীর* ছাপাখানা ভস্মীভূত হয়। পুনঃপ্রকাশের পর ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ পেতে থাকে। আবদুর রহিমের সম্পাদনায় *মিহির ও সুধাকব* এবং *মোসলেম হিতৈষী* বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল। *মোসলেম হিতৈষীর* যুগে আবদুর রহিম আরেকটি স্বল্পায়ু মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তার নাম *ইসলাম-দর্শন*।

সাংবাদিক এবং গ্রন্থাকাররূপে আবদুর রহিম বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা করেছেন, সফলকাম হয়ে তিনি তার পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর মতামত পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। সেই মতামতের সঙ্গে ঐক্য থাক বা না থাক, সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই প্রচেষ্টার মহৎ মূল্য আছে।

তিন

পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্‌মদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৮) একালের একজন প্রধান লেখক। তাঁর আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার চারান গ্রামে। 'সংস্কৃত ভাষায় ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরেজী এবং উর্দু ভাষায় মোটামুটি অধিকার ছিল।' তিনি 'এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।...দেলদুয়ারের জমিদার মিঃ এ. কে. গজনভী সাহেব ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পন্ডিত সাহেবকে স্বীয় ইস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ম্যানেজারী পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে এক প্রকার চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[১৯] ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সুধাকর* পত্রিকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

তাঁর দুটি বই, *অগ্নি-কুক্কুট* ও *সমাজ ও সংস্কারক* একই বছরে (১২৯৬) প্রকাশিত হয়। বোধহয় *সমাজ ও সংস্কারক*[২০] কিছু আগে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এটি হচ্ছে সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) জীবনী ও কর্মসাধনার বিবরণ। জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনী ও কর্মসাধনার বিবরণ। (১৮৩৮-১৮৯৭) জামালউদ্দীনের জীবনীরচনা-প্রসঙ্গে একজন মনস্বী লেখক মন্তব্য করেছেন :

> To write his story in full would be to write a history of the whole Eastern. Question in recent times, including in this survey Afghanistan and India, and in a much greater degree, Turkey, Egypt and Persia in which latter countries his influence is still, in different way, a living force.[২১]

বিভিন্ন দেশের জনসমষ্টিকে কুসংস্কারমুক্ত করে বর্তমান জীবন ও জগতের সঙ্গে যুক্ত করার সাধনা যেমন জামালউদ্দীন করেছিলেন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাদেরকে উঠে দাঁড়াবার মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। ১৮৫৭, ১৮৬৯ ও ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাঁর ভারত সফর এদেশের মুসলমানদেরকে গভীর প্রেরণা দান করেছিল। যদিও ইংরেজ সরকার তাঁদের এই 'সম্মানিত অতিথির' সঙ্গে দেশীয় নাগরিকদের মেলামেশার পথে যতদূর সম্ভব অন্তরায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তবু আফগানীর প্রভাবে মুসলিম চিন্তানায়কেরা প্যান-ইসলামাবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

১৮৮২ খৃস্টাব্দে আফগানী যখন কলকাতায় এলেন, তখন মাদ্রাসা ভবনে তাঁর বক্তৃতা শোনার একটা আয়োজন করা হয়, কিন্তু অধ্যক্ষ হর্নলি শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা নাকচ করে দেন এবং সভা অ্যালবার্ট হলে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনাটির উল্লেখ *সমাজ ও সংস্কারকে* আছে। মনে হয়, এই বক্তৃতাসভায় পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্‌মদ মাশহাদি উপস্থিত ছিলেন এবং জামালউদ্দিনের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও *'হৃদয়োন্মাদকর বক্তৃতা'* তাঁর চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। এর সাত বছর পর যখন *সমাজ ও সংস্কারক* রচনা করেন, তখন জামালউদ্দীনের মতামত বেশ গভীরভাবে আত্মস্থ করেছেন। বইটি কেবল আফগানীর জীবনী নয়, তাঁর মতামতের আলোকে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর পুনর্বিচারও বটে। এই আলোচনায় লেখকের নিজের ভাবধারাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, সিপাহী অভ্যুত্থান ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে তিনি ভারতবর্ষের দুটি মাত্র *রাষ্ট্র বিপ্লব'* বলে

ভিহিত করেছেন এবং এ দুটির ব্যর্থতার যে কারণ নির্ণয় করেছেন তা মূল্যবান :

> ওহাবি মন্ত্রণা প্রৌঢ়ি পরিগ্রহ করিবার পূর্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচরীভূত ও অঙ্কুরেই বিদলিত হয়। কিন্তু উহা পরিপক্ক, পরিস্ফুট ও মোসলমান নামে প্রচন্ডতা পরিগ্রহ করিলেও সিপাহিবিপ্লব অপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রসব করিত না। কারণ, ওহাবিগণ বৃকোদর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিশাল কুক্ষিতে নিঃশেষে পরিপাতিত মোসলমান সাম্রাজ্যের— যাহার অস্থি পর্যন্ত তৎকালে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,— তাহারই উদ্ধারার্থ এই গুরুতর ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে যুগে ভারতবর্ষে হিন্দু, মোসলমান,শখ প্রভৃতি জাতিবিশেষের অসংমিলিত চেষ্টায় কোন কার্য সিদ্ধ হইত, এখন আর সে যুগ নাই।...সিপাহি বিদ্রোহের মূলমন্ত্র যাহাই থাকুক না কেন, ইহা পরিশেষে খন্ড খন্ড সুতরাং উপাদানিক দুর্বলতা পরিগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ দুরাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির স্বার্থসাধনে পরিচালিত হয়।...এই সমস্ত বিদ্রোহ যদি মতপ্রকর্ষে, লক্ষ্যের দৃঢ়তায়, যে প্রতিকূল বিষয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব সজ্জাত হইয়াছিল তাহার তীব্রতায় ভারতবর্ষীয় সার্বজনীন সহানুভূতি লাভ করিতে পারিত এবং যদি ভারতবর্ষকে ইংল্যান্ডের করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত তাহা হইলে সিদ্ধি নিতান্ত দুরবস্থায়িনী হইত না। কারণ, বহু কোটি দাসত্ব সহিষ্ণু, ধৈর্য শৃঙ্খলা বিমুক্ত উন্মত্ত মানবের পক্ষে, কয়েক সহস্র প্রভূতাভিলাষী দুরাকাঙ্ক্ষা লোকের ধ্বংস কেবল হুঙ্কার ও ফুৎকারমাত্রে সমাহিত হইয়া যাইত।

ভাষান্তরে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, সিপাহী অভ্যুত্থান সফল হল না, কেননা, এই সুযোগে অনেক সামন্ততান্ত্রিক প্রধান পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করেছিলেন; আর ওয়াহাবী আন্দোলন সফল হল না, তার কারণ এটি ছিল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তাঁর এই বিশ্লেষণ বিস্ময়কর বলতে হবে। এর পশ্চাতে যে ধর্মনিরপেক্ষতা মৌলিক গণতান্ত্রিক চেতনার উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়, তার প্রকাশ বলিষ্ঠ ও সাহসিক। কেননা, পন্ডিত মাশাহদির সমকালেও মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণের প্রচেষ্টা চলেছিল, তাও তার ধর্মগত অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে এবং তার মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের আবকাশ তাঁর ছিল। তার চেয়ে বড় কথা, হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা কেবল নয়, পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে দাবি এখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা সেকালে কোন দেশীয় রাজনীতিবিদের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রাথমিক প্রচেষ্টা চলে শাসক-শাসিতের রাখীবন্ধনের।

জামালউদ্দীন আফগানীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়েও পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্মদ মাশহাদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন :

> তিনি [আফগানী] প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পাইলেন— যে জাতি একদিন মহামূল্য পরিচ্ছদ ও রাজমুকুট পরিধানপূর্ব্বক কটিদেশে প্রচন্ড অস্ত্রধারণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ঘোর আড়ম্বরে স্বদেশ হইতে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, সে আজ বিদেশে

জরা-মৃত্যু-রোগের আক্রমণে. স্পন্দনরহিত ও নিতান্ত দারিদ্র্য দশায় নিপতিত হইয়াছে। যাঁহাদের উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে একদিন অখন্ড পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার নিরস্ত হইয়াছিল. আজ তাঁহারা সূচিভেদ্য অন্ধতমোরাশিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন।...অপরপক্ষে জ্ঞানবিদ্যা সভ্যতার সূতিকা ক্ষেত্রে জগতের আদিগুরু ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত বেদ বেদান্তের উজ্জ্বল ঈশ্বরজ্ঞান পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে। যাহাদের দর্শন ও গণিতের উজ্জ্বল জ্ঞানে. ব্যবস্থা সূত্রের আবিষ্কারে জগতের কল্যাণ ও কুশলেন পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, আজ তাহারা অবনতির নিম্নতর স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।...সৈয়দ জামাল-অল-দিন বুঝিতে পারিলেন. ভারতবর্ষের দুঃখের রজনী অবসানপ্রায় হইয়াছে. কারণ. নিশার তৃতীয় যাম ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তত গভীর নিদ্রা সম্ভব না।

হিন্দুর ভারতবর্ষ ও মুসলমানের আরব ইরানের যে মহিমা এখানে গাওয়া হয়েছে. আলীগড়-আন্দোলনের প্রভাব এই মনোভাবকে বিস্তৃতি দান করেছিল। পন্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্‌মদ মাশহাদি কিন্তু এ মত সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন :

যাঁহারা এসলাম গ্রহণ-পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন. তাঁহাদের গভীর প্রেম. স্বগণস্নেহ. স্বদেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়. কেবল তৎসমুদায়ের স্থানে এক সামান্যরূপ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতি সঞ্চার দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হস্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুহিত হইয়াছে। মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই, প্রত্যুত তৎসমস্ত পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে।

শুধু তাই নয়। মুসলমানের অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন. আলীগড়-আন্দোলনের চিন্তাধারা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। অধঃপতিত ঐতিহ্য-গর্বের অন্ধতা ও বিচার বুদ্ধির মূঢ়তা লক্ষ্য করে নিন্দাভাষণে তিনি কুণ্ঠিত হন নি

তাঁহারা [মুসলমানেরা] আরাস্তু (অ্যারিষ্টটল). আফালতুন (প্লেটো) প্রভৃতির জীর্ণমত সকল গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া কৃতার্থ হয়েন বটে, কিন্তু আধুনিক নিউটন. গ্যালিলিয়ো. কেপ্‌লার. ডারুইন, লাপাস. কমটির অতুল প্রতিভার দিকে তাঁহাদের অণুমাত্রও মনোঃসংযোগ নাই। প্রত্যুত একপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মোসলমান মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীসকে আপনাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া জগতে অকুণ্ঠিত চিত্তে. মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক অজ্ঞাত মোসলমান শিক্ষিত লোকেরা তাদৃশ প্রধান্যের কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বিবেচনা করেন। সুতরাং পৃথিবীর জাতিসাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞানবুদ্ধির আদান প্রদানে যে কুশল ও কল্যাণ সম্ভব তা মুসলমানেরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত রহিয়াছেন, কিন্তু যাহা সত্য. তাহা নিউটনের সত্য. কোপার্নিকস বা আর্যভট্টের সত্য বা আবু আলি সিনার সত্য নহে. উহাতে প্রত্যেক বিশ্বাসীরই তুল্য অধিকার। সত্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গৌরবান্বিত হয় নাই. প্রকৃতপক্ষে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা গৌরান্বিত হইয়াছেন. একথা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।...মুসলমানেরা

একবার গ্রন্থগত চিন্তা ও বিদ্যাকে কার্যের সহিত সমন্বয় করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না। বস্তুর ধ্বংস নাই একথা গ্রন্থগত, সুতরাং সত্য, অভ্রান্ত ও সর্বদাগ্রাহ্য। কিন্তু সম্মুখস্থ প্রদীপ যে অবিরত তৈলশোষণ করিতেছে, তৎপ্রতি তাঁহাদের চিন্তা ব্যাবৃত্ত হয় না। অপরপক্ষে অধিকাংশ মোসলমানই বিজ্ঞান-গণিত-দর্শন-জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রকে নাস্তিকতার আকর ও ধর্মের বিরোধী বলিয়া মনে করেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের যে প্রয়োজনীয়তার ওপরে পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদি এখানে জোর দিয়েছেন, জামালউদ্দীন আফগানী এবং স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ সারা জীবন ধরে সেই প্রয়োজনেরই গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

অগ্নি-কুক্কুট (১৯২৬)[২২] রচনার আশু উপলক্ষ ছিল মীর মশারবফ হোসেনের পুস্তিকা *গো-জীবনী* (১৯২৫) যে বিতর্কের সূত্রপাত করে, তাতে অংশগ্রহণ করা। মশাররফ হোসেনের প্রতি পণ্ডিত মাশহাদি একটু কটাক্ষপাত করেছেন:

হিন্দুদিগেব প্রবোচনায় দুই একজন আত্মতত্ত্ববিহীন ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ অদূরদর্শী মোসলমানও আজকাল গরু কোরবানী ও গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। [১০৭]

তবে তিনিই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মশাররফ হোসেন ও নইমুদ্দীনের মধ্যেকার মামলা-মকদ্দমার মীমাংসা করেন।[২৩]

সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা হিন্দুর শুভবুদ্ধি সম্পর্কে পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্‌মদ মশহাদিকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। তার একটি দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগে গোহত্যানিবারণ আন্দোলনের কিছু অপ্রীতিকর ফল, আর একটি হিন্দু জমিদারের সঙ্গে তিতুমীরের সংগ্রাম। অগ্রসব ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে অনগ্রসর ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত অনেক ক্ষেত্রে ধর্মবিদ্বেষের পোশাক পরে দেখা দিয়েছিল, ফলে বিভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্যজনক ছিল না। ক্ষুব্ধচিত্ত পণ্ডিত যখন লেখেন :

গোমাংসভক্ষণ একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়, এই সামান্য কথা হইতেই মোসলমানসমাজ যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা এখন আব সামান্য নহে। উহা দেশের সর্বত্র পুঞ্জীভূত দৃষ্ট হইয়া থাকে।... [৯৫]

ইহারাই [হিন্দু] তিতুমীরের বিদ্রোহের পূর্বে মোসলমানদিগের দাড়ির উপর টেক্স বসাইয়া ছিলেন।... [১০০]

এমন কি, হিন্দুর অত্যাচারের কথা স্মরণ করে তিনি ইংরেজ সরকারের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন :

ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গভর্ণমেন্ট! তুমি কি অন্ধ? হিন্দু কর্তৃক মোসলমানের প্রতি এই যে দেশব্যাপী অসহ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে মোসলমানের কিছু বলিবার পূর্বেই কি তোমার সে উৎপীড়ন চেষ্টাব মূলোচ্ছেদ করা উচিত নহে ?...

তোমার কৌশলে না হউক—অন্তত তোমার আলস্য ও উদাসীনতায় ভারতবর্ষীয় মোসলমানেরা রাজকার্য হইতে বঞ্চিত, শক্তিবিরহিত সুতরাং জাতিসাধারণের দ্বারা উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইতেছিল। কয়েকদিন হইল, তোমার সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এখন

> চক্ষু মার্জন ও দেশের চারিদিকে গূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, মোসলমানেরা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে যে অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে কি না ? [১০৯]

কিন্তু ইংরেজ যে মুসলমানের বন্ধু নয়, এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। *সমাজ ও সংস্কারকের* প্রচার সরকারের আদেশে বন্ধ হয়েছিল। হয়তো সেই রোষদৃষ্টি মোচনের উদ্দেশ্যেই এখানে তিনি তৃতীয় পক্ষরূপে ইংরেজের শরণ নিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা যে অভিন্ন এবং পরাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা যে সম্প্রদায়ভেদে এক, একথা তিনি বলেছেন :

> আমার গৃহজীবনের সহিত তোমার সম্পর্ক নাই, তখন তুমি হিন্দু, আমি মোসলমান। আমার সামাজিক জীবনের সহিতই বা তোমার সম্পর্ক কি? ...তোমার আবশ্যক আমার রাজনৈতিক জীবন লইয়া, দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে আমার মত কি, অস্ত্র সংক্রান্ত আইন, খাজানার আইন, স্বত্বের আইন, প্রেস এ্যক্ট, রাজ কর, টেক্স, এইরূপ গুরুতর বিষয় মীমাংসার সময় কেবল তোমার আমার সম্বন্ধ। এখন তুমি আমি – একত্রে এক দেশবাসী, একজাতি, তোমার বিপদ সম্পদে দুঃখে-সুখে, রাজদ্বারে, শ্মশানের আসন্নতর স্থান বধ্যমঞ্চে, আমাকে স্থির বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বন্ধুরূপে দেখিতে পাইবে।... তোমার এক বিন্দু রক্ত আমার এক বিন্দু রক্ত অপেক্ষা কম প্রিয় মনে করিব না। [৫৫]

জাতীয়তার যে সংজ্ঞা এখানে তিনি দিয়েছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ভিত্তি ধর্মমত নয়, রাজনৈতিক ঐক্য। হিন্দু ও মুসলমানের নানামুখী স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁদেরকে এক জাতিরূপে কল্পনা করে পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্‌মদ মাশহাদি প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের আদর্শকেই গ্রহণ করেছেন। আলীগড় আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। বরঞ্চ দেওবন্দের ভাবধারার সঙ্গে এর মিল আছে।

প্রবন্ধ-কৌমুদী (১৮৯১)[২৪] ছয়টি প্রবন্ধের সংগ্রহ। 'আরব ও এসলাম' প্রবন্ধে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব দেশে প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও ফলাফল আলোচিত হয়েছে। 'মোসলমান বীরঙ্গনা'য় খাওয়ালার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর বিদ্রোহকালীন একটি ঘটনা 'আত্মসম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ইওরোপীয় আদর্শে আমরা জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম বা বীরত্বের কথা যখন বলি, তখন এই সমস্ত উপাদান যে আমাদের দেশেও লভ্য একথা ভুলিয়া যাই। ইতিহাসের পাতা থেকে তাই তিনি বর্ধমানের রাজকন্যা ও সেনানায়ক নেয়ামত খাঁর মর্যাদাবোধ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এরমুক যুদ্ধের পূর্ব্বাভাস' সিরিয়ায় মুসলিম-বিজয়ের কাহিনী। 'মালেক অল গাজি' প্রবন্ধে ইখতিয়ারুদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজীর জীবনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন :

> এমন একদিন ছিল, যখন মোসলমানের বিজয় গান, সাহসবার্ত্তা, যশোগৌরব, নূতন অধিকার প্রভৃতির বর্ণনা না করিলে ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা অতৃপ্ত থাকিয়া যাইত, আজ এমন একদিন উপস্থিত হইয়াছে, যখন প্রতি মুহূর্তে মোসলমানের ধ্বংস, পরাজয়, বিনাশ কুৎসা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ না করিলে ঐতিহ্যসিক প্রত্যবায় হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এখন কার্য্যের যুগ অবসান হইয়াছে, স্মৃতির যুগ উপস্থিত। [৭১]

বলা বাহুল্য যে, স্মৃতির চেয়ে কর্মকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের অতীত গৌরব লুপ্ত হয়েছে, এ যেমন তাঁর কাছে আক্ষেপের কথা, তেমনি অতীত গৌরব নিয়ে যে আমরা শুধু আক্ষেপ করছি, এটাও তাঁর কাছে শোচনীয় বলে মনে হয়েছে।

বইটির শেষ প্রবন্ধ 'মহররম' কেবল কারবালা-ইতিবৃত্ত নয়, মুহরম অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় মতামতের পরিচয়বাহী। এই মতামত — যাকে আমরা বলতে পারি — পুরোপুরি পিউরিট্যানিক। তিনি বলেছেন :

> পারস্য দেশের লোকেরা মহাত্মা আলির প্রতি নিতান্ত ভক্তিসম্পন্ন। তদ্দেশীয় কোন সম্রাট কারবালার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আনিয়া স্বদেশে স্থাপন করেন এবং বৎসরান্তে তথায় ঘোর ঘটার সহিত কারবালার ঘটনার অভিনয় করিয়া শোকপ্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই বর্তমান মহররম উৎসবের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন আর ইহাতে শোকের ভাগ নাই। কালক্রমে ইহা এক নরপূজারূপে পরিণত হইয়া ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধপথে যাইয়া পড়িয়াছে, শোক ঘটনার এইরূপ পুনরভিনয় করা হাদিস শরিফ অনুসারেও নিষিদ্ধ।
>
> মোসলমানদের সুন্নি অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যেও মহরম ঘটনার সম্বন্ধে অন্যবধি ভ্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। মহরম মাসের দশম দিবসে পূর্ব্বতন সমুদয় প্রেরিত পুরুষগণ উপবাসব্রত— রোজা প্রতিপালন করিতেন ! …সুন্নি মোসলমানেরা হাদিস সরীফের আদেশ অনুসারে মহরমের আশুরার উপবাস ব্রত ধারণ করিয়া মনে করেন, তাঁহারা মহাত্মা হোসেনের জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছেন। [১২৩-২৪]

আমাদের দেশে মুহররম অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র শিক্ষায় তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্য থেকে এবং সেই সূত্রে ফারায়েজীদের দ্বারা। সংস্কারমুক্ত মনের কাছে এই আপত্তির মূল্য আছে। আফগানীর প্রেরণায় পণ্ডিত মাশহাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শিখেছিলেন; তাই আশ্চর্য নয় যে, ইসলামের মূল শিক্ষার আলোকে বিচার করে এই অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন করার কথা ভেবেছেন।

সুরিয়া-বিজয় (১৮৯৫) শেখ আবদুর রহিম-সম্পাদিত মাসিক *মিহির* পত্রিকায় (১৮৯২) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, পরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে সংগ্রাহক আবদুর রহিমের ভূমিকা-সংবলিত হয়ে গ্রন্থরূপে প্রচারিত হয়। হজরত মুহম্মদের (দ:) দেহত্যাগের পর এই ইতিহাসের সূত্রপাত এবং হজরত আবুবকরের খিলাফতকালে আজনাদিন ও দামেস্কে রোম সম্রাটের পরাজয়ে এর পরিসমাপ্তি। *সুরিয়া-বিজয়ের* কাহিনী অবশ্য এখানে শেষ হয় নি। লেখক ও সংগ্রাহক উভয়েরই বইটির দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা কার্যে রূপান্তরিত হয় নি।

পণ্ডিত রেয়াজ-আল-দীন আহ্মদ মাশহাদির বাণী হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। এবং তা করলে দেখা যাবে যে, এক অর্থে তিনি অনন্যপরতন্ত্র। ঐতিহ্যচেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু ঐতিহ্যগর্ব তাঁকে অন্ধ করতে পারে নি। মুসলমানের অতীতে যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয়, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন কেবল সুখস্মৃতিরূপে নয়, নতুন সৃস্টির প্রেরণা হিসেবে। যে ঐতিহ্যচেতনা কেবল আত্মগর্বমূলক, সৃষ্টিপ্রেরণায় অক্ষম, তার নিন্দাও তিনি করেছেন,

শুধু মুসলমানের নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পদেরও উত্তরাধিকার তিনি দাবি করেছেন এদেশের অধিবাসী হিসেবে, এটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা। কিন্তু কেবল অতীত-বিচারই তিনি করেন নি, বর্তমানের পর্যালোচনাও তিনি করেছেন এবং আফগানীর মতোই পরাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসম হিন্দু-মুসলমানের বাস্তব সংঘাতকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মবিদ্বেষ বলে দেখাটা তাঁর পক্ষে সমীচীন বলে মনে হয় না। তবু রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে একতার কথা এবং এক-জাতীয়তার কথা বলেছেন, সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেযুগের মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এখানেই তাঁর অমিল। কলকাতা মাদ্রাসায় আফগানীর বক্তৃতায় যাঁরা বাধাপ্রদান করেছিলেন, তাঁরা 'কোন স্বজাতিদ্রোহী মোসলমান কুলতিলকের কাতর প্রার্থনায়' প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, এই খেদোক্তি *সমাজ ও সংস্কারকে* আছে। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন যে, আফগানী 'যখন কলকাতায় উপস্থিত হন তখন নবাব আবদুল লতীফ প্রমুখ বাংলার তদানীন্দন শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলিকাতা মাদ্রাসায় তাঁর বক্তৃতাদানে বাধা দেন।'[২৫] অতএব, এইসব নেতা যে-রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, তার সঙ্গে পন্ডিত মাশহাদির আত্মিক যোগ না থাকাই স্বাভাবিক।

আক্ষেপের কথা, তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির আগেই সাহিত্যের জগৎ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। *মোসলমান সাম্রাজ্য* নামে ইসলামের রাষ্ট্রিক ইতিহাস-রচনার যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তাও কখনো বাস্তবে রূপায়িত হয় নি, অন্য বই লেখা তো দূরের কথা। তবে পণ্ডিত মাশহাদি যেসব গ্রন্থাদি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, তা তাঁর মৌলিক— এমন কি, অনেকক্ষেত্রে বৈপ্লবিক—চিন্তার পরিচয়বাহী, এটি সান্ত্বনার কথা।

চার

সাংবাদিক গ্রন্থাকার রূপে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ (১২৬৯-১৩৪০ বঙ্গাব্দ; ১৮৬২-১৯৩৩ খৃঃ) বহুল পরিচিতি লাভ করেছিলেন। স্বলিখিত 'পাক-পাঞ্জতন' বইটির ভূমিকায় রেয়াজুদ্দীন 'গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় ও আত্মনিবেদন' শিরোনামায় নিজের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রধানত এটিই অবলম্বন করে সম্প্রতি তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের একটি পরিচিত প্রকাশিত হয়েছে।[২৬] এ থেকে জানা যায় যে, বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম হয় এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসা গ্রামের 'মহাপরাক্রান্ত ও দাতাগ্রগণ্য আদর্শ জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী' (নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর স্বামী) আশ্রয়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি ক্লাস পর্যন্ত এবং 'কিঞ্চিত উর্দু' অধ্যয়ন করেন। রূপসাতে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং ১২৯০ বঙ্গাব্দের (১৮৮৩-৮৪ খৃ.) দিকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। রূপসায় অবস্থানকালে হুগলীর *'এডুকেশন গেজেট'* ও *'দৈনিক'* পত্রে তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয় এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দে তিনি *'পদ্য-প্রসূন'* নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে একালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা— বিদ্যাসাগরের *'বোধোদয়'* পুস্তকের কয়েকটি অসংগতির প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং পরবর্তী সংস্কার বিদ্যাসাগর-কর্তৃক তার সংশোধন ও রেয়াজুদ্দীনের পত্রের স্বীকৃতি জ্ঞাপন।

কলকাতায় আসবার পর তিনি প্রথমে শশিভূষণ মুখোপাধ্যায প্রতিষ্ঠিত স্বল্পায়ু *মুসলমান* পত্রিকার এবং পরে ঢাকার *শ্রীমন্ত সওদাগর* নামক বাণিজ্য-পত্রিকার যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। আরো পরে তাঁর সম্পাদনায় মুনশী আবদুল ময়েজ-প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক *নব সুধাকর* আত্মপ্রকাশ করে, তবে সেটিও পাঁচ-ছ সংখ্যার বেশী চলে নি। কলকাতায় রেয়াজুদ্দীনের সঙ্গে পরিচয় হয় কবি মোজাম্মেল হকের আর পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহ্মদ মাশহাদি, মোহাম্মদ মেয়ারাজউদ্দীন আহ্মদ ও শেখ আবদুর রহিমের। এই সময়ে চব্বিশ পরগণা, যশোর, খুলনা ও ঢাকায় কোন কোন মুসলমান ধর্মত্যাগ করে খৃস্টান ও ব্রাহ্ম হয়ে যান। তারই প্রতিক্রিয়ায় শেষোক্ত তিনজন লেখকের সঙ্গে যোগ দিয়ে রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'এসলাম তত্ত্বের' (দু খণ্ড, ১২৯৫-৯৬) অন্যতম লেখক হয়ে ওঠেন। বোধ হয় এর কিছু পূর্বেই তিনি ধর্মতত্ত্ববিষয়ক আরেকটি বই, 'তোহ্ফাতোল মোসলেমিন' প্রণয়ন করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যে 'এসলাম তত্ত্ব' প্রচারিত হয়, সেই একই উদ্দেশ্য এর চারজন লেখকের সম্মিলিত উদ্যোগ ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে 'সুধাকর' প্রকাশিত হল। 'সুধাকরে'র সংস্রব ত্যাগ করার পূর্বেই তিনি 'ইসলাম প্রচারক' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এর প্রধান পর্যায় (১৮৯১-৯২) স্বল্পকালীন হলেও দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৯৯-১৯০৬) অনেকদিন চলেছিল। 'ইসলাম প্রচারকে'র আয়ু যখন ফুরিয়েছে তখন (১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৬) মহীপুরের (রংপুর) জমিদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ ও রাজশাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর অর্থানুকূল্যে সাপ্তাহিক *'সোলতান'* প্রচারিত হয় রেয়াজুদ্দীনকে সম্পাদক করে। শেষ জীবনে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন এ.কে.ফজলল হক-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত *নবযুগ* আর জনৈক ব্যারিস্টার-পৃষ্ঠপোষিত *'রায়ত-বন্ধু'* পত্রিকা দুটি।

গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০৮) তাঁর যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় বহন করে। মুসলমান সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে তিনি বইটি আরম্ভ করেছেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিতব্য বিষয় অবশ্য গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের আনুপূর্বিক ইতিহাস। তুরস্ককে তখন মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়রূপে দেখা হত বলে এই যুদ্ধটি প্রায় ধর্মযুদ্ধরূপেই লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। হাফেজ পাশা, জামাল পাশা ও গাজী ওসমান পাশার বীরত্বের প্রতিতুলনায় ডিউক অফ স্পার্টার ভীরুতা এবং গ্রীকদের কাপুরুষতার অন্যান্য প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি তুরস্কের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনচরিতের (১৯২৭) ভূমিকায় লেখক ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হজবতের জীবনীসমূহের উল্লেখ করেছেন। গিরিশচন্দ্র সেন, শেখ আবদুর রহিম, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মুনশী মায়যুদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিঞা, সৈয়দ শরাফত আলী 'শেখ (আবদুর রহিম) সাহেবের পুস্তকের প্রায় সম্পূর্ণ নকল করিয়া স্বীয় স্ত্রী নোয়াজ বেগমের নামে...মুদ্রিত করেন' এবং মধু মিঞার বইটি তাঁর [রেয়াজুদ্দীনের] 'পুস্তকেরই অনেক উপকরণে পূর্ণ' ছিল।

এই বইটি রেয়াজুদ্দীনের রক্ষণশীল চিত্তের পরিচয় বহন করে। *মোস্তফা-চরিতে*[৭] মোহাম্মদ আকরম খাঁ যুক্তির দ্বারা হজরতের জীবন কাহিনীর যে পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, রেয়াজুদ্দীন তাতে ক্ষুব্ধ হন। *মোজেজার* সত্যতায় সংশয়হীন বিশ্বাস তাঁর ধর্মবোধের অঙ্গ

বলে এখানে প্রতিভাত হয়েছে। হজরত মুহম্মদের বক্ষঃবিদারণ, সুর গিরিগুহায় চন্দ্র ও সূর্যের একত্র সমাবেশ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনাকে তিনি আক্ষরিক অর্থে বাস্তব বলে গণ্য করেছেন।

তাঁর চিন্তাধারার পশ্চাদ্‌গতির স্পষ্টতর পরিচয় আছে আধুনিক জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর মনোভাবে। লেখক সুলতান হামিদের ভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি। কামাল পাশার অভ্যুত্থান তাই তাঁর চিত্তে দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, নব্য তুর্কীর বিজয়াভিযানের কল্যাণময় দিকটা তাঁর চোখেই পড়ে নি। বাংলা ভাষা যে মুসলমানদের মাতৃভাষা, এটা তাঁর কাছে একটা বেদনাদায়ক সত্যের রূপ ধারণ করেছে। এই কাফেরী জবানকে শুদ্ধ করে নেবার জন্যে যতদূর সম্ভব আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ তাঁর কাম্য ছিল। এই কামনা যদি ভাষার মাধুর্য ও স্বাভাবিকতার প্রতি প্রবণতা থেকে আসত, তাহলে আক্ষেপ ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে। তিনি বলেছেন,

> মোসলমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতি, কিন্তু আমার মত চিরদিনই ইহার বিপরীত। হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা আমাদের জীবনের গতি বিপরীত পথাভিমুখী হইয়াছে। আমরা আল্লাহতা'লা স্থলে ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা ভগবান শব্দ ব্যবহার করিতেছি...আমাদের নবীন সাহিত্যিকদিগের জানা উচিত যে, মোসলমান জাতির ভাষা আরবীর সাহায্য ব্যতীত এই বিশাল প্রথিবীতে কখনই পরিপুষ্টতা ও পূর্ণতা লাভ এবং জাতীয় জীবনগঠনের সহায়তা করে নাই।...বর্তমান নব্য তুর্কী বা কামালী দল অবশ্য আরবীর সে প্রভাব নষ্ট করিয়া, সেই স্থলে রোমান প্রভাবের প্রতিষ্ঠা পূর্বক মোসলমানদিগের জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।...উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই করণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।...বেহারে মোসলমান সংখ্যা খুব কম (শতকরা ১৪/১৫ জন) হইলেও, তাহাদের মাতৃভাষা খাঁটি উর্দু, এবং তাহারা জীবন্ত মোসলমান।...আমাদের নব্যশিক্ষিত তরুণ সাহিত্যিক দল আরবী ফারসীর সঙ্গে অপরিচিত। যুবকবৃন্দ উর্দু ভাষার নাম শুনিলেই নাক সিটকাইয়া থাকেন, এবং শিহরিয়া উঠেন। অনেকে উর্দু-পারসীর বিরুদ্ধে গরলোদ্‌গার করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

এই আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী যে সামাজিক প্রগতির সহায়ক হতে পারত না, তা বলা বাহুল্য।

এই বইটির সঙ্গে হজরত আলী, বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান ও হোসেনের জীবনী প্রণয়ন করে একই খন্ডে তিনি প্রকাশ করেন *পাক পাঞ্জাতন* নামে (১৩৩৫)। হজরত আলীর বিরত্ব সম্পর্কে অনেকগুলি কিংবদন্তী তিনি ঐতিহাসিক সত্য বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁর নয় পত্নী, চৌদ্দ পুত্র ও সতেরো কন্যার পরিচয় দিয়েছেন। ফাতেমার জীবনের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি হজরত মুহম্মদের তনয়া। হাসান ও হোসেনের জীবনী প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। হাসানের জীবননাশের জন্যে জায়দাকে

দোষী করা—তাঁর মতে—অকর্তব্য। তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এজিদ হোসেনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

পাক পাঞ্জাতন-এ ভাষা দুর্বল এবং রচনারীতি শিথিল। রেয়াজুদ্দিনের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে ঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লিভারপুলের ইংরেজদের পরিচয়-সংবলিত *বিলাতী মুসলমান* (১৯০৯), *কৃষক-বন্ধু কাব্য* (দ্বি-স ১৩৩২), *আমার সংসার জীবন* (১৩২২) *জঙ্গে রুম ও ইউনান* (মিশ্র ভাষারীতিতে লেখা গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের বিবরণ) ও *হক নছিহৎ*।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও রেয়াজুদ্দীনের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচয় আমরা বিশেষ করে পাই। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলতার প্রমাণ আছে নাটকাভিনয় ও প্রণয়-কাহিনী সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে। 'এবনে মাঅ‌ীজ' ছদ্মনামে 'মিহির ও সুধাকরের রুচিবিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে 'থিয়েটারের লম্বা চওড়া সমালোচনা বাহির কারিয়া মুসলমান গ্রাহক-পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান' করার অপরাধে *মিহির ও সুধাকরের* সম্পাদককে তিনি দায়ী করেন।[২৮] অন্যত্র 'সমাজ-সেবক' বক্তা ছদ্মনামে সম্ভবত তিনিই 'বঙ্গসাহিত্যের মুন্ডপাত' শিরোনামায় বলেন :

> প্রচারক নামক একখানি মাসিক-পত্র আছে।...বোধহয় কোন অর্বাচীন প্রতারক লোক সমাজ-সেবার ভাণ করিয়া, প্রতারণার জাল বিস্তার করত, দু'পয়সা উপার্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।...এক শেখ ফজলল করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলাম-বিরোধী কোরআন অবিশ্বাসী হিন্দু।...শেখ ফজলল করিম সাহেবেরও যে দুইটি প্রবন্ধ প্রচারকে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটি লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাৎপদ বর্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে?... লায়লীর রূপমাধুরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়নভঙ্গী, বিলোম কটাক্ষ, প্রেম কথন ও প্রেমচাতুর্য— মজনুর প্রেমাসক্তি প্রেমোন্মত্ততা দ্বারা তাঁহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে না কি?...তারপর পরিত্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাব্য, প্রকৃতপক্ষে কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করি, যে বিষয় অবলম্বনে [হজরত মুহম্মদের (দ:) জীবনী] উহা লিখিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অসার কল্পনাপ্রসূত কাব্যকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার কোন মুসলমানের আছে কি?...বাঙ্গালা ভাষার সম্পাদকের যেমন অগাধ জ্ঞান, ইংরেজীতে তেমনি বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাপুরুষ।[২৯]

মিহির ও সুধাকর এবং *প্রচারক* সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের মূলে এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার বিষয়টি যে সক্রিয় ছিল, এই অনুমানের সম্পূর্ণ অবকাশ আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই বিরূপ সমালোচনার মধ্যে তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতা তীব্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই সীমাবদ্ধতা তাঁর রাজনৈতিক আলোচনায়ও পরিস্ফুট হয়েছে। 'বঙ্গ বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন' প্রবন্ধে এবনে মাঅ‌ীজ লিখেছেন :

> ইংরেজ শাসনাধীন যে আমরা পরম সুখ ও শান্তিতে বাস করিতেছি, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। বিদেশীর শক্তির অধীনে এরূপ সুখশান্তি কোনও দেশের অধিবাসীদিগের ভাগ্যেই ঘটে না। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।...

> গভর্নমেন্ট রাজকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশে দুইজন বা তিনজন লেপ্টেনান্ট গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করিলে তাহাতে তোমার আমার কি?…
>
> যদি কাশিমবাজারের মহারাজা এবং হিন্দু সংবাদপত্রসমূহের উক্তি সত্য হয়, তবে নতুন বঙ্গে মুসলমান অধিক পরিমাণে চাকবি লাভ করিবেন, এবং হিন্দুগণের সেই স্বার্থে আঘাত পড়িবে বলিয়াই তাঁহারা ততোধিক বিচলিত হইয়াছেন এবং গভীর গর্জ্জন চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেছেন, আমরা কেন এ কথা মনে করিব না?…
>
> যে সকল বিকৃতমনা ও অদূরদর্শী মুসলমান এই গোলমালে হিন্দুদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে, তাহারা হয় ভন্ড কাপুরুষ, নয় ঘোর মূর্খ।…
>
> মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, তাহারা রাজভক্ত না হইয়া পারে না। মুসলমানের ধর্মে আঘাত না পড়িলে তাহারা কদাচ রাজার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয় না। সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি যে সকল ঘটনায় মুসলমানগণ রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, সে সমস্তই ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। অবশ্য রাজার দ্বারা কোনও অন্যায় অনুষ্ঠান হইলে, আমরা ধীরভাবে তৎপ্রতিকারের প্রার্থনা জানাইব তা বিনীতভাবে—কাতরভাবে নিজেদের অভাব অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিব। ইংরেজ রাজ্যে আমাদের ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না।…
>
> অভিধানে এমন কোনও গালির শব্দ নেই, যাহা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুগণ প্রয়োগ না করিয়াছেন।…
>
> বঙ্গের মুসলমান স্বাধীনতা-রবি কাহাদের কল্যাণে অস্তমিত হইয়া ছিল ? …হিন্দুদিগের সংস্রবে ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ধর্ম ও নৈতিক জীবনের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গেলে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।[৩০]

এই অবনতির নমুনা হিসেবে তিনি বাউলদের উৎপত্তি, মুসলমানের মাদক দ্রব্য সেবন, ব্যভিচার, আতশবাজী পোড়ানোর অভ্যাস, চৈত্র সংক্রান্তি বা দুর্গাপূজায় উৎসব, হিন্দুয়ানী নাম গ্রহণ, গোমাংসভক্ষণে বিমুখতা, মেয়েদের বেপর্দা ও অসতীত্ব, কবরে বাতি, ফুল, চিরাগ ও সিজ্‌দা প্রদান প্রভৃতি আচারের উল্লেখ করেছেন। এর সবগুলো যে হিন্দু-সংসর্গের ফল নয়, একথা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই লক্ষ্য করবেন। ভারতে বা বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে রেয়াজুদ্দীন যদি আন্দোলন করতেন, তবে তা হয়তো কল্যাণভিসারী হত। কিন্তু তিনি অকৃত্রিম ইসলামের কথা ভেবেছেন হিন্দু সম্পর্কে আপত্তি করতে যেয়ে, দ্বিতীয়ত: এই ইসলামকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন রাজ অনুগত ধর্ম বলে। সাম্রাজ্যবাদের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং স্বেচ্ছাচারীর কাছে আবেদন-নিবেদনের থালা বহনকে রাজনৈতিক প্রয়োজন বলে সেযুগে যেসব মুসলমান নেতা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু এই নীতিকে ধর্মবোধের সঙ্গে যোগ করেন নি। ইংরেজ-শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের আগ্রহ যে ইসলাম ধর্মবোধ-প্রণোদিত নয়, তার প্রমাণ দু মাস পরের *ইসলাম প্রচারক* থেকে পাওয়া গেলে। *মহাজন-বন্ধু* সম্পাদক শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল 'ধন্য ইসলাম প্রচারক' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে এবনে মাঅীজের বক্তব্য সমর্থন করে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালেন।[৩১]

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মেদের মানস-বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, ইংরেজ

শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, হিন্দু সম্পর্কে বিরূপতা, সামাজিক প্রগতির বিরোধিতা এবং সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

পাঁচ

ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা ভাষায় যাঁরা গ্রন্থরচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মোহম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত উপাধি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন চট্টগ্রামবাসী। প্রথম জীবনে তিনি রংপুরের একটি মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, পরে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন পেশা হিসেবে। কলকাতায় স্থাপিত আঞ্জুমানে-উলামার তিনি ছিলেন যুগ্মসম্পাদক এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ্-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেছিলেন।

ভারতে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪) সম্ভবত: তাঁর *শ্রেষ্ঠ* রচনা। এর *অবতরণিকা*য় তিনি কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে সত্য বিকৃতির এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন :

> বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের এরূপ ন্যায়ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অলীকও ভিত্তিহীন ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্য কি তা তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে কয়েকটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের চিরন্তন ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষ, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক অভিসন্ধি সাধন...মুসলমানগণের প্রকৃত জাতীয় গৌরবের কহিনী এবং সভ্যতার মূলীভূত উপকরণসমূহের আলোচনা হইতে বিরত থাকার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে।

দশটি পরিচ্ছেদে তিনি মুসলমান-শাসনকালে পূর্ত বিভাগ, লঙ্গরখানা ও খয়রাতখানা, রাজকীয় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকগণের নাম, পুস্তকালয়, মুসলমান সভ্যতার বিবিধ নিদর্শন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের সহিত মুসলমানগণের ব্যবহার, জিজিয়া এবং ভারতে মুসলমান স্থাপত্যবিদ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেবল মুসলমানদের কীর্তিকাহিনী বিবৃত করে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভারতের ইতিহাসের দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তাকিয়েছেন, তাকে আমরা জাতীয়বাদী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী বলতে পারি। কংগ্রেসের সমর্থক জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা যেমন নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত হয়েও স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানেরা বিশ্বাসস্থাপন করতে পারেন নি, মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীও তেমনি হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নয়, মিলন কামনা করেছেন এবং ইতিহাসের মধ্যে এই মিলনের সূত্র সন্ধান করেছেন। আওরঙ্গজেবের সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কভঞ্জনের চেষ্টা করে তিনি বলেছেন :

> যে আওরঙ্গজেবের প্রতি ইউরোপীয় ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ অসংখ্য কলঙ্কের বোঝা

> চাপিয়ে গিয়াছেন সেই আওরঙ্গজেব অসংখ্য হিন্দু দেবালয়ের জন্য নিষ্কর ভূমি দানপূর্বক সনন্দ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। [১৬২]
>
> তিনি মুসলমানদিগকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার হিন্দু প্রজা-সাধারণকেও তদ্রূপ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। [১৬৫]
>
> এরূপ অলীক ও ভিত্তিহীন গল্পগুজবের প্রশ্রয়াধিক্য এতদ্দশীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [১৭১]

ইতিহাসের বিচার তাঁর এই মতামতসমূহের আত্যন্তিক মূল্য কি দাঁড়াবে, তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু কোন্ অভিপ্রায়ের বশবর্তী হয়ে তিনি মুসলিম-শাসিত ভারতবর্ষের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে বসেন, তা আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি।

ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আল-এসলাম পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি মুসলিম-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তিনি বলেন :

> হিন্দু ও মুসলমান, ভারত-মাতার যুগল সন্তান। তাঁহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখসম্পদ ও সমৃদ্ধি গৌরব যে এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা, পরস্পর একতা ও সম্প্রীতিব উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলোক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই উভয় ভ্রাতার পরস্পর একতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ স্থাপনের উপায় কি, তদ্বিষয় অতি অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকেন।...
>
> ...দেশের প্রকৃত হিতৈষী ও চিন্তাশীল লোকগণের মতে, বিদেশীর ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারতের অলীক ও ভিত্তিহীন ইতিহাস এবং তাঁহাদের আদর্শ-অবলম্বনে রচিত এতদ্দেশীয় অনুকরণ-প্রিয় লেখকগণের কল্পনা-কাহিনী বেনামে ভারতের ইতিবৃত্ত, এ সকলই হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।...
>
> ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্যসেবকগণের প্রধান কর্তব্য।[৩২]

এই কর্তব্যপ্রণোদিত হয়েই তিনি বলেছেন যে :

> রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দায়ে পড়িয়া মুসলমানগণ যে কেবল হিন্দুদের দেবালয় ভাঙ্গিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং আবশ্যক মতে তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধকালে মস্‌জেদ ও সমাধিমন্দির বিধ্বস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।[৩৩]

ইতিহাস থেকে এই সব প্রমাণ উদ্ধৃত করে হিন্দ-মুসলমানের মিলন ঘটাবেন বলে মনিরুজ্জামান আশা পোষণ করেছিলেন।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল প্রাচীনপন্থী পরিবেশে, মূলত ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে সুফীপন্থা তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে। পীরদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাও আমরা দেখেছি। এরই পরিচয় আছে তাঁর *খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়া* (১৯১৬) গ্রন্থে। বইটি নিজামউদ্দীনের বংশ, জীবনকাহিনী ও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়।

কোন কোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে তাঁর মনেও সন্দেহ জেগেছে, তবু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের প্রচারকদের মতো তিনি এগুলোকে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন:

> এই প্রবাদটি অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির অলৌকিক প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও ইউরোপ ও আমেরিকাতে 'মেসমেরেজম' ও 'হিপনাটিজমে'র উন্নতির সঙ্গে অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা ক্রমে সকলের নিকট সমর্থিত হইতেছে। [২৫]

অলৌকিকতার সত্যতা-প্রমাণের এই চেষ্টা দুর্বল হলেও, এর তাৎপর্য এই যে, অলৌকিক ঘটনামাত্রই যে প্রামাণ্য নয়,— তারও যে প্রমাণ আবশ্যক— এই কথাটি এখানে পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা দরকার যে ইসলামাবাদী সংস্কারাচ্ছন্ন পীরবাদী ছিলেন না, বরঞ্চ তার ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করেছেন। দু'বছর পর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> দেশের যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষেরা পীরের দর্গাহে যাইয়া ও জীবিত পীরের নিকট যাইয়া বর্ণিতরূপে শেরক বেদআৎরূপ মহাপাপ অর্জন করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।...কবরে, দর্গাহে, মাজারে বাতি জ্বালান, মানত চড়ান সমূলে বিনাশ করা আবশ্যক।[৩৪]

অতএব, আমরা ধরে নিতে পারি যে, নিজামউদ্দীনের প্রতি তিনি যে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, তা ঠিক পীরবাদের প্রতি নয়, আল্লাহর একজন অনন্যসাধারণ ভক্তের দার্শনিকোচিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু আত্মার উদ্দেশ্যে। আশ্চর্য এই যে, ইসলামের মতো বৈরাগ্যবিরোধী ধর্মের অনুসারীদের জন্যে মহাত্মা নিজামের যে সমস্ত উপদেশ তিনি সংকলন করেছেন, তার মধ্যে একটিতে বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তির কথাই আছে :

> নামাজ, রোজা, তপজপ আধ্যাত্মিক ভান্ডারের উপকরণবিশেষ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে সন্ন্যাসব্রত উপকরণ, উপাসনাদি বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। [৬৭]

মনে হয়, শিক্ষা ও সংস্কারের মধ্যে কিছুটা আপসরফা এখানে তাঁকে করতে হয়েছে।

এই ধরনের আপসরফার একটি উদাহরণ *তুরস্কের সুলতান* [১৯১৮] বইটি থেকেও নেওয়া যেতে পারে। তুরস্কের শাসনব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> তুরস্কে ব্যক্তিগত বা ইচ্ছাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত বলিয়া অনেকেই দোষারোপ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষেও প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী দ্বারা যেরূপ সুশাসন হইতে পারে, ব্যক্তিগত শাসন দ্বারা তাহা হওয়া কখনো সম্ভবপর নহে। তুরস্কের বর্তমান সুলতান ইচ্ছাতন্ত্র রাজত্ব করিতেছেন, এই কথা কতকাংশে সত্য হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য প্রজাতন্ত্র প্রণালীর অনুকরণে সভাসমিতির মধ্যস্থতায় সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। [৭৮]

তাঁর বলবার অভিপ্রায়টা এখানে কি ? তিনি জানেন যে, স্বৈরতন্ত্র ভাল নয় এবং একথাও জানেন যে তুরস্কে গণতন্ত্র প্রচলিত নেই। কিন্তু তুরস্কের সুলতানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশত তিনি বলতে চেয়েছেন যে, স্বৈরতন্ত্র হলেও এর মধ্যে গণতন্ত্র আছে—কথাটা অনেকখানি *সোনার পাথরবাটি*'র মত শোনায়।

তুরস্কের সুলতানের প্রতি তাঁর এত শ্রদ্ধার কারণ এই যে, সুন্নী মুসলমানেরা সাধারণত তাঁকেই ধর্মজগতের প্রধান বলে গণ্য করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, 'বর্তমানে এই তুরস্কই মোসলেম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল।' ফলে, তুরস্কের স্বার্থকে সব সময়েই তিনি নিখিল জগতের মুসলমানের স্বার্থরূপে দেখেছেন। ১৯০০ খৃস্টাব্দের দিকে দামেস্ক থেকে মক্কা হয়ে সানা নগর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচশত মাইলের একটি রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মনিরুজ্জামান বলতে চেয়েছেন যে, এই রেলপথ নির্মাণকার্যে সহায়তা করলে আমাদের পুণ্যলাভ ঘটবে :

> এই মহা সদনুষ্ঠান দ্বারা যে ইসলাম জগতের কতদূর উপকার সাধিত হইবে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ওসমানীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও এই রেলওয়ে লাইন বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই লাইনটি সর্ব্বসাধারণ মুসলমানবর্গের যাতায়াতের সুবিধার্থে নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া, মহামান্য তুরস্কের সুলতান সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানকে এই সৎকার্যে চাঁদা দানপূর্বক অসীম পুণ্যাধিকারী হইতে অনুমতি দিয়াছেন। [৬৩-৬৪]

অবশ্য এই মনোভাব তাঁর একার ছিল না। সে যুগে এই রেল লাইনের জন্যে বাংলাদেশ থেকে অর্থসংগ্রহের জন্যে রীতিমতো সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছিল এবং সে প্রচেষ্টা স্বার্থকও হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাঙালী মুসলমানদেরকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নারী-জাগরণের কামনা করেছেন। সামাজিক প্রগতি ও দেশহিত ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। তাঁর সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনায় তাই তাঁকে বলতে শুনি :

> বাল্য-বিবাহ প্রথা, বিবাহে অতিরিক্ত জেওর মোহর ধার্য্য করা, বিবাহোৎসবে ঢোল, বাদ্য, বাজনা, নাচ, গান, বাজী পোড়ান, বরযাত্রীগণের জন্য অতিরিক্ত আহারীয় ব্যয় এবং সুদী কর্জ্জ করিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথাসমূহ সামাজিক শাসন দ্বারা রহিত করা আবশ্যক।[৩৫]

সামাজিক প্রগতি এবং দেশহিতকামনার সঙ্গে সঙ্গে মনিরুজ্জামান প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই, বরঞ্চ ইসলামের নীতিজ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিচিন্তার অনুকূল, একথা তিনি অতি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৬]

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে পাই আর্নল্ডের *Preaching of Islam* অবলম্বনে লেখা *ভারতে ইসলাম প্রচার*, *আওরঙ্গজেব*, *মোসলেম বীরঙ্গনা*, *খগোলশাস্ত্রে মুসলমান*, *ভূগোলশাস্ত্রে* মুসলমান প্রভৃতি ইতিহাসমূলক রচনা।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও মনিরুজ্জামানের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক *সোলতান* পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে প্রকাশিত তাঁর কংগ্রেস-সমর্থক মনোভাব *ইসলাম-প্রচারকে*'র সমালোচনার বিষয় হয়েছে।[৩৭] মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত *আল-এসলামে*'র তিনি যুগ্ম-সম্পাদক, পরে সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। ১৯২৯-এ তিনি দৈনিক আমীর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাদান ও সম্পাদনা করেন।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে আমরা মূলত খিলাফতপন্থী বলতে পারি। খিলাফত আন্দোলনকারীরা যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্যান ইসলামবাদী ছিলেন,স্বদেশের

ক্ষেত্রে তেমনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। খিলাফত আন্দোলনের শেষে এঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তার দৃষ্টান্ত। ইসলামাবাদী এক্ষেত্রে তাঁরই অনুসারী ছিলেন।

ছয়

মওলানা মনিরুজ্জামানের মতো মোহাম্মদ কে. চাঁদও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কয়েক খন্ডে মোসলেম *সভ্যতার ইতিহাস* প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন, এর প্রথম খণ্ড *মোসলেম জগতে বিদ্যাচর্চা* (১৯১৭) নামে প্রকাশিত হয়। হজরত মুহম্মদের (দঃ) বিদ্যানুরাগ এবং আরবদের জ্ঞানসাধনার বিস্তৃত পরিচয় এতে আছে।

মোসলেম পরকালতত্ত্বে (১৯১৯) পরলোক সম্পর্কে ইসলামসম্মত ধারণাদানের প্রচেষ্টা আছে। এতে তিনি বলেছেন যে, 'কোরআন শরীফের আয়াতগুলো কতকাংশে *মহকম* (চূড়ান্ত বা অস্পষ্ট) আর কতকাংশে *মতশাবিহ্* (রূপক)।' এই সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, স্বর্গসুখ ও নারকী যন্ত্রণার যেসব বর্ণনা কুরআনে আছে তা রূপকার্থে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ আরবদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে যেযে, তাদের উপলব্ধির খাতিরে, স্বর্গীয় সুখ বলতে হুরীদের সাহচর্য প্রভৃতি ভোগবিলাসের কথা বলা হয়েছে। এসব কথা বাস্তব অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামের ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে *আরব জাতির ইতিহাস* (তিন খণ্ড, ১৯১৪-১৫) প্রণেতা সেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। এটি আমীর আলীর *History of the Saracens*-এর অনুবাদ। তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুল করিমের *ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত* (১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল।[৩৮] শেখ আবদুল জব্বারের *মক্কা শরীফের ইতিহাস* ১৯০৬), *মদীনা শরীফের ইতিহাস*, (১৯০৭), *বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস* (১৯১০) ও *হজরতের জীবনী* প্রভৃতি গ্রন্থ এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

প্রচারক ও ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক ময়েজউদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিয়া লেখেন *শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ* এবং *তুরস্কের ইতিহাস*। সম্ভবত উভয় গ্রন্থই বিশ শতকের একেবারে শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল। *ভূপালের বিবরণ* -রচয়িতা আবু নাসের সইদুল্লা আফগানিস্তানের আমীর আবদুর রহমানের ফারসীতে লেখা আত্মজীবনীতে ইংরেজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তর করেন *আফগান আমীর-চরিত* নামে (দু'খণ্ড, ১৩১৮-১৩৩১)। মোহাম্মদ আবদুল আজিজের *সংক্ষিপ্ত মহম্মদ চরিত* (১৯০১), আলী হাসানের *শেষ নবী*, আলাউদ্দীন আহমদের হজরত বড় পীর সাহেবের জীবন-চরিত (১৮৯৯) ও ওমর চরিত (১৯০৩) এবং কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদের মহাত্মা হজরত আবু হানিফা সাহেবের জীবনচরিত (১৮৯৯) জীবনী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সাত

ফরিদপুর জেলার পাংসা গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) ছিলেন শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখক। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তার বিষয়বস্তু হলেও সঙ্কীর্ণ ঐতিহ্যগর্বের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নি। বরঞ্চ সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনায় তার মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মানব মুকুট তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটি হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনসম্পর্কিত সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি। এখানে তিনি হজরত মুহম্মদকে দেখেছেন কেবল ইসলামের নবী হিসেবে নয়, নিখিল মানবজাতির সেবক ও পথপ্রদর্শকরূপে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন :

> এই মানবতার যুগে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষরূপে বিশ্বমানবের নিকটে ইহা অসঙ্কোচে বলিবার সময় আসিয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ মানবতার যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুধু অসামান্য নহে, অতুলনীয়, মুহূর্তের মৃত্যু দ্বারা নহে, পবন্তু বহু বর্ষব্যাপী জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা চিরকালের জন্য মানুষের সুমহান আদর্শরূপে উজ্জ্বল হইয়া আছে। [৫]

হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে নয়, তাঁর মধ্যে মানবজীবনের যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল, তারই জন্য হজরতকে তিনি দেখেছেন এক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মর্ত্যপ্রেমিক মানবরূপে। এয়াকুব আলী দেখেছেন :

> মহাপুরুষেরও শৈশব আছে, মানব-শিশুর স্বাভাবিক সোহাগ-বিরাগ ও মান-অভিমান তাঁহারও জীবনে লীলায়িত হয়, শৈশব-স্মৃতির পুষ্প-পরশে তাঁহারও প্রাণের কোমল পর্দায় ঝঙ্কার উঠে। [৩০]

মধ্যযুগীয় আদর্শে হজরতের চরিত্র অলৌকিকতা আরোপ করে নয়, বরঞ্চ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ হজরত মুহম্মদের প্রতি গভীর মানবপ্রেমকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন, ধর্মনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই মানবহিতৈষণা অনুকরনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিস্ময়ের কথা, শাহ আবদুল আজিজের মতো এয়াকুব আলীও শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষরূপে গণ্য করেছেন এবং হজরত মুহম্মদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন :

> মানুষের নিকটে স্বাভাবিক ধর্মজীবনের আদর্শ-স্থাপনকারীরূপে সকলের উপরে দুইজন মহাপুরুষের কথাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। একজন শ্রীকৃষ্ণ, অপর হজরত মোহাম্মদ। ইহারা উভয়েই গৃহী ছিলেন, সমাজে বাস করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে ক্রিয়া করিয়াছেন ও তদবস্থায় মানুষকে স্বাভাবিক উপায়ে ধর্মসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের কথাই এক হইয়া দাঁড়ায় —*ভোগের মধ্যে থাকিয়া ত্যাগের সাধনা কর*। [১৬-১৭]

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় হজরতের জীবনাদর্শকে তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেছেন। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ অনুসরণের বস্তু নহেন, মানুষের সহায় ও বান্ধব নহেন। কারণ তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মানুষও তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। [১৭-১৮]

কিন্তু হজরত মুহম্মদের মহৎ গৌরব এই যে, তিনি মানুষের ভাই ও বন্ধুরূপে দেখা দিয়েছেন। মানবরূপে, গৃহীরূপে, কর্মীরূপে এবং ইহজীবনের প্রতি গভীর ভালবাসায় মুহম্মদকে তিনি বুদ্ধদেব ও যীশুখৃস্টের চাইতে বড় বলে দেখেছেন এবং এই কারণেই তাঁর কাছে হজরত মুহম্মদ মানবের মুকুটস্বরূপ।

শান্তিধারায় ছটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে : 'শান্তিধারা', 'ইসলামের স্বরূপ', 'ইসলামের ধারা', 'রমজান', 'আজান' ও 'উপাসনা'। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে এখানে তিনি দার্শনিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় এতে আছে। এখানেও দেখি, সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনগঠনের প্রেরণারূপে তিনি দেখেছেন ইসলামকে — তার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীরতার অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। এই রচনাসমূহে ব্যক্তিগত বা ভাবাশ্রিত প্রবন্ধের ঢং তিনি এনেছেন।

নূরনবী কিশোরদের উপযোগী করে লেখা হজরতের জীবনচরিত। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসালাভের সৌভাগ্য এই বইটির হয়েছিল। *ধর্মের কাহিনীতে* ধর্মসঙ্গত অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের উপদেশমূলক দশটি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। লেখক স্বয়ং এই বইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

> এই পুস্তক সংসারে সার্বজনীন পাপস্রোতের বিরুদ্ধে ধর্মের এক স্বাভাবিক আর্তনাদ। মানুষকে সংসারে ধর্মের নামে ধর্মকে ফাঁকি দিয়া নিত্য নিয়ত অধর্ম করিতে দেখিয়া অন্তরে যে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাহারই প্রকাশ মাত্র। যাহা লিখিয়াছি তাহার কিছুই কল্পনা করিয়া লিখি নাই, সমস্তই আমার প্রত্যক্ষ সত্য ও সত্যের ছবি।

তিনি দেখিয়েছেন যে, কথিত বাক্যের সঙ্গে কৃতকর্মের এবং ধর্মের নির্দেশের সঙ্গে আচরণের বৈসাদৃশ্যে মানুষের জীবনযাত্রায় কত গ্লানি জমেছে।

সাহিত্যিক হিসেবে মোহম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় কৃতিত্ব ভাবাশ্রিত প্রবন্ধরচনায়। ভাষার লালিত্যে ও ওজস্বিতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতায় তাঁর রচনাশৈলী বিশিষ্ট। ভাবুকরূপে তাঁর বড় অবদান, কেবল ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে থেকে নয়, নিখিল মানবজাতির অংশরূপে নিজকে চিন্তা করতে শেখানো।

আট

এ পর্যন্ত আমরা যাঁদের রচনার কথা আলোচনা করেছি, তাঁরা সকলেই ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনাও তাঁরা করেছেন, তবে সে আলোচনা সাধারণত ধর্মকে সহজভাবে লোকসাধারণের কাছে উপস্থিত করবার প্রেরণাজাত। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্কে এঁরা যেতে চান নি; এমন কি, সাধারণভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা এঁদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এবারে আমরা যাঁদের কথা বলতে যাচ্ছি, তাঁরা প্রধানত ধর্মতত্ত্বের লেখক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মবিষয়ক বিতর্ক এঁদের রচনার প্রিয় বিষয়। এক কথায়, এঁরা

প্রধানত ধর্মপ্রচারক, আর আগে যাঁদের কথা বলেছি, তাঁরা প্রধানত লেখক। এই কারণে, পূর্ববর্তীরা সাহিত্যসেবী হিসেবে যে স্থান দাবি করতে পারেন, এঁরা তা পারেন নি।

অবশ্য এই শ্রেণীকরণ—যাকে বলে জল-অচল বিভাগ—তা নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখকদের কোন কোন বই প্রথম পর্যায়ভুক্ত হতে পারে বা প্রথম পর্বের কোন কোন গ্রন্থ এভাগেও এসে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আবদুর রহিমের *নামাজ-তত্ত্ব* বা *নামাজ-শিক্ষা*'র মতো বইয়ের কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, কিংবা ধর্মবিষয়ে তাঁর কোন মৌলিক চিন্তার প্রকাশও এতে ঘটে নি। কাজেই এসব বই সাধারণ পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করে না, নিছক ধর্মবিষয় বলেই তাঁদের চিহ্নিত করতে হয়। আবার শেখ জমিরুদ্দীনের *ইসলামী বক্তৃতা* হয়তো প্রথম পর্যায়েও স্থান পেতে পারত। তবে লেখকদের মূল প্রবণতা লক্ষ্য করে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনার মধ্যে আমরা একটি ভেদ-রেখা টানবার পক্ষপাতী।

নয়

বাংলা ভাষায় ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের (১৮৩৮-১৯০৮) ভূমিকা চিরস্মরণীয়।[৩৯] তিনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। স্থানীয় মধ্য-বাংলার স্কুল থেকে বাংলা ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম শিক্ষাগ্রহণ করে আলেম-উদ্-দহর উপাধিতে ভূষিত হয়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি করটিয়ার জমিদার খানপন্নী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত 'মাহমুদীয়া যন্ত্র' নামক প্রেসটির পরিচালক নিযুক্ত হন। এই প্রেস থেকেই তাঁর সম্পাদনায় মাসিক *আখবারে এসলামীয়া* প্রকাশিত হতে থাকে।[৪২]

নইমুদ্দীনের প্রধান কীর্তি কুরআন শরীফের বাংলা তরজমা। এই কাজে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনি পথিকৃৎ ১৮৯২ থেকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে নয় পারার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তাঁর মৃত্যুর পর দশম পারার অনুবাদ গ্রন্থাকারে বের হয়। এরপর তিনি আর অনুবাদ করে যান নি। সহজ ও সুন্দর ভাষায় এই অনুবাদ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর অনূদিত *আমপারা* (১৮৯৯) জনপ্রিয়তা লাভ করে। বুখারী শরীফের তরজমায়ও তিনি হাত দিয়েছিলেন, এর প্রথম খণ্ড প্রকাশলাভ করেছিল (১৮৯৮)।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে *জোব্দাতল মসায়েল* (প্রথম খণ্ড ১৮৭৩; দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯১) এবং *ফতওয়ায় আলমগিরী* (চার খণ্ড; চতুর্থ খণ্ড ১৮৯২) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্ম-সম্পর্কিত মূলতত্ত্ব বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সংকলন করে বালক ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তররূপে *জোব্দাতল মসায়েল* রচিত হয়। এই প্রণালী বঙ্কিমচন্দ্রের *ধর্মতত্ত্বে*'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *ফতওয়ায় আলমগিরী* উক্ত নামের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় সংকলনের বঙ্গানুবাদ। এ পর্যন্ত উল্লিখিত বইগুলো তিনি লেখেন বা অনুবাদ করেন জনৈক গোলাম সারওয়ারের সহযোগে।[৪১] *কালেমাতল্ কোফরে* (১৮৯২ খৃঃ বা তার আগে) মুসলমানের পক্ষে পরিহার্য কথাবার্তা বা মনোভাবের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এসব মনোভাব পোষণ করলে মুসলমান কাফেরে পরিণত হবে। *এনছাফ* (১৮৯২) ও *এছবাতে আখেরজ্জোহর* (১৮৯৭) মিশ্র ভাষারীতিতে

লেখা শাস্ত্রীয় বিতর্কমূলক গ্রন্থ। *রফায়েদেন* (১৮৯৬) ও *আদেল্লায় হানিফিয়া* (১৮৯৭) শাস্ত্র-সম্পর্কিত আর দুটি বই।

শাস্ত্রবিষয়ক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্কের বই বলে নইমুদ্দীনের গ্রন্থাদি ঠিক সাধারণ কৌতূহলের বিষয় নয়। মনে হয়, বিভিন্ন মজহবের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত বাদানুবাদকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং হানাফী মজহবভুক্ত ছিলেন এবং এই মজহবের বিশ্বাসমতো তিনি বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাকে বলে নৈয়ায়িক তর্ক, তাও প্রচুর আছে। এসব কারণে তাঁর রচনাবলীর আবেদন অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। তবে এসবের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের সঠিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন (১৯০৭ থেকে) চব্বিশ পরগণা জেলার অধিবাসী মোহাম্মদ আব্বাস আলী। আরবী মূলের সঙ্গে এতে শাহ্ রফিউদ্দীনের উর্দু-অনুবাদ সংযুক্ত হয়। আব্বাস আলী উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ করেন এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে টীকা সন্নিবেশ করেন। ময়মনসিংহের খোন্দকার আবুল ফজল আবদুল করিম *আমপারার*'র সটীক অনুবাদ করেন (১৯১৫)। এতে হজরত মুহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংকলিত হয়েছে। খান বাহাদুর তসলিমউদ্দিন আহমদের সম্পূর্ণ কুরআন অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। তবে এর অংশবিশেষ বের হয় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে। আবু মুহম্মদ আবদুল হক-কৃত তফসীরের উর্দু অনুবাদের বঙ্গানুবাদ করেন মধু মিয়া। মূল আরবী কুরআনের সঙ্গে এই ভাষ্য যুক্ত হয়ে *বঙ্গানুবাদিত তফসীর হাক্কানী* নামে প্রকাশ পায় (১৯০১)। আলাউদ্দিন আহ্মদও *তফসীরে হাক্কানী*'র বঙ্গানুবাদ করেন।

ইসলাম ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখা যেসব বই একালে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছুসংখ্যক বইয়ের উল্লেখ করছি :

একিনউদ্দিন আহমদ : *ইসলাম ধর্ম্মনীতি*।

খোন্দকার গোলাম আহ্মদ : *এসলামের প্রভাব ও ধর্ম্মনীতি* (১৯০৫)।

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী : *ঈদুল আজহা* (১৯০০) ও *মৌলুদ শরীফ* (১৯০৩)

ছমিরুদ্দীন আহমদ : *মোহাম্মদীয় ধর্ম্মসোপান* (পাচ খণ্ড ১৯০২)।

গোলাম মোহাম্মদ : *ইসলাম সারসংগ্রহ* (১৯১৩)।

গোলাম লতিফ : *ইসলাম-প্রভা* (১৯০৮)।

শরিয়তী ইসলামের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুফী সাধনসম্মত ধর্মমতের ব্যাখাদানের প্রচেষ্টাও চলেছিল। এ বিষয়ে রাজশাহীর মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ইমাম গাজ্জালীর ইয়াহিয়া-উল-উলমুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত ফারসী সংস্করণ *কিমিয়া-ই-সাদাৎ* গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ তিনি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* নামে (১৮৯৫-১৯১৫)। তাঁর রচিত *দুগ্ধ সরোবর* পুস্তিকায়ও সুফী চিন্তার ছাপ আছে। তিনি 'নূর-অল-ইমান সমাজ' নামে একটি বিদ্যোৎসাহিনী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার সম্পাদক ছিলেন তাঁর পুত্র মীর্জা নূরুল ইসলাম। এই সমাজের মুখপত্র *নূর অল-ইমান* রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হত। *সোলতান* পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাতে ইউসুফ আলীর প্রচেষ্টাও সক্রিয় ছিল।

যশোরের আবদুল করিম-রচিত *খোদাপ্রাপ্তিতত্ত্বে* সুফী সাধনতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন শাখার সুফীমতের আলোচনা আছে। হিন্দু দর্শনের সঙ্গে সুফী দর্শনচিন্তার তুলনামুলক সমালোচনা এতে স্থান পেয়েছে। লেখক স্বয়ং নক্‌শবন্দীয়া-পন্থী সুফী সাধক ছিলেন।[৮২] এই পর্যায়ের আর দুটি বই গোলাম রসুল খোনকারের *মাজেজাত* এবং দেওয়ান আবদুর রশীদ চিস্তির *জ্ঞানসিন্ধু বা গঞ্জে তওহিদ*।

দশ

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ও শেখ জমিরুদ্দীন লেখক হিসাবে অতটা স্মরণীয় নন, কিন্তু ইসলাম ধর্মপ্রচারকরূপে তাঁরা যে কীর্তি স্থাপন করেছেন, সেজন্যে তাঁদের নাম অমর হয়ে থাকবে।

যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে মেহেরুল্লাহ্‌র জন্ম হয় (১০ পৌষ ১২৬৮)। অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ ঘটে নি। *বোধোদয়* পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়ার প্রথম পর্ব তিনি সাঙ্গ করেন। তারপর কিছু বাংলা, আরবী ও ফারসী শেখেন, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন দর্জিগিরি। যশোর শহরে তাঁর দোকানের সামনে খৃস্টান পাদরীরা যখন বক্তৃতা করতেন এবং সেই উপলক্ষে ইসলাম ধর্মকে লাঞ্ছিত করতেন, তখন মেহেরুল্লাহ্‌র পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হয় নি। এক সময়ে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু পরে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর আক্রমণ পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করে পাদরীদের সঙ্গে বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্রথম তিনি পাদরীদের সভায় বাদপ্রতিবাদ করতেন, পরে হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। প্রচারক-জীবনের এই পর্যায়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন মোহাম্মদ কাসেম ও গোলাম রব্বানী। কিছুকাল পর ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরোপুরি প্রচারক-জীবন গ্রহণ করেন। এর পরেই মিশনারী জন জমিরুদ্দীনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন এবং জমিরুদ্দীন পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর অভিন্নসহচর ইসলাম-প্রচারক হয়ে ওঠেন।

প্রচারক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে মেহেরুল্লাহ্ কলকাতায় এসে *সুধাকর* -দলের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর থেকে *সুধাকরে* তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হাতে থাকে। কিছুকাল পর খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দর ও খান বাহাদুর নূর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজহিতৈষীর সহায়তার তিনি *নিখিল ভারত ইসলাম-প্রচার সমিতি গঠন* করেন দেশের বিভিন্ন অংশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্যে। এই কাজে তিনি ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের বিশেষ সহায়তা লাভ করেন।[৮৩]

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম বই *খ্রীস্টীয় ধর্মে অসারতা* (১৮৮৬) ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সূচনায় তিনি খৃস্টধর্ম-প্রচারকদের নিন্দা করেছেন—অপর ধর্মমতের প্রতি তাঁরা নিয়ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। কিন্তু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিতর্কে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ তিনি নিজেও দিয়েছেন। যীশুখৃস্টের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে অন্তত দুজন যে জারজ ছিলেন, অনেকে যে পরনারী-গমন করতেন,

পানাসক্ত ও প্রবঞ্চক ছিলেন, বাইবেল থেকে এই পরিচয় উদঘাটিত করে মেহেরুল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এই ধারাই পরবর্তী কালের খৃস্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যীশুর মধ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞানের ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ্য করেছেন, এমন কি, বাইবেলের স্রষ্টাও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। ত্রিতত্ত্ববাদের অসত্যতা ও বাইবেলের পরস্পরবিরোধিতা প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি করেছেন।

মেহেরুল এসলাম[৪] সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ—আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয় যে, ১৮৯০ খৃস্টাব্দে পরে এটি মুদ্রিত হয়। এটি গদ্যে-পদ্যে লেখা, মূল রচনা অধিকাংশ ছন্দোবদ্ধ, কিছু অংশে এবং পাদটীকায় গদ্যের ব্যবহার আছে। এতে তিনি একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং হিন্দু ও খৃস্টানদেরকে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন। বিশেষত: যীশুখৃস্টকে ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত করা তাঁর কাছে গর্হিত বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি যে উক্তি করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ :

> হিন্দুদিগের মধ্যে হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনা পূর্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।

বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি মুমীন মুসলমানের পক্ষে আবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান—নামাজ, রোজা প্রভৃতি-পালনের প্রয়োজনীতা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে মেহেরুল্লাহ্ প্রায়ই ব্যবহারিক জীবন থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র প্রতি মানুষের কর্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, তাঁদের প্রতি ক্ষোভ এতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছেন 'নাড়ার ফকির' (বাউল) ও 'গাইনেরা' (যাঁরা কবিগান করেন)। এঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়, তাহাদের জানাজা নামাজ পড়া উচিত নহে।…হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।

ধনীগৃহে সঙ্গীতের চর্চা ও মুসলমানের সুদগ্রহণের তীব্র নিন্দাও এতে ধ্বনিত হয়েছে।

এখানে দেখা যায় যে, মেহেরুল্লাহ্ ইসলামকে কেবল খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান নি, প্রচলিত ধর্মজীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সংস্কারান্দোলন তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল, এমন ধারণা করা স্বাভাবিক। সৈয়দ আহমদ-পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয় নি। অনুরূপভাবে, মেহেরুল্লাহ্ যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের বিকাশকে প্রশ্রয় দেন নি। ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা এর অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকে নৃত্যগীতের বিশুদ্ধ চর্চার

চাইতে তার আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চাই আমাদের দেশে বিস্তারলাভ করেছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, এই প্রভাব একটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ওয়াহাবীদের অননুমোদিত মিলাদ শরীফ সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এর কারণ, মেহেরুল্লাহ্ সৈয়দ আহ্মদের নয় কেরামত আলী জৌনপুরীর ভাবশিষ্য ছিলেন। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তাঁর কালগত ও পরিবেশগত পার্থক্যের জন্যে আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা প্রবলতর। ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর মূলগত ঐক্যসন্ধানের মধ্যে এই প্রবণতার পরিচয় পাই। তাঁর চিন্তার আরেকটি প্রকাশ আছে তাঁর বক্তৃতায় আলোচিত বিষয়ের তালিকায়। আসিরউদ্দিন তাঁর একটি সভার বর্ণনায় বলেছেন :

> সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রের উপর লোক সমবেত হইয়াছিল।...তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতীলক মুন্সী ছাহেব মগরেবের নামাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইা সমাজপতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতেব গৌরব, জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মোক্তব মাদ্রাসা স্কুলস্থাপন, শিল্পশিক্ষা, ধর্ম্মগত প্রাণগঠন, ব্যায়ামচর্চা, সভাসমিতির উপকারিতা, বয়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।[৮৫]

ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভাববার মধ্যে তাঁর যে ধরনের সজাগ অনুভূতির পরিচয় পাই,তা মূল্যবান।

প্রধানতঃ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করেই *বিধবাগঞ্জনা*[৮৬] লেখা হয়। মুসলমান সমাজেও এর অপ্রচলনের নিন্দা তিনি করেছেন। এটিও গদ্য-পদ্য রচনা, প্রথম ও শেষভাগ ছন্দোবদ্ধ, মধ্যে গদ্যেব ব্যবহার আছে। প্রথমাংশে বিধবা তরঙ্গিণীর সঙ্গে বিধবা সরলার কথোপকথন। নানাছন্দে বিলাপ করতে করতে তরঙ্গিণী বলেছেন ঃ

পরপতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে   বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন   হইবে নিশ্চয়।

ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের উপরেও বিধবাদের আশা ভরসার উল্লেখ আছে।

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল!
ধরে সব বীরবেশ   কত উদ্ধারিলে দেশ
হায়! বিধবা-উদ্ধার তরে হলে দুর্বল?

বলা বাহুল্য, এই আক্ষেপোক্তি রচনার পূর্বেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই আস্থাপ্রকাশে বা মহারানীর প্রতি

বিধবাদের আবেদন অথবা লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রশস্তিতে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। এই মনোভাব তাঁর অগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংস্কার-কর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের রক্ষণশীল চিত্তকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। *বিধবাগঞ্জনায়* কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ধর্মীয় জীবনের উপর খৃস্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয় নি, বরঞ্চ অভিনন্দিত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন এতে আছে। এ থেকে আমরা বুঝি যে, এখানে তাঁর ধর্মবোধ এমন একটা যথার্থ্য ও উদারতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানসিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আত্যন্তিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

বিধবাগঞ্জনা-রচনার মূলে হালীর *মুনাজাত-ই-বোওয়ার* প্রেরণা আছে বলে মনে করি। তবে বইটিতে মেহেরুল্লাহ্ সুরুচির পরিচয় দেন নি। বিধবাদের এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের দুরবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে ভারতচন্দ্রীয় 'নারীগণের পতিনিন্দা'র ধরনে তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, অতটা শালীন হবার চেষ্টা করেন নি। এই কারণে এই বইটি প্রচার সরকার বন্ধ করে দেন।

অশ্লীল ও ধর্মবিদ্বেষমূলক বলে তাঁর *হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা* বইটিও নিষিদ্ধ হয়। এর সপ্তম সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম পাই আবুল মনসুর, এম. এম. ইউ। মেহেরুল্লাহ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মনসুর আহমদ—তিনিই এই বইয়ের প্রকাশক। এই দিক দিয়ে দেখলে মূল লেখকের পরিচয় ছদ্মনাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ইংরেজী বর্ণগুলোও তাঁরই নামের আদ্যক্ষর। বঙ্কিমচন্দ্র (*মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ ও কবিতাপুস্তক) ঈশ্বর গুপ্ত (*কবিতাসংগ্রহ), দামোদার মুখোপাধ্যায় *(প্রতাপসিংহ)*, যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় *(বঙ্গানুবাদিত রাজস্থান) ও দীনবন্ধু মিত্র* (জামাই বারিক) *প্রমুখ লেখকের রচনায় 'সম্পূর্ণ অলীক অসার ও মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে মুসলমান বিদ্বেষিতার যে সকল চূড়ান্ত পরিচয়' আছে, তার প্রতিবাদে এই বই তিনি লিখতে বসেন। মহাভারত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি হিন্দু দেবদেবীদের যৌন সম্পর্কের আলোচনা করেছেন; তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, চন্দ্র, সূর্য ও ধর্ম এবং কুন্তী, গঙ্গা ও তুলসীর মতো দেবদেবী যে সমাজে শ্রদ্ধেয়, সেই সমাজের নরনারীর নীতিজ্ঞান শিথিল হতে বাধ্য। পরিণামে তা সমস্ত সমাজদেহকেই বিষাক্ত করে তুলবে।

পান্দনামা (দ্বি-স ১৯০৮) শেখ সাদীর সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ। এতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরে মূল কাব্যের সঙ্গে তার পদ্যানুবাদ আছে। *শ্লোকমালা* (১৯১০) একেশ্বরবাদ সম্পর্কে সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ।

মেহেরুল্লাহ্ আরও দুইটি বই লিখেছিলেন : *খৃস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ* খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারণার জবাবে লেখা; দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ একই বিষয়ের *রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এসলাম* তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

মেহেরুল্লাহ্র রচনাবলীর মূল উদ্দেশ্যে ধর্মবিষয়ক তর্কে ইসলামের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তাঁর সমগ্র জীবনও এই কাজে ব্যয়িত হয়। প্রচারক-জীবনে তিনি হাজার হাজার লোককে ইসলামে দীক্ষা দিয়েছেন বা ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরূপে তাঁদের জীবনযাপনে প্রেরণা দিয়েছেন। ১৩০৫ সালে নোয়াখালিতে তিনি যান ধর্মসভা করতে—এই উপলক্ষে সেখানে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় জনৈক আবদুর রহিমের *আখলাকে আহাম্মদীয়া* কাব্যে :

মুনশী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম ॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতে হাদী জানো দীনের হাতিয়ার ॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া ॥
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া ॥
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার ॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তেব শত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার॥
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে ॥[৪৭]

এই উক্তির সত্যতা আছে। যে-সময় খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের তীব্র সমালোচনায় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকসাধারণ ধর্মান্তরের দিকে ঝুঁকেছিল, মেহেরুল্লাহ্ তাঁর স্বল্প বিদ্যা, অমিত উদ্যম ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারীদের সম্মুখীন হয়ে বাঙালী মুসলমানদেরকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

কেরামত আলী জৌনপুরীর সঙ্গে তার ভাবধারার ঐক্যের কথা বলেছি। মেহেরুল্লাহ্‌র রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। যশোরের মনোহরপুরে মেহেরুল্লাহ্ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে কেরামত আলীর স্মৃতিতে এর নামকরণ করেন *মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া।*

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনে ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের প্রভাব কার্যকরী ছিল। পীর আবুবকরের মতো মেহেরুল্লাহ্ও স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন :

একখানি ভগ্ন ও একখানি সবল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর, সেইরূপ শিক্ষায়-দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হইতে না পারিবে, ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরণ করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বিড়ম্বনা।[৪৮]

এগারো

শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন বইটিতে শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁর অন্যান্য বইতেও অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত সমাচার আছে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব গ্রামে। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতসহ নর্মাল শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণ করেন। ইতিমধ্যে মিশনারীদের প্রভাবে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি.এম.এস. হাই স্কুল, এলাহাবাদের সেন্ট পল্স ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি.এম. এস. হাইস্কুল, এলাহাবাদ সেন্ট পল্স ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি.এম. এস. ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খৃস্ট ধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে তিনি মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে H. G. R. ডিগ্রী লাভ করেন।

এরপর জন জমিরুদ্দীনকে দেখতে পাই খৃস্টধর্ম-প্রচারক-রূপে। ১৮৯২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে *খ্রীস্টীয় বান্ধব পত্রিকায়* 'আসল কোরান কোথায়?' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বর্তমানে যা কুরআন শরীফ বলে প্রচলিত আছে, তা মূল কুরআন নয়। এই প্রবন্ধের উত্তরে মেহেরুল্লাহ্ *সুধাকর* পত্রিকায় 'ঈসায়ী বা খৃস্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে (২০ ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) জন জমিরুদ্দিনের মতামতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে *সুধাকরে* জমিরুদ্দীন একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন. একই পত্রিকায় মেহেরুল্লাহ্ তার জবাব দেন 'আসল কোরান সর্বত্র' নামে। এরপর জমিরুদ্দীন আর প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করেন নি। বরঞ্চ, অনতিবিলম্বে তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মেহেরুল্লাহ্র একনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে ওঠেন।

প্রচারক-জীবনের কর্তব্যরূপেই জমিরুদ্দীন অনেকগুলো বইপত্র লিখেছিলেন। প্রচলিত মতে, তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক : তবে কেউ এ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা তৈরী করে এই কিংবদন্তীর সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন নি।

ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মবলম্বিদিগের মন্তব্য (১৯০০) ইসলাম সম্পর্কে ম্যাক্স মূলর, কার্লাইল, আচার্য কেশব সেন, পণ্ডিত ধর্মানন্দ মহাভারতী প্রভৃতি দশ জন পণ্ডিতের অনুকূল মতের সংকলন। মীর মোশাররফ হোসেনের *মৌলুদ শরীফ* পাঠ করে জমিরুদ্দীনের মনে *আসল বাঙ্গালা গজল* সংকলনের প্রেরণা জাগে (১৯০৮)। এতে সংকলিত গজলের মধ্যে বারোটি তাঁর রচনা এবং দুটি মেহেরুল্লাহর। মীর মোশাররফ হোসেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('জীবন-সঙ্গীত) ও কৃষ্ণচন্দ্র মুজমদারসহ কয়েকজন কবির একটি করে কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

ত্রিপুরা জেলার পাদ্রী জন টেকেল-বিরচিত *শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুনশীর ভুল* পুস্তিকার প্রতিবাদে পীর আবুবকরের আদেশে জমিরুদ্দীন লেখেন *শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন* (১৯১৩)। এতে দেখা যায় যে, তিনি *মাজেজায়* আস্থাস্থাপন করেছেন এবং হজরতের অঙ্গুলিসংকেতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এই প্রচলিত মত গ্রহণ করেছেন।

কুরআনের সত্যতা ও বাইবেলের অসত্যতা প্রমাণ করতেও তিনি চেষ্টিত হন। এই বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহ্মদের সঙ্গে জমিরুদ্দীনের মতানৈক্যের আভাস বইটিতে আছে।

পাদ্রীদের প্রচারণার জবাবে তিনি অনেকগুলো প্রচার-পুস্তিকা প্রণনয় করেন, যেগুলোর সাধারণ নাম 'রদ্দে খৃস্টান'। এগুলোর অধিকাংশই ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে রচিত ও প্রচারিত হয়। এই পর্যায়ের প্রথম বই *ইসলামী বক্তৃতা* (১৯০৭) *Christianity and Islam* নামক ইংরেজী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। দ্বিতীয় বই *ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য* (১৯২৫) ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত রাউস (*খ্রীস্টীয় বান্ধব পত্রিকা*-সম্পাদক)-রচিত হজরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত প্রবন্ধের তরজমা। তৃতীয় পুস্তিকা *রদ্দে সত্যধর্ম-নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টান* (১৯২৫)। নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের পাদরীদের প্রচারিত *সত্যধর্ম-নিরূপণ* (১৮৯৯) বইতে হজরত মুহম্মদকে (দঃ) মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরিনির্যাতিক বলে চিত্রিত করে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। লেখকের ভাষায়, 'কোরানের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে, কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম'। *সত্যধর্ম-নিরূপণ* থেকে 'মোহাম্মদী ধর্ম্মের পরীক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি জমিরুদ্দীনের বইতে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং টীকা সংযোজন করে তিনি এর উত্তর দেন। জমিরুদ্দীনের উত্তর-দানের পর *সত্যধর্ম্ম-নিরূপণ* নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং বাংলা সরকারকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হয়। চতুর্থ পুস্তিকা *হজরত ইসা কে?* আকবর মসীহ্-রচিত উর্দু গ্রন্থ *উলুহতে মসীহ* অবলম্বনে লিখিত ও মুনসী মেহেরুল্লাহ্ কর্তৃক সংশোধিত। এতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যীশুখৃস্ট ঈশ্বর নন, ঈশ্বর পুত্র নন, বান্দা মাত্র।

> ইসাই বা খ্রীস্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, হজরত ইসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর, স্বয়ং জগৎ পিতা ঈশ্বর।...ইঞ্জিলে জলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, আদম ঈশ্বরের পুত্র, দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ। এখন কি আমরা বলিব যে আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত কি? সত্য যদি প্রেরিতগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়, কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারেন না। [২১-২২]

সাত নম্বর পুস্তিকা *পাদ্রি মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন* (১৯২৭)। হজরত মুহম্মদকে আক্রমণ কর মনরো হজরত মোহাম্মদের বেগোনা থাকা বিষয়ে *মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা* নামে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, জমিরুদ্দীন তার উত্তর দেন এই রচনায়। মনরোর বক্তব্য ছিল এই যে, নবী পিস্পাপ ছিলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্যে জমিরুদ্দীন দেখালেন যে, সেখানেও যীশুর অপরাধ-স্বীকৃতি ও ক্ষমাভিক্ষা আছে। হজরত মুহম্মদকে নিস্পাপ প্রতিপন্ন করে তিনি আরেকটি বই লেখেন, যার নাম *মাসুম হজরত মোহাম্মদ*। মোহাম্মদ আকরম খাঁর *যীশু কি নিস্পাপ?* (১৯১৫) এই জাতীয় আরেকটি তর্কের বই।

মেহেরুল্লাহ্র মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে জমিরুদ্দীন *মেহের-চরিত* (১৯০৮) প্রকাশ করেন। মেহেরুল্লাহ্র জীবনকাহিনী-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উভয়ের মিলিত প্রচার আন্দোলনের বিবরণ এতে আছে। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়ে এটি মূল্যবান।

কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন,

সেগুলো *শোকানল* নামে সংগৃহীত হয়। সরল ভাষায় আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা থাকলেও এগুলো কবিতা হয়ে ওঠেনি। দুটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। প্রথম পত্নীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন :

অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।...
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন,
তব সনে হয় মোর বিবাহ-বন্ধন,
সেই প্রেম-সম্মিলনে,
এক সঙ্গে দুই জনে
সুখ দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল।...
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার,
স্ত্রৈণ বলি পাছে হই ঘৃণিত সবার।

দ্বিতীয়া পত্নীর পিতাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

কেমনে ভুলিব পিতঃ! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
পক্কদাড়ী সুবদন,
সুসুন্দর ও গঠন,
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?

তাঁর আরেকটি বই *বিশুদ্ধ খতনামা* আদর্শ পত্ররচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। পত্রলেখকদের প্রতি উপদেশদান-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মোসলমানের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্রবিরুদ্ধ'। বইটি থেকে কয়েকটি আদর্শ পাঠ তুলে দিচ্ছি। পিতাকে লিখিত পত্রের শিরোনাম :

বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জেম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।

স্ত্রীকে লিখিত পত্রের শিরোনামা :

বেয়াপ্তনিহিতালা সানহু বানজাদে বানুয়ে
দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে
নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহ্‌তালা
বিবী নছিরুন্নেসা খাতুনে জান্নাত।

এর পরে সন্নিবিষ্ট স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পত্রটিও শিরোনামার মতোই কৌতুকাবহ।

ইসলাম গ্রহণ, জওয়াবোন্নাছারা, উপদেশ ভাণ্ডার, দুই শত উপদেশ, খোসগল্প প্রভৃতি জমিরুদ্দীনের অন্যান্য রচনা।

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থাদির যা কিছু মুল্য— -মেহেরুল্লাহ্‌র রচনাবলীর মতো—তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা স্মরণীয়। রচনার যে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে উঠে, তা তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। তা এঁদেব অভিপ্রেতও ছিল না। খৃস্টান ধর্মপ্রচারের প্লাবনে ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙন এসেছিল, এঁরা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে এঁরা গৌরবান্বিত হয়েছেন।

বারো

সিরাজগঞ্জ-নিবাসী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা [হোসেন] 'ছানী [দ্বিতীয়] মেহেরুল্লাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। যশোরেব মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র অনুকরণে তিনি নিজেকে ইসলাম-প্রচারক বলে অভিহিত করতেন। তাঁর একটি পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে তাঁর নিম্নলিখিত রচনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় :

১. ইসলামিক বক্তৃতামালা।
২. বাল্য বিবাহের বিষময় ফল।
৩. এসলাহুল কওম বা সমাজ-সংস্কার।
৪. মানবজীবনের কর্ত্তব্য।
৫. মহা বাক্যাবলী ('বিবিধ নীতিবাক্যপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ')।
৬. বাঙ্গালা কোরান শরিফ, ১ খণ্ড।
৭. শ্লোকমালা ('বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি হইতে এসলামের সত্যতা প্রমাণ')।
৮. উপদেশমালা।
৯. হক নছিহত।

এগুলো সবই ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা।

বাল্যবিবাহের বিষময় ফল (১৯০৯) পুস্তিকায় তিনি বলেছেন :

> মুসলমান সমাজে সুসংস্কার অপসৃত হইয়া কুসংস্কারাদি এতই অধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহা বর্ণনাতীত।...সমুদয় কুসংস্কারের মধ্যে সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান মারাত্মক ও অবনতির দ্বারস্বরূপ বাল্যবিবাহ।...পুত্র অন্তত কুড়ি ও কন্যা অন্তত চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে তাহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

বাল্যবিবাহ যে সংগত নয়, এটা বোঝার জন্যে তিনি হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজার বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

উপদেশমালায় (১৯০৯) সংসার-জীবন ও ধর্মপথে চলার জন্যে এক শ' নীতি-উপদেশ আছে। এর মধ্য একটি কৌতুকাবহ :

> মুসলমানের উচিত যে, মুসলমানী সংবাদপত্র মিহির ও সুধাকর, ইসলাম-প্রচারক,

মুসলমানী ইংরেজী পত্রিকা, বাসনা ইত্যাদি সংবাদপত্র, মহম্মদীয় পঞ্জিকা ও এইরূপ যে সকল পঞ্জিকায় নামাজ, রোজা-মসলা ইত্যাদি শিখিবার বিষয় আছে, ঐরূপ পুস্তক ও পত্রিকা প্রত্যেক মুসলমানদের ঘরে ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

বইয়ের শেষে মুসলমানদেরকে জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বারো চরণ পয়ার যুক্ত হয়েছে এতে তিনি বলেছেন :

জাগরে মস্‌লেমগণ জাগ একবার।
দুনিয়ার মোহ-নিদ্রা কর পরিহার ॥

দুনিয়ার মোহ কাটিয়ে কবি তাঁদেরকে যেখানে নিয়ে যেতে চান, চিরনিদ্রা ছাড়াও সেখানকার পথ আছে, বোধহয় এর এমন একটা অর্থ করা যেতে পারে। তবে কবির অভিপ্রেত অর্থের সঙ্গে তার সংগতি নাও থাকতে পারে।

তেরো

এ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজহিতৈষীদের মধ্যে মেহেরুল্লাহ্ নামের কিছু আধিক্য দেখা যায়। যশোরের খ্যাতনামা প্রচারক মুনশী মেহেরুল্লাহ্ এবং সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ্ ছাড়াও খুলনায় তৃতীয় মেহেরুল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সন্ধান পাচ্ছি। তাঁর একমাত্র জ্ঞাত রচনা *ইসলাম কৌমুদী* (১৯১৪) ইতঃপূর্বে অন্য কোন আলোচকের চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

বইটিতে ওয়াহাবী চিন্তাধারার কিছু ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অসংলগ্ন এবং আজগুবী কথাও বেশ কিছু আছে। প্রথমে সেগুলোর উল্লেখ করি। লেখক বলতে চেয়েছেন যে, হজরত নূহকেই ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা মনু আখ্যা দিয়েছেন এবং বেদ হজরতে মুসা-প্রচারিত তৌবাত গ্রন্থের রূপান্তর মাত্র। আদিযুগের কবি দেমক ও বাল্মীকি সম্ভবতঃ অভিন্ন এবং আকবর বাদশাহ্ যে নতুন ধর্মের সূত্রপাত করেন, কালক্রমে তারই পরিচয় হয় ব্রাহ্মধর্মরূপে। পৌত্তলিকদের সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধা গোপন করার কোন চেষ্টা লেখক করেন নি। তাঁর মতে, 'পৌত্তলিকগণ পক্ষী অপেক্ষাও অজ্ঞান'। বেদের সমালোচনা করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের তুলনায় ইসলাম শ্রেষ্ঠ। ধর্মজগতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনার পর তিনি ইসলামের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং আচরণীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ ব্যাখ্যা করেছেন।

এরপর আধুনিককালে ইসলামের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে তিনি অনেকখানি আবেগহীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

আধুনিক ইসলাম জগতে অধিকাংশ মুসলমানগণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মোহাম্মদভক্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে একেশ্বরবাদ ধর্মক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে।...হিন্দুরা রামভক্ত, খৃস্টানেরা যিশুভক্ত, আমরাও মহম্মদভক্ত।... আমাদের দেশে যে মৌলুদ পাঠ হয়, তাহাতে সুফল উৎপন্ন না হইয়া কুফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা পাঠ করেন *মৌলুদের ভূমিকা ও হজরতের জন্মবৃত্তান্ত*। ভূমিকায় লেখা আছে মৌলুদ শ্রবণ করিলে

> এ পুণ্য সে পুণ্য। জন্মবৃত্তান্তে লেখা ঈশ্বর মোহাম্মদকে নিজের নূর হইতে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাকে সৃষ্টি না করিলে ঈশ্বর জগতে আর কাহাকেও সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মোহাম্মদকে এত অলৌকিকতা দিয়া সৃজন করিলেন ইত্যাদি। তাহাতে সাধকের কি কোন উপকার হয়?···
>
> ···আমাদের মুসলমান সমাজ যে ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে ও আমরা ক্রমে ধর্মহারা, জ্ঞানহারা অর্থাৎ সবিহারা হইয়া পড়িতেছি, তাহার আর একটা গূঢ় কারণ এই যে, আমাদের সমাজের স্ত্রীজাতিরূপে অন্তরঙ্গকে দীর্ঘকাল আমরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি···। [২৯৫-৯৬]

স্বামী ও মুরুব্বীর প্রতি মেয়েদের অশ্রদ্ধা, তাদের ব্যবহারের অশিষ্টতা, ঘরবাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্দাহীনতা, বিবাহসভায় যুবতীদের অশ্লীল আলাপ এবং পীরের মানসিক করার প্রথা ইত্যাদি এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন। তারপর বলছেন :

> এই শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীকুল আরও গোপনে ও প্রকাশ্যে যে কত সেরেক বেদাত কার্য করিয়া ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করিতেছে তাহা আর তোমাদিগকে দেখাইয়া লজ্জিত করিব না।···স্ত্রীশিক্ষার অভাব ভিন্ন ইসলাম সমাজে আরও কয়েকটি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহের স্বাধীনতা লোপ। [৩০-১-৩]

পরিশেষে তিনি সমাজ-সংস্কারের উপদেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে কতকগুলো উপদেশ উদ্ধৃত করা হল :

১. জাতিভেদ একেবারে সমাজ হইতে তুলিয়া দিতে হইবে।···

২. সমাজের যে কোন বালক-বালিকাকে ৭ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাধ্য করিতে হইবে।

৩. সমাজকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।···

৪. পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অন্যান্য ভাষা শিক্ষার্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবে।

৫. কতকগুলি রমণীকে পবিত্র অবরোধপ্রথার মর্যাদা রক্ষা করিয়া বক্তৃতাকারিণী, লেখিকা, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীসমাজের অভাব পূরণ করিতে হইবে।

৬. স্ত্রীলোকদিগকে বোরখা মুখে দিয়া কিঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে।···

৭. বালিকাদিগকে গার্হস্থ্য বিদ্যা অর্থাৎ মোটামুটি গৃহচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

৮. স্ত্রীলোকদিগের উলঙ্গ ও বাঙ্গালী পোষাক একেবারে তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে আরবীয় অথবা তুর্কি পোষাকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. বাল্যবিবাহ সমাজ হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া বালক বালিকাদিগকে ১৪/১৫ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ দিতে হইবে।···

১২. শিল্পবিদ্যা শিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয় আলোচনার জন্য স্থানে স্থানে পর্দার মর্যাদা রক্ষা করিয়া মহিলা সম্মিলনীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।···

১৫. ···বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনের সময় যুবক-যুবতীর কথঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৯ সংবাদপত্রের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক গৃহস্থকে একখণ্ড জাতীয় সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে।...

৩১ বিবাহে অতিরিক্ত অর্থব্যয় না করা উচিৎ, কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বিবাহের জন্য অতিরিক্ত পণ গহনা দিয়া বিবাহ করিয়া শেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আর বিবাহের *মোহর* অতিরিক্ত হওয়া উচিত নহে, এই অতিরিক্ত মোহের [মোহরের] দানে অনেকের ভূ-সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। [৩০৫-৩১০]

বোঝা যায়, সমাজের অনেক ত্রুটি সত্যিই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, সেগুলো সংশোধনের ইচ্ছাও তাঁর আন্তরিক। এই সংশোধনের অনেকগুলো উপায় তাঁর যথার্থ। তবু মেয়েদের পোশাক ও পর্দা সম্পর্কে যথেষ্ট সংস্কার তাঁর মনে রয়ে গেছে। তার কারণ এই যে, আরো অনেকের মতো নতুন সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য ছিল না, পুরাতনের জীবনই কাম্য ছিল।

চৌদ্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে মুসলমানের আত্মসচেতনতা জাগবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে খৃস্টান মিশনারী এবং রক্ষণশীল হিন্দুর সঙ্গে তাকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হিন্দুর সঙ্গে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ক্ষমতাসীন ইংরেজের কৃপাপ্রার্থনা করতে হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং ইংরেজের সঙ্গে সাধারণভাবে আপোষরফার চেষ্টা চলেছে। এই অবস্থায় আত্মবিশ্বাসহীন মুসলমানের মনোবৃত্তি যা হতে পারে তারই সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায় সেখ আবদুস সোবহানের *হিন্দু মোসলমান* (১৮৮৮) বইটিতে।

গ্রন্থকার বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি, বাংলা ভাষাকেও—তাঁর মুসলমানিত্বের গৌরবে—আপন বলে মনে করেন নি :

আমি জাতিতে মোসলমান,—বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে,—বিশেষতঃ জীবনেও কখন ৫ মিনিট কাল স্কুল পাঠশালার বেঞ্চে বসি নাই... ! [৯]

এই ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে বাস্তব সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আবদুস সোবহানও তা পারেন নি, ভাসাভাসাভাবে তিনি সমস্যার আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে তাঁর কল্পনাবিহীন দাস মনোভাবের পরিচয় আছে। প্রথমে, 'মুসলমান জমিদার হিন্দু আমলা' শীর্ষক অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, হিন্দু আমলারা কিভাবে মুসলমান জমিদারের সর্বনাশ করে থাকে। 'জাতীয় সম্মিলন—ভারত উদ্ধার' এ তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার সারমর্ম এই সরকারী চাকরীতে মুসলমানের স্থান নেই—তাদের চাকরী পাওয়া দরকার। এমনিতেও হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সুতরাং মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদানে বিরত থাকা উচিত, নইলে ইংরেজ মুসলমানের উপরে অসন্তুষ্ট হবে। 'নব্য শিক্ষিত—ভারত উদ্ধার' প্রসঙ্গে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, হিন্দু মুসলমানে মিল হবে কি করে? হিন্দুর গল্প-উপন্যাসে এবং সামাজিক ব্যবহারে মুসলিম-বিদ্বেষ দেখা যায়। ইংরেজ আমাদের রাজা, আমরা তার প্রজা : ইংরেজ-রাজত্বে অত্যাচার যা হচ্ছে, সব

হিন্দুর মাধ্যমেই হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানে মিল নেই, হবে না এবং হবার দরকার নেই। বরঞ্চ দরকার রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। অতঃপর 'মাত: ভিক্টোরিয়া'র প্রতি প্রার্থনা জানিয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

সেখ আবদুস সোবহান ছিলেন স্বল্পায়ু *ইসলাম সুহৃদ* পত্রিকার সম্পাদক। *আর্য্যধর্ম্ম* নামে তাঁর আরেকটি বই দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৪)। এ বইতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, ইহুদী, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের আলোচনা করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামই যথার্থ আর্যধর্ম। এর সমালোচনায় *নবনূর* বলেন :

> ...একমাত্র ধীরতা ও সংযমের অভাবে তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও স্বীয় উদ্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ...যখন যুক্তিতর্ক তাহার [ইসলামের] *আর্য্যধর্ম্মত্ব* প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি, যুক্তিতর্কেই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতে না পারিলে চলিবে কেন?[৪৯]

পনেরো

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তীব্র হয়ে উঠে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে, যার জের চলে আরো পরবর্তী কাল পর্যন্ত। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে গোলাম হোসেনের (১৮৭৩-১৯৬৪) *বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান* প্রকাশিত হয় (১৯১০)। বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলাদেশের এই সামাজিক সমস্যার আলোচনার মুখবন্ধস্বরূপ ইংরেজী Preface-এর স্থান বাস্তবিকই বিস্ময়কর, বিশেষ করে, ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকারও যখন অপরিণত। অপটু ইংরেজীতে তিনি মাতৃভাষায় নিজের দক্ষতার অভাবের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> He [লেখক] belongs to the Mohamedan community of Bengal. The majority of this community, we can say, if we are no guilty of an exaggeration, ninety nine percent of its members or above never care much to cultivate the Bengali language
> Though it is true it is their mother tongue and they learn to lisp in that language while in their cardles...
> They look upon it something as Greek or Latin, so far as any production in the language is concerned..
> The case is, no doubt, very deplorable. [v-vi]

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের যে মনোভাবের সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোলাম হোসেন যে বাংলা ভাষায় গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন, তা আনন্দের কথা বলতে হবে।

বইয়ের প্রথমেই তিনি ইংরেজের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন :

> আমরা ইংরেজের কোন নিন্দাবাদ করিতে চাহি না। ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নন। তবে তাঁহারা যে কেহ কেহ আমাদের জাতীয় কুৎসায় ঢাকী হইয়া তা তিলে তাল করিয়া জগতে রটনা করিয়াছেন, ইহা আক্ষেপের বিষয়।... [১৭]

...ইংরেজের রাজত্বে আমরা বেশ সুখে আছি। অসুখী কিসে ·· এমন সুখ এমন শান্তি কি ভারতে কখনও ছিল? [২১০]

কিন্তু তাহলেও পরাধীনতার বেদনা তাঁকে ক্লিষ্ট করেছে তিনি বলেছেন :

হয়ত সহস্র বর্ষের মধ্যে এমন হতে পারে, ভারতের সাম্রাজ্য ইংরেজ জাতির হস্তস্খলিত, অধিকার-বিচ্যুত। পরমেশ্বর না করেন, তেমন হয়। আমরা তাঁহাদের স্থায়িত্বই কায়মনঃপ্রাণে কামনা করি।

আমরা ইংরেজ-রাজ্যে কি অসুখী আছি যে, তাহার লোপ কামনা করিব? যদি কোন অসুখ, অসুবিধাই আমরা ভোগ করি, সে অধীনতারই ফল। অধীনতা, যে জাতিরই হউক,—সে স্বজাতিরই কি, বিজাতিরই বা কি, স্বধর্মীর কি, বিধর্মীরই বা কি,—অধীনতা চিরকালই অধীনতা। তাহাতে স্বাধীনতার সুখ, স্বেচ্ছাচারিতার আনন্দ আশা করা বিড়ম্বনা। [২১৯]

এই প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কে কথা এবং এই দুই সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা তিনি উত্থাপন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হিন্দুগণ শিক্ষাবলে দেশের বিষয় ভাবিতে, চিন্তা করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। মুসলমানের মধ্যে সেরূপ লোকের নিতান্ত অভাব। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আত্ম-চিন্তাপরায়ণ, কিন্তু পরের ভাবনা ভাবিতে মোহপ্রাপ্ত হন।... [২১২]

যাহা হউক, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপকার আছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। আজি প্রায় চারি বৎসর হইল, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে।... [২১৪]

স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি দেখেছেন পরাধীন জাতির নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য গঠনের উদ্যোগরূপে। ইংরেজকে যদি কোনদিন এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়, তখন ভারতবর্ষের নিজস্ব বলে কিছু থাকা চাই।

এই কারণে নানাদিক চিন্তা করিয়া হিন্দু বিজ্ঞ, দূরদর্শী, শিক্ষিত ও দেশীয় নেতাগণ, ভারতের ভাবী মঙ্গলের জন্য এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মুসলমান জাতি একবার জেদ করিয়া ইংরেজদের ভাষা শিখিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া যতদূর শিক্ষাক্ষেত্রে অধোগতি প্রাপ্ত হইবার হইয়াছেন। এবার যদি তাঁহারা এক্ষেত্রেও (স্বদেশী আন্দোলন) সেইরূপ পিছাইয়া পড়েন, তবে কিছুতেই তাহার উন্নতির আশা কোনোকালেই নাই। [২২০-২২১]

এরপর তাঁর হয়তো মনে পড়েছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা শাসকশ্রেণীর পক্ষে রুচিকর নাও হতে পারে, সুতরাং ইংরেজীতে যোগ করেছেন যে ঃ

We must not here hesitate to say that the so-called *'Swadeshi Movement'* has been carried on wrong line. Surely it might be safe, if had no connection with the Partition of Bengal. [230]

বোঝা যায়, লোকহিতৈষণার এবং শাসকদের প্রতি আস্থা বা তাঁদের সম্পর্কে ভীতি, এই দুই মনোভাবের মধ্যে লেখকের সংঘাত বেধেছে। এবং তিনি দু'কূল বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেছেন।

তবু হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ আন্তরিক। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি সজাগ :

> কিন্তু প্রজাদের সেই অভাব, অভিযোগ, অনুযোগ, হিন্দু মুসলমানে একযোগে যতদিন না করিবেন, ততদিন তাহাতে তাঁহরা কান দিতে বাধ্য নন। শাসিতদের এক পক্ষ যদি অসন্তোষের চীৎকারে আকাশ তুমুল করেন, তাহা হইলেও কোন ফল হইবে না। [২২৫]

এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামাজিক কল্যাণবোধ আছে বলেই গোলাম হোসেনের *বঙ্গ দেশীয় হিন্দু-মুসলমান* আজকের পাঠকের কিছু শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে।

গোলাম হোসেনের অপর রচনা *দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ* সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-কাহিনী।

ষোল

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কিছুটা তিক্ততা যে সৃষ্ট হয়েছিল, সে কথা অনস্বীকার্য। এই তিক্ততার ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তি আছে 'এম.এ.আর' ছদ্মনামধারী-রচিত *বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন-রহস্য* নামক পুস্তিকায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকার নবাবকে হিন্দু সম্প্রাদায়ভুক্ত কোন দুর্বৃত্ত শারীরিক আক্রমণের চেষ্টা করে। সেই ঘটনার উল্লেখ করে পুস্তিকার আরম্ভ হয়েছে।

নবাব সাহেব নহে বঙ্গস্বামী
তবে কেন দোষী করিছ তাঁহারে।
তোমাদের মাতা বঙ্গ-লক্ষ্মী-পতি
ইংরাজ রাজাকে বল জেদ্ করে॥ [৫]

আমাদের সভ্যতা ইংরেজের দান, এই মত ব্যক্ত করে লেখক বলতে চান যে, বিলাতিবর্জনের মধ্যেও অনুকরণপ্রিয়তা দেখা যায় :

এই বঙ্গভূমি ছিল পূর্ব কালে
গহন জঙ্গল অসভ্যের স্থান।...
কোন্ মুখে তব হে জংলী বাঙালী?
সভ্য জগতের লোক নিন্দা কর।...
দেশী সিগারেট বলিছ তোমরা
দেশী সিগারেট পূর্ব্বে ছিল কোথা?
স্বদেশী সাবাস বিলাতী ধরনে
নকল করিছ কেন যথা তথা ? [১১]

ইংরেজের সদিচ্ছার প্রতি আস্থাপ্রকাশ আছে :

রাজার যে দয়া মায়া আমাদের প্রতি
তুমি কি বুঝতে পার কি আছে শকতি॥ [২৫]

পরিশেষে বঙ্গভঙ্গ মেনে নেবার উপদেশ আছে।

ছন্দোবদ্ধ রচনা হলেও বইটির কোন সাহিত্যমূল্য নেই।

সতেরো

আল এস্‌লাম (১৯১৫-২১) এ যুগের একটি খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকা। আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্ররূপে এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ছিলেন আঞ্জুমনের এবং পত্রিকার সম্পাদক। মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামবাদী আঞ্জুমনের ও পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং পরে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ধর্মবিষয়ক বিতর্ক এতে স্থান পেত। যেমন, প্রথম সংখ্যায় মোহাম্মদ আকরম খাঁ লেখেন 'মূল বাইবেল কোথায়?' প্রবন্ধটি মেহেরুল্লাহ্-জমিরউদ্দীনের ধর্মপ্রচার-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম-মিশনের উদ্যোগে ক্রিশ্চান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটির অনুকরণে কিছু প্রচার-পুস্তিকা প্রচারিত হয়, যার প্রথম বই মোহাম্মদ আকরম খাঁ-রচিত *যীশু কি নিষ্পাপ?* এই পুস্তিকার খ্রীস্টদাস-রচিত সমালোচনার জবাবও দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা *আল এসলামে* পত্রস্থ হয়। কে. চাঁদের প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৫০]

ইসলামের গৌরবগান করে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়, তার একটি উল্লেখযোগ্য ধারায় পাই ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা —যা বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের স্মারক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (পরে ডক্টর) 'কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান' এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রথম। তিনি বলেন :

> কোরআন শরীফ বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কোরআনে আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য প্রাসঙ্গিকরূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্য্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বশতঃই।[৫১]

এই প্রবন্ধে তিনি লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সঙ্গে কোরআনের বর্ণিত তথ্যের সংগতি প্রদর্শন করেন। মঈনুদ্দীন হোসেন,[৫২] আহমদ আলী[৫৩] ও মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী[৫৪] প্রমুখ লেখকের রচনা এ বিষয়ের আলোচনায় পুষ্টিসাধন করে।

ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে এতে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ইসলামে নারীর স্থান ছিল সগৌরব আলোচনার বিষয়।

ভাষা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথম বলতে হয়, বাংলা ভাষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতিপ্রকাশের কথা। বাংলা ভাষার প্রতি এক শ্রেণীর মুসলমানের অশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের উল্লেখ করে এতে বলা হয় :

> মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে মায়ের এবং দেশের দীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।[৫৫]

আবার :

> আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা

> বাঙ্গালা। আশ্চর্য ক্ষোভের বিষয়—এমন অনেক রওশন খেয়াল মুসলমান আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা তথা শ্রীহট্টের বাঁশবন ও আম্রকানন-মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বাগদাদ, কাবুল, কান্দাহার ও ইরান তুরানের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।[৫৬]

এর আগে বাঙালী মুসলমানের চিত্তে আরব-ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগের উপলব্ধি দেখেছি, সেই মনোভাবের পরিবর্তন ববং ভৌগলিক সীমার মধ্যে জাতীয়তাবোধের এই সূচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনাও অনেকে ধ্বনিত করেছেন। মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর কথা আগেই বলেছি।[৫৭] সেখ হবিবর রহমান আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন :

> হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি কেবল নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উভয় জাতি মিশিয়া যাহাতে একটি বিরাট জাতীয়তাব পত্তন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা সর্বোতভাবে কর্তব্য। হিন্দু হিন্দুকে, মুসলমান মুসলমানকে আপন মনে করুন, তাহাতে আপত্তি করা শোভা পায় না। কিন্তু আর এক স্তর অগ্রসর হইলে যে হিন্দু মুসলমান সবই আপন, একথা ভুলিয়া গেলে তা ভাল দেখায় না।[৫৮]

আকবরউদ্দীন এরই প্রতিধ্বনি করেছেন :

> আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানের একতা। ভারতের এই দুইটি মহাজাতির যদি একতা না হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেশের উন্নতি অসম্ভব।[৫৯]

কিন্তু হিন্দু-লেখকের রচিত মুস্লিম চরিত্রে তখনো মুসলমানের পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছে।

> সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবুব কথাই ধরা যাক্। তিনি দয়া করিয়া তাঁহার উপন্যাসে যে সকল মুসলমান রমণীকে স্থান দান করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়াছেন, আমাদিগের দূরদৃষ্টি নিবন্ধন তাহার একটিকেও আমাদের কুলরমণীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারি না।[৬০]

পুনশ্চ :

> হিন্দু সাহিত্য আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মনেও আত্মসম্মানের ভাব এমনি করিয়া কমাইয়া দিয়াছে ও মুসলমানের হীনতা মনের মধ্যে এমনি করিয়া গাঁথিয়া দিয়াছে যে, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষদিগের বাদশাহ এবং বেগম ও শাহজাদীদিগের কল্পিত ও অতি জঘন্য অতি জুগুপ্সিহ চরিত্রের নাটক থিয়েটার ও অভিনয় দেখিয়াও ইহাদের ধমনী পর্যন্ত স্পন্দিত হয় না।[৬১]

মোহাম্মদ কে. চাঁদও এই অভিযোগ করেছেন :

> আজও পর্যন্ত হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া অনেক কথা লিখিতেছেন। বহুকাল তো লিখিয়া আসিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত লিখিতে ছাড়িতেছেন না।...আজিকালি সাহিত্যিক মিলন, রাজনৈতিক মিলন, জাতীয় মিলন প্রভৃতি মিলনযুগে যদি ঐরূপ লিখিত হয়, তাহা হইলে মিলন সুদূরপরাহত।[৬২]

এই ক্ষুব্ধচিত্ত তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেক সময়ে স্বতন্ত্র পথ সন্ধান করেছে। *আল এসলাম* পত্রে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়েই মূলত: প্রতিভাত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণের কথা তখনো ওঠে নি।

তথ্য-নির্দেশ

১. S Khuda Buksh, *'Thoughts on the Present situation'*, Essays Indian and Islamic (London, 1912), 220 তুলনী, বঙ্কিমচন্দ্র, *শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতি*, ভূমিকা।

২ Saksina, 213-16

৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান', *সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব-রচনাসম্ভার* (কলিকাতা, ১৩৬৪), ১০।

৪. গিরিশচন্দ্র সেনের রচনাবলী : *তাপসমালা* (১৮৮০-৯৫), *তত্ত্বকুসুম* (১৮৮২), *মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনচরিত* (১৮৮৫-৮৭), *দরবেশদিগের ক্রিয়া* (১৮৮৫), *হাফেজ* (১৮৯১), *হাদিস—পূর্ববিভাগ, (১৮৯২), কোরান শরীফ, (ভূ-স; ১৯০৮), তত্ত্বরত্নমালা, (১৯০৭), চারিজন ধর্ম্মনেতা, (১৯১৩) এমাম হাসান ও হোসায়ন (১৯১১)।*

৫. Long *৪৫৫-৫৬*।

৬. *ঐ, ৪৬১*।

৭. *সত্যার্ণব প্রেসে মুদ্রিত ও ক্রিশ্চান ট্রাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত। বইতে লেখকের নাম ছিল না। লঙের পুস্তকতালিকায় এই নাম পাওয়া যাবে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইটিতে লেখক হিসেবে লং স্বাক্ষর করেছেন।*

৮. BMC 1 25

৮ক. *ধর্মপ্রচার করতে যেয়ে মিশনারীরা যে মওলানাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতেন এবং তাঁদের সঙ্গে জনসমক্ষে তর্ক করতে অস্বস্তি বোধ করতেন, ডক্টর মোহর আলী তা উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মওলানারা অনেকগুলো পুস্তিকা প্রণয়ন করে সারা প্রদেশে প্রচার করেন। এই প্রচার- পুস্তিকাগুলির মধ্যে একটির রচয়িতা ছিলেন কলকাতার খানসামা আবদুল্লাহ্। দ্রষ্টব্য* Muhammad Mohar Ali *'The Bengal Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1853)' লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পি-এইচ-ডি থিসিস (১৯৬৩)*, 333-36.

৯. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, *'এসলাম-তত্ত্ব', মাহে নও*, মে ও জুন ১৯৫৪।

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় ভাগ, *বঙ্কিম-রচনাবলী, ২॥* ৩৬৩-৬৭।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, ৯৬টী।

১২. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, ৯৩। এটিও আরভিংয়ের রচনার ভাবানুবাদ। দ্রষ্টব্য আবদুল কাদির, *'মিহির', মাহে নও*, ফেব্রুয়ারী ১৯৬২।

১৩ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, ১২৭। রাজবিহারী দাস, *'বঙ্গীয় সংবাদপত্র', সা-প-প,* ১৩০৪।

১৪. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, *মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ* (ঢাকা, ১৯৫৯), ১৬-১৯।

১৫. *মিহির ও সুধাকর*, ৮ পৌষ ১৩০৬।

১৬. *ইসলাম-প্রচারক*, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০।

১৭. সেখ ওসমান আলী, *'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি', হাফেজ*, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭।

১৮. মোজাম্মেল হক, *মাওলানা-পরিচয়*, ৩৪-৩৬।

১৯. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, *'পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী', ব-মু-সা- প*, বৈশাখ ১৩২৬।

২০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *'সমাজ ও সংস্কারক', বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, জানুয়ারী ১৯৫৭ দ্রষ্টব্য। মূল রচনার উদ্ধৃতিগুলো এই প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

২১ Browne The Persian Revolution of 1905-1909, 12

২২. *'ফকির আবদুল্লা-বিন আল্-কোরেশী আল্ হিন্দী'* ছদ্মনামে রচিত।

২৩. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ, *'পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী', ব-মু-সা- প*, বৈশাখ ১৩২৬।

২৪. *'ফকির আবদুল্লা আল্-কোরেশী আল্-হিন্দী'* ছদ্মনামে রচিত।
২৫. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ* (কলিকাতা, ১৩৫৮), ৩৯।
২৬. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, *মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ*।
২৭ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত* (তৃ-স; কলিকাতা, ১৯৩৮)।
২৮. ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০।
২৯. ঐ, জানুয়ারী ১৯০২।
৩০. ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।
৩১. ঐ, ডিসেম্বর ১৯০৫।
৩২. এসলামাবাদী, *'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার'*, *আল এসলাম*, আশ্বিন ১৩২২।
৩৩. ঐ।
৩৪ এসলামাবাদী *'সমাজ-সংস্কার'*, *আল-এসলাম*, মাঘ ১৩২৫।
৩৫ এসলামাবাদী *'সমাজ-সংস্কার'*, *আল-এসলাম*, ভাদ্র ১৩২৬।
৩৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান'*, *নবনুর*, ভাদ্র ১৩১২।
৩৭. *'ভূতপূর্ব্ব সোলতান-প্রতিপলক' '১৮ মাস-বয়স্ক দুষ্পোষ্য শিশুর বেআদবি ও সোলতান-প্রতিপালকের কৈফিয়ৎ'*, *ইসলাম-প্রচারক*, আগস্ট ১৯০৫।
৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব'* *আধুনিক সাহিত্য*। *'রবীন্দ্ররচনাবলী'*, ৯ (তৃ-স, কলিকাতা, ১৯৫৮) ৪৯৫-৯৮ দ্রষ্টব্য।
৩৯. মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের আলোচনায় প্রধানতঃ আবদুল কাদির, *'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন'*, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬ অবলম্বন করেছি। এই প্রবন্ধে নইমুদ্দীনের জন্ম বলা হয়েছে ১২৩৮ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩২ খৃস্টাব্দে। কিন্তু তাঁর জন্ম সন ১২৪৪ বলে শেখ জমিরুদ্দীন নির্দেশ করেছেন (শেখ জমিরুদ্দীন, *'মৌলভী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী'*, *ইসলাম-প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১ দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধটি নইমুদ্দীনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় বলে এতে প্রমাদের সম্ভাবনা কম মনে করি। এখানে তাই শেষোক্ত তারিখ গ্রহণ করেছি।
৪০ আবদুল কাদির-নির্দেশিত, পত্রিকার প্রকাশকাল ১২৯৯ সম্ভবত: মুদ্রণ-প্রমাদ। মীর মশাররফ হোসেনের *গো-জীবনে*'র (১২৯৫) প্রতিকূল সমালোচনা এই পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রকাশিত হয়। সে হিসেবে পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল হয় বৈশাখ ১২৯১।
৪১. BMC, II, 142, 162, 171, 183.
৪২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৪০-৪১।
৪৩. মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, *মেহেরচরিত* (কলিকাতা, ১৯০৮), মোহাম্মদ আসিরুদ্দীন প্রধান, *মেহেরুল্লার জীবনী*, (জলপাইগুড়ি, ১৯০৯) এবং শেখ হবিবর রহমান, *কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা*, (কলিকাতা, ১৯৩৪)।
৪৪. আমার ব্যবহৃত বইটির আখ্যাপত্র না থাকায় প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া গেল না।
৪৫. আসিরুদ্দীন, ২৫-২৭। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-কৃত মূল বইয়ের নকল থেকে গৃহীত।
৪৬ আমার ব্যবহৃত বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। ভেতরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর সীলমোহর আছে ৩১ মার্চ ১৮৯৮। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে বুঝি, এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকতালিকায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *বিধবাগঞ্জনা*'র ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখ আছে।
৪৭. উদ্ধৃত, জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত, ৫৪-৫৫।
৪৮. উদ্ধৃত, শেখ হবিবর রহমান, ১০৮।
৪৯. *'গ্রন্থ-সমালোচনা'*, নবনূর, ফাল্গুন ১৩২২।
৫০. মোহাম্মদ কে. চাঁদ, *'কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা'*, *'আল-এসলাম'*, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ১৩২২, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় ১৩২৩।
৫১. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ *'কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান'*, ঐ, শ্রাবণ ১৩২২।

৫২ মঈনুদ্দীন হোসেন, *'কোরআন ও জ্যোতির্বিদ্যা'*, ঐ, ভাদ্র ১৩২২।
৫৩ আহমদ আলী, *'আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম'*, ঐ, আশ্বিন ১৩২২।
৫৪ এসলামাবাদী, *'কোরআন ও বিজ্ঞান'*, ঐ ভাদ্র ১৩২০।
৫৫ *'খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী'*, *'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা'*, ঐ কার্তিক ১৩২২।
৫৬ আবদুল মালেক চৌধুরী, *'বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান'*, ঐ, আশ্বিন ১৩২৩।
৫৭. পূর্বে পৃ ২৮৮ দ্রষ্টব্য।
৫৮ সেখ হবিবর রহমান, *'জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান'* ঐ, বৈশাখ ১৩২৩।
৫৯ এম এম. আকবরউদ্দীন, *'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান'*, ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।
৬০ আবদুল মালেক চৌধুরী, *'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান'*, ঐ, বৈশাখ ১৩২২।
৬১ সিরাজী, *'সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'*, ঐ, আষাঢ় ১৩২৩।
৬২ মোহাম্মদ রে. চাঁদ *'বঙ্গভাষা ও মুসলমান'*, ঐ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৩।

নবম অধ্যায়

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ঃ দ্বিতীয় পর্ব

উনবিংশ শতাব্দীতে যে মুসলমান লেখক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের রচনাবলীর পরিচয় পেয়েছি।[১] এই ধারায় অনেকেই যোগ দিলেন বিংশ শতাব্দীতে। সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে এসব লেখক নিজেদের শক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ করে যাবার চেষ্টা করেছেন।

সৃষ্টিধর্মী লেখক হওয়া সত্ত্বেও এঁরা সাধারণভাবে সকলেই সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি থেকে। মুসলমান হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এঁরা সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতা কাউকে স্বতন্ত্র পথে চলবার প্রেরণা দিয়েছে কেউ বা স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে মিলনের উপায় খুঁজেছেন।

ইসলাম ও মুসলিম-জীবন বলতে সকল লেখক এক ব্যাপার বোঝেন নি। শরিয়তী ইসলাম আর সুফী-সাধনাকে অধিকাংশ লেখক সমার্থক জ্ঞান করেছেন। এসব ভেদাভেদ নিয়ে তাঁরা বেশী চিন্তা করেন নি, তার একটা কারণ, মুসলমানদের জাগরণ তাঁদের সবার কাম্য ছিল, সেই জাগাবার প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক না কেন, এঁদের পক্ষে তা শিরোধার্য হয়েছিল।

হিন্দু লেখকের হাতে মুসলিম (ঐতিহাসি বা কাল্পনিক যাই হোক) চরিত্রে রূপায়ণ সে যুগে বেশ ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। অনেক লেখক তার পাল্টা জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মেয়েদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ এবং তাদেরকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেবার প্রয়োজনীয়তা একালের সাহিত্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। আধুনিককালের প্রথম লেখিকার আবির্ভাব এ যুগের স্মরণীয় ঘটনা।

দুই

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) সুফীভাবাপন্ন লেখক ছিলেন। বংশানুক্রমে তাঁরা ছিলেন চিশতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীরদের মুরীদ। সুফী ভাবাধারাপুষ্ট পীরবাদ তার আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছিল। *পথ ও পাথেয়* (১৯১৩) অবতরণিকায় তিনি তাই বলেছেন :

> ক্ষুধা যেমন অকাট্য হইয়া দুর্নিরীক্ষ, বিধাতাও তেমনি সত্য অন্তরঙ্গ হইয়া দুর্দশ। তাঁহাকে অনুভব করিবার, হৃদয়ে ধরিবার জন্য জীবন ধারাটিকে কিরূপে সজ্জিত করিতে হইবে, মানুষ মাত্রেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।
>
> এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়।...এ পথের গাইড —গুরু—ব্যতীত পথ চলা সাধারণতঃ অসম্ভব।

ফজলল করিমের পৈতৃক আবাস ছিল রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে। সেখানে অতি

অল্প বয়সে তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি রচনা প্রকাশ করতে থাকেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩১৫ থেকে ১৩১৭ সাল পর্যন্ত কাকিনা থেকে *বাসনা* নামে একটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[২] *জমজম* ও *কল্লোলিনী* নামে আরো দুটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফজলল করিম সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। *বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্তে* বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রথম বই *সরল পদ্য বিকাশ* প্রকাশকালে কবি ছিলেন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।[৪] কিন্তু ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *তৃষ্ণা* কাব্যকে তাঁর '*প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস*' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ঐ কাব্যের ভূমিকায়। মহর্ষি মনসুরের একটি কবিতার (উর্দু অনুবাদ থেকে) বঙ্গানুবাদসহ মোট সতেরটি গীতিকবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। সুফী কবিতার মতো এই রচনাগুলোয় স্রষ্টাকে প্রেমিকারূপে কল্পনা করা হয়েছে। সুফী কবিতার মতো এই রচনাগুলোর স্রষ্টাকে প্রেমিকারূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং প্রেমিকার প্রতি তীব্র আবেগানুভূতির প্রকাশ এতে ঘটেছে।

'*বঙ্গভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই*'—এই অভাববোধ থেকে ফজলল করিম একটি ক্ষুদ্রকায় জীবনীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন *মানসিংহ* (১৯০৩) নামে। রচনা হিসেবে এটি অকিঞ্চিৎকর : উপকরণ যথেষ্ট নয় এবং রচনা-রীতি ত্রুটিপূর্ণ। একই সময়ে তিনি *আসবাত্ উস্-ছামৗ বা ছামাতত্ত্ব* (১৯০৩) নামে একটি শাস্ত্রীয় বিতর্কের পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সুফী সম্প্রদায়ের—বিশেষতঃ চিশতিয়া ও সুহরাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্যগীতের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম প্রকাশের যে ধারা প্রচলিত ছিল, তাকেই *সামা* বলা হয়। এটি ধর্মসিদ্ধ কি না, এ নিয়ে মুসলমান শাস্ত্রকারদের মধ্যে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। এই পুস্তিকায় ফজলল করিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এটি শাস্ত্রসিদ্ধ।

সতেরো বৎসর বয়সে তিনি রচনা করেন *লায়লী মজনু* (১৯০৩)। এখানে দেখি, তিনি সকাম প্রেমকে উপেক্ষণীয় এবং নিষ্কাম প্রেমকে বরণীয় বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, সুফীতত্ত্ব-অনুযায়ী নিষ্কাম প্রেমকে সদগুরুরূপে দেখেছেন এবং সে প্রেমকে গণ্য করেছেন ধর্মের মহান পথের চালকরূপে। লায়লী-মজনুর জীবনে এই দেবসুলভ প্রণয়ের আবির্ভাবকে তিনি তাঁর রচনায় গৌরব-মন্ডিত করেছেন। তাই, পরিশেষে লায়লীকে একান্ত কাছে পেয়েও মজনু তাঁকে পিত্রালয় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং নিজে সমাহিত হলেন পরমপুরুষের ধ্যানে। এই বইটেতে তাঁর রচনা প্রথম দানা বাঁধল। এটি তৎসম শব্দপ্রধান সাধুভাষার লেখা, শব্দালংকার ও অর্থালংকারের যথেষ্ট ব্যবহার আছে—যদিও তা কোথাও কোথাও দুষ্ট প্রয়োগ হয়েছে।

হজরত মুহম্মদের জীবনকাহিনী নিয়ে ফজলল করিম রচনা করলেন *পরিত্রাণ* কাব্য (১৯০৩)। ইসলাম-প্রচারের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে মক্কাবিজয় পর্যন্ত ঘটনাবলী এতে বর্ণিত হয়েছে। এটা যাতে কাব্য হয়ে ওঠে, সেজন্যে কবির চেষ্টা ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এটি কাব্য হিসেবে ঠিক রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার জন্যে তিনি কাতর হয়ে বলেছেন :

কাঁদার সময় আজি হয়েছে মোদের
মোস্লেম সন্তান মোরা হেন দীন হীন

ধৰ্ম্মহারা পথভ্রান্ত অলস অধম
কেবল গণিছি বসে মরণের দিন।
জগতে পতিত বলি ইসলামের নামে
কলঙ্ক দিয়েছি ঢালি অভাগ্য আমরা। [৮৪]

সমসাময়িককালে এই আক্ষেপের মনোভাব বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল, তা আমরা দেখেছি। সেই ভাবধারা দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবেন, হয়তো *মুসদ্দস-ই-হালীর* প্রভাব এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

এই প্রসঙ্গে মাতৃভাষার অনাদরের জন্যে কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন :

কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে
লিখেছিলা হেন দুঃখ বল বঙ্গভাষা,
অনাহারে, অবহেলে,— পরিচর্য্যাভাবে
জীর্ণাশীর্ণা হারায়েছ সকল ভরসা।
হতভাগ্য বাঙ্গালীর অদৃষ্টের দোষে
তুমি মা কাঙ্গালী আজ আপনার দেশে। [৮৩]

এই কলঙ্কভঞ্জনের জন্যেই হয়তো তিনি সাহিত্যচর্চার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ফজলল করিম এবারে লিখলেন চিশ্‌তিয়া সাধকদের আদিগুরু *মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রহঃ)র জীবনী* (১৯০৪)। এই জীবনকাহিনী অলৌকিক ঘটনায় আকীর্ণ। এতে তিনি *সামার* পক্ষ সমর্থন করেছেন এবং '*যে ব্যক্তি চিশ্‌তিয়া খান্দানে মুরিদ হইবে, সে নির্ব্বিচারে বেহেশ্‌তে গমন করিবে*—এই আকাশবাণী উদ্ধৃত করেছেন। *মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফ-সানীর (১৯০৫)*[৮] *জীবনী রচনা করতে বসেও এই অলৌকিকতার মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি।*

আফগানিস্থানের ইতিহাস (১৯০৯) রচনার আশু উপলক্ষ ছিল আমীর হাবীবউল্লাহ্ খানের ভারত-সফর। বইটি তেমন সুখপাঠ্য নয়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনে লেখকের আগ্রহের পরিচয় এতে আছে।

বাঙালী মুসলমানদের যে পতন হয়েছে, এটা সে যুগে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এই পতনের একটি কারণও তখন সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছিল। তা হচ্ছে বাঙালী মুসলমানের আদর্শচ্যুতি। তাই তার জীবনে যাতে এই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেষ্ট হয়ে পড়লেন এবং এই চেষ্টা প্রধানতঃ দেখা দিল আদর্শ পুরুষদের জীবনকাহিনী রচনার মাধ্যমে। *পথ ও পাথেয়তে* (১৯২৩) ফজলল কারম এই আদর্শ জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবন থেকে নীতি ও ধর্মনিষ্টার নানা দৃষ্টান্ত তিনি এতে উপস্থিত করেছেন। নীতির দিক দিয়ে এগুলো খুবই প্রশংসার্হ, এঁদের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রকাশ এতে নিশ্চয় ঘটেছে। কিন্তু দু'একটি দৃষ্টান্ত ছাড়া, সর্বত্রই লৌকিক জীবনের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করা যাবে। কেননা, এতে বর্ণিত মহাপুরুষদের মতো ফজলল করিমের আকর্ষণ ইহকালের তুলনায় পরকালের প্রতি অনেক বেশী। রচনার সংযমে ও ভাষায় ললিত প্রকাশে বইটি বিশিষ্ট।

চিন্তার চাষ (১৯১৬) এক শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি উপদেশমূলক রচনার সমষ্টি।

বিবি রহিমা (১৯১৮) এক ধরনের আদর্শবাদ প্রকাশ করার জন্যে লিখিত। এই আদর্শবাদের স্বরূপ আল্লাহ্‌র প্রতি অচলা বিশ্বাসস্থাপন এবং স্বামীর প্রতি শর্তহীন নিষ্ঠা ও আনুগত্য-প্রকাশ। আদর্শবাদের চাপে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রসমূহ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়েছে বর্ণহীন, তাদের মানবীয় আবেদন ক্ষুণ্ন হয়েছে, নীতিকথা বলার আগ্রহাতিশয্যে তেমনি অনেক সময়ে তাদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়েছে। এর কাহিনী অবশ্য পাঠকচিত্তকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। প্রাঞ্জল ও লালিত্যময় কথ্য ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে, রচনার একটা সাবলীল গতি আছে, অলংকারের ব্যবহারও রয়েছে। কিন্তু বইটি মেয়েদের জন্যে লেখা বলে তিনি সব কিছু সহজ করে বোঝাতে গেছেন, ফলে তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে এমন চপলতা দেখা দিয়েছে, যা তাঁর বক্তব্যের আস্বাদে ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে এবং বিবাহে পণপ্রথার প্রচলনের বিরুদ্ধে এখানে তিনি মন্তব্য করেছেন।

বিবি ফাতেমা (১৯২১) এই দোষ ও গুণের লক্ষণাক্রান্ত। এটি ফাতেমার জীবনী হলেও তাঁর জনকের কথা বলতে গিয়ে লেখক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। দু'জনের মধ্যে কার কথা এতে বেশি আছে, তা বলা দুষ্কর। মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রা-গঠনের আদর্শ এতে তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন।

*রাজর্ষি এবরাহীম*কে (১৯২৪) ফজলল করিমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। তার প্রধান কারণ এই যে, এ বই কেবল রাজর্ষি ইবরাহীমের (মৃত্যুঃ আঃ ৭৭৭ খৃঃ) কাহিনী নয় : বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কি তার চেয়ে বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে তপস্বী আদহামের কাহিনী এবং সেই কাহিনীই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আদহাম ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ দরবেশ, অপার্থিব প্রণয়ে বিভোর, নিত্যবস্তুর সন্ধানে হৃতজ্ঞান। আকস্মিক ভাবে বলখরাজনন্দিনীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শন করে তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটে এবং একই রকম নিষ্ঠা নিয়ে সেই রমণীকে লাভ করবার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এই ঘটনার মধ্যে যে human interest আছে, তা সত্যি মূল্যবান। আধ্যাত্মিক জীবনসাধনা থেকে পার্থিব জীবনে ফিরে আসার দৃষ্টান্ত আমাদের *গোরক্ষবিজয়ে*ও আছে। কিন্তু মীননাথের সেই পতনের পেছনে ছিল দেবীর অভিশাপ, তাঁর ভোগলালসা বিকৃতিরই নামান্তর। আদহামের প্রেমে বরঞ্চ সুস্থ, সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে। তাঁর ভক্ত ও প্রেমিক জীবনে চিরবিচ্ছেদ ঘটে নি, একই সূত্রে দুই জীবনকে তিনি গ্রথিত করেছিলেন। সুফী সাধকের ভাবতন্ময়তার সঙ্গে প্রেমিক-হৃদয়ের অতলস্পর্শী গভীরতা যুক্ত হয়ে তাঁর চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্যদান করেছে। আর সে চরিত্র-অঙ্কনে লেখক তাঁর সকল ক্ষমতা নিয়োগ করেছেন।

রিপুর দমন ও মানবীয় অনুভূতির প্রবল অস্বীকৃতিই ইবরাহীমের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। রাজ্যত্যাগী ঋষির হৃদয়ে যখন পুত্রস্নেহ প্রবল হয়ে উঠল, তখন এই মায়াবন্ধন থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যে পুত্রের জীবনাবসান হল তাঁর কাম্য। সে কামনা অচিরেই পূর্ণ হল আর তাও সেই শিশুর জননীর সম্মুখেই। এ ঘটনা অলৌকিক শক্তিলাভের চরম নিদর্শন সন্দেহ নেই, এতে আমরা বিস্ময়ে আপ্লুত হতে পারি, কিন্তু ধূল্যবলুণ্ঠিত জননীর কাতর

আর্তনাদের মধ্যেই আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই উপাখ্যানে খাজা খোজেরের অস্তিত্ব এর অতিপ্রাকৃত ভিত্তির আরেকটি পরিচয় বহন করে। বইটির ভাষা ললিত, মধুর ও বেগবান, সাংগীতিক ব্যঞ্জনা ও ভাবাবেগময়তা এর বৈশিষ্ট্য।

বিবি খাদিজা (১৯২৭) প্রচলিত ছাঁদে লেখা জীবনচরিত। বিধবা বিবাহের সমর্থন তিনি এতে জানিয়েছেন।

ফজলল করিমের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে গীতিকাব্য *গাথা* (১৯১৩) গদ্যোপাখ্যান *হাতেম তাই* এবং ছোটদের জন্যে রচিত দুটি জীবনচরিত—*সোনার বাতী* (হজরত আবদুল কাদির জিলানীর জীবনী) এবং *হারুনর রশীদের গল্প*।

ফজলল করিমের সাহিত্যকর্মের সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে আদর্শবাদ। আদর্শ পুরুষ ও রমণীর জীবনচরিত-অঙ্কনই ছিল তাঁর গদ্যরচনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কবিতায়ও তিনি নানারকম নীতিবাদপ্রকাশ করেছিলেন। ঊনিশ শতকের মানবতাবাদের ছোঁওয়া তাঁর রচনায় লাগেনি। দেশকালের পরিচয় খুব সামান্যই তাঁর রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। বরঞ্চ তাঁর লেখা থেকে এ ধারণা জন্মায় যে প্রাকৃত জীবনের প্রতি লেখকের ততটা আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শ জীবন বলতে তিনি ধর্মসাধনায় নিয়োজিত জীবনকে বুঝেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সবকিছু ত্যাগ করে, যে-জীবন স্রষ্টার ধ্যানে সমাহিত—শুধু তাই নয়—যে-জীবন অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাকেই তিনি প্রণতি জানিয়েছেন। আধুনিক সমালোচকের কাছে তাঁর জীবনবোধ যদি মনে হয় কিছুটা পলায়নমুখী বা লৌকিক জীবন বিরোধী তাহলে খুব অন্যায় হবে না। হয়তো তাঁর সুফীধারাপুষ্ট আদর্শবাদ শরিয়তপন্থী মুসলমানের পক্ষেও সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে না।

তিন

শেখ ওসমান আলী ছিলেন একাধারে কবি ও প্রবন্ধলেখক। বিচার বিভাগের কাজকর্মের (তিনি প্রথমে ছিলেন মুনসিফ, পরে সাব-জজ পদে উন্নীত হয়েছিলেন) ফাঁকে ফাঁকে চারটি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধসমূহের কোন সংকলন প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর চিন্তাধারা ও সৃষ্টিপ্রচেষ্টার সবটুকু গোচরীভূত হয় না। তবে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁর ভাবধারার কতকগুলো সূত্রের সঙ্গে আমাদেরকে পরিচিত করতে পারে।

প্রথম জীবনে রচিত একটি প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা এবং এতে মুসলমানদের যোগদানের আবশ্যকতা ব্যাখা করেন। এটি প্রকাশিত হয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যেই। এতে তিনি বলেছেন :

> আমরা ইংরাজদিগের অধীন, সুতরাং আমাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা সমস্তই ইংরাজদিগের নিকট হইতে পূরণ করিবার আশা করিয়া থাকি, আমাদের ন্যায্য অধিকার তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইতে পারি।... আমরা ইংলণ্ডে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে অনুরোধ করিতে পারিলে ও তাহাদিগকে আমাদের অভাব আকাঙ্খা অবগত করাইতে পারিলে আমাদের অভাব যতবড় হউক না কেন, আমাদের আকাঙ্খা যত উচ্চ হউক না কেন নিশ্চয় পূরণ হইবে।

তিনি বলেছেন যে, এই অভাবজ্ঞাপনের মাধ্যমরূপেই কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসে মুসলমানেরা যোগ দিতে কুণ্ঠিত কেন, তার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে তিনি যুক্তি সহকারে তার আলোচনা করেছেন :

> প্রথমতঃ কংগ্রেস যেরূপ ভাবে গবর্ণমেন্টের কায্যাবলীর সমালোচনা, প্রতিবাদ আদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের বিরোধী সুতরাং এহেন কংগ্রেস মুসলমানদের যোগ দিয়া গবর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিত নহে। কিন্তু প্রকৃত কি তাই?...
>
> প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে তা বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ত নহে বরং যাহাতে বৃটিশ রাজত্ব আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে তাহারই আলোচনা হইয়া থাকে।
>
> দ্বিতীয়তঃ মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেসদ্বারা কোন ফল লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই পাইবেন না। কেন, কংগ্রেসী কি এমন কোন অধিকার প্রার্থনা করে, যাহা কেবল হিন্দুগণই পাইবেন এবং মুসলমানগণ তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন?
>
> প্রকত কথা এই যে, অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস কি জানেন না। আলস্যই তাহার প্রধান কারণ। আমরা চিরদিন আলস্যেই কাটাইলাম।
>
> ভাই মুসলমানগণ! আলস্য পরিহার কর আর বৃথা কালক্ষয় করিও না। তোমাদের দুঃখনিশা প্রভাত হইতে চলিল।[৭]

প্রথম যুগের কংগ্রেস রাজনীতিকদের শাসকশ্রেণীর শুভেচ্ছায় বিশ্বাস, বৃটিশ শাসনের স্থিতিকামনা আবেদন-নিবেদনের মনোভাব প্রতিফলিত হলেও দেশহিত ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা যে তাঁর লক্ষ্য, সেটা এখানে সুস্পষ্টই ধরা পড়ে।

দেখা যায় যে, ভারতবাসীর পরাধীনতা ও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তাঁকে সমভাবে ব্যথিত করেছে। ১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয় প্রাচ্যবাসীর মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তার স্পর্শে ওসমান আলী ভারতবাসীকে জাগরণের আহ্বান জানালেন জাপানের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে।[৮] সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঘৃণার মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন :

> বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান সময় একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত।...একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়।[৯]

কিন্তু লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা এবং এর বিরুদ্ধে বাঙালী হিন্দুর প্রবল প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈরীভাবই বরঞ্চ বৃদ্ধি পেল। শিবাজী-উৎসব যে হিন্দু-মুসলমানকে নিকটতম না করে দূরে ঠেলেছে, তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন।[১০] *কোহিনূর* পত্রিকায় ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় এবং ১৩১৪ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ওসমান আলী এ বিষয়ে আলোচনা করেন। দেখা যাচ্ছে এখানে ইংরেজের শুভেচ্ছা সম্পর্কে তাঁর আস্থা বিচলিত হয়েছে :

> ইংরাজ দেখিল যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতি। সুতরাং হিন্দু

মুসলমান দুই প্রধান জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে হইল। Divide and rule এই রাজনীতি মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া ইংরাজ দেশ শাসন করিতে লাগিল। ইহার ফলে ইংরাজগণ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল।

অতএব হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের প্রধান প্রধান পাঁচটি কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ১ম, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন, ২য়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও ধর্মগত পার্থক্য, ৩য়, ইংরাজ জাতির ভেদনীতি, ৪র্থ, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও অগ্র ব্যবহার এবং ৫ম, হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান।...

প্রথমতঃ—ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন জনিত বিরোধের কারণ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না।...

দ্বিতীয়তঃ—হিন্দু মুসলমানে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে চাই কি ? চাই কেবল toleration।...[১১]

তৃতীয়তঃ—যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইংরাজ জাতি মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করিতেছেন বা উত্তেজিত করণ জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অথবা যখন দেখা যাইবে যে মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, তখনই আমাদের কর্তব্য হইবে ইংরাজ জাতির কথা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির কথা বিবেচনা করিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হওয়া।

চতুর্থতঃ—ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজী শিক্ষা কখনই আমাদের অমঙ্গলের হেতু নহে।[১১ক]

পরিশেষে হিন্দুর উদ্দেশ্যে লেখকের আবেদন :

মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করিতে নিরস্ত হও, মুসলমানের উপর অযথা অন্যায় গালিবর্ষণ বন্ধ কর, তাহাদের মিথ্যা গ্লানি কুৎসা হইতে বিরত হও।[১২]

উপরে আলোচনায় তাঁর ভাবজগতের আবহাওয়া আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি। তাঁর প্রথম কাব্য *হাফেজ সাহেবের* বিষয়বস্তু অজ্ঞাত হলেও, *দেবলা* কাব্যে *(১৯০১) তাঁর এই মানসিকতারই পরিচয় পাই। দেবলাকে* তিনি বলেছেন '*ঐতিহাসিক কাব্য*' উনিশ শতকে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনীকাব্যের আদর্শে এটি রচিত হয়। আলাউদ্দীন কর্তৃক রাণী কমলার পাণিগ্রহণের ঘটনায় এই কাহিনীর সূচনা। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধস্মৃতির চর্চা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাই পরিণামে আলাউদ্দিনের পুত্র খিযির ও দেবলার অতি গভীর অতি নিবিড় প্রেমকে জয়যুক্ত করলেন সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

অলোক সভা (১৯০৪) কল্পনামূলক রচনা। এতে মানব কর্তৃক অপমানিত রবি, পবন, সলিল, মশক প্রভৃতির প্রতিশোধ-গ্রহণের সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে।

'*লালচাঁদ*' (১৯১২) কাব্যের উপাদান দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস থেকে গৃহীত। স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা নায়ক লালচাঁদের কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে : সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর মতো তাঁর ন্যূনতম দাবিও হচ্ছে উচ্চ রাজপদ। যেমন,

আজ আমি ক্রীতদাস পরের অধীন,
উচ্চ রাজপদে মম নাহি অধিকার,

অথবা অন্যায়রূপে, বঞ্চিত তাহায়,
দেখিব স্বাধীন হতে পারি কিনা আমি
ঘুচাইতে পারি কিনা অধীনতা পাশ,
লভিবারে পারি কিনা উচ্চ রাজপদ।... [১১-১২]

স্বাধীনতা মহাজন নিরেদি রাজন,
জগতে অমূল্য নিধি স্বাধীনতা মণি।...
পথের ভিখারী, কিন্তু স্বাধীন যে জন
সেও শ্রেষ্ঠ শত গুণে। তেঁহ মহাভাগ!
জীবন শোণিত দানে , হেরি জগজন
ক্রয় করে স্বাধীনতা ধনে।... [৩৫]

ইংরেজ শাসকদের মতো লালচাঁদও আবার ভেদনীতির প্রয়োজন অনুভব করেছেন :

বুদ্ধিবল মহাবল রয়েছে আমার,
সেই বুদ্ধিবলে, ভেদনীতি অনুসরি
তাদের একতা-পাশ করিব ছেদন
তাহলে বাসনা মম হইবে পূরণ। [৭১]

কিন্তু প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে ওসমান আলীর যে বলিষ্ঠ চিত্তের পরিচয় আমরা পাই, কাব্যের ক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ পাই না। হয়তো কাব্য বলেই— ঊনিশ শতকী রীতিতে— তিনি অদৃষ্টের অপ্রতিরোধ্য বিধানকেই এখানে বড় করে তুলেছেন। এমন কি, পরাধীনতা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখতে পাচ্ছেন না গেয়াসুদ্দীন :

ভাগ্য দোষে তার
দাসত্ব নিগড় হের বেড়িয়াছে পায়
নির্ব্বিবাদে হবে তারে করিতে বহন,
ইথে দুঃখে করা অনুচিত। [৭]

গেয়াসুদ্দীন অবশ্য সম্রাট, ক্রীতদাস লালচাঁদের প্রভু, তার পক্ষে এই মন্তব্য স্বাভাবিক। কিন্তু স্বয়ং লালচাঁদও এই মায়াবাদী দর্শনের প্রভাব এড়াতে পারছেন না :

তবে কি এ ভবে জীব নিয়তির দাস?
তবে কি মানুষ শুধু ক্রীড়ার পুতুল?
সত্য কি অদৃষ্টলিপি না হয় খন্ডন,
মানুষের চেষ্টা সত্য নাহি আসে কাছে? [৭৯]

পরিণামে তিনি নিজেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

অদৃষ্টচক্রের গতি ভেবেছিনু মনে
পারে নর ফিরাইতে, আপন উদ্যোগে,
কিন্তু এবে বুঝিনু বিশেষ, নরগণ
অদৃষ্টের বশ, ভাগ্যলিপি নাহি পারে
খন্ডাইতে কেহ...। [৮৮]

এতটা অদৃষ্টবাদী এতটা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হলেন কেন ওসমান আলী? সমসাময়িককালে তাঁর অভিপ্রেত আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ দেখতে পেলেন না, এই দুঃখ থেকে হতে পারে। তবে এই পরিণাম অনেকখানি যে কাব্য সম্পর্কে গতানুগতিক আদর্শ-অনুসরণের ফলে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

চার

নদীয়াবাসী কবি দাদ আলীর (১৮৫৬-১৯২৭)[১৩] প্রথম কাব্য *ভাঙ্গাপ্রাণ* (১৯০৫) রচনার আশু উপলক্ষ ছিল কবিপত্নীর মৃত্যু। সংকলিত সতেরোটি কবিতার মধ্যে চৌদ্দটি মৃত পত্নীকে স্মরণ করে লেখা। কবির আন্তরিক শোক এখানে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। শেষ কবিতা 'বিদায়'তে কবি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা করেছেন :

এস ভাই মোসলেম এস ভ্রাতা হিন্দুগণ!
ভায়ে ভায়ে মিশামিশি ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন।
ভায়ে ভায়ে একমন
হিংসা মদ বিসর্জ্জন।

মনে হয়, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে যে তিক্ততা এসে গিয়েছিল, তারই অবসান-কামনায় এটি রচিত হয়। সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কেও একটি ইঙ্গিত আছে :

বিলাতি বর্জ্জনে মন করেছ অভিনিবেশ
দুকুল অভাবে কাল আকুল হইবে দেশ।

দাদ আলীর শিক্ষাজীবন সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনীতি নিয়ে খুব গুরুত্বের সঙ্গে তিনি চিন্তা করেছেন, এমন প্রমাণ নেই।

আশেকে রাসুল (১৯০৭) প্রথম খণ্ডে সংকলিত ছত্রিশটি কবিতা অধিকাংশই হজরত মুহম্মদের (দঃ) স্মরণে রচিত। কবির ভক্তমনের প্রকাশ এখানে ঘটেছে। 'পিউ কাঁহা' কবিতায় মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন কবি :

এই বঙ্গে কেন তব আগমন
বঙ্গভাষা নাহি কর উচ্চারণ
এ ভাষা কি হীন?—সুধা-সম্মিলন
কারে খুঁজ, পাখি! বলি *পিউ কাঁহা*।
না, না, পাখি! কভু তাহা ভাবিও না।
বঙ্গভাষা বলি ঘৃণা করিও না
সুধাপূর্ণ এটি—নহে প্রতারণা
কারে খুঁজ, পাখি! বলি *পিউ কাঁহা*।

একই ধরনের ভাবে পুষ্ট হয়ে *আশেকে রাসুলে*র দ্বিতীয় খণ্ড বের হয়েছিল মাত্র তেরটি কবিতা নিয়ে।

সমাজ-শিক্ষা (১৯১০) নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। মুসলমানের অতীত গৌরবের স্মৃতি ও বর্তমান পতনের আলোচনা এতে আছে। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে *শান্তিকুঞ্জ* (১৯১৭) প্রকাশিত হয়। ভগবদ্‌প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক বাইশটি কবিতা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকাশবৈচিত্র এমন কিছু নেই।

শান্তিকুঞ্জে তাঁর রচিত পনেরোটি বইয়ের উল্লেখ আছে, এর মধ্যে এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিষয়ক ছন্দোবদ্ধ দুটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর আর কটি বই প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে এই বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় পদ্য ও কবিতার পার্থক্য দাদ আলী বুঝতে পারেন নি। কেবল তিনি নন, তাঁর সমকালীন অনেকেই পারেন নি, কিন্তু পদ্যের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

পাঁচ

চট্টগ্রামবাসী আবুল মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৫) স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, স্কুলপাঠ্য বইগুলোয় মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-বিষয়ক কোন রচনাই স্থান পায় না। তখন থেকে তাঁর সংকল্প হয় এমন সাহিত্যসৃষ্টির, যাতে মুসলমানদের জীবনাদর্শ এবং আনন্দবেদনার ছায়াপাত থাকবে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো এই কামনার অভিব্যক্তি।

খণ্ড কবিতার সংগ্রহ *ভ্রাতৃবিলাপ* (১৯০৩) সম্ভবত হামিদ আলীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। *নবনূরে* এর সমালোচনায় বলা হয় : *'গ্রন্থকারের কতটা শক্তি আছে কিন্তু তিনি তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'*[১৪]

কাসেম বধ-কাব্য (১৯০৫) আখ্যানকাব্য-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধ[১৫] এবং রবীন্দ্রনাথের একটি সমালোচনা[১৬] উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, এঁরাও মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে নেবার উপদেশ দিয়েছেন এবং বাক্য-রচয়িতা সেই উপদেশকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

কারবালার শোচনীয় কাহিনীর একাংশ নিয়ে এই কাব্য রচিত। বিষয়বস্তু মিশ্র ভাষারীতির কাব্য থেকে নেওয়া। কাজেই, ইতিহাসের বস্তুর সঙ্গে কল্পনার রং বেশ গাঢ় রকমেই মিলেছে। সপরিবারে কারবালা-প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে হোসেন তাঁর আশু বিপর্যয় সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং লোকান্তরিত ভ্রাতার ইচ্ছাপূরণের জন্যে ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেমের সঙ্গে কন্যা সখিনাকে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। এই পরিণয়কে কাব্যোচিত গৌরব দান করার উদ্দেশ্যে তিনি কাসেম-সখিনার 'বিশুদ্ধ বাল্যপ্রণয়ের' উল্লেখ করেছেন এবং অতিপ্রাকৃত উপাদান অবতারণা করার জন্যে কাসেমের তাবিজের উল্টো পিঠে পরলোকগত পিতার অভিলাষ প্রকাশিত হবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। বিবাহের পর কারবালা-প্রান্তরে কাসেম নিহত হন এবং সখিনা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। এরপর কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে হোসেনের মৃত্যুতে কবি এই উপাখ্যান সমাপ্ত করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে হামিদ আলী যতই 'স্বতন্ত্র সাহিত্য' সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকুন না কেন, রচনারীতির দিক দিয়ে তাঁর কোন স্বাতন্ত্র্যই পরিস্ফুট হয় নি। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র দু'জনকেই তিনি আক্ষরিকভাবে অনুকরণ করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর রচনায় অনৌচিত্য দোষ আছে। যেমন কাব্যের সূচনায় 'হেমাঙ্গি কল্পনাসুন্দরী'র উদ্দেশ্যে যে নিবেদন তিনি করেছেন, সেখানে জননী ও সন্তানের উপমা একেবারেই অসংগত হয়েছে। তেমনি, কাব্যের শেষে কাসেম ও সখিনাকে রোমিও-জুলিয়েটের সঙ্গে তুলনা করা সংগত হয় নি। মিশ্র ভাষারীতির বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছিলেন বলে এবং মধুসূদনের অনুরাগী পাঠক ছিলেন বলে অদৃষ্টবাদের কথা এখানে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে।

কারবালা-কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা-অবলম্বনে হামিদ আলী লেখেন *জয়নালোদ্ধার কাব্য (১৯০৭)। এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি মুসলমানদের 'স্বতন্ত্র সাহিত্য' সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার বর্জন করা যে এর জন্যে অত্যাবশ্যক, একথা তিনি বলেছেন। এই ভূমিকার সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক অংশ উদ্ধৃত করছি :*

> বিশেষতঃ আজকাল বঙ্গভাষা Matriculation এর জন্য compulsory এ পরিণত হওয়াতে প্রত্যেক মোসলমান ছাত্রকেই বাধ্য হইয়া বঙ্গ ভাষার আলোচনায়—বাঙ্গালা outbook পাঠে—মনোনিবেশ করিতে হইবে। *যেন, ম্যাট্রিকুলেশনে অবশ্যপাঠ্য না হলে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক ছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিও যে কম আচ্ছন্ন ছিল না, এখানে তার প্রমাণ পাই।*

জয়নালোদ্ধার কাব্যে ও মধুসূদন-নবীনচন্দ্রের অনুসরণ আছে। মিশ্র ভাষারীতির বিখ্যাত নায়ক মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ এবং পরিণামে হোসেন-পরিবারের মুক্তিলাভের এই কাব্যের বিষয়। হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিকের প্রতি ওমর ও সমুরের বাণীতে কবির দেশানুরাগের প্রকাশ ঘটেছে :

> করিবে না বিদূরিত অসহ যন্ত্রণা
> পর-পদ-দলনের বক্ষঃস্থল হতে
> জননীর সুকোমল? ভীরু কি তোমরা
> আলিঙ্গিতে অসি হস্তে যমের সাদরে—
> রক্ষিতে জনমভূমে—স্বাধীনতা-ধনে ?...
> ভীরু যেই (মূঢ় সেই, নরকুলগ্লানি),
> দৈবের, যমের প্রতিকূল আচরণ
> করিয়ে রক্ষিতে স্বীয় জন্মভূমেরে
> পশুসমতুল্য সেই...
> ...ঘৃণার্হ সেই দাসত্বের ধিক্ [৬২]

কবির অপর আখ্যাকাব্য *সোহ্‌রাব-বধের* বিষয়বস্তুও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য থেকে গৃহীত। *কবিতাকুঞ্জ* নামে তাঁর আরেকটি খণ্ড কবিতা-সংগ্রহ আছে।

ছয়

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) একালের বিশিষ্ট কবি ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক। নবনূর-প্রতিষ্ঠার আগে তিনি ইসলাম-প্রচারক, কোহিনূর এবং ঢাকার *প্রতিভায়* কবিতা প্রকাশ করেছেন নিয়মিত, কখনো কখনো প্রবন্ধ লিখেছেন। এ সময়ের একটি প্রবন্ধ খুবই উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি বলেছেন যে, বাঙালী মুসলমানের নেতার অভাব ঘটেছে।

> কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমাদের Muhammedan Literacy Society, Central Muhammendan Association প্রভৃতি সভা আছে, এই সভাসমূহের যাঁহারা নেতা তাঁহারা যদি একযোগ হইয়া কার্য করেন, তবেই ত আমাদের নেতার অভাব পূরণ হয়। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পুরোভাগে যেরূপ আদর্শ নেতার কথা বলিয়াছি (সর্বজনমান্য নেতা), এই সমুদয় সমিতিতে কি তেমন কোন নেতা আছেন? যদি তেমন কেহ থাকিয়া থাকেন তিনি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হউন এবং সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সামজের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে নেতার আসন গ্রহণ করুন। সর্বসাধারণের সঙ্গে যে নেতা প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে না, তিনি আবার কিসের নেতা? আমরা সমগ্র বঙ্গদেশে (র) জন্য একজন recognised leader চাই। সকলেই আজ্ঞাকারী, কেহই আজ্ঞাধীন নহেন, এবং বহু নেতার আমাদের বিন্দুমাত্র আবশ্যক নাই।[১৭]

বলা বাহুল্য, এখানে বেশ একটা মৌলিক ও সমালোচনামূলক মনোভঙ্গীর পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, নেতার সঙ্গে অনুগামী জনতার যোগসূত্রটা খুবই ক্ষীণ, তাই এই সৌখিন নেতৃত্বের খুব মূল্য দিতে চান নি। হয়তো এই নেতাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার আরো পার্থক্য ছিল। *নবনূরের সূচনায়* তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনাকেই বড় করে তুলে ধরেছেন, তাঁর উল্লিখিত নেতাদের কাছে হয়তো মিলনের চাইতে স্বাতন্ত্রই বড় বলে মনে হয়েছিল। 'সূচনা' থেকে একটু উদ্ধার করা যেতে পারে :

> আজ আমরা বঙ্গভাষার প্রত্যেক মুসলমান সেবককে সাদরে আমাদের এই পুণ্যব্রতে সাহার্য্যার্থে আহ্বান করিতেছি।...ভারতবর্ষের অদৃষ্টফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখ দুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত, বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।
>
> আজ আমাদের অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে নবনূরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য সাদরে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে।[১৮]

ডালি (১৯১২)—সৈয়দ এমদাদ আলীর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ—তেত্রিশটি কবিতার সংকলন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী, দু'দিক দিয়েই এটি গৌরব দাবী করতে পারে। তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা কবিতা 'সেকেন্দ্রা' এতে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতায়, কবি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রত্যাশা করেছেন :

> আজি যুগ যুগান্তরে সেই দুই জাতি
> কি দ্রোহ কি কলহেতে রহিয়াছে মাতি।
> যদি কোন শুভদিনে বিধির বিধানে,

এই দুই মহাজাতি মিশে প্রাণে প্রাণে,
সেকেন্দ্রা, তোমার এই নীরব শ্মশান,
সেদিন ভারতে হবে নব তীর্থস্থান।

স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনায় কিন্তু আকবরের চাইতে আওরঙ্গজেব বড়।

নারী-জাগরণের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত *নবনূরে* বেগম রোকেয়ার অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিবি ফাতেমা জোহরা' কবিতায় তিনি বলেছেন :

তাহারে [নারীকে] উঠাই যদি হাতে ধুলিপঙ্ক হতে
আপনি উঠিব মোরা, জয়ধ্বনী উঠিবে জগতে।

সেদিন নিকটতম হোক, এই তাঁর প্রার্থনা। মুসলমানের নবজাগরণও তাঁর লক্ষ্য : কিন্তু মুসলমানের সামরিক শক্তির নয়, তার জ্ঞানসাধনার পুনরাবির্ভাব তাঁর বিশেষভাবে কাম্য। 'মোসলেম নারীর প্রতি' তাঁর বক্তব্য তাই :

বিশ্বে আরবার
দেখাও এরমুক দৃশ্য।...
আজ মোরা নাহি চাহি অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা,
আজ লক্ষ্য আমাদের জ্ঞানের সাধনা!
দুরূহ কঠোর ব্রত সম্মুখে দেখিয়া
যে অভাগা ভয়াতুর আসিবে ফিরিয়া
তার লাগি রচি রেখ অনন্ত ধিক্কার,
ফিরাইয়া দিও তারে যুদ্ধে আরবার।
সেই জন্য জয় লভি আসিবে যখন,
পরাইয়া দিও কণ্ঠে বিজয়-ভূষণ।

হয়তো নারীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি লেখেন *তাপসী রাবেয়া* (১৯১৭)। সুফী ভাবধারার প্রভাব বা প্রবল ভক্ত মনের পরিচয় তাঁর রচনায় তেমন নেই। কাজেই, এই গ্রন্থরচনার সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে। রাবিয়ার অধ্যাত্মসাধনার কাহিনী বলে অলৌকিক ঘটনা এতে আছে। ভাষা ও ভঙ্গী প্রশংসনীয়।

নবনূর (১৯০৩-০৬)-সম্পাদনায় দক্ষতা সৈয়দ এমদাদ আলীর খ্যাতির অন্যতম কারণ। এই পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনার একটি সুষ্ঠু ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। নির্ভীক, পক্ষপাতহীন ও সরস সমালোচনা অনেক সময়ে কবি ও লেখককে সম্পাদকের প্রতি বিমুখ করে তুললেও ভবিষ্যতের কাছে সম্পাদক তাঁর রসবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর রসবোদ্ধা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সবকিছু দেখতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর রচনায় অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে :

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন বঙ্গসাহিত্যের দুই ধারা—হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা গঙ্গা-যমুনার মত মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করুক। এই এক প্রার্থনা ছাড়া আমি আর প্রার্থনা জানি না।[১৯]

সাত

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং সমাজকর্মী রূপে বাঙালী মুসলমান সমাজে বিশিষ্ট আসনলাভ করেছেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে তাঁর জন্ম, স্থানীয় মাইনর স্কুলে শিক্ষার সমাপ্তি, এগারো বছর বয়সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যরচনার সূত্রপাত। জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনচরিত পাঠ করে তিনি প্রেরণা লাভ করেন এবং তুরস্কগমনের সংকল্প নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু তুরস্কে যাওয়া তখনকার মতো স্থগিত থাকে, দেশে ফিরে এসে তিনি কাব্যচর্চায় রত হন[২০] এবং মুনসী মেহেরুল্লাহ্‌র উৎসাহে কবিতা-সংকলন *অনলপ্রবাহ* (১৩০৬) প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সিরাজী ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কংগ্রেসের রাজনীতিকে তিনি মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গঠিত হয়, তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। খিলাফত আন্দোলনেরও তিনি একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সিরাজী ঝাঁপিয়ে পড়েন, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্যে অর্থসংগ্রহ করেন এবং মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে যোগ দেন আইন-অমান্য আন্দোলনে। দ্বিতীয় সংস্করণ *অনলপ্রবাহ* (১৩১৫) ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁর দু'বছরের কারাদণ্ড হয়; আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যেও তিনি কারারুদ্ধ হন।[২১]

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অনলপ্রবাহে* দেশহিতৈষণার অকৃত্রিম আবেগ রূপায়িত হয়েছে। এর প্রকাশ হয়েছে পরাধীনতার জন্যে তীব্র ক্ষোভে, স্বাধীনতার কামনায় এসব মুসলমানের নবজাগরণের প্রার্থনায়। অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে তিনি বর্তমান পতনের প্রতিতুলনা করেছেন :

কোথা ভারতের স্বর্ণ-সিংহাসন
কোথা সে স্পেনের মহিমা-কেতন
কোথা আরবের প্রতাপ-তপন
  সকলি কি আজি ঘোর অন্ধকার! [৭]

এরপর জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন :

উঠ তবে ভাই! উঠ মুসলমান,
জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ
সাধহ কর্তব্য রাখিবারে মান,
এখনি নিশার হবে অবসান;
  এখনি ভাতিবে আলোক রাশি। [২৪]

প্রসঙ্গক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা নিবেদন করেছেন :

পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার,
ঘুচাতে দাসত্ব-কলঙ্কের ভার
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন,

জাতীয় কলঙ্ক করিতে মোচন,
করেছে সকলে কি পণ কঠিন! [৪]

প্রকাশভঙ্গীতে হেমচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও দেশপ্রেমের আবেগ সিরাজীর অকৃত্রিম।

*অনলপ্রবাহে*র দুই সংস্করণের মধ্যমর্তী সময়ে তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়, তার নাম *উচ্ছাস* (১৯০৭)। একে তিনি বলেছেন জাতীয় কাব্য। আট সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যে অধঃপতিত পৃথিবীতে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্ম ও ইসলামপ্রচার, সমগ্র জগতে ইসলামের ব্যাপ্তি, মুসলমানের অতীত গৌরব, বর্তমান পুনর্জাগরণের চেষ্টা, সেই তুলনায় নিষ্ক্রিয় ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। হালীর মতো তিনিও ঐতিহ্যগর্ব জাগাতে চেয়েছেন :

এই কি সে জাতি হায়, এই কি সে মুসলমান
কর্ম্মে মত্ত, ধর্ম্মে রত জ্বলন্ত জীবন প্রাণ!
অশ্ব পৃষ্ঠে শয্যা যার, সঙ্গী ছিল তরবার,
কিবা স্থলে, কিবা জলে ঝঞ্ঝাগতি ছিল যার [২৬]

বর্তমান অবস্থার প্রতি ধিক্কার জাগাতে চেয়েছেন :

ছিনু নরপতি কাল যেই দেশে
অতুল সম্মানে সুবিপুল যশে,
আজি সেই দেশে হয়ে হতমান
বিচরি মজুর গোলাম সমান!
অবজ্ঞা লাঞ্ছনা নিয়ত সহি। [৩৫]

পুনরুত্থানের স্বপ্ন ব্যক্ত করছেন :

একটিও যদি পাই মহাপ্রাণ,
একটিও যদি পাই মুসলমান
তাহলে অচিরে মহা অভ্যুত্থান
গাইব,—গভীরে প্রলয়-বিষাণ
দিব ফুৎকারিয়া টলিবে পাষাণ
পদতলে ধরা পড়িত লুটি! [৩৬]

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে গঠিত মেডিক্যাল মিশনের সদস্য হয়ে ইসমাইল হোসেন সিরাজী তুরস্কে গমন করেন। তাঁর তুরস্ক সফরের অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে *তুরস্ক ভ্রমণে* (১৯১৩)। এতে তিনি বলেছেন যে, 'মুসলমানকে দক্ষিণ হস্তে কোরাণ এবং বাম হস্তে বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।' তুর্কী নারীদের প্রতিতুলনায় আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের কথা তাঁর মনে পড়েছে :

> তুর্কী স্ত্রীলোকেরা অবরোধ বন্দিনীর ন্যায় আবদ্ধ নহে।...সুতরাং তুর্কী মহিলারা ভারতীয় মহিলাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ, কুসংস্কারাপন্ন এবং বহির্জগতের কার্য্যকলাপ ও সংবাদ সম্বন্ধে অন্ধ নহেন।...বাস্তবিক ভারতীয় অবরোধ প্রথা আমাদের সামাজিক জীবন গঠন এবং জাতীয় উন্নতির পথে বিষম কুঠারাঘাত করিতেছে। [৫৭-৫৮]

এই বইতে তিনি প্যান ইসলামবাদ প্রচার করেন এবং সারা জগতের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা আরবী হওয়া উচিত, এই মতামত প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কামনা করেন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য।

তুর্কী নারী-জীবন (১৯১৩) এরই পরিপুরক গ্রন্থ। এতে তিনি তুর্কী নারীদের প্রগতির তুলনায় আমাদের দেশের মেয়েদের পশ্চাৎপদতার কথা বলেছেন। বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারীশিক্ষা ও থিয়েটারের শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। বলা আবশ্যক যে, পর্দা এবং অবরোধকে তিনি এক মনে করেন নি।

তুরস্কের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তিনি লেখেন *আদব-কায়দা শিক্ষা* (১৯১৪)। নামকরণ, সম্বোধন, অভিবাদন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আহার, উপখাদ্যাবলী, সভাস্থলের আদব, উপবেশনপ্রণালী, বিনয়, স্বাস্থ্যনীতি, বিবাহনীতি এবং তুর্কীদিগের সভ্যতা বিষয়ে তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণার পরিচয় এতে দিয়েছেন। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছেন, থিয়েটারের প্রচলন এবং চা, তামাক ও সিগারেট খাবার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। কিন্তু বিবাহের জন্যে বংশবিচারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেয়েছেন, আবার, তুর্কীরা যে চা, কফি ও সিগারেট দিয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে, সেটারও প্রশংসা করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উপদেশ কিন্তু হাস্যকর হয়ে উঠেছে, যেমন,

> নিজের স্ত্রীর সহিতও সম্ভ্রমসূচক ভাষায় কথা বলিবে। আহ্বান করিতে হইলে বিবি সাহেবা সম্বোধন করিবে। তবে নির্জ্জনে আমোদ প্রমোদ বা হাসি ঠাট্টা রসিকতার সময় স্বচ্ছন্দে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পার। [২৫]

স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪)-রচনার উদ্দেশ্য অতীত গৌরব-গাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানকে নবজাগরণের প্রেরণা দেওয়া। আট সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় হচ্ছে : রডারিক কর্তৃক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডার সতীত্বনাশ, পিতৃসমীপে ফ্লোরিডার পত্রপ্রেরণ, জুলিয়ানের মুসলমানের পক্ষে যোগদান, তারেক ও তৎপুত্র আবদুল্লাহ্ কর্তৃক স্পেনবিজয় এবং রডারিক ও তার পুত্রের নিধন। মধুসূদনকে অনেকাংশে তিনি অনুসরণ করেছেন। সপ্তম সর্গে দূতমুখে রডারিকের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণ, শোকার্ত রানীর প্রবেশ ও রাজাকে দায়ী করা প্রভৃতি ব্যাপার *মেঘনাদবধ কাব্যের* (১৮৬০) প্রথম সর্গের অনুকরণে রচিত। মৃতদেহ-সৎকারের বিবরণে *মেঘনাদবধের* নবম সর্গের অনুসৃতি আছে। প্রাক্তনের অপ্রতিরোধ্য গতিও মধুসূদন-অনুপ্রাণিত। অনেক বাক্য ও প্রকাশভঙ্গী *মেঘনাদবধ* থেকে গৃহীত।

সঙ্গীত-সঞ্জীবনী (১৯১৬) গানের সংকলন। নাতের অংশ :

> জয় মোহাম্মদ নবিবরম
> সুরাসুর-বন্দিত পুণ্যাকরম্
> বালভানু-বিনিন্দিত কান্তি ধরম্
> জনজন-অজ্ঞান-ভ্রান্তি হরম্।
> ভীম ভবার্ণব কাণ্ডারী তুহি,
> পদপল্লবমুদারম্ দীনজনে দেহি। [৫]

আশ্চর্যের কথা, একটি কবিতায় আছে :

হৃদি-সিংহাসন পাতিয়া রেখেছি
এসো হে বঁধুয়া চিকন কালা। [১৫]

অন্যটিতে ইংরেজের জয় কামনা করা হয়েছে। (স্পষ্টতঃই প্রথম মহাযুদ্ধে) :

দেহ দেহ জয় ওহে দয়াময়।
দেহ ব্রিটিশেরে অভয় আশ্রয়![২২] [৩৯]

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপন্যাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাসের কথা স্মরণ করা দরকার। ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে উপন্যাস রচনার যে-আয়োজন তখন হয়েছিল, তাতে হিন্দু-মুসলমানের শক্তিপরীক্ষা বেশ একটা বড় জায়গা দখল করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *ঐতিহাসিক উপন্যাসে* (১৮৫৭) এর সূত্রপাত বলে গণ্য করা যেতে পারে, যদিও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'-উপখ্যানে মুঘল-মারাঠার দ্বন্দ্বের চাইতে রশিনারা-শিরাজীর প্রণয় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এর প্রভাবে *দুর্গেশনন্দিনী*তে (১৮৬৫) মুঘল-পাঠান যুদ্ধে দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহকে জড়িয়ে পড়তে দেখি এবং যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে আয়েষা-জগৎ সিংহের প্রণয় সংঘটিত হয়। *মৃণালিনী, রাজসিংহ, আনন্দমঠ,* ও *সীতারাম* প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মধ্যে এরকম মিলনের আভাসও দেখা দেয় নি। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বিরোধের কাহিনী আছে। ভূদেব-রমেশ-বঙ্কিমের অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, তাঁদের পুনর্জাগরণবাদী মানসিকতার সৃষ্টি এই উপন্যাসসমূহ হিন্দু-মুসলমানেব তিক্ত সম্পর্কের স্মৃতি জাগ্রত করে বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে ছায়া ফেলেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমান লেখকেবা যখন এগিয়ে এসেছেন, তখন এই বিরোধ-চিত্র তাঁদেরকেও বিব্রত করেছে। বিশেষ করে, তাঁদের কাল মুসলিম পুনর্জাগরণের সময় হওয়ায়, অতীত সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আর পূর্বোক্ত ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী এক বলে প্রতিভাত হতে পারে নি। অর্থাৎ হিন্দু ঔপন্যাসিক যখন রাজপুত বা মারাঠার কাছে মুঘলের পরাজয় দেখিয়েছেন এবং মুসলমানের ভীরুতা নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন, মুসলমান পাঠক বা লেখক তখন স্মরণ করেছেন এমন ঘটনা, যেখানে ঠিক এর উল্টোটি ঘটেছে। আরেকটি বিষয়ও কাউকে কাউকে অকারণ উত্তেজিত করেছিল। বাংলা উপন্যাসের প্রথমে যুগে অনূঢ়ার প্রেম দেখাতে হলে নায়িকাকে মুসলমান হতে হত, নয়তো হিন্দু কুমারীকে অস্বাভাবিক পরিবেশে লালিত হতে হত—বাস্তবতার তাগিদে। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের দুটি নায়িকাকে লক্ষ্য করলে তাই দেখা যাবে। কিন্তু শিবজী বা জগৎসিংহের প্রতি রশিনারা বা আয়ের প্রণয়চিত্রকে মুসলমান লেখকেরা অন্য দিক দিয়ে দেখলেন। তাঁদের মনে হল যে, এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় করা হয়েছে। হৃদয়বৃত্তির তীব্রতা যে সম্প্রদায়-ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে, এ যুক্তি মানলেও তাঁরা মুসলমান যুবতীর পক্ষে হিন্দু যুবতীর প্রতি ভালবাসা অনুমোদন করলেন না।[২৩]

মুসলমান লেখকেরা এবারে ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে এমন উপাখ্যান রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব থাকবে, মুসলমানের বীরত্ব প্রকাশ পাবে এবং হিন্দু নারী মুসলমান যুবকের প্রণয়ে নিমজ্জিত হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে। সিরাজীর

উপন্যাসসমূহে আমরা ঠিক এই ব্যাপার দেখতে পাই। *তারাবাঈতে* (১৯০৮) শিবাজীর কন্যা তারাবাঈ ও বিজাপুরের সেনাপতি আফজাল খাঁর প্রেম, শিবাজীর শঠতা, মালোজীর কৃতঘ্নতা, আমিনাবানুর সাহসিকতা ও আফজাল খাঁর বীরত্ব চিত্রিত হয়েছে। *নূরউদ্দীনে* প্রধানত বর্ণিত হয়েছে মালবের যুবরাজ নূরউদ্দীন এবং চিতোরের রাজকুমারী রুক্মিনীর প্রণয়-কাহিনী। চিতোরের প্রধান সেনাপতি রুমী খাঁর প্রতি রাণার বিধবা ভগ্নী হীরাবাঈ ও কন্যা স্বর্ণবাঈয়ের আসক্তি এবং রানীর ইচ্ছাক্রমে রুমী-স্বর্ণবাঈ প্রণয় এই উপন্যাসের দ্বিতীয় উপাখ্যান। *ফিরোজা বেগম* উপন্যাসে দিল্লীর উজীর সফদর জঙ্গের কন্যা ফিরোজা বেগমের সঙ্গে রোহিলার নজীবউদদৌলার বিবাহ, ফিরোজার রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ সদাশিবের কৌশলে ফিরোজাহরণ, ফিরোজার পলায়ন ও পরে আহমদ শাহ্ আবদালীকে ভারতে আমন্ত্রণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত আছে। *রায়নন্দিনী* সিরাজীর সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা উপন্যাস। এতে ঈশা খাঁর প্রতি কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী এবং মহাতাব খাঁর প্রতি প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীর প্রণয় বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের শঠতা এবং হেমদা ও অভিরামস্বামীর কামার্তভাবের বিপরীত ঈশা খাঁর বীরত্ব ও মহাতাব খাঁর ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নায়িকাদের প্রেমের গভীরতাও বেশ আবেগসহকারে চিত্রিত হয়েছে। একজন সুফী দরবেশের কেরামতির কথা আছে এবং মুহর্‌রম উৎসবের সমর্থন আছে।

উপন্যাসের শিল্পরূপের দিক দিয়ে সিরাজী অবশ্য কোন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি। যে-বঙ্কিমচন্দ্রের *দাঁতভাঙ্গা জবাব* দেবার চেষ্টায় তাঁর উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর উপন্যাসের সর্বত্র দেখা যাবে। *নূরউদ্দীনে* কাপালিক সন্ন্যাসী কর্তৃক রুক্মিনীর উদ্ধার ও পরে তাকে বলিদানের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে *কপালকুণ্ডলাকে* (১৮৬৬) স্মরণ করিয়ে দেয়। ঝড়জলের মধ্যে স্বর্ণময়ীর শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ এবং ঈশা খাঁর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকার, *রায়নন্দিনীর* এই সুচনা *দুর্গেশনন্দিনী*'র দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। এই উপন্যাসের হেমদা অনেকটা *মৃণালিনীর* (১৮৬৯) ব্যোমকেশের ছাঁদে গড়া। পুরুষের ছদ্মবেশধারী ফিরোজা বেগমও আমাদেরকে চকিতের জন্য *আনন্দমঠের* (১৮৮২) শান্তিকে মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমের পরোক্ষ প্রভাবের পরিচয়ও আছে অন্যভাবে। কিন্তু মানবহৃদয়ের যে গভীরতায় বঙ্কিম প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, সিরাজী তা পারেন নি। তার অন্যতম কারণ এই যে, এক ধরনের মসীযুদ্ধের অস্ত্ররূপে উপন্যাসগুলোকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফলে পাত্রপাত্রীর মুখে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের ব্যস্ততায় তিনি অনেক সময়ে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানবীয় অনুভূতির অধিকারীরূপে চিত্রিত করেন নি। তবে সিরাজীর ভাষা সুন্দর, যে-ভাষাকে সাধারণত বঙ্কিমী বলা হয়, সেই ভাষারীতিতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র সিরাজী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, বলা চলে। সেদিক দিয়ে তিনি স্মরণীয়। কিন্তু তাঁর সেই উপন্যাসগুলোয় বর্ণিত যুগ সব চেয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে নি, এখানে তাঁর অসম্পূর্ণতা। তবে সে যুগের মুসলমান পাঠক এসব রচনায় মুসলমানদের পরাক্রমতার পরিচয় পেয়ে উল্লাসিত হয়েছে, এখানে তাঁর সার্থকতাও বটে।

তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের কথা বলে আলোচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে। *স্ত্রী-শিক্ষা* (১৯১৬) প্রথমে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (কলিকাতা,

১৯০৪) কথিত হয়, পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেছেন :

> পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতা হরণের ন্যায় পাপ-কার্য আর কিছুই নাই। যেরূপ পরাধীনতা মানুষকে নির্বোধ এবং অজ্ঞ করিয়া রাখে, যে পরাধীনতা পরম করুণাময় খোদাওন্দতালাপ্রদত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞান ও শিক্ষার অমৃত রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে সেরূপ পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়: । ...তাহা হইলে অকারণে নারীজাতিকে সদাসর্ব্বদা অন্তপুরে বদ্ধ রাখা কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ পাপ,... । ...দেশে এ পর্যন্ত একটা মুসলমান বালিকাও মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয় নাই। ...ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ যেমন স্বচ্ছন্দে এবং অনায়াসে সর্বত্র গমনাগমন করে, তাহা দেখিলেও আনন্দ হয়।

সামাজিক প্রগতিকামী তাঁর এই চিন্তাধারা মূল্যবান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পীর-মুরীদ প্রথা, পীরদের কবর-জিয়ারতের নিয়ম, মৌলুদ শরীফে সালাম পাঠ, *এগারোই শরীফ* পালন, 'গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া সুফীগিরি করা' প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাল্যবিবাহের অপকার এবং মেয়েদের ব্যায়ামচর্চার প্রয়োজনীয়তা (এ বিষয়ে তিনি অন্য প্রবন্ধে, এমন কি উপন্যাসেও আলোচনা করেছেন) ব্যাখ্যা করেছেন।

স্বজাতি-প্রেমে তিনি বলেছেন যে, হিন্দুরা যেমন স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য-সচেতন, স্বজাতি-প্রেমিক মুসলমানকেও তেমনি নিজের সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে।

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা*য় (দ্বি-স, ১৩২০) তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত স্পেনের গৌরবের কথা বলেছেন।* সুচিন্তা *(১৩২৩) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ পুস্তকারে প্রকাশিত হয়েছিল।* নব উদ্দীপনা *(১৩১৪) ও প্রেমাঞ্জলি* কাব্য তাঁর প্রথম যুগের রচনা।

সাময়িকপত্র-প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম উল্লেখযোগ্য। প্রথম যুগে তিনি ছিলেন *ইসলাম-প্রচারকের* নিয়মিত লেখক। *ইসলাম-প্রচারকের* সঙ্গে মিহির ও সুধাকরের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। *মিহির ও সুধাকরে* তাই তাঁর রচনার বিরূপ সমালোচনা (১২ ও ১৫ ভাদ্র ১৩১০) এবং *ইসলাম-প্রচারকে* তার প্রত্যুত্তর (জুলাই-আগস্ট ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। *লহরী, সোলতান ও নবনূরে* তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১৯২০ খৃস্টাব্দে তিনি স্বল্পায়ু *নূর* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩-এ নবপর্যায় *সোলতান* পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাময়িকপত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান সমাজের মাতৃভাষারূপে বাংলা, ভাষা যাতে আদৃত হয়, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে সিরাজী যাই হোন না কেন, সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যপন্থী চিত্তের পরিচয় মেলে। সাহিত্যকে তিনি সমাজ-সংস্কারের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন।[২৪] সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করায় তিনি তখনকার রক্ষণশীলদের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন, তবু পরাজয় স্বীকার করেন নি। মুসলমান সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্যে তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টা স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। তাঁর স্বাতন্ত্র্যপন্থী রচনার মূল অভিপ্রায় মুসলমানকে আত্মসচেতন করা এবং তার হীনম্মন্যতা দূর করা। তাঁর মতামত ও অনুসৃত পথের সঙ্গে যাঁদের ঐক্য নেই, তাঁরাও এই অভিপ্রায়ের মূল্য দেবেন।

আট

হিন্দু লেখকের উপন্যাসে অমুসলমান যুবকের প্রতি মুসলিম তরুণীর প্রণয়চিত্র ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো মতীয়র রহমান খানকেও (১৮৭২-১৯৩৭) ক্ষুব্ধ করেছিল। সিরাজীর মতো তিনিও হিন্দুর ইসলাম-গ্রহণের কাহিনী এবং মুসলমান নায়কের প্রতি হিন্দু নায়িকার প্রেম নিয়ে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন। *মোক্ষপ্রাপ্তি* উপন্যাসে 'মুসলমান আধিপত্যের সায়াহ্নে এবং ইংরেজ রাজত্বের অরুণোদয়ে বারাণসীধামের' হিন্দু সমাজচিত্র-অঙ্কনের প্রয়াস আছে। বণিক কৃষ্ণদাসের ভগ্নী লীলাবতীর বৈধব্যযন্ত্রণা দেখিয়ে লেখক হিন্দু সমাজের অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রামচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণদাস-তনয়া সদ্যবিধবা গোপার প্রেমোন্মেষের পরিচয় দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, হিন্দু সমাজে এদের হৃদয়নুভূতির মূল্য নেই। রামচন্দ্র যখন ইসলামের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছেন, তখনই সমাধানের পথ তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। রামচন্দ্র এবং সকন্যা কৃষ্ণদাসের ইসলাম গ্রহণে তাই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

যমুনা উপন্যাসিকায় পানিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা-নায়ক বিশ্বাস রাওয়ের কন্যা যমুনা ও আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর প্রথম দর্শনজাত প্রণয় অত্যন্ত অল্প সময়ে মারাঠা-নন্দিনীর ইসলামগ্রহণে ও আবদালীর সঙ্গে পরিণয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

ইতিহাসের পটে আঁকা কাহিনী দুটিতে কিন্তু ঘটনাকালের পরিবেশ তেমন ফুটে ওঠে নি। *মোক্ষপ্রাপ্তি*-তে অ্যানাক্রনিজমের চিহ্ন আছে। কোম্পানী আমলের সূচনায় দেশীয় বণিকের *লেজার-বহি* ব্যবহার, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অস্তিত্ব এবং কৃষ্ণদাসের সংলাপে 'ভিনিসীয় সাইলকে'*র উল্লেখ তার দৃষ্টান্ত। ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কের বাহুল্য সত্ত্বেও উপন্যাসটি স্বাভাবিক গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সে যুগের আদর্শে রোমাণ্টিক পরিবেশ-রচনায় লেখকের সফলতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। কিন্তু* যমুনা*র আখ্যান অনেক বেশি দ্রুতগতি—পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতার কাছে তা অধিক দাবি করে। মতীয়র রহমানের ভাষায় বৈশিষ্ট্য দুটি উপন্যাসেই সুস্পষ্ট। সে ভাষা ধ্বনিময় ও অলঙ্কারবহুল ঃ বঙ্কিমের তো বটেই, বিদ্যাসাগরী রচনারীতির প্রভাবও এতে দেখা যায়।*

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিক স্ব-সমাজের আলেখ্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলমান লেখকেরা এক্ষেত্রে এক ধরনের আলস্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই অভাব মতীয়র রহমানের রচনায়ও চোখে পড়ে। তাঁর কোন উপাখ্যানেই সমকালীন মুসলিম-জীবন প্রতিফলিত হয় নি। নব-কুমুদ *উনিশ শতকের সমাজচিত্র, কিন্তু পাত্রপাত্রী লেখকের স্ব-সমাজের নয়। এই গল্পে হিন্দু সমাজের ক্ষমাহীন পাষাণমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে বটে, কিন্তু লেখক ব্রাহ্ম নবকুমারের পক্ষাবলম্বনও করতে পারেন নি। যে দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্ব এখানে দেখানো হয়েছে, তার কোনটির প্রতিই সম্পূর্ণ সহানুভূতি না থাকায়, তাঁর রচনা সার্থক হয়ে ওঠে নি।*

গণপতিসিংহ নীতি উপদেশমূলক গল্প*।* ভোলানাথ *রূপকথাধর্মী রচনা। দুই বন্ধু একতাবদ্ধ বন্য পশুর হাতে মানুষের লাঞ্ছনার ইতিহাস। সাহিত্যমূল্যের চাইতে উপদেশের মূল্যই এখানে বেশি।*

উনিশ শতকী আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে মতীয়র রহমান অনেকগুলো ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে লেখা 'গূঢ়তত্ত্ব, আধুনিকাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপ *গুপ্ত সভা* এবং ইংরেজের বিচার নিয়ে রচিত *কমিডি না ট্রাজিডি* উল্লেখযোগ্য। *পীর শাহ্ শাহী* প্রবন্ধে তাঁর স্বদেশপ্রীতির সাহসিক প্রকাশ আছে।

কাব্য-রচনায়ও মতীয়র রহমান মনোযোগী ছিলেন, যদিও, মনে হয়—গদ্যই ছিল তাঁর যথোপযোগী মাধ্যম। সেযুগের প্রিয় ও প্রচলিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে তিনি কাব্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'এজিদের সভায় হজরত জয়নাল আবেদীন', 'মোশ্লেম-বধ', ও 'ছোহরাব-রোস্তম' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। তাঁর মৌলিকতা প্রকাশের অধিকতর সুযোগ হয়েছে 'উদ্দীপনা' ও 'স্বদেশানুরাগ' প্রভৃতি দেশহিতৈষণামূলক কবিতায়—যেখানে তিনি স্বদেশবাসীর, বিশেষত মুসলমানের, পুনর্জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। আবার এর সঙ্গেই মিলিয়ে পড়তে হবে 'মহারানী ভিক্টোরিয়া'—যা মাতৃ-স্বরূপা রাজরাজেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার 'মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে' লিখিত। একদিকে স্বদেশপ্রেম ও অন্যদিকে ইংরেজ-শাসনের স্থায়িত্বকামনা আমরা আরো অনেকের লেখায় দেখেছি।

মতীয়র রহমান ছিলেন—যাকে বলা যায়—উচ্চকণ্ঠ কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, ভাষার কারুকার্যে এবং বক্তব্যের প্রত্যক্ষতায় তাঁর কবিতা আমাদেরকে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খন্ড কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মতীয়র রহ্মান খান প্রথমে *মিহির ও সুধাকরের* পরে *নবনূরের* নিয়মিত লেখক ছিলেন। সাময়িকপত্র থেকে সংগৃহীত তাঁর রচনাবলী সম্প্রতি বৃহদাকার গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নয়

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন 'হোসেনী ছন্দে'র প্রবর্তক বলে বিখ্যাত। 'হোসেনী ছন্দ' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের থেকে মূলত অভিন্ন। চোদ্দ মাত্রার চরণ না সাজিয়ে তিনি গদ্যের মতো টানা লিখে গেছেন, কমা সেমিকোলন ও পূর্ণছেদ বিরতি ও যতির কাজ করেছে। 'গৈরিশ ছন্দে'র মতো এখানেও অমিত্রাক্ষরের মূল প্রকৃতি গৃহীত হয়েছে।

ছন্দোবৈচিত্র্যে মনোযোগ থাকলেও সৈয়দ আবুল হোসেনের রুচি মোটেই উন্নত ছিল না। তাঁর সাহিত্যকর্মের আগাগোড়া রুচিবিকৃতির ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। *যমজ-ভগিনী কাব্যের* (১৯০৫) বিষয়বস্তু সিরাজদৌল্লার পতনের কাহিনী : ইতিহাসের অংশ সামান্য, কল্পনাই অধিক। কল্পনা-প্রসঙ্গে *নবনূরের* সমালোচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি ঃ

> গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ তৃতীয় সর্গে সহোদর-সহোদরা লইয়া তিনি যে চতুর কৌতুক-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অমার্জিত রুচি বর্ব্বর সমাজেরও কেহ কল্পনায় আনিতে পারে কিনা সন্দেহ। ...গ্রন্থমধ্যে যে সকল কুরুচির বিকাশ দেখা গেল...। ...উপন্যাসের অনন্যোপায় প্রেমিকাগণকে প্রণয়িনী-লাভ কল্পে বিভিন্ন উপায় ও পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাঘ্র-ছদ্ম ধারণপূর্বক সরোবর তীরস্থ ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অবসরমত প্রেমিক আপনার স্নানরতা প্রেয়সী লইয়া পলায়ন করিয়াছে এরূপ কল্পনা ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাস পাঠকের নিকট বস্তুতই বিচিত্র।[২৫]

সিরাজউদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে প্রচলিত কতকগুলো অভিযোগ তিনি সিরাজের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে বসিয়েছেন। সিরাজ কর্তৃক গর্ভবতী রমণী হত্যা করে গর্ভস্থ সন্তান দেখার কথা উমিচাঁদ বলেছেন, রায়দূর্লভ অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী বিবৃত করেছেন, সিরাজের আদেশে স্ত্রীলোক-সহ নৌকাডুবির বিবরণ দিয়েছেন, কৃষ্ণচন্দ্র, অন্যেরা তাঁর লাম্পট্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের *সিরাজউদ্দৌল্লা* (১৩০৪) প্রকাশের পর সিরাজের কলঙ্কভঞ্জন হয়েছিল। অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত গিরিশ ঘোষের *সিরাজউদ্দৌল্লা* (১৯০৩) নাটকে সিরাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হয়তো সরকারের ভয়ে আবুল হোসেন তা করেন নি, আবার লোকভয়ে সিরাজের সরাসরি নিন্দা করতে পারেন নি। অতএব, নবীন সেনের *পলাশির যুদ্ধের* অনুকরণে দুকূল রক্ষা করেছেন। এই কাব্যের অনুসরণ আরো স্পষ্ট অনুভব করা যায় ক্লাইভ প্রভৃতির চিন্তায় এবং আকাশবাণীতে অভয়লাভে। শ্বেতাঙ্গিনীর (ইংল্যাণ্ড) প্রতি সিরাজের উপদেশে এই কলঙ্কের ভার অবশ্য কিছুটা লাঘব করা হয়েছে :

> হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায়দ্বয়ে, রাখিও বিভিন্ন সদা, কুত্রাপি একটি যেন না পারে হইতে।—ইহারা একত্র মাগো হইবে যেদিন, সেদিন তোমার শিরে উড়িবে গো চিল কাক, কহিনু নিশ্চয়। আমার দুর্নাম আর, রটাইয়া সদা দেশে রাখিও কহিনু। [৩০৪]

যমজ-ভগিনীতে কবির সরস্বতী-বন্দনা বিস্ময়োদ্রেক করে।

জীবন্ত-পুতুল কাব্য (১৯০৭) ঐতিহাসিক রোমান্স। উড়িষ্যার সুবাদার সৈয়দ আহমদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত কাহিনী। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে দুষ্পাতি-কিরণ এবং শমসের-জবাব প্রেম কিভাবে জয়যুক্ত হল, এখানে তা দেখান হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস-অবলম্বনে আবুল হোসেন এবারে কয়েকটি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। *মোসলেম পতাকা তারিখুল ইসলামে* (১৯২৪) প্রায় ছ শ পৃষ্ঠায় হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও চার খলীফার বৃত্তান্ত, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের কথা, স্পেন ও ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত এবং সুদান সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। হজরত মুহম্মদ (দঃ) থেকে ষষ্ঠ ইমাম সৈয়দ জাফর সাদেকের মাধ্যমে আবুল হোসেন তাঁর বংশপীঠিকা টেনেছেন এ বইতে। 'ভারতে মোসলেম পতাকা' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর ভাবধারার পরিচয় দেয় :

> ১৭৫৬-৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহানল সমগ্র ভূ-ভারতে জ্বলিয়া ওঠে যাহার প্রকোপ পড়িয়া ইংরেজদিগকে অর্দ্ধ পরিমাণে ভস্মীভূত হইতে হয়। ঘটনাটি ইদানীন্তন বন্দেমাতরম ও নন্দকুমারে ধৃষ্টতার মত হিন্দু মহলের একটা গাজন স্বরূপ, তবে সে গাজনটা অতি ভীষণ প্রকৃতির আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই সময়ে হিন্দুরা সিপাহীদিগকে ইংরেজ-বিরুদ্ধে, টোটা-আদি জাতি-নষ্টকর কথায় উত্তেজিত করিয়া লয়। তাহাতে মুর্খ সিপাহীরা ...বাহাদুর শাহ্‌কেও উত্তেজিত করিয়া ...ইংরেজদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করাইতে থাকে।... হিন্দুর পরামর্শ যখনই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখনই মুসলমানের ক্ষতি হইয়াছে। তথাপিও এ-জাতির আক্কেল খোলে না।

তাঁর রাজভক্তি ও হিন্দু-বিদ্বেষের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি এখানে ঘটেছে —কিন্তু বইয়ের প্রচারবৃদ্ধির সম্ভাবনায় হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের প্রশংসাপত্র আবুল হোসেনের কাব্যে সর্বদাই মুদ্রিত হতে দেখা গেছে।

এই পর্যায়ের অপর গ্রন্থ *স্পেনে মোসলেম পতাকা বা স্পেনবিজয়* (১৯২৫) মুসলমান সেনাদের স্পেন-জয়ের বৃত্তান্ত। মুসলমান যুবকের প্রতি অমুসলিম তরুণীর প্রণয়-কাহিনী বিবৃত করার প্রবৃত্তি এর মধ্যে দেখা যায়। সেনাপতি ঈসার সঙ্গে কাউন্ট জুলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রী মেরীর এবং স্পেন-রানী এলজিলানোর সঙ্গে আমীর মুসার তনয় আবদুল আজিজের প্রণয়চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডাও ঈসার প্রতি আসক্ত, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হওয়ায় সে ঈসার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। পরিণামে মুসা কর্তৃক তারিকের অপমান এবং খলীফা কর্তৃক মুসার দণ্ডদান বিবৃত হয়েছে।

আবুল হোসেনের লেখা আর কয়েকটি বই অনেকটা প্যারডীর পর্যায়ভুক্ত। এ-সব ক্ষেত্রে সুপরিচিত কাহিনীর বিকৃতিসাধন করে লেখক উল্লসিত হতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ে *সাবিত্রীর সত্য জীবনী* (১৯২৩) প্রথম রচনা। লেখক দাবি করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে জনৈক জার্মান পণ্ডিতের সংগৃহীত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম-সংকলন করে এ বই প্রকাশ করা হল, কিন্তু এ দাবি মেনে নেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আরম্ভে দুর্গার বন্দনা আছে, গদ্যে-পদ্যে সাবিত্রীর জীবনকে অনেকখানি বিকৃত করে দেখানো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপান্তরই সবচেয়ে বেশি পরিচিত লাভ করেছিল। স্বতন্ত্রভাবে ন খণ্ডে তাঁর চোদ্দটি উপন্যাসের প্যারডী প্রকাশ করেছিলেন আবুল হোসেন, পরে সেগুলো একত্রে *জ্ঞানভাণ্ডার* (১৯২৪) নামে প্রচারিত হয়েছিল। নমুনাস্বরূপ, তাঁর বঙ্কিম-সমালোচনা একটু উদ্ধৃত করি :

> ঠাকুর তো সাহিত্য-সম্রাট হইলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার সাহিত্য সাম্রাজ্য দেখিয়াছেন কি? আমরা তাঁহার কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তন্নবিতন্ন করিয়া দেখিলাম, তিনি সাতখানি মাত্র গণ্ডগ্রামের সে পত্তনে, অতিমাত্র ক্ষুদ্র তালুকদার। ...যথা—
>
> ১। মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টি আদি মেঘের ভিতর দেবদেবী।...
> ২। কুলত্যাগিনী ও নিঃসহায় কন্যা।
> ৩। জলমগ্ন কন্যা।...
> ৪। সন্ন্যাসী আচার্যাদি তন্ত্র মন্ত্র গ্রাম।...
> ৫। কুলকন্যার অন্তঃপুর হইতে পলায়ন...।
> ৬। ডাকাত ও দস্যুদল।...
> ৭। স্বপ্ন...।
>
> ... নভেল ঠাকুর তদীয় সম্প্রদায়গত হিন্দু রমণীসমূহকে অসতী, লম্পটী ও দুশ্চরিত্রা এবং পুরুষ সকলকে অধর্ম্মাচারী, পরম স্বার্থপর ও অন্যায়াসক্ত করিয়া আকার ইঙ্গিতে ও প্রকাশ্য কথায় দেখাইয়াছেন।

কাহিনীর রূপান্তরে আবুল হোসেন কুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, 'সীতারাম বা কাগজ-রাজ্যে' তিনি দেখিয়েছেন যে, শ্রী ভয়ানক দুশ্চরিত্রা ও মহাপাপিষ্ঠা, জয়ন্তী স্ত্রীবেশী পুরুষ ও শ্রীর উপপতি। অনুরূপ, 'দেবী চৌধুরাণী বা ধনই ধর্ম্মে' তিনি নিশিকে দাবি করেছেন স্ত্রীবেশী পুরুষ ও ভবানী ঠাকুরের জারজ সন্তান বলে। তার ঔরসে প্রফুল্লের দুটি সন্তানও কল্পনা করেছেন। সূর্যমুখী ও শৈবলিনী তো দুশ্চরিত্রা বটেই, 'আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী'তে

একেবারে ব্যভিচারের জোয়ার বয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীনে' নবকুমারকে পদ্মাবতীর গৃহে কাবাবরুটী খাইয়েছেন, শ্যামার মুসলমান প্রণয়িনীর আমদানী করেছেন, পরিশেষে শ্যামা ও নবকুমার, পেশমন ও গৌরী, সবাইকে হিন্দু থেকে মুসলমান করেছেন।

এই বইয়ের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, ১৯২১/২২-এর দিকে আবুল হোসেন *দেবর্ষি দরবার* নামে এক ক্ষণস্থায়ী সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম : *স্বর্গারোহণ কাব্য, স্বাধীন খাতুন,* (১৯২৪) (এখানে তিনি নারী-স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন), *হাবশী বাদশা* (১৯২৫), *মিশর-বিজয়* (১৯২৬) ও *বিবাহ-বিভ্রাট* (১৯২৭)।

আবুল হোসেনের আত্মগর্ব ছিল। তিনি নিজের রচনাকে গণ্য করেছেন এই বলে যে, 'এক একটি গ্রন্থ, এক একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার, মাণিক্যের নিকর ও হীরক প্রস্তর প্রায় উজ্জ্বল ও জ্ঞানোদয়ী কথায় পরিপূর্ণ' বিচারপতি স্যার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতালাভ এই আত্মগর্বের অন্যতম কারণ।

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর *বঙ্কিম-দুহিতাও* বঙ্কিমের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন রচনা। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, 'অনেক নোংরা কথা তাতে আছে, এগুলো হতে বাধ্য। কেননা, বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল অত্যন্ত নির্জীব। কিন্তু সমস্ত action এর reaction আছে।'[১৬] *জ্ঞানভাণ্ডারের* মতো এসবও সাহিত্যপদবাচ্য নয়।

দশ

যে সময়ে আমাদের সমাজের পুরুষেরাই সংকীর্ণ ও অনুদার পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, সে সময়ে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) আবির্ভাব বিস্ময়কর। রংপুর পায়রাবন্দ গ্রামে অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জেষ্ঠ্যভ্রাতা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও উদারহৃদয়। তাঁর প্রভাবে বেগম রোকেয়ার চিত্তবৃত্তি যখন বিকাশলাভের পথে অগ্রসর হয়েছে, তখন তাঁর বিবাহ হয়। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর মধ্যে তিনি লাভ করেন এক মুক্তবুদ্ধির মানুষকে। তাঁর প্রেরণায় তিনি শিক্ষাদীক্ষার পথে অগ্রসর হন, কিন্তু অচিরেই সাখাওয়াত হোসেনের অকালমৃত্যু তাঁর পারিবারিক সুখশান্তি বিপর্যস্ত করে দেয়। বেগম রোকেয়া এবারে অগ্রসর হলেন সাহিত্যচর্চায় এবং বাঙালী মুসলমান-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে। একটির ফল *মতিচুর, পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী* অন্যটির ফল কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

বেগম রোকেয়ার রচনানীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর ভাষার সারল্যে, ভঙ্গীর তীক্ষ্ণতায় এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে। মুসলমান লেখকদের মধ্যে এর আগেও কেউ কেউ—যেমন মীর মশাররফ হোসেন—সমাজ-সমালোচনার উপায়স্বরূপ ব্যঙ্গরচনার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু স্থূলতা ও অতিরঞ্জন থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি এবং কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ছাপ লেগেছে। বেগম রোকেয়া বিদ্রুপের শানিত কশা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নামলেন এবং আঘাত করলেন ব্যক্তিকে নয়, সমাজের মনোবৃত্তিকে।

নবনূর, মহিলা, নবপ্রভা ভারত-মহিলা, আল-এসলাম, সওগাত ও *বঙ্গীয়* মুসলমান

সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত সতেরোটি প্রবন্ধ, দু খন্ড *মতিচুরে* (১৯০৬ ও ১৯২১) সংকলিত হয়। তাঁর অত্যন্ত স্বচ্ছ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, ভারতের জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের পরিপেক্ষিতে তাঁর উক্তি :

> আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি- আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের কংগ্রেস-অধিবেশন যখন ভেঙে গেল, বেগম রোকেয়া তখন লিখলেন *মুক্তিফল* গল্প, যার মর্মকথা হল এই যে, মুক্তির উপায় সম্পর্কে অতি প্রবীণ থেকে শুরু করে অতি নবীনদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধে মুক্তির সম্ভাবনা বিলম্বিত হচ্ছে : এ ক্ষেত্রে মেয়েরাই মায়ের সেবায় অগ্রসর হয়ে তাঁর মুক্তিসাধন করবেন। এটি, যাকে বলা যায়, ইউটোপিয়ান রচনা। অবশ্য বেগম রোকেয়া জানতেন যে তাঁর অভীষ্ট ভবিষ্যতে উপনীত হতে হলে বহু সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন এবং তার জন্যে মূল্য দিতে হবে। এই মূল্যদানের জন্য বাঙালী নারীসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন।

> এ পোড়া সংসারে আর কোন ভাল কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? 'পৃথিবীর গতি আছে' এই কথা বলাতে মহাত্মা, গ্যালিলিও (Galileo)-কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভাল কথা বা ভাল কাজের বর্তমানে আদর হয় না।...
>
> প্রথমে জাগিয়ে উঠা সহজ নহে, জানি, সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি, ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর (অর্থ্যাৎ প্রাণদন্ডের) বিধান দিবেন এবং চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন জানি! (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হইক পৃথিবী ঘুরিতেছে (but nevertheless it (earth) does move)। আমাদিগকেও এইরূপ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।... [*স্ত্রী জাতির অবনতি*]

পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি এই জাগরণের প্রধান অন্তরায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> গোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্যজাতিদেরই কোন না কোন রূপ অবরোধ-প্রথা আছে।
>
> তবে সকল নিয়মেরই একটি সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।...
>
> যাহা হউক ঐ সকল কৃত্রিম পর্দ্দা moderate করিতে হইবে।... আমরা অন্যায় পর্দ্দা ছাড়িয়া আবশ্যকী পর্দ্দা রাখিব।...
>
> শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি- তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হউক। ['বোরকা']

আমাদের স্ত্রী-পুরুষের অসাম্য সম্পর্কে একটি কৌতুককর চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন

'অৰ্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে :

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সূদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য্যমন্ডলের ঘনফল তুলাদন্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন।

এই অসাম্যের বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে :

> যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না,- সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

এই ধরনের ব্যঙ্গরচনার একটি সার্থক নমুনা *নিরীহ বাঙ্গালী*। *নবনূরে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে [২৭] তিনি 'দেবতাদের অনুকরণে' সৃষ্ট পীরদের *নজর ও নেয়াজ* দেবার যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচরিত হয়েছে, তার সমালোচনা করেছেন।

লেখিকার 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটি প্রথমে ইংরেজীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, পরে তাঁর স্ব-কৃত অনুবাদ *মতিচুর* দ্বিতীয় খন্ডে সংকলিত হয়।

অবরোধবাসিনী (১৯২৮) তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা। 'খান্দানী জমিদার ঘরে, কি সাধারণ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরে, অবরোধের নামে নাবীত্বের ও মনুষত্বের অবমাননা বহুকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত আছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বর্ণনা ও গল্পের সাহায্যে এমন অনেক মুসলিম মহিলার পর্দা রক্ষার কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে, যা পড়তে গেলে অবিশ্বাস্য মনে হয় ও অতিরঞ্জত ঠেকে।— বেগম রোকেয়া এমন অনেক করুণ চিত্র এঁকেছেন তাঁর অবরোধবাসিনীতে।'[২৮] *পদ্মরাগ* তাঁর অপর রচনা।

সামাজিক কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়ার অভিযান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একালের সাহিত্যে তিনিই প্রথম মুসলমান লেখিকা, কিন্তু নারীসুলভ জড়তা তাঁর নেই : সমাজকল্যাণের স্বপ্ন তাঁকে সংগ্রামে প্ররোচিত করেছিলো। সেই সংগ্রামে পরিণামে রক্ষণশীলতায় পরাজয় ঘটেছে, এটা তাঁর সার্থকতার চরম নিদর্শন।

এগারো

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যকর্মে—বিশেষতঃ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে—ঐতিহ্য-গর্বের প্রকাশ অর্থাৎ মুসলমানের গৌরবযুগের কাহিনীরচনার এবং আদর্শ জীবনবন্দনার প্রয়াস এবং হিন্দু সমাজের কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের প্রত্যুত্তর দেবার প্রচেষ্টা যতখানি দেখা যায়, সেই তুলনায় আত্মসমালোচনার প্রবৃত্তি কম দেখা দিয়েছে। মোজাম্মেল হকের *জোহরা*য় সমাজের কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা চকিতের জন্যে ধরা পড়েছে—অনুচ্চকণ্ঠে লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রবন্ধাবলীতে বরঞ্চ কিছু কিছু সমালোচনা আছে। তবে আমাদের সামজের গ্লানিময় দিকটা বিশেষ করে উদ্ঘাটন করলেন দুই উদারহৃদয়

সাহিত্যব্রতী : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)।

এই শতাব্দীর শুরু থেকেই ইমদাদুল হক সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন। *নবনূর* ও *ভারতী* পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর প্রথম বই সম্ভবত কবিতা সংগ্রহ *আঁখিজল* (১৯০০) বইটি আমরা দেখি নি—তবে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতাসমূহ থেকে অনুমান করা যায়, ইমদাদুল হক কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ *মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা* (১৯০৪) পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে *ভারতী* তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল (১৩১০)। তৃতীয় বই *নবীকাহিনী* শিশুদের জন্যে বারোজন পয়গম্বরের জীবনকাহিনীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। চতুর্থ গ্রন্থ প্রবন্ধমালা'য় পাঁচটি নতুন প্রবন্ধের সঙ্গে 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা' পুনর্মুদ্রিত হয়। *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস *আবদুল্লাহ্* তাঁর মৃত্যুর পর আনোয়ারুল কাদীর কর্তৃক সম্পূর্ণীকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় (১৯৩৩)।

মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা তাঁকে প্রথম থেকেই চিন্তিত করে তুলেছিল। তবে সেকালের মুসলমান লেখকদের মতো ঐতিহ্যগর্ব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করেছিল। এটা সে যুগের পরিবেশের ফল বলতে হবে। ঐাতহ্যগর্বের পরিচয় তাঁর *মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা* তে পাই- সেখানে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মুসলমানেরাই আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা। সমসাময়িক একটি প্রবন্ধে তাঁর এই গর্ববোধের চমৎকার পরিচয় আছে। সাবিত্রী প্রবন্ধাবলীর একটিতে – 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা'য় – শ্যামাসুন্দরী দেবী মুসলমান রমণীর দুরবস্থা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেন, তার জবাবে ইমদাদুল হক লেখেন 'হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা'। এতে তিনি বলেন :

> স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের ভারতীয় মুসলমান সমাজে আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে কোন মুসলমান সমাজকে তাহার অভাবে হাহাকার করিতে হয় না। হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ত শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে, যে ভারতবাসী মুষ্টিমেয় মুসলমানের যাহা নাই, মুসলমান জাতিটাতেই তাহা নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে !...
>
> স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মান, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে প্রদর্শন এবং নারীজাতিকে চিরদাসীত্বে পরিণত যদি কোন জাতি করিয়া থাকে, তা সে হিন্দু।[২৯]

এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় মুসলমানদের শিক্ষাবিষয়ক নবাব আবদুল লতিফের প্রবন্ধটির আলোচনা-সভার কথা। সেখানে প্যারীচাঁদ মিত্র মুসলমান নারীর শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলভী আবদুল হাকীম জবাব দিয়েছিলেন যে, হযরত মুহম্মদের (দঃ) সময় থেকে মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আসছেন, ইত্যাদি।[৩০] অর্থ্যাৎ আত্মাভিমান থেকে বর্তমান সমস্যা এড়িয়ে তাঁরা চলে গেলেন অতীতে বা অন্য দেশে। ইমদাদুল হকও আত্মাভিমানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তবে তিনি অন্ধতার পরিচয় দেননি। অব্যবহিত পরে রচিত একটি প্রবন্ধে[৩১] তিনি বলেছেন যে,

হিন্দুরা শিক্ষালাভ করে সমাজের কল্যাণসাধন করেছেন, অন্যদিকে মুসলমানেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাঁদের পতন ঘটেছে। সম্প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে—শিক্ষার প্রচলন না হলে আমাদের কোন আশা নাই।

নবনূর পত্রিকায় 'বিমলা' নামে সৈয়দ এমদাদ আলীর একটি গল্প প্রকাশিত হয়।[৩২] সেখানে বিমলার সঙ্গে একটি মুসলমান তরুণের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে : পরিণামে যুবকটি ভেবেছে যে, 'পরজগতে বিমলাকে পাইব। সে ত আমারই।' গল্পটি তখনকার দিনে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন 'মাতৃভাষা' শিরোনামায় লেখা লিখিত একটি প্রবন্ধে[৩৩] এই গল্পটি সম্পর্কে আপত্তি করে বলেন যে, এতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাকে অপমান করা হয়েছে। *নবনূর* - সম্পাদক এর প্রতিবাদ করেন[৩৪] এবং ইমদাদুল হক এই উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৩৫] তিনি বলেন যে, 'বিমলা' গল্প নিয়ে এত আপত্তি উঠেছে, অথচ রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' ও নগেন্দ্রনাথের *মিলন* গল্প নিয়ে আপত্তি উঠেনি কেন? মুসলমান নায়িকা ও হিন্দু নায়কের প্রেমচিত্র সহনীয় হলে বিপরীতটা অগ্রাহ্য হবে কেন?

উপরের আলোচনা থেকে ইমদাদুল হকের উপরে সমকালীন পরিবেশ ও ভাবধারার প্রভাব বোঝা যাবে। 'প্রবন্ধমালায় 'আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার', স্পেনের মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক 'আব্দুর রহমানের কীর্তি' 'ফ্রান্সে মোসলেম অধিকার', 'আলহামরা' ও 'পাগলা খলিফা' সম্পর্কে আলোচনার মূলে যে মনোবৃত্তি কাজ করেছে, তাও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীন চিত্তের ও মৌলিক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে। এ বইটি বাঙালী মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ পরিহার্য রীতিনীতি-সমালোচনার এক স্মরণীয় প্রচেষ্টা।

আবদুল্লাহ উপন্যাসে আমাদের সামাজিক সমস্যার অনেকগুলো দিক আলোচিত হয়েছে। প্রথমে দেখা যায় পীরবাদ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি। আবদুল্লাহ্ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, কিন্তু কুসংস্কার বিরোধী। পীবপ্রথা সম্পর্কে তাঁব উক্তি: 'এই পীর-মুরীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখাদেখিই শেখা, নইলে হজরত ত নিজেই মানা করে গেছেন, কেউ যেন ধর্ম সম্বন্ধে হেদায়েত করে পয়সা না নেয়।' [পৃঃ ২৬] শুধু তাই নয়। শাহ্পাড়ার কাসেম গোলদারের বাড়ীতে আবদুল্লাহ্ 'নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বসিয়া বসিয়া' তাঁর পূর্বপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার 'সরল বিশ্বাসের উচ্ছাস-রঞ্জিত উপাখ্যানগুলি জীর্ণ করিতেছিল।...অতপর আবদুল্লাহ শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, পুত্রের পীরত্বে পিতার হৃদয়ে এরূপ সাংঘাতিক হিংসার উদ্রেক আরোপ করিয়া ইহারা পীর মাহাত্ম্যের কি অদ্ভুত আদর্শই মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছে!' [পৃঃ ২০]

আশরাফ-আতরাফ সমস্যা আমাদের সমাজে কি মূর্তি ধারণ করেছে লেখক তাও উদ্ঘাটন করেছেন। সৈয়দ সাহেবের মাদ্রাসায় পাঠদানের বৈষম্য দেখে বিস্মিত হয়ে আবদুল্লাহ মৌলভী সাহেবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন।

মৌলভী সাহেব আবদুল্লাহ্র আরো কাছে ঘেসিয়া আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিতে

লাগিলেন, 'খতাডা খি, বোজ্‌লেন নি দুল্‌হা মিয়া ? অরা অইলো গিয়া আতরাফগোর ফোলাফান অরা এই সব মিয়াগোরের হমান হমান চল্‌তাম ফারে? অরগো জিয়াদা সবক দেওয়া মানা আছে, বোজলেন নি?'

'কার মানা?'

'খোদ সা'বের! তিনি আইস্যা দহলিজে বইস্যা হুনেন খারে খি সবক দি না দি।'...সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তা ওদের পড়তে আসতে দেন কেন ? একেবারেই যদি ওদের না পড়ান হয়, সেই ভালো নয় কি ?' এই কথায় মৌলভী সাহেবের হৃদয়ে করুণা উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'অহঃ, হেডা কাম ভাল অয় না, দুলহা মিয়া! গরীব তালবেলম হিক্‌বার চায়, এক্কেকালে নৈরাশ করলে খোদার কাছে কি জবাব দিমু? গোম্‌রারে এলেম দেওনে বহুৎ সওয়াব আছে কেতাবে ল্যাহে।' ।৮৪।

এই সমস্যা চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে বরিহাটিতে—সৈয়দ সাহেব যখন মসজিদের ইমাম জোলা বলে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়তে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করেছেন আর তথাকথিত সুফী সাহেব নীরবে সৈয়দকে সমর্থন জানিয়েছেন।

এই বংশাভিমানের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্ এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। পীর-ব্যবসা তিনি ত্যাগ করেছেন, জোলা ইমামের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন, উচ্চবংশের ছেলের চাকুরী করাটা যখন অশিষ্ট বলে গণ্য হত, তিনি তখন স্বোপার্জনে নেমেছেন। বংশ মর্যাদা প্রসঙ্গে মীর সাহেব বলেছেন, 'কবরের ওপারের দিকে তাকাবার আমি কোন দরকার দেখি নে।' তিনি 'immediate environment'-এর মূল্য বেশী দিতে চেয়েছেন। গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ই এখানে ধ্বনিত হয়েছে।

ওয়াহাবীদের গোঁড়ামীর ছাপবর্জিত হলেও তাঁদের পিউরিট্যানিক মনোভাবের প্রভাব যে ইমদাদুল হকের উপরে পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত বিধবাবিবাহের সমর্থনের এবং মৌলুদ শরীফ সম্পর্কে মনোভাবের দিক দিয়ে ওয়াহাবী মতের সঙ্গে তাঁর ঐক্য মিলবে। তবে সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের সমস্যা তাঁকে নতুন পথসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। পর্দা-প্রথার শ্বাসরুদ্ধকর কড়াকড়ির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ বিদ্রোহ করেছেন। পল্লীসমাজের পরনিন্দা-প্রবৃত্তি এবং খাতকের প্রতি মহাজনের অত্যাচার-চিত্র উদ্‌ঘাটনে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের তিনি পর্যালোচনা করেছেন, কিন্তু সম্প্রদায় নয়- ব্যক্তিবিশেষকেই তিনি অভিযুক্ত করেছেন। আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে হিন্দু সমাজের অনেকে যেমন শঠতা করেছেন, তেমনি উদারহৃদয় ডাক্তার দেবনাথ সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারার ধারক সৈয়দ সাহেব এবং নবীনতার ধারক আবদুল্লাহ্ ও আবদুল কাদেরের সংঘর্ষে নবীনেরই জয় হয়েছে। লেখক ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সমাজকে সজীব ও সচল রাখতে হলে সকল সামাজিক মূঢ়তা ত্যাগ করে শিক্ষার আলোকে স্নাত হয়ে বাস্তব জগতে পদার্পণ করতে হবে।

বারো

যশোরের ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) পেশা ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, কিন্তু নেশা ছিল সাহিত্যে ও সমাজকর্মে। তিনি কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন বটে কিন্তু প্রবন্ধরচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা মুক্তি পেয়েছে। ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতায়, প্রকাশের কৌশল এবং চিন্তার মৌলিকতায় তাঁর প্রবন্ধাবলী বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সম্ভবত *বৃহৎ ডন কুইকজোটের অনুবাদ*। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা চল্লিশটি কবিতার সংগ্রহ প্রকাশ [১৯১৫] তাঁর প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। ভূমিকায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁকে কাব্যক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সিরাজীর সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল দেখি না। তাঁর কবিতাবলীর বিষয় সাধারণত: প্রেম, মানবপ্রীতি ও নীতিবোধ। কতিপয় রচনা দুর্বল, তবে তার চরণের কয়েকটি ভাল কবিতাও আছে। উনিশ শতকী নীতিকবিতা এবং রাবীন্দ্রিক গীতি-কবিতার ছাপ এসব রচনায় অল্পবিস্তর দেখা যায়। প্রথমটির উদাহরণ 'স্বাধীনতা' কবিতা :

অসত্য কলুষ যার হৃদয়ে না পশে
অনুগ্রহ আশে কর পাতে না যে জন,
বীর গরীয়ান সেই স্বাধীন পুরুষ
প্রয়োজনে হাসিমুখে লভে সে মরণ।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ, 'নাই', রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতার স্মারক :

কহিছে পরাণ কাঁদি—নাই, নাই, নাই,
রৌদ্রদগ্ধ বক্ষভরা বিশ্বপানে চাই।
যারে চাই এ ধরায় তারে পাই নাই,
নীরস লোহায় বাঁধা জীবন কাটাই,
কোথা তৃপ্তি, কোথা প্রেম, কোথা ভালবাসা?
অসত্যের ঘর বাঁধি মিছামিছি হাসা।

লুৎফর রহমানের উপন্যাসরচনার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর আদর্শবাদী মনের প্রকাশ। ব্যক্তির উন্নতি যেমন তাঁর আত্যন্তিক কামনা, সমাজ-সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তেমনি তাঁর প্রবল। উপন্যাস হিসেবে এগুলোর কোনটাই সার্থক হয়নি তাঁর এই সামাজিক কল্যাণমূলক আদর্শ উপন্যাসে আরোপিত হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কাহিনীর অগ্রগতি সাধনের পরিবর্তে এই সব উপন্যাসে তিনি ব্যক্তির সংকট এবং সামাজিক সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। *সরলা* য় (১৯১৭) একটি পথভ্রান্ত নারীর জীবনসমস্যা এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তার প্রাণপণ সংগ্রাম বিবৃত হয়েছে। 'এ উপন্যাসটিতেও চরিত্র-চিত্রণ নেই, আছে শুধু আদর্শ ব্যাখ্যানোপযোগী ঘটনার বর্ণনা'[৩৬] *পথহারা* র[৩৭] চরিত্রসংখ্যা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশী। বিভিন্ন চরিত্রের জীবনকাহিনী বর্ণনার সূত্রগুলো অসংলগ্ন। হিন্দু বিধবার দুরবস্থা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনাদর, হিন্দুর ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রভৃতির আলোচনা আছে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ পতিতাবৃত্তি প্রসারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রকারান্তরে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। *রায়হানে* র (১৯১৯) আদর্শবাদী

নায়কও তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা লেখকের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। *প্রীতি-উপহার* (১৯২৭) 'মেয়েদের জন্য' 'তাহাদের বধূ জীবনের মঙ্গলকামনায়' রচিত হয়, স্ত্রীকে বইটি উৎসর্গ করে তিনি বলছেন, 'প্রার্থনা করি অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরের ভাষা আর বেদনার বাণী তাহার চিত্তে ধ্বনি লাভ করুক'। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারকে উচ্চচিন্তা এবং উন্নত জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত করান, পরিবারে শান্তি, সুখ এবং ধর্ম্মভাব জাগ্রত করানই, আমার এই ধরনের পুস্তক লিখিবার একমাত্র উদ্দেশ্যে।

চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা হালিমার বিবাহ স্থির হয়েছে, সেই উপলক্ষে তার ভাবী কুলসুম সাংসারিক জীবন সম্পর্কে নানারকম উপদেশ দিচ্ছেন। এই কথোপকথন উপন্যাসের অধিকাংশ স্থান নিয়েছে। দু'তিনটে অধ্যায়ে অন্যান্য চরিত্র দেখা দিয়েছে। প্রসংঙ্গত বিদেশী পণ্যবর্জনের সমর্থন আছে। *বাসর-উপহার* নামে তাঁর আরো একটি উপন্যাস আছে।

প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূরণ হয়েছে। *মানবজীবন* (১৯৩৬) ও *উন্নত জীবন* তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আশ্চর্য সারল্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধমাত্রই ভাবাশ্রিত রচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আদলে গড়া। এই অনায়াস কথনভঙ্গী, অল্পকথায় অধিক বলা তাঁর বিশেষরীতি। মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেবল এয়াকুব আলী চৌধুরী ও বেগম রোকেয়া এক্ষেত্রে তাঁর তুল্য। তাঁর চিন্তার ও প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে প্রতিয়মান হবে।

মানবজীবনের 'আল্লা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব। 'সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন।... তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে।' এই উপলব্ধি থেকে 'স্বভাবগঠন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> খোদার জন্য যে তর্ক করে, তার মূল্য খুব কম। এসলাম শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলবার জন্যে যে মহা আস্ফালন করে, তারও মূল্য খুব কম। যে মিথ্যা পরিহার করে, আপন স্বভাব গঠন করে সেই প্রকৃত খোদাভক্ত, সেই পরম শান্তিতে আছে সেই মুসলমান। মুসলমানের অর্থ তর্ক নয়, আস্ফালন নয়, এর অর্থ নীরবে নিজেকে গঠন করে তোলা। এসলাম মানে কাজ—বাক্য নয়।

অনুরূপ মাপকাঠিতে তিনি ইসলামের বর্তমান অবস্থার পুনর্বিচার করতে চেয়েছেন, বৃথা ঐতিহ্যগর্ভে আন্দোলিত হন নি। 'প্রেম' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> খৃষ্টান ধর্ম্ম আজ এত সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে ইসলাম ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে। আল্লার মঙ্গলবাণী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, তার ফলে ইঞ্জিল কেতাবের দীপ্তি ইউরোপবাসীর চোখে সমুজ্জল হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। (সত্যের মর্য্যাদার জন্য একথাও বলতে হবে, আজ খৃষ্টান জাতি এবং তাদের culture ইসলামের সৌন্দর্য্য নূতন করে অনুভব করতে আমাদিগকে সাহায্য করেছে। কার কতখানি কৃতিত্ব,... মানুষের মানুষ্যত্ব, প্রেম, বিনয়, তার নিজস্ব মূল কি, তাই দেখতে হবে।)

স্যর সৈয়দ যেমন ইওরোপীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য স্বীকার করেছিলেন, পরে কিন্তু তেমনি আবার ইউরোপীয় সভ্যতার চাইতে ইসলামকে বড় বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলেছিল হালীর কাব্যে, আমীর আলীর প্রবন্ধে ও নোমানীর গবেষণায়। সমকালে ইকবালও ইওরোপের সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। লুৎফর রহমান কিন্তু ইওরোপের মানবতাবাদের মূল্য নির্ণয়ে ভুল করেননি, তবে সেটাকে খৃস্টান আদর্শ বলে আখ্যাত করা তাঁর সংগত হয়নি। আমাদের আচরিত ধর্মজীবনকেও তিনি সমালোচনা করেছেন 'সেবা' প্রবন্ধে :

> সাধু ও মারফত-পন্থী বুজর্গ বল্লে আমরা বুঝি তিনি দিবারাত্র ঘরের মধ্যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেন —দোওয়া পড়ে রোগীকে রোগমুক্ত করেন। বুজর্গের ইহাই ভাব নয়। ইহা ধর্মহীন লোকের চালাকী। সেবক শুধু দরুদ পড়েন না, সেবাকার্য্যের প্রয়োজন হলে প্রাণ দেন। সেবায় তাঁর কোন অহঙ্কার নাই।

খৃস্টান মিশনারীদের আর্তসেবা এখানে হয়তো তাঁর মনে পড়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী সক্রিয় হয়েছে তাঁর এই ধারণা যে, মানুষের মধ্যেই স্রষ্টা আছেন এবং সকল ধর্মে স্রষ্টার কাছে প্রণতি জানাবার যে রীতি আছে, তার সার্থকতম উপায় মানবহিতৈষণায় পাওয়া যাবে।

উন্নত জীবনেও এই মানবপ্রীতির অভিব্যক্তি প্রথম ও প্রধান কথা। তিনি বলেছেন :

> কোন জাতিকে যদি বলা হয়—তোমরা বড় হও, তোমরা জাগ, তাতে ভাল কাজ হয় বলে মনে হয় না—এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি। পল্লীর অজ্ঞাত অবজ্ঞাত এক একটা মানুষের কথা ভাবতে হবে।

মানুষের উন্নতির জন্য—তিনি বলেছেন—প্রয়োজন তার চিত্তে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগানো, মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন করা, তার চলার পথ নির্বিঘ্ন করা। অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, সাধনা, চরিত্রশক্তি ও আদর্শ প্রভৃতি সদ্‌গুণের মূল্য উপলব্ধি করে, জীবনে এসবের চর্চা করলে মানুষ বড় হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিকতার মূল্য তিনি কখনোই স্বীকার করেন নি :

> জ্ঞান, চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও কর্ম্ম ছাড়া যদি আধ্যাত্মিকতা স্বতন্ত্র জিনিষ হয়, তবে সে আধ্যাত্মিকতায় কোন কাজ নেই।

সত্য ও কর্মের আদর্শ প্রতিপালন করতেন বলে মধ্যযুগের ইওরোপীয় নাইটদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা যে নারীর সম্মান দিতে জানতেন, সেকথা লুৎফর রহমান বারবার মনে করেছেন। উপন্যাসের মাধ্যমেই নারীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা তিনি করেন নি, *নারীশক্তি* বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ এবং *নারীতীর্থ* নামে একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *মহৎজীবনে* ও *সত্যজীবনেও* এই আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ও সংকীর্ণতার বন্ধনে আবদ্ধ দেশবাসীকে এই পথে ডাক দিয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল।

কিশোরদের উপযোগী তাঁর অন্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম : *ছেলেদের মহত্ত্ব কথা, ছেলেদের কারবালা* ও *রানী হেলেন*।

তেরো

একালের মুসলমান কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পাবনা জেলার অধিবাসী। নর্মাল স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি শিক্ষতায় আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়েই তিনি সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম বই *বিলাতী বর্জ্জন-রহস্য* (১৯০৫) লেখা হয় স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষে। বইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এরপরই ১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের জন্ম-সভায় তিনি যোগ দেন।[৩৮] তবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কর্ম—কোলাহলের বাইরে—সুদূর পল্লীতে শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টায় এবং সাহিত্য-রচনায়।

আনোয়ারা (১৯১৪) তাঁর প্রথম সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। সতী নারীর আদর্শ জীবন কেমন হওয়া উচিত, এতে নজিবর রহমান তাই বলতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে তখনকার বাস্তব অবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ও তার সার্থকতা বর্ণিত হয়েছে। পল্লীসমাজের গ্লানির দিকটা—পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, নীতিবোধ ও শিক্ষার অভাব, মিথ্যা কুৎসারটনা, দলাদলি ও চক্রান্ত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আন্তরিকতা প্রভৃতি—তিনি বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। মনে হয় বংশের আভিজাত্যে লেখকের কিছুটা আস্থা ছিল। আর উপদেশদানের প্রবৃত্তি ছিল অত্যন্ত বেশী। এই জন্যে আনোয়ারা অনেকখানি নিষ্প্রাণ হয়েছে, তুলনায় পার্শ্বচরিত্রেরা সজীব। তবে সমগ্র বইটি থেকে বোঝা যায় যে, লেখকের অভিপ্রায় এই যে, বাঙালী মুসলমান যেন শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয়, চাকরির চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেন তারা অধিকতর মনোনিবেশ করে।

আনোয়ারার পরিশিষ্ট হিসেবে তিনি লেখেন *প্রেমের সমাধি*, কিন্তু বস্তুত এ দুইয়ের মধ্যে কোন যোগ নেই। প্রথমোক্ত বইতে লেখক মোটামুটি বাস্তবতার দাবি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পরেরটিতে যোগ করেছেন অলৌকিকতা। বাংলাদেশে সতী নারীর প্রার্থনায় বাগদাদের গাছে ফুল ফুটবে,— বিশ্বাসী মনের কাছে এটা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস যেহেতু বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘনের অধিকারী নয়, সেজন্য এতে কোন আখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, বাস্তব অর্থে যার ব্যাখ্যা চলে না। এখানে মূলত প্রাচীন আদর্শে সতী নারীর পতিভক্তির মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে। স্কুলস্থাপন নিয়ে যেসব দ্বন্দের কথা বলা হয়েছে, তা সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কংকটের পরিচায়ক।

গরীবের মেয়ে (১৯২৩) একই আদর্শপ্রণোদিত সামাজিক উপন্যাস। বাঙালী মুসলমানের অশিক্ষা এবং তজ্জনিত অন্যান্য ক্রটির সমালোচনা এতে আছে। লেখক যে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এ বইতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। *গরীবের মেয়েতে* সম্ভবত তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পরিণাম- এ দেখা যায় হিন্দু নায়েবের চক্রান্তে মুসলমান জমিদার পরিবারে ভাঙন ও বিবাদ ধরল ; অন্যপক্ষে কূপমন্ডূকতা-জনিত আমাদের অন্যান্য সামাজিক গ্লানির উদ্ঘাটনও এতে আছে। স্থানে স্থানে লেখকের কল্পনা ঔচিত্যবিরোধী। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং কাফেরের ইসলাম গ্রহণে গ্রন্থ-সমাপ্তি।

চাঁদ-তারা বা হাসনগঙ্গা বাহমনি' দূর ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস। মুসলমান

যুবকের প্রতি হিন্দুকন্যার আসক্তি এবং তাদের পরিণয় দেখিয়ে সেকালে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছিল, এটি তার অন্যতম। লেখক এক জায়গায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন :

> আমরা চাই প্রত্যেকের ধর্ম্মে বাস্তবিক যেটুকু নিষেধ বিধি আছে তাহা মানিয়া চলিয়া হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ভাই ভাই গলায় গলায় মিশিয়া যাও, এক বিছানায় ওঠা বসা কর, আলাপ পরিচয়ে পরস্পরের পারিবারিক কুশল অবগত হও, ছুটির পর একে অন্যের বাসায় যাও, মিলিয়া মিশিয়া আমোদ কর··· । এইরূপে একের দয়া, প্রেম-প্রীতি মৈত্রী মঙ্গলেচ্ছার বীজ অন্যের হৃদয়ে বপন কর ।··· ফলতঃ যখন তোমাতে আমাতে এইরূপ এক হইয়া এক অপূর্ব মহান ভাবের সৃষ্টি করিবে তখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গল প্রকৃত উন্নতি হইবে। [২২-২৩]

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উন্নত জীবনযাত্রার আদর্শ অমুসলমানদের জীবনে অনুসৃত হয়ে থাকলে নজিবর রহমান তাকে আদর্শ বলে আখ্যা দিতে কার্পণ্য করেন নি। [৩৭১]

নজিবর রহমানের অন্যান্য গ্রন্থ : *সাহিত্য প্রসঙ্গ* (১৩১১) *দুনিয়া আর চাই না* (১৯২৩) ও *মেহেরউন্নিসা* (১৯২৩?)।

নজিবর রহমানের শিক্ষা ও কল্পনাশক্তি পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে ভাবধারা বা রচনা নৈপুণ্যের দিক দিয়ে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে তিনি পারেন নি। তাঁর রচনায় লোকপ্রিয় বিষয়বস্তু—যেমন সতীত্বের জোর—জটিলতামুক্ত রূপ লাভ করেছে বলে অল্পশিক্ষিত পাঠকমহলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাত করে তিনি সামাজিক প্রগতির সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু নজিবর রহমান যেকালে এসব বিষয় নিয়ে লিখেছেন, সেকালে মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে : ফলে এখানেও তিনি সমাজকে নতুন কোন পথ দেখান নি বা আঘাত করেন নি।

চোদ্দ

এয়াকুব আলী চৌধুরীর অগ্রজ এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওসন আলী চৌধুরী গ্রন্থাকার ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সাধনার পরিচয় সর্বজনবিদিত হয়েছিল *কোহিনুর*[৩৯] পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনায়। ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে (১৮৯৮) এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে সম্পাদক বলছেন :

> হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থ *কোহিনুর* প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।···
>
> সভ্যতালোকে দেশ আলোকিত হইবার পর কত পত্র, কত পত্রিকাই না প্রকাশিত হইল, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখকগণকে একত্রিত ও একসূত্রে গ্রথিত করিয়া কখন কোন পত্র বা পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে ?

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় পত্রিকা-প্রকাশের প্রচেষ্টা একেবারে যে অভিনব, তা

বলা যায় না। ইতঃপূর্বে প্রচারিত *আহমদী*[৪০] এবং সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধন। তবে এই পত্রিকা দুটির অপেক্ষা *কোহিনুর* ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল এবং সাহিত্য পত্রিকারূপে এর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মুজমদার, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামপ্রাণ গুপ্ত, শশাঙ্কমোহন সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, পাঁচকড়ি দে, কালিদাস রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অমুসলমান কৃতবিদ্য লেখকদের রচনায় *কোহিনুর* সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলমান লেখকদের মধ্যে লিখতেন কায়কোবাদ, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ওসমান আলী, মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, নূরন্নেসা খাতুন, মোহাম্মদ কে. চাঁদ. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (পরে ডক্টর), কাজী ইমদাদুল হক, শেখ হবিবর রহমান প্রভৃতি।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে *কোহিনুরে* প্রায় নিয়মিত রচনা প্রকাশিত হত।[৪২] তুরস্ক সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয়ও এতে ছিল। মুসলিম তাপস ও রাজনদের বৃত্তান্তের[৪৩] পাশাপাশি হালীর *মুসদ্দসের* অনুবাদ এবং বাঙালী মুসলমানের সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের আলোচনায় কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-স্মৃতির চর্চা করা হয় নি, বরঞ্চ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় প্রবন্ধ ও কবিতা মুদ্রিত হয়। মশাররফ হোসেন ও ওসমান আলীর রচনার কথা ইতঃপূর্বে বলেছি।[৪৪] হিন্দু লেখকদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার আর মুসলমান লেখকদের মধ্যে (ভোলার) মুহম্মদ মোজাম্মেল হকের নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয়। মোজাম্মেল হকের *হিন্দু-মুসলমান* কবিতা থেকে একটু উদ্ধৃত করি :

আজি ভাই, শুভ লগ্নে ভুলে যাও মম
অতীতের শত অপরাধ
আমিও তোমারে ক্ষমি প্রীতিভরে আজ
ভাঙ্গিতেছি ভিন্নতার বাঁধ
তোমারো যে দেশ সে যে আমারো স্বদেশ,
—উভয়ের এক জন্মভূমি,
এক গঙ্গাজলে তোষে দোঁহে চিরদিন
হিমাদ্রির পাদদেশ চুমি।[৪৫]

অনতিবিলম্বে মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় মঙ্গল' (১৯০৯)[৪৬] কাব্য প্রকাশিত হয়। বৃথা ঐতিহ্যগর্বের বদলে কর্মের পথে অগ্রসর হবার জন্যে বাঙালী মুসলমানকে এই কাব্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

বাঙালী মুসলমানের ভাষা-সমস্যাও *কোহিনুরে* আলোচিত হয়েছিল। এয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে মূল মনোভাবটা বোধগম্য হবে :

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তাসৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না

কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।... সুতরাং জনসমাজকে উর্দ্দু শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা-বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না। ...ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।[৪৭]

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে লর্ড কার্জন যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে এদেশবাসীর প্রতি তাঁর অবজ্ঞা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিবাদ করে জানকীনাথ পাল শাস্ত্রী একটি প্রবন্ধ লেখেন। *কোহিনুর* সম্পাদক সেটি পত্রস্থ করে[৪৮] সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাজশক্তিকে তুষ্ট রাখার রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

কোহিনুর পত্রিকা সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণের আদর্শকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পরাধীনের ঐক্য এর লক্ষ্য ছিল।

পনেরো

সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত *নবনূর* (১৯০৩-০৬) যে কেবল উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তা নয়। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে এই পত্রিকায় নিয়মিত রচনা প্রকাশিত হত। *কোহিনুরের* মতো *নবনূর*ও ছিল হিন্দু-মুসলমানেব মিলনপ্রার্থী। *হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তৎপ্রতিকারের উপায়* সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার জন্যে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ দুটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন : একটি হিন্দু লেখকের জন্যে, অপরটি মুসলমান লেখকের জন্যে।[৪৯] এই পত্রিকা যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, ওসমান আলি, ইমদাদুল হক, আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং যদুনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, চারুচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নিশিকান্ত চক্রবর্তী, সরলাবালা দেবী ও অনুপমা দেবী।

মুসলমান-সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার মতো এতেও ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতির আলোচনা থাকত। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকের তুলনায় অমুসলমান লেখকেরা বেশী লিখেছিলেন কি না, তা সহজে বলা যায় না। চারুচন্দ্র মিত্রের *'ধর্মযুদ্ধ'*[৫০] ও *'কোরাণ শরীফের ইতিবৃত্ত'*[৫১], রামপ্রাণ গুপ্তের *'খলিফাগণের শাসননীতি'*,[৫২] *'সুলতান সালাদীন'*[৫৩] ও *'মোগল রাজ-বংশ'*[৫৪], কেশবচন্দ্র গুপ্তের 'মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস'[৫৫] ও *'আওরঙ্গজেবের পুত্রকন্যাগণ'*[৫৬] প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী,[৫৭] তসলিমউদ্দীন আহ্‌মদের কুরআন-অনুবাদ অংশত এতে প্রকাশিত হয়েছিল,[৫৮] *'খলিফাগণের শাসননীতি'* সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে সুবৃহৎ আলোচনার অবতারণা করেন ফজলর রহমান খাঁ,[৫৯] আওরঙ্গজেব- সম্পর্কে অনেকগুলো প্রবন্ধের মধ্যে এস. এম. এ. আহাদের আলোচনা[৬০] উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দীর *'আরবীয় দর্শনালোচনা'*[৬১] এবং মোহাম্মদ কে. চাঁদের *'হাই ইবনে ইয়কজান'* এই ধারায়

মূল্যবান সংযোজন।[৬২] নির্মলচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ করেন *মুসদ্দস-ই-হালীর*।[৬৩] পরে সতীশচন্দ্র রায় কৃত কালিদাসের *ঋতুসংহারে'র* অনুবাদ বের হয়।[৬৪]

এই ভারসাম্য ও সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা সত্ত্বেও হিন্দু লেখকের অঙ্কিত মুসলিম চরিত্র *নবনূরের* লেখকদেরকে বিচলিত না করে পারে নি। এ সম্পর্কে প্রথম রচনা *'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা'* মনোমোহন গোস্বামী রচিত ঐ নামের নাটকের বিরূপ সমালোচনা। এ প্রসঙ্গে *কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা* ছদ্মনামে জনৈক লেখক ক্ষুব্ধচিত্তে প্রশ্ন করেন :

> সাহিত্যরথী সুধীপ্রবর বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎসমাজকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছেন এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা ?[৬৬]

আফতাবউদ্দীন আহমদ,[৬৭] মোহাম্মদ ইসহাক,[৬৮] ইমদাদুল হক,[৬৯] ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিবর রহমান,[৭০] এবং সম্পাদক স্বয়ং[৭১] এ বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর শুনতে পাওয়া গেল মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ্‌র রচনায়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হিন্দু লেখকেরা এখন মুসলমানের গুণকীর্তনে *'পরাঙ্মুখ নহেন'* এবং এর প্রমাণস্বরূপ দৃষ্টান্ত দেখালেন রবীন্দ্রনাথের *'সতী'* নাটিকা ও ক্ষীরোদপ্রসাদের *'রঘুবীর'* নাটকের।[৭২]

হেদায়েতুল্লাহ্ এই প্রমাণ খুঁজে বের করেন প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির আশায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাঁর কাম্য ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তাই তিনি বলেছেন :

> এখনকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একত্রাবস্থানজনিত যে একটা সাম্য সংস্থাপিত হইয়া গেছে তাহার উচ্ছেদন বা উৎপাটন সম্ভবপর নহে। বিদেশীর যত কিছু যেরূপভাবেই আমাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন, এ সাম্য এ ঐক্য এ সামঞ্জস্য যাইবার নহে। তবে, এ সাম্য যে এখন অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ...
>
> ইংরাজ আমাদের উন্নয়ন কার্য্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাঁহার ভেদনীতিই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। ...আমরাও অন্য পথ লইব। ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করা একেবারে অসম্ভব নহে।[৭৩]

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ *নবনূরে* প্রকাশিত হয়। খায়রুন্নেসা মুসলমান নারীসমাজকে বিলাতী পণ্য বর্জন করার আহ্বান জানান,[৭৪] একিনউদ্দীন আহমদ *'সৃষ্টিছাড়া'* বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করেন,[৭৫] *'খয়েরখাহ্ মুন্‌শী'* মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণা দেন এই ভাষায় :

> ...গবর্ণমেন্টের মনোহর বাক্যের প্রলেপ মুসলমানের চক্ষু দীর্ঘকাল বন্ধ রাখিতে পারে নাই। ইংরাজদের কর্মশালার বহু দ্বার এ দেশীয়ের পক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট মুসলমান প্রীতির বশে তাহার একটাও খুলিয়া দেন নাই। ...গবর্ণমেন্টের নিকট হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিজাতি ; উভয়ের ক্ষমতালাভই ইংরাজের সমান স্বার্থবিরোধী।

> ফলতঃ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এজন্যই দেখা যাইতেছে যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ...মুসলমানগণ এক যুগ ধরিয়া গবর্ণমেন্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন। তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে?[৭৬]

কিন্তু মতান্তরও দেখা দিয়েছিল প্রবলভাবে। লেহাজউদ্দীন আহমদ বললেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম বর্তমানের জন্যে ভাল হলেও ভবিষ্যতের জন্যে অশুভকর হতে পারে।

> যখন The survival of the fittest -এর সময় আসিবে, তখন রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের অস্তিত্বও দৃষ্টিগোচর হইবে কিনা ঘোর সন্দেহের কথা। ...মুসলমানকে হয়ত তখন মুখনিঃসৃত পিয়াজের দুর্গন্ধাপরাধে সভা হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। অতএব ভাই হিন্দু, অগ্রে আমাদিগকে মুসলমান হইতে অবসরটুকু দাও, এবং পার যদি গিরিশবাবুর ন্যায় পুস্তকাদির অনুবাদ কার্য্যে আমাদের সহায় হও, তারপর রাজনীতিক্ষেত্রে এক হইতে ডাকিও।[৭৭]

হিন্দু-মুসলমান মিলনের আন্তরিক প্রবৃত্তি সত্ত্বেও সংশয়, অবিশ্বাস ও দুঃখবোধ সহজে যে দূর হতে পারত না, এ রচনাটি থেকে তার প্রমাণ পাই।

নবনূরের একজন প্রধান লেখিকা ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সম্পাদকও নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও মতদ্বৈধ ছিল। একজন লেখক সুস্পষ্টই বললেন, 'নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।'[৭৮] এমন কি নওশের আলী খান ইউসফজীর মতো উদার লেখকও বেগম রোকেয়াকে ঠাট্টা করে প্রবন্ধ লিখলেন।[৭৯] *মতিচুরের* সমালোচনায় *নবনূরের* সমালোচক বললেন যে, বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধ খৃস্টান মিশনারীদের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত এবং 'মতিচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে, আমরাও এমত আশা করিতে পারি না।'[৮০]

বোঝা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী মুসলমান একটা বড় রকম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে থেকে চলার পথ বেছে নিতে তার কিছুদিন সময় লেগেছিল।

এই পর্বান্তরের লক্ষণটি সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* (১৯১৮-১৯২২)। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এ পত্রিকায় সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, তার আবেগ ছিল ধর্মীয় নয়, মানবীয়। নজরুল ইসলামের আত্মপ্রকাশ হয় এই পত্রিকায় পৃষ্ঠায়। তাঁর রচনা ধারণ করে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার* মতো মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন-সম্পাদিত *সওগাত*ও (প্রথম প্রকাশ ১৯১৮) নবযুগের জয়যাত্রা ঘোষণা করে।

তথ্য-নির্দেশ

১. সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়, ১৪৭ ও ১০৬।
৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৪।
৪. ঐ, ১৯৪।
৫. এর বছর তিনেক পরে *কোহিনুর* পত্রিকায় (জৈষ্ঠ ভাদ্র ১৩১২ এবং পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ১৩১৩) 'উচ্ছাস' শিরোনামায় তিনি *মুসদ্দসের* অনুবাদ করতে থাকেন।
৬. প্রথম প্রকাশ : *ইসলাম-প্রচারক*, আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫।
৭. *সেখ ওসমান আলী, 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি', হাফেজ*, জানুযারী ১৮৯৭।
৮. ও, আলি, *'কেন'? কোহিনুর* , বৈশাখ ১৩২২।
৯. ওসমান আলি, *'সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র?' ইসলাম প্রচারক*, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫।
১০. ও. আলি, 'শিবজী উৎসব ও মুসলমান জাতি', *কোহিনুর*, ভাদ্র ১৩১৩।
১০. ক. ও, আলি, 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়', *কোহিনুর*, মাঘ ১৩১৩।
১১. ঐ, ফাল্গুন ১৩১৩।
১২. ঐ, বৈশাখ ১৩১৪।
১৩. মতান্তরে ১৮৫২-১৯৩৬ খৃঃ। দ্রষ্টব্য গোলাম সাকলায়েন, 'কবি দাদ আলী,' *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫।
১৪. *নবনূর*, মাঘ ১৩১০।
১৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *'মাতৃভাষা', মিহির ও সুধাকর*, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০।
১৬. *ভারতী*, ১৩১০।
১৭. সৈযদ এমদাদ আলী, 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' *ইসলাম প্রচারক*, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩।
১৮. 'সূচনা', *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০।
১৯. সৈযদ এমদাদ আলী, *বঙ্গভাষা ও মুসলমান*, 'ব-মু-সা-প', শ্রাবণ ১৩২৫।
২০. এর মধ্যে অনেকগুলি তুরস্ককে কেন্দ্র করে লেখা। যেমন, 'শোকোচ্ছাস', 'ইসলাম প্রচারক', নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯ ; 'ক্রন্দন', লহরী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৭।
২১. এম. সেরাজুল হক, *শিবাজী-চরিত* (কলিকাতা, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।
২২. তুলনীয ঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে লেখা তাঁর কবিতা, 'শোক-লহরী', *ইসলাম প্রচারক*, মে-জুন ১৯০০।
২৩. উদাহরণস্বরূপ *'শ্রীতঃ'* (তসলিউদ্দীন আহমদ ?), *'হিন্দু সাহিত্য', ইসলাম প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩ উল্লেখযোগ্য । এতে *দুর্গেশনন্দিনী, রোশিনারা ও মাধবীকঙ্কণে* অঙ্কিত হিন্দু যুবকদের প্রতি মুসলিম তরুণীর প্রণয়চিত্রে আপত্তি করা হয়েছে। এ জাতীয় অন্যান্য প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বে পৃ: ৩২০ এবং ৩৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।
২৪. দ্রষ্টব্য সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন, 'সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন' *নবনূর*, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।
২৫. 'যমজ-ভগিনী কাব্য বা সিরাজউদ্দৌলা উপন্যাস', *নবনূর*, কার্তিক ১৩১৫।
২৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *'মুসলমান-সাহিত্য'*, 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ' (কলিকাতা, ১৯৬১-৬৬), ৬ ঃ ৯৯৬।
২৭. মিসেস আর. এস. হোসেন *'বসনা-পূজা', নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১১।
২৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৭৭।
২৯. ইমদাদুল হক, 'হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা', *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০।
৩০. দ্রষ্টব্য Abdool Luteef *A Paper on Mahomedan Education in Bangal* 19.

৩১. ইমদাদুল হক, 'আমাদের শিক্ষা', 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১০।
৩২. *নবনূর*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০।
৩৩. *মিহির ও সুধাকর*, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০।
৩৪. *'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান'*, *নবনূর*, পৌষ ১৩১০।
৩৫. ইমদাদুল হক, *'রমলা ও হিন্দু সমাজ'*, *নবনূর*, মাঘ ১৩১০।
৩৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ১৮৬।
৩৭. আমার ব্যবহৃত বইটির আখ্যাপত্র ছিল না, তবে আভ্যন্তরীণ প্রমাণে বোঝা যায় যে, এটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লেখা।
৩৮. গোলাম সাকলায়েন *'মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন'*, *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪।
৩৯. *কোহিনুর* প্রথম প্রকাশিত হয় কুমারখালি থেকে, আষাঢ় ১৩০৫-এ। আশ্বিন মাস থেকে প্রকাশালয় স্থানান্তরিত হয় পাংসায় (ফরিদপুর)। ১৩২২ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রচারিত হয়, তবে কয়েকবারই এর প্রকাশ দীর্ঘকালের জন্যে বন্ধ থাকে।
৪০. পূর্বে পৃঃ ২৫২ দ্রষ্টব্য।
৪১. *হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী* (মাসিক পত্র)। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১২৯৪ (১৮৮৭ খৃঃ) সম্পাদক : মুনসী গোলাম কাদের। মাগুরা (যশোর) থেকে প্রকাশিত হয়।
৪২. সেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদের *আরবজাতির ইতিহাস* এতে ধারাবাহিকভাবে (বৈশাখ ১৩১৮ থেকে) বেরিয়েছিল। এ বিষয়ের অন্যান্য রচনার মধ্যে রামপ্রাণ গুপ্ত, 'আফগান শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা' (ভাদ্র ১৩১২), ইমদাদুল হক, 'ফরাসীরাজ্যে মোসলেম অধিকার' (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১৮), মোহাম্মদ কে. চাঁদ, 'মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা' (অগ্রহায়ন-চৈত্র ১৩১৮) ও *'মোসলেম গণিতজ্ঞগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'* (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
৪৩. মোজাম্মেল হক, 'মহর্ষি আবু হেফ্স' (শ্রাবণ, ১৩০৫), আলাউদ্দীন আহমদ , 'শেখ নেজামুদ্দীন আউলিয়া' (ভাদ্র ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪), শেখ আবদুল জব্বার 'মহর্ষি নেজামউদ্দিন' (বৈশাখ ১৩১৮)।
৪৪. পূর্বে পৃ: ২১২-১৩ ও ৩৩৩-৩৫ দ্রষ্টব্য।
৪৫. *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩১৮।
৪৬. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *জাতীয় মঙ্গল* (চ-স ; কলিকাতা, ১৯৪৫)।
৪৭. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য', *কোহিনুর*, মাঘ ১৩২২।
৪৮. জানকীনাথ পাল শাস্ত্রী, 'বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি-বিতরণ সভা ও লর্ড কার্জ্জন', *কোহিনুর*, বৈশাখ ১৩১২।
৪৯. *'নবনূরের পুরস্কার-রচনা'* , *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
৫০. *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১৩১১।
৫১. ঐ. অগ্রহায়ণ ১৩১১।
৫২. ঐ. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
৫৩. ঐ. মাঘ- চৈত্র ১৩১২।
৫৪. ঐ. আশ্বিন ১৩১৩।
৫৫. ঐ. কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১২ ; শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১৩।
৫৬. ঐ. বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
৫৭. 'ধর্ম্মযুদ্ধে, গাজী ও জেহাদ', *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১০।
৫৯. ঐ. আষাঢ়-আশ্বিন ১৩১২।
৬০. ঐ. অগ্রহায়ণ, মাঘ ১৩১০ ; জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ১৩১১।
৬১. ঐ. ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১০।
৬২. ঐ. বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩১৩।
৬৩. ঐ. বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।

৬৪. *ঐ*. বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, চৈত্র ১৩১১।
৬৫. *ঐ*. জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।
৬৬. 'কেনচিং মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা', 'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার', ভাদ্র ১৩১০।
৬৭ আফতাবউদ্দীন আহমদ, 'হিন্দু লেখক ও মুসলমান সমাজ', ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০।
৬৮. মোহাম্মদ ইসহাক, 'বিশ্বকোষে বসুজ' ঐ, আষাঢ়, ১৩১১।
৬৯. ইমদাদুল হক, 'গ্র্যান্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য', ঐ, আশ্বিন ১৩১২।
৭০. মোহাম্মদ হাবিবর রহমান, 'ওসমান ও জগৎসিংহ', ঐ, বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
৭১. 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান', *নবনূর* , পৌষ ১৩১০।
৭২. মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা, *'বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান'*, ঐ, কার্তিক ১৩১১।
৭৩. মোহাম্মদ হোদায়েতউল্লা, 'স্বদেশী আন্দোলন', ঐ, কার্তিক ১৩১২।
৭৪. খায়রুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', ঐ, কার্তিক ১৩১২।
৭৫. একিনউদ্দীন আহমদ, 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ', আশ্বিন ১৩১২।
৭৬. খয়েরখাহ্ মুনশী 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান', ঐ ভাদ্র ১৩১২।
৭৭. লেহাজউদ্দীন আহমদ, 'রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান', ঐ, আষাঢ় ১৩১২।
৭৮. এস, এ, আল মুসাভী, *'অবনতি-প্রসঙ্গ'*, ঐ, আশ্বিন ১৩১২।
৭৯. নওশের আলী খান ইউসফজী, 'একেই কি বলে অবনতি ?' ঐ, কার্তিক ১৩১১।
৮০. *'গ্রন্থ-সমালোচনা'*, ঐ, ভাদ্র ১৩১২।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

পূর্ববর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে ইংরেজ-আমলের (১৭৫৭-১৯১৮) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে স্পষ্টত আমরা দুটি ভাগ দেখতে পাই। ১৮৭০ পর্যন্ত মুসলমানদের রচনায় মূলত পুরোনো আদর্শই অনুসৃত হয়, তারপরে দেখা দেয় আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস। এই ভেদরেখা ১৮৬০ খৃস্টাব্দ বলেও নির্দেশ করা যেতে পারে। বিশেষত আমরা যখন ১৮৬০কে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনাকাল বলে গণ্য করেছি, তখন এ সময়টাকে বলতে হয় কালান্তরের উপযুক্ত সীমারেখা। তবে ১৮৬৯-এর আগে এ পর্যায়ে মুসলমানের কোন সৃষ্টি নেই। এই বছরে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের *রত্নবতী* ও প্রাচীনতার অনুবর্তন করেছে। সুতরাং ১৮৭০ খৃস্টাব্দকে মুসলমান-রচিত বাংলা সাহিত্যে নবযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অসমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃস্টাব্দকে এই যুগান্তরের কাল বলে মনে করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে।

১৮৬০ বা ১৮৭০ খৃস্টাব্দ যাই বলি না কেন, তার আগে পর্যন্ত মুসলমানদের সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। এই ধারার কাব্যে আধুনিক জীবন ও জগতের কোন ছাপ নেই। এর দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগীয়, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এর আস্থা নেই, অসাধারণ ও অলৌকিক জীবনকেই তা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের একান্ত অভাব এতে দেখা যায়। কল্পনাবিলাসের কাছে বাস্তবতাবোধ এখানে পর্যুদস্ত।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই আধুনিকতা কিন্তু কোন সজ্ঞান আদর্শানুকরণের ফল নয়। এই কারণে তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের স্পষ্ট কোন প্রভাব এই কাব্যধারায় পাই না। মুহররমের জন্যে শোকপ্রকাশ নিষেধ করে যখন ধর্মান্দোলন চলছে তখন এই ধারার কবিরা কারবালা-কাহিনী নিয়ে সাড়ম্বরে কল্পনাশ্রিত কাব্য রচনা করে চলেছেন। দেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটেছে অনেককাল আগে, এঁরা কিন্তু তখনো কল্পনায় বিশ্বজয় করছেন। এঁদের ধারণামতে, ইসলামের যে রূপ, তা অনেকখানি লৌকিক সংস্কারমিশ্রিত, আর অনেকখানি সুফী প্রভাবজাত। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের পিউরিট্যানিক মনোভাব এঁদেরকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি : যদিও দেশের মানুষের মধ্যে এসব আন্দোলনের প্রভাব যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল।

পরবর্তী কালের সাহিত্যেও তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ দেখতে পাই নে। পণ্ডিত রেয়াজ-আল-দীন আহমদ মশহাদীর মতো দু-একজন নিঃসঙ্গ লেখক হয়তো ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, কিন্তু এই মনোভাব সামগ্রিকভাবে পরিব্যাপ্ত হয় নি। তা যদি হোত, তবে তিতুমীরের বিদ্রোহ নিয়ে কেউ না কেউ কিছু লিখতেন। শুধু তাই নয়। মশাররফ হোসেনের *বিষাদসিন্ধু* বা *মৌলুদ*

শরীফ কিংবা হামিদ আলীর *কাসেমবধ কাব্য* প্রভৃতি রচনা প্রমাণ করে যে, ধর্মসংস্কারের পিউরিট্যানিক আন্দোলন একালের লেখকদের গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে নি।

বরঞ্চ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর আপোসমূলক মতবাদ কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্মজীবনের সংস্কার-কামনা করলেও কেরামত আলী পীরবাদের উচ্ছেদ চান নি। আর ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষসংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই তাঁর মতবিরুদ্ধ ছিল : কেননা ভারতবর্ষকে তিনি মনে করতেন দার-উল-ইসলাম বলে। জনমানসে এই পীরবাদের ভিত্তি ছিল জোরালো। তাই শরীয়তউল্লাহ্‌র পুত্র দুদু মিয়াও পিতার আদর্শ থেকে সরে গিয়ে নিজেকে পীর বলে ঘেষণা করেছিলেন। যে সামাজিক পরিবেশে পীরবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, তার বদল না হওয়া পর্যন্ত এই আদর্শের উচ্ছেদ ঘটানো সম্ভবপর ছিল না। বাস্তবে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। মওলানা জৌনপুরী এবং তাঁর শিষ্যেরা তাই সহজে স্থান করে নিয়েছিলেন লোক-মানসে। এই ধারার একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন ফুরফুরার আবুবকর সাহেব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল : তাঁদের সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। অতএব পীরবাদের প্রতি এবং সেই সূত্রে সুফী সাধনতত্ত্বের প্রতি একালের লেখকেরা যে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন, তা আকস্মিক নয়।

ধর্মসংস্কারবিষয়ে মওলানা জৌনপুরী নরমপন্থী ছিলেন, একথা বলেছি। একালের কতিপয় ধর্মপ্রচারক লেখক (যাঁরা তাঁর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন) ধর্মপ্রচার করেছেন বা ধর্মবিষয়ে লিখেছেন বটে, কিন্তু ধর্মজীবনের পিউরিট্যানিক সংস্কার চান নি। উদাহরণস্বরূপ, মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীনের নাম করা চলে। তাঁরা *মৌলুদ শরীফে* পাঠের উপযুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং রচনা করতে উৎসাহিত করেছেন।

এভাবে নতুন লেখকদের সঙ্গে পুরানো সাহিত্যধারার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয় মিশ্র ভাষারীতির *তাজকিরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, জঙ্গনামা, শাহনামা* ও *হাতেম তাই* এবং শাস্ত্রকথার নানারকম বইয়ের সাধু গদ্যে চমৎকার রূপান্তর দেখতে পাই একালে। সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পুনঃসৃষ্টি একে হয়তো বলা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মূল কারণ স্বতন্ত্র। যে মনোভাব থেকে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যধারার সৃষ্টি, তা তখনো আমাদের মধ্যে থেকে অপসৃত হয় নি। আমরা নতুন পাত্রে পুরাতন-সুরা পান করেছি মাত্র।

দুই

আলোচ্য সময়ের সাহিত্যে নতুন কোন ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেনি, একথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ যে নতুন ভাব-আন্দোলনের সূচনা করেন, আমাদের সাহিত্যে তার প্রভাব আছে।

এই প্রভাবের একটি দিকে দেখা যায় ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে সগর্ব ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহপূর্ণ মনোভাব। তবে লক্ষণীয় এই যে, স্যার সৈয়দ বা খুদা বখ্‌শের মতো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ ও পাশ্চাত্ত্য মূল্যবোধের আদর্শে জীবন ও জগতের সমালোচনা কোন বাঙালী লেখকের রচনায়

ধরা পড়েনি। বরঞ্চ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও খৃস্টধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার যে প্রয়াস দেখা যায় আমীর আলীর রচনায়, সেই ধারাই অনুকৃত হয়েছে শেখ আবদুর রহিম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ কে, চাঁদের রচনায়। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনের যে চেষ্টা এঁদের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে কাজ করেছে যে-কোন মানদণ্ডে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপ্রাদনের প্রবৃত্তি। সে কারণেই যুক্তি ও তর্কের আলোকে অনেক পুরোনো বিশ্বাসকে এঁরা বাতিল করতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের মূলগত ঐক্য প্রতিপন্ন করতে। ইসলামের সভ্যতা ও মর্মবাণীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে এই সতর্ক মনোভাবের পরিচয়দানই এঁদের রচনার বিশেষ গৌরব।

এঁদের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীন এবং শেষ জীবনের মশাররফ হোসেনের পার্থক্য গুরুতর। শেষোক্ত লেখকদের রচনায় আধুনিক জগত সম্পর্কে কোন সচেতনতার পরিচয় নেই। ওয়াজ-মাহফিলের উপযোগী অশিক্ষিত লোকসাধারণের বোধগম্য এবং কিছুটা মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন রচনাতেই এঁরা সকল শক্তি ক্ষয় করেছিলেন। মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীনের সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে কাজ করেছে ধর্মজীবনকে—যুক্তিতর্ক নয়— শাস্ত্রের আক্ষরিক নির্দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এবং তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে রক্ষণশীলতা।

আধুনিক সমাজ-আন্দোলনের আরেক দিক ছিল ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে মওলানা জৌনপুরীর ভাবধারার নিগূঢ় যোগের পরিচয় পেয়েছি। এই প্রভাব মোটের উপর ব্যাপ্ত হয়েছিল। দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল লেখকই ইংরেজ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের পক্ষপুটে প্রসারিত অধিকার লাভ করার স্বপ্ন দেখেছেন। তবে বাস্তব জীবনের সংঘাতে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল। এর আকস্মিক বিস্ফোরণ দেখা যায় নজরুল ইসলামের রচনায়।

তিন

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে. আবার অনেক সময়ে স্বাতন্ত্র্যের উপরেও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য সময়ে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যেও এই দ্বৈতধারা লক্ষ্য করা যায় : একদিকে *আমীর হামজার* মতো যুদ্ধকাব্য, অন্যদিকে *সত্যপীরের পুঁথি*। সমন্বয়বাদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে বাউল গানে।

কিন্তু ধর্মসংস্কারের পিউরিট্যানিক আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে খুব বড় করে তুলে ধরে। আবার, আধুনিককালের সমাজান্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের উপরে জোর দেওয়া হয়।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে অমুসলমান সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, বাংলার নবজাগরণ দেখা দিল হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে। কিন্তু অচিরেই এই নবজাগৃতি রূপ নিল হিন্দু পুনর্জাগরণের। তখন প্রাচীন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপরে জোর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মানসে তার অতীত সমৃদ্ধি ও

বর্তমান উন্নতির তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাসকে মনে হল লজ্জাজনক। এর জন্যে তাঁরা স্বভাবতই দায়ী করলেন মুসলমানদেরকে---যাঁরা আক্রমণকারীরূপে একদা এদেশে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, সেই আক্রমণকারী মুসলমান আর সমকালীন পরাধীন মুসলমান সবদিক দিয়ে ভিন্ন। শিক্ষিত হিন্দুর মনে স্বাধীনতার যে প্রেরণা এসেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ সেদিন সম্ভবপর ছিল না। কেননা, ইংরেজ-শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তার স্থায়িত্বে আস্থা এবং তার শক্তিমত্তায় ভীতি— এই মিশ্র মনোভাব শিক্ষিত হিন্দুর অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। তাই মুঘল-রাজপুত বা মুঘল-মারাঠার দ্বন্দ্বের আলোচনায় হিন্দু-মানসে একই সঙ্গে মুসলমানের সম্পর্কে ক্ষোভ এবং স্বাধীনতার পুস্তকী অনুপ্রেরণা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমান সমাজে স্বাতন্ত্রবাদী চেতনার উদ্বোধনে ইসলামের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে গর্ববোধ করতে গিয়ে মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নি। মুসলমানও নিজেদেরকে বহিরাগতরূপে কল্পনা করে তৃপ্তিলাভ করেছেন। তার উপর, ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হিন্দু লেখকদের কাব্য ও উপন্যাস তাঁদেরকে বিচলিত করেছে এবং তাঁরা আত্মপক্ষ-সমর্থনের উপায় খুঁজেছেন।

হিন্দু লেখকদের এই ধরনের রচনা নিয়ে মুসলমানদের ক্ষোভের অন্ত ছিল না, তার প্রমাণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও পাই। হিন্দু লেখকদের হাতে মুসলমান চরিত্রের রূপায়ণ এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যে আয়েষা চরিত্রাঙ্কনের জন্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা হয়েছিল : এঁরা কেউ ভেবে দেখেন নি যে, বঙ্কিমের পক্ষে কুমারী হিন্দু নারীর প্রণয়চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর ছিল না। তাঁর নায়িকারা হয় বিধবা (কুন্দ, রোহিনী), নয় সাধবা (মৃণালিনী , ইন্দিরা, শৈবলিনী, লবঙ্গলতা) ; কুমারী হলে হয় তাকে অস্বাভাবিক পরিবেশে লালন করতে হয়েছে (তিলোত্তমা, মৃন্ময়ী) ; নয় আঁকতে হয়েছে মুসলমানরূপে (আয়েষা, জেবউন্নেসা)। মোটকথা, হিন্দু লেখকদের রচনায় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব দেখে মুসলমানেরা যেমন খুশী হতে পারেন নি, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের প্রণয়কাহিনীতেও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাহিত্যমূল্যবর্জিত প্যারডী রচনা করেছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন। তাঁর কথা বাদ দিলেও মোজাম্মেল হক-ইসমাইল হোসেন সিরাজী-মতীয়র রহমানের উপন্যাসে এর প্রতিক্রিয়ার মুসলমান নায়ক ও হিন্দু সমাজেও আবার এর একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল : অর্থাৎ তাঁরাও এগুলোকে স্বীকার করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশ দত্ত-ভূদেব মুখোপধ্যায় কেবল নন, *নীলদর্পণ*-কার দীনবন্ধু মিত্রও মুসলমানের ক্ষোভের কারণ ছিলেন তাঁর *জামাই বারিক* রচনার জন্যে। অথচ দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা সহজ নয়।

এইভাবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছায়াপাত করল : কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে। এর সঙ্গে ধর্মপ্রচারকদের প্রচার আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহীদের ঐতিহ্যগর্ব মিশ্রিত হল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।

সাহিত্যিকের পক্ষে এই পরিবেশ যে কতখানি শোচনীয় হতে পারে, মশাররফ হোসেন তার দৃষ্টান্ত। প্রথম জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রসারতা, জীবনবোধের যে গভীরতা ও শিল্পীমনের যে প্রগাঢ়তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, শেষ জীবনে সংকীর্ণতা, সংস্কার আর অন্ধতার মধ্যে তা হারিয়ে গেল।

এই পরিণতি হয়তো সবার ঘটে নি। কিন্তু দু চার জন লেখক ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বড় বেশী আব কেউ বলেন নি। যাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর খুব প্রবল ছিল না। পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ এঁদের একজন : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলন তিনি কামনা করেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই মনোভাবের মধ্যেও এঁদের রচনাকালের পরিবেশ বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

চার

ভাবধারার দিক দিয়ে একালের মুসলিম লেখকদের কি ইতিবাচক কোন ভূমিকা নেই, এই প্রশ্ন এখন সংগতভাবেই এসে পড়ে। আছে নিশ্চয়। মুসলমান সমাজের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে এঁদের সেই অবদান খুঁজতে হবে। তার একটি সূত্র পাওয়া যাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এঁদের মনোভাবে।

পাঠান আমলে মুসলমান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উন্নতি-সাধন করেছিলেন, মুঘল শাসনকালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। মুঘল আমলে ফারসী সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, এমন অনুমানের সুযোগ আছে। ইংরেজ-শাসনের প্রায় প্রথম সত্তর বছর রাজভাষা হিসেবে ফারসীর ব্যবহার অব্যাহত থাকে। সুতরাং অভিজাত মুসলমানের পক্ষে তখনো বাস্তব সুবিধা ও মানসিক সান্ত্বনা একসঙ্গে দুই লভ্য হয়েছিল।

রাজভাষা হিসেবে ইংরাজীর প্রবর্তনে উচ্চাভিমানী মুসলমানের জীবনে সংকট সৃষ্টি হল। বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে এঁরা ঐতিহ্যগর্ব এবং বৃথা অনুতাপের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইলেন। এঁদের লক্ষ্য করেই *বঙ্গদর্শন* লেখেন :

> যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন, বা বাঙ্গলা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন… ।[১]

অথচ সমাজে মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে এঁরাই ছিলেন মহাজন।[২] সুতরাং এঁদের অনুসরণে সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রবৃত্তি জেগেছিল আরব-ইরানের সঙ্গে আত্মীয়তাসন্ধানের এবং বাংলা ভাষাকে অবহেলা করে ফারসী, আরবী ও উর্দুর প্রতি পক্ষপাত-প্রকাশের।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বাল্যস্মৃতি-প্রসঙ্গে মধ্য-উনিশ শতকের মুসলমান সমাজের যে চিত্রাঙ্কন করেছেন, এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য :

> চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল। গ্রাম্য

> শিক্ষক মুন্সী ভিন্ন পাশ করা মৌলভী আমাদের দেশে কেহ ছিল না।... বাঙ্গালা বিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল।...পুণ্য জন্য আরবি শিক্ষা। কোরাণ শরীফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য্য। অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবি কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না...মুন্সী সাহেব বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না।...বাঙ্গলা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।... আমার পূজনীয় পিতা একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না।[৩]

আরেকজন লেখক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী দুঃখ করেছেন :

> আমার স্বজাতি মোসলমান সমাজ আজি কালি শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব পশ্চাদপদ। তাহাতে বঙ্গভাষা বা সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই, প্রকারান্তরে তদ্প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অমনোযোগ, ঔদাসীন্য এবং অনভিজ্ঞতাই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।... বাঙ্গালা ভাষা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মোছলমানই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন।[৪]

এই মনোভাব কতিপয় লেখকের মধ্যেও (যেমন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ[৫]) সঞ্চারিত হয়েছিল।

ধর্মসংস্কারের পিউরিট্যানিক আন্দোলনের কালে অনেক বইপত্র লেখা হয়েছিল উর্দুতে। আর স্যার সৈয়দ আহমদের সমাজান্দোলনের বাহন ছিল এই ভাষা। হৃতগৌরব-দিল্লী-অযোধ্যার দরবারে উর্দু-চর্চার স্মৃতি এবং উত্তর ভারতের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাতের কাছে এর সমাদর আমাদের কাছে উর্দু ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। অন্যপক্ষে বাংলা দেশে আধুনিকতার যে আন্দোলন দেখা দেয় তার মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। কেবল সাহিত্যচর্চার মাধ্যমরূপেই বাংলা ভাষা সমাজে মর্যাদা লাভ করে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার আবশ্যকতা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষা সম্পর্কে সমাজের সংকোচ দূর করার চেষ্টা দেখা যায়। প্রথম (বিশেষত ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে) শোনা গিয়েছিল একটু কৈফিয়তের সুর। যেমন শেখ আবদুর রহিমের *হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতির* (১৮৮৯) আখ্যাপত্রে একটি ফারসী উদ্ধৃতি এবং তার বঙ্গনুবাদ আছে :

> ধর্মের কথা হিব্রু ভাষায় বল, আর সিরিয়ান ভাষায় বল, অযথা সত্যানুসন্ধান জাবালকা দেশে কর, আর জাবালসা দেশেই কর, তাহাতে ধর্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না।

বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গণ্য করে এই ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করে যেসব রচনা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে নওসের আলী খাঁ ইউসুফজীর *বঙ্গীয় মুসলমান*[৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে *মিহির ও সুধাকরের* সম্পাদকীয় প্রবন্ধও[৭] স্মরণ করা যেতে পরে। তবে বাঙালী মুসলমান মাতৃভাষা কি, সে সম্পর্কে সমাজে যে দ্বিধাবোধ বিদ্যমান ছিল, তার ফলে আমাদের লেখকেরা মাঝে মাঝে খুব কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। যেমন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেন :

> বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাংলায় পরিণত হইয়াছে। ...ভ্রাত :

বঙ্গীয় মুলমান ! আর নিদ্রিত থাকিও না। বাংলা ভাষাকে অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা না করিয়া ইহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হও।[৮]

মনে হয়, এককালে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া অন্য কিছু ছিল, এ ধরনের একটা বোধ এই উক্তির পশ্চাতে লুকিয়ে আছে। এও এক অর্থে আমাদের বহির্মুখী মানসিকতার পরিচায়ক। এ ধরনের মনোভাবের প্রতিধ্বনি আরও পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমাদের লেখকদের মনোভাব যে ক্রমেই বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারও প্রমাণ পাই। এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন :

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলবী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দ্দু পত্রিকার বিফলতা জ্বলন্ত প্রমাণ।[৯]

দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে (পরে ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন :

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোন জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে ? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নত করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই···।

অনেকদিন পূর্ব্বে উর্দ্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিযাছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দ্দু পক্ষকে সও(য়)াল জও(য়)াব করিতে শুনিতেছি। ···দখল বাংলারই থাকিবে তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্ত্বে কিছু বন্দোবস্ত পাইতে পারে।[১০]

তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন :

দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি ? উর্দ্দু না বাঙ্গালা ?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে, না বেল?— বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[১১]

এই মনোভাব যে আমাদের সমাজে সঞ্চারিত হয়, মুসলিম লেখকদের চেষ্টাই তার মূল কারণ। স্যার সৈয়দ আহ্মদের মতো কোন প্রভাবশালী সমাজনেতা বাংলাদেশে মাতৃভাষার সাধনায় অগ্রসর হন নি। লেখকদের প্রচেষ্টায় অবশ্য বাঙালী মুসলমান নেতাদের পরোক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তাও তাঁরা করেছিলেন ভাষাপ্রীতি থেকে নয়, জনগণের সমর্থন লাভ করার মতো বাস্তব সুবিধার প্রত্যাশায়।

পাঁচ

কালানুক্রমিকভাবে একালের বাঙালী মুসলমানের রচনা পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব যে, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহ সম্পর্কে তাঁরা ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। সমাজের রক্ষণশীল শক্তি যে কোন কোন লেখকের মধ্যে কাজ করে নি, তা নয়। কিন্তু মূলত লেখকের (এঁরা অধিকাংশই বর্তমান শতাব্দীর লেখক) প্রগতিশীল সংস্কারের প্রতি ক্রমবর্ধমান পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

এই সংস্কার-প্রবণতার অনেকগুলো দিক আছে। ধর্মবিষয়ে এর অভিব্যক্তি হয়েছে পীর সাহেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি এবং মাজার বা দরগাহ পূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে। ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাবার প্রয়াসও এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে মাওলানা এসলামবাদীর নাম স্মরণযোগ্য। সামাজিক ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বিবাহোপলক্ষে অতিরিক্ত ব্যয় ও বেশী দেনমোহর ইত্যাদি ধার্য করার নিন্দা অনেকে করেছেন। মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, মেহেরুল্লাহ্ ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তবে এঁদের থেকে আরেকটু অগ্রসর হয়েছেন খুলনার মেহেরুল্লাহ্ খান, যিনি স্বেচ্ছাবিবাহের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ রূপে শ্রেণীভেদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেকে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। এর সবচাইতে সাহসিক অভিব্যক্তি ঘটে বোধহয় কাজি ইমদাদুল হকের রচনায়। বংশ ও ঐতিহ্যগর্বের অসারতা সম্পর্কে অনেক লেখক সচেতন ছিলেন। তাই বৃথা গৌরববোধের বদলে শিক্ষাদীক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিতে আত্মনিয়োগের জন্য তাঁরা স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়টিও খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। 'ইনলাইটেন মোহামেডান লেডী' সম্পর্কে মশাররফ হোসেনের শ্লেষ 'এ্বি শেখা বিবি'র প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের বক্রোক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থার বদল হয়েছে। সিরাজী, ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, ফজলল করিম এবং সর্বোপরি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, অবরোধ সম্পর্কে সমাজের মনোভাবকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন। অবশ্য পর্দা ও অবরোধের মধ্যে অনেকে একটা পার্থক্য করতে চেয়েছেন এবং পর্দার পক্ষে ও অবরোধের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন। এঁরা বোধহয় প্রচলিত অবস্থা এবং কাম্য সংস্কারের মধ্যে একটা সন্ধিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার সাহিত্যসৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নারীর শিক্ষার জন্যে তাঁর সাধনা রক্ষণশীল মনোবৃত্তির উপরে আধুনিক মনোভাবের জয়পতাকাস্বরূপ।

মোটকথা, আধুনিক জগৎ ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন ও জটিলতা সম্পর্কে লেখকেরা সজাগ হয়ে উঠছিলেন। পারিবারিক বা সমাজিক গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তাঁরা স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পারছিলেন বহির্বিশ্বের প্রতিতুলনায়। বাইরের জীবন তাঁদের অন্তরের তারে ক্রমাগত আঘাত করেছিল বলে এতে বেজে উঠছিল নতুন সুর। স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই উদার ও মহান পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন তাঁরা এবং এই পৃথিবীতে নিরুদ্যম দর্শকের বদলে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিস্ময়কর উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মন্তব্যের সময়ে বিশেষ করে মনে পড়ছে লুৎফর রহমানের কথা। রেনেসাঁসের সাধনা যেমন আর সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁর রচনায় সেই প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। ধর্মের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, ধর্মজীবন বলতে যে জীবনধারা তিনি বুঝিয়েছেন, তা কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডীবদ্ধ ব্যাপার নয়। এর পেছনে রয়েছে হিউম্যানিস্টের উম্মুক্ত দৃষ্টি।

অন্য কোন লেখকের রচনায় এই আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টির পরিচয় হয়তো এতটা স্পষ্ট নয়। তবু বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে উদারনৈতিকতার পরিচয় পাই অধিকতর। নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে স্ব-মহিমায় মানুষের যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই, লুৎফর রহমানের মতো লেখকের সাধনায় সেই মানসিক আবহাওয়ার সূচনা।

ছয়

রচনার বিষয়বস্তু এবং লেখকের সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আধুনিক কালের মুসলমান লেখকদেরকে তিনটে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায়ে পড়েন সৃষ্টিধর্মী লেখকেরা। সাহিত্যসৃষ্টিই এঁদের মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু লেখকের সৃষ্টিধর্মী রচনার অনুকরণ করতে গিয়ে হিন্দু পাত্রপাত্রীর জীবন নিয়ে কাহিনী লিখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু সাধারণভাবে এঁরা উপাদান সংগ্রহ করেছেন মুসলমানের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য থেকে। যেসব লেখক তাঁদের রচনার মাধ্যমে নীতি-উপদেশ দিতে চেয়েছেন, তাঁরা প্রায়ই আদর্শ মুসলমানের জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, ফজলল করিম এই শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তীকালে কেউ কেউ অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যেমন, লুৎফর রহমান।

তথ্যনিষ্ঠ লেখক বলতে পারি দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখকদেরকে। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সগর্ব আলোচনা করেছেন এঁরা। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় এঁদের আছে এবং সেই সূত্রে এঁরা তুলনামূলক আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অন্য ধর্মের উপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইউরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডারে মুসলমানের দান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, আবার তার সঙ্গে ইসলামের ঐক্য, এঁদের আলোচ্য। শেখ আবদুর রহিম ও মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী প্রমুখ লেখক এই পর্যায়ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণীতে আসেন ধর্মতত্ত্ববিষয়ক লেখকেরা। তথ্যনিষ্ঠ লেখকেরা ধর্মীয় নির্দেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। দ্বিতীয়ত:, তাঁদের আলোচনা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের জন্যে—আপামর জনসাধারণের জন্যে নয়। ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক লেখক বলে যাঁদেরকে চিহ্নিত করতে চাই ; যেমন নইমুদ্দীন বা মেহেরুল্লাহ, —তাঁরা একদিকে যেমন ইসলামের বিভিন্ন মজহবের নির্দেশসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তেমনি আবার খৃস্টান মিশনারীর সঙ্গে ইসলামের মত ও পথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। লোকসাধারণের কাছে ধর্মপ্রচার এঁদের মূল উদ্দেশ্য। এসব রচনার সাহিত্যমূল্য প্রায় কিছুই নেই : বক্তব্যের দিক দিয়েই এর যা কিছু গুরুত্ব।

লক্ষণীয় যে, একালের সকল শ্রেণীর লেখককে তাঁর ধর্মীয় অস্তিত্ব প্রভাবান্বিত করেছিল। ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এঁদের সকলের হয়তো ছিল না, তবু এ সম্পর্কে একটা সাধারণ আবেগের পরিচয় তারা দিয়েছেন।

সাত

সাহিত্যের আঙ্গিকের দিক দিয়ে একালের মুসলমান লেখকেরা সাধারণভাবে হিন্দু পূর্বসূরীদেরকে অনুসরণ করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের *জমীদার দর্পণ* (১৮৭৩) তেরো বৎসর পূর্বে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণের* (১৮৬০) অনুকরণে রচিত। কায়কোবাদ সাধারণভাবে হেম-নবীনের অনুসারী। ইসমাইল হোসেন সিরাজী বঙ্কিমের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত। *রায়নন্দিনীতে দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) ও *মৃণালিনীর* (১৮৬৯), *নুরুউদ্দীন*-এ *কপালকুণ্ডলার* (১৮৬৬), এবং *ফিরোজা বেগম* এ *আনন্দমঠের* (১৮৮২) প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যত্র পূর্বসূরীদের প্রভাব এত স্পষ্ট নয় : কিন্তু বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তীর সাধানা পরবর্তীর পথ নির্দেশ করেছে।

এর একটা কারণ এই যে, মুসলমান লেখকেরা যখন আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন হিন্দু লেখকেরা প্রস্তুতির পর্ব শেষ করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মশাররফ হোসেনের আধুনিক পদবাচ্য *বসন্তকুমারী নাটক* (১৮৭৩) প্রকাশকালে বঙ্কিমের *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়েছে, এই বৎসরে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর তিরোভাব, হেম-নবীনের যুগ শুরু হযেছে, বিহারীলালের প্রতিষ্ঠাও আগতপ্রায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদনের মতো প্রতিভা না থাকলে এঁদের প্রভাবকে অতিক্রম করে যাওয়া কোন লেখকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মৌলিক প্রতিভার দিক থেকে নজরুলের আগে বাঙালী মুসলমান লেখকেরা কেউ অতটা অগ্রসর হন নি— যার ফলে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে তারা সক্ষম হতেন। অধিকাংশ লেখকের অসম্পূর্ণ শিক্ষাজীবনের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

বাঙালী মুসলমান লেখকদের ভাষাব্যবহার লক্ষ্য করলেও এই কথাটি সত্য বলে প্রতিভাত হয়। একালের উল্লেখযোগ্য লেখকমাত্রই বঙ্গিমচন্দ্রের ভাষার সাফল্যজনক অনুকরণ করেছেন। তাঁদের রচনাশৈলী হয়তো বিভিন্ন— কিন্তু মশাররফ হোসেন থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী পর্যন্ত সকলেই একই গদ্যের কাঠামোর উপরে প্রসাধন করেছেন। আরো পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব এসেছে। প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার এঁদের রচনায় সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। 'আল্লাহ' ও 'নামাজের' বদলে এঁরা 'ঈশ্বর' ও 'উপাসনা' লিখেছেন, কখনো 'ওজু' লিখলে তার অর্থস্বরূপ 'অঙ্গশুদ্ধি' শব্দটি যোগ করেছেন পাদটীকায়। মিশ্ররীতির ভাষার প্রতি যে এঁদের তেমন শ্রদ্ধা ছিল না, তার পরিচয় মশাররফ হোসেনের 'বিবি খোদেজার বিবাহের (১৩১২) 'ভূমিকা'য় পাওয়া যায়। অতএব, বিষয়বস্তু ছাড়া আঙ্গিক ও ভাষার দিক দিয়ে একালের হিন্দু ও মুসলমান লেখকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

আনন্দের কথা এই যে, অনুকরণ সত্ত্বেও অনেক লেখক কৃতিত্ব বা মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আমরা যে মানদণ্ডের প্রয়োগ করে থাকি, তার পরিমাপে মশাররফ হোসেনের *বিষাদসিন্ধু*, মোজাম্মেল হকের *মহর্ষি মনসুর* কায়কোবাদের *অশ্রুমালা* বা রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মশহাদীর *সমাজ ও সংস্কারক* খুবই প্রশংসনীয় রচনা। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে অনেকে গদ্য বা কাব্য-রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন : যেমন লুৎফর রহমান ও সৈয়দ এমদাদ আলী। এঁদের রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে।

আলীগড় আন্দোলনের প্রেরণায় বাঙালী মুসলমানের মধ্যে জীবনচরিত ও ইতিহাস রচনার যে আগ্রহ দেখা দেয়, তার গুরুত্ব সমধিক। পেশাদার ঐতিহাসিক না হয়েও এঁরা যে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অতীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক রচনার অপূর্ণতা অনেকখানি দূর হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনার ইতিহাস ১৮৭০ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তীকালে মধ্যযুগের অনুবৃত্তি চলেছে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে তার আধুনিকতার প্রথম স্তর বলতে হয়। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে প্রস্তুতির পর সাহিত্য ও সমাজক্ষেত্রে রূপান্তর বা যুগান্তর ঘটেছে। এই নতুন যুগের প্রবর্তনা দেখতে পাই নজরুল ইসলামের রচনায়। নজরুলের পূর্ববর্তীদের রচনায় শুধু সমসাময়িক কালের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে বলে নয়, অনাগত পরিবর্তনের বীজ রোপিত হয়েছে বলে একালের সাহিত্যকর্মের ধারা ও প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুশীলনের যোগ্য।

তথ্য-নির্দেশ

১. *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০।
২. এঁদের একজন, দেওয়ান ফজলী রব্বি খান বাহাদুর, ফারসীতে *হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালা* লিখে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, বাংলার মুসলমানেরা প্রায় সকলেই বহিরাগত।
৩. মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী*, (কলিকাতা, ১৩১৫), ১০২-৪।
৪. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, *উদাসী* (টাঙ্গাইল, ১৯০০), *ভূমিকা*।
৫. পূর্বে পৃ: ২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য।
৬. পূর্বে পৃ: ২৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য।
৭. পূর্বে পৃ: ২৬৮ দ্রষ্টব্য।
৮. *ইসলাম প্রচারক*, জানুয়ারী ১৯০৯।
৯. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, *বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য*, *কোহিনুর*, মাঘ ১৩২২।
১০. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ'*, *ব-মু-সা-প*, বৈশাখ ১৩২৫।
১১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *'তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সভাপতির অভিভাষণ'*, *ব-মু-সা-প* মাঘ ১৩২৫।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আলোচিত লেখকদের গ্রন্থ

আবদুর রহিম : গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুথি। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৫।
আবদুর রহিম : প্রেমলীলা। কলিকাতা : গৌড়ীয় যন্ত্র, ১২৬৮।
আবদুল করিম : জগৎমোহিনী নাটক। কলিকাতা : জি.পি. রায় এন্ড কোম্পানী, ১২৮২।
আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী : উদাসী। টাঙ্গাইল, ১৯০০।
আবুঅল মনসুর এম.এম.ইউ : হিন্দুর ধর্ম্মরহস্য ও দেবলীলা; প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। সপ্তম-স; যশোহর : মনসুর আহমদ, ১৩১৫।
আবুল মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী : কাসেমবধ বা শাহাদাতে ইমাম কাসেম। কলিকাতা : এ. কে. রায় এন্ড কোং, ১৩১২। জয়নালোদ্ধার কাব্য। চট্টগ্রাম : শ্রীমতি আয়েসা খাতুন, ১৩১৪।
উজীর আলী আহমদ মোসলেম রত্নহার। তা.বি.।
'এম.এ.আর,' : বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন রহস্য। কলিকাতা : সীবাদহ আফজালী প্রেস, তা.বি.।
ওয়াজেদ আলী : সত্যপীরের পুথি — মদন কামদেবের পালা। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫১।
কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ্। তৃ-স; ঢাকা ঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫২। : প্রবন্ধমালা। দ্বি-স; কলিকাতা ১৯২৬।
কাজি সফিউদ্দিন (প্রকাশক) : সর্ব্ববৃহৎ আসল কাছাছুল আম্বিয়া। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৩৪।
কাদের আলী, র.স. : মোহিনী প্রেমপাশ নাটক। কলিকাতা : গুপ্ত প্রেস, ১২৮৭।
কায়কোবাদ
 : অমিয় ধারা কাব্য। ঢাকা, ১৩২৯।
 : অশ্রুমালা। দ্বি-স; ঢাকা : ছয়েফউদ্দীন আহমদ, ১৩২৫।
 : কুসুম-কানন, প্রথম ভাগ। দ্বি-স; নান্নার : ভারত-সুহৃদ যন্ত্রালয়, ১২৮৮।
 : মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জ্জনকাব্য। দ্বি-স; ঢাকা : গ্রন্থাকার, ১৩৫৬।
 : মহাশ্মশান কাব্য। চ-স; আগলা, ঢাকা : তাহেরউন্নিসা খাতুন, ১৯৪০।
 : শিব-মন্দির বা জীবন্ত-সমাধি কাব্য। দ্বি-স; আগলা, ঢাকা : তাহেরউন্নিসা খাতুন, ১৯৪০।
 : শ্মশানভস্ম কাব্য। ঢাকা : তাহেরউন্নিসা খাতুন ; ১৩৪৫।
গরিবুল্লা : দেলারাম। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৪।
গোলাম হোসেন : হাড়জ্বালানী। কলিকাতা : এ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, ১২৭১।
ছাদ আলি ও আবদুল ওহাব : সহিদে কারবালা। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৪৭।
জয়নাল আবেদীন : আবু সামা। ঢাকা : অলিমী প্রেস তা. বি.।
 : ঈমানদার নেকবিবির কেচ্ছা। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৬।
জান মোহাম্মদ : হাজার মছল্লা। কলিকাতা, তা.বি।
জোনাব আলি : তাজকেরাতুল আওলিয়া। কলিকাতা : ছিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী, ১৩১৭।
নওসের আলি খাঁ ইউসফজী : বঙ্গীয় মুসলমান। কলিকাতা : শাহানশা : এন্ড কোং, ১২৯৭।
 : শৈশব-কুসুম। টাঙ্গাইল : আহমদী প্রেস, ১৩০২।

নাজিমউদ্দীন : জুম্মা। তা.বি.।
ফক্কির আবদুল্লা-বিন এসমাইল অল কোরেশী অল হিন্দী : অগ্নি-কুক্কট । দ্বি-স; কলিকাতা : শাহানশা এন্ড কোম্পানী, ১৩০৯।
: প্রবন্ধ-কৌমুদী, প্রথম খন্ড। কলিকাতা : মিলন-যন্ত্র, ১৮৯১।
ফকির মোহম্মদ : ইউসুফ জেলেখা। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৫।
: সোনাভান। ঢাকা : হামিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৪১।
ফয়জন্নেছা চৌধুরানী : রূপজালাল উপাখ্যান। ঢাকা : গিরিশ যন্ত্র, ১৮৭৬।
মতীয়র রহমান খান : গ্রন্থাবলী। ঢাকা : এম, রহমান, ১৯৬০।
মফিজউদ্দীন আহাম্মদ : কেচ্ছা আলেফ লায়লা। তৃ-স; কলিকাতা : সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী, ১৩২৯।
মালে মোহাম্মদ : ছয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জামাল। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৬।
মীর মশাররফ হোসেন : আমার জীবনী, দশ খন্ড। কলিকাতা : মুন্সী সাদেক আলী ও মীর মহবুব হোসেন, ১৩১৫-১৬।
: আমার জীবনীর জীবনী — কুলসুম-জীবনী। কলিকাতা : মীর এবরাহিম হোসেন, ১৩১·
: উদাসীন পথিকের মনের কথা। কুষ্টিয়া : মীর মহতাব আলি, ১২৯৭।
: এসলামের জয় : দ্বি-স; কলিকাতা, তা.বি।
: গাজী মিয়াঁর বস্তানী, প্রথম অংশ। কলিকাতা : এম. ইউ. আহম্মদ, ১৩০৬।
: গো-জীবন। টাঙ্গাইল : আহমদী যন্ত্র, ১২৯৫।
: গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু। কলিকাতা : আজিজউদ্দীন মহম্মদ, ১২৭৯।
: জমীদার-দর্পণ । কলিকাতা : মধ্যস্থ যন্ত্র, ১২৭৯।
: বসন্তকুমারী নাটক। দ্বি-স; ময়মনসিংহ : আইনদ্দীন বিশ্বাস, ১২৯৪।
: বিবি খোদেজার বিবাহ। কলিকাতা : মীর এব্রাহিম হোসেন, ১৩১২।
: বিষাদ-সিন্ধু। কলিকাতা : প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, তা. বি.।
: মদিনার গৌরব। দ্বি-স; কলিকাতা : মীর আশরাফ হোসেন ব্রাদার্স, ১৩২০।
: মোসলেম-বীরত্ব। কলিকাতা : এম. ইব্রাহিম এন্ড কোম্পানী, ১৩১৪।
: মৌলুদ শরীফ। পঞ্চম স; কলিকাতা : মোহম্মদী বুক এজেন্সী, ১৩২৪।
: হজরত ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভ। কলিকাতা : মীর এব্রাহিম হোসেন, ১৩১২।
মোজাম্মেল হক :
: অপূর্ব্ব-দর্শন কাব্য। শান্তিপুর : মহম্মদীয় লাইব্রেরী, ১২৯২।
: খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশ্‌তী। ঢাকা : আবদুল আজিজ খাঁ, ১৩২৫।
: জাতীয় ফোয়ারা। দ্বি-স; কলিকাতা : বেকার মাদ্রাসা হোস্টেল, ১৩১৯।
: জোহরা। চ-স; কলিকাতা : নওরোজ লাইব্রেরী, ১৩৬৩।
: তাপস-কাহিনী। ষষ্ঠ-স; কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫।
: তাপস-জীবনী, কলিকাতা : লতিফ প্রেস. ১৩০৭।
: দরাফ খান গাজী। কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৩২৬।
: ফেরদৌসী-চরিত, দ্বাদশ মুদ্রণ; কলিকাতা, মুসলিম পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৫।
: মহর্ষি মনসুর। তৃ-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৩২৩।
: মাওলানা-পরিচয়। কলিকাতা : গণেশ পুস্তকালয়, ১৩২১।
: শাহ্‌নামা, প্রতম খন্ড। পঞ্চম-স; কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২।
: হজরত মোহাম্মদ. প্রথম খন্ড। কলিকাত : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬।

মোমিনউদ্দিন আহমদ : তৃষ্ণবতী বিরাগুরু। ঢাকা : আজিজিয়া লাইব্রেরী, ১৩৪৫।
মোহাম্মদ এয়াকুব : মোক্তার হোসেন — জঙ্গনামা। ঢাকা : হামিদীয়া লাইব্রেরী ১৩৪১।
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : ধর্মের কাহিনী। পঞ্চম-স; ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৫২।
: নূরনবী। তৃ-স; ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৫০।
: মানবমুকুট। পঞ্চম-স; কলিকাতা : নওরোজ লাইব্রেরী ১৯৫৩।
: শান্তিধারা। ষষ্ঠ-স; ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৩৫৫।
মোহাম্মদ কে, চাঁদ : মোসরেম পরকালতত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবাদ। কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৯১৭।
: মোসলেম সভ্যতার ইতিহাস। কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৯১৭।
মোহাম্মদ খাতের : সাহানামা ; কলিকাতা : সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী, ১৩৪৪।
: সোলতান জমজমা। কলিকাতা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৪৪।
মোহাম্মদ গোলাম হোসেন : বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান। কলিকাতা : হামেদিয়া প্রেস, ১৩১৭।
মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন : আসল বাঙ্গালা গজল। নবম-স, নদীয়া : শেখ মোহাম্মদ জালালুদ্দীন, ১৩২০।
: ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য। নদীয়া : গ্রন্থাকার, ১৩৩২।
: ইসলামী বক্তৃতা। চ-স; নদীয়া : শেখ আজিজুদ্দীন, ১৩৩২।
: ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বিদিগের মন্তব্যে। তৃ-স; নদীয়া : নূরজাহান খাতুন, ১৩১৯।
: পাদ্ মন্‌রো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন। নদীয়া : মোহম্মদ সোলেমান এন্ড ব্রাদার্স, ১৩১৮।
: মেহের-রচিত। কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস ১৩৩৫।
: রদ্দে সত্যধর্ম-নিরূপণ ও হেদাযেতুল কৃষ্টান। নদীয়া : গ্রন্থাকার, ১৩৩২।
: শোকানল। নদীযা : গ্রন্থাকার, ১৩১৬।
: শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন। রাজশাহী : জয়নাল আবেদীন, ১৩২৩।
: হজরত ইসা কে? চ-স; নদীয়া : শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, : ১৩৩৩।
মোহাম্মদ দাদ আলী : আশেকে রসুল, প্রথম খন্ড। নদীয়া : মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ১৩১৪।
: ভাঙ্গাপ্রাণ, প্রথম খন্ড। কলিকাতা : কালিকা যন্ত্র, ১৩১২।
: শান্তিকুঞ্জ। কলিকাতা : মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ১৩২৪।
মোহাম্মদ দানেশ : চাহার দরবেশ। কলিকাতা : আজিজীয়া লাইব্রেরী, ১৩৪৬।
মোহাম্মদ নজিবর রহমান : আনোয়ারা। ত্রয়োবিংশ-স; কলিকাতা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫৬।
: গরীবের মেয়ে। পঞ্চম-স; ঢাকা : ওসমানিয়া বুক ডিপো তা.বি.।
: পরিণাম। দ্বি-স; কলিকাতা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫৫।
: প্রেমের সমাধি। চতুর্দশ-স; ঢাকা : ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৫৭।
: চাঁদ তারা বা হাসন গঙ্গা বাহমণি। চ-স; কলিকাতা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫৮।
মোহম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী : খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া। কলিকাতা : মোহাম্মদ আব্বাছ আলী, ১৩২৬।
: ভারতে মুসলমান-সভ্যতা, প্রথম ভাগ। কলিকাতা : শাহজাহান কোম্পানী, ১৯১৪।
: মহামান্য তুরস্কের সুলতান। কলিকাতা : রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, তা.বি।
মোহাম্মদ মেহেরউল্লা : খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা। তৃ-স; কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস

১৩১৮।
: বিধবাগঞ্জনা। তা.বি.।
মোহাম্মদ মেহেরুল ইসলাম তা.বি. মেহেরুল্লা (হোসেন) : উপদেশমালা। সিরাজগঞ্জ, পাবনা : গ্রন্থাকার, ১৩১৬।
: বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা : গ্রন্থাকার, ১৩১৬।
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা খান : ইসলাম কৌমুদী। খুলনা : গ্রন্থাকার, ১৩২১।
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ : গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, প্রথম ভাগ। কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩০৬।
: গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, দ্বিতীয় ভাগ। কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৫।
: পাক পাঞ্জাতন। কলিকাতা: মনিরুদ্দীন আহমদ, ১৩৩৬।
: হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) এর জীবনচরিত। কলিকাতা : মনিরুদ্দীন আহম্মদ, ১৩৩৪।
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : উন্নত জীবন। পঞ্চম-স; ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৫৫।
: পথহারা, তা.বি।
: প্রকাশ। সিরাজগঞ্জ, পাবনা : শক্তি লাইব্রেী, ১৩২২।
: প্রীতি-উপহার। তৃ-স; কলিকাতা : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯৩০।
: মানবজীবন। দ্বী-স; কলিকাতা : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, তা.বি.।
: রায়হান। কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৩২৬।
রেয়াজ-অল্-দীন আহমদ : সুরিয়া-বিজয়। কলিকাতা : মুন্সী নজমূল হক, ১৩০২।
শেখ আবদুর রহিম : ইসলাম ইতিবৃত্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা : হাতেম আলী খাঁ, ১৩১৭।
: ইসলাম নীতি, প্রথম ভাগ। চ-স ; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৩৩৪।
ইসলাম নীতি, দ্বিতীয় বাগ। ষষ্ঠ-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৩৪০।
খোৎবা। তৃ-স; কলিকাতা : মুখদুমী লাইব্রেরী, ১৩৩৯।
নামাজ-তত্ত্ব। তৃ-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯২৭।
নামাজ-শিক্ষা : এয়োবিংশ মুদ্রণ; কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৫।
প্রণয়-যাত্রী। দ্বি-স; কালকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯২৭।
রোজা-তত্ত্ব। কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯২৮।
: হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি। ষষ্ঠ-স; কলিকাতা ঃ মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯২৬।
শেখ ফজলল করিম : আফগানিস্তানের ইতিহাস। দ্বি-স; ঢাকা : মজিদীয়া লাইব্রেরী ১৯২৭।
: আববাত-উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব। রংপুর : শেখ ওয়াদিদ হোসেন, ১৩০৭।
: তৃষ্ণা। কাকিনা, রংপুর : করিমস লাইব্রেরী, ১৩০৭।
: পথ ও পাথেয়। তৃ-স; কলিকাতা : নবযুগ প্রকাশনী. ১৯৫৪।
: পরিত্রাণ। যশোহর : মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, ১৩১০।
: বিবি খাদিজা। ঢাকা : মজিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯২৭।
: বিবি ফাতেমা। দ্বি-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৪০।
: বিবি রহিমা। চ-স ; কলিকাতা : নূঁর লাইব্রেরী, ১৯৫২।
: মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতি। দ্বি-স: কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৯১৪।

: মানসিংহ। কাকিনা, রংপুর ১৯০৩।
: রাজর্ষি এব্রাহীম। দ্বি-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৪০।
: লায়লী মজনু। ষষ্ঠ-স; কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৩৩৩।
সমছুদ্দিন মহম্মদ ছিদ্দিকি খোন্দেকার : উচিত শ্রবণ। অর্থাৎ পরমার্থিক ভাব। কলিকাতা : বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১৭৮২ শকাব্দ।
: ভাবলাভ, শুরতজান। বর্দ্ধমান : হানিফি যন্ত্র, ১২৬০।
সাদ আলী ও আবদুল ওহাব : শহীদে কারবালা। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৪০।
সাহা গরীবুল্লা- ছৈয়দ হামজা : আমির হামজা। কলিকাতা : গাওছিয়া লাইব্রেরী, ১৩৩৬।
সেখ আজিমদ্দী : কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে। কলিকাতা : জ্ঞানদীপক যন্ত্র, ১২৭৫।
সেখ আবদোস সোবহান : হিন্দু মোসলমান। বিক্রমপুর, ঢাকা : গ্রন্থকার ১৮৮৮।
সেখ ওসমান আলি : আলোকসভা। মেদিনীপুর : মুনশী শেখ খয়রাত আলী, ১৯০৪।
: দেবলা। কলিকাতা : রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, ১৯০১।
: লালচাঁদ। কলিকাতা : মুন্শী আবদুর রহিম, ১৩১৯।
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী : অনলপ্রবাহ। তৃ-স; সিরাজগঞ্জ, পাবনা : সিরাজী লাইব্রেরী, ১৩৬০।
: আদব-কায়দা শিক্ষা। কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯১৪।
: উচ্ছ্বাস। কলিকাতা : নব্য ভারত প্রেস, ১৩১৪।
: তারাবাঈ। দ্বি-স; কলিকাতা : করিম বক্‌স ব্রাদার্স, তা. বি.।
: তুর্কী নারী-জীবন। দ্বি-স, ত্রিপুরা : বজলুর রহমান চৌধুরী, ১৩২৫।
: তুরস্ক-ভ্রমণ, প্রথম খন্ড। কলিকাতা : শাহাজাহান এন্ড কোং, ১৯১৩।
: নূরউদ্দীন। দ্বি-স; কলিকাতা : করিম বক্‌স ব্রাদার্স, তা. বি.।
: ফিরোজা বেগম। কলিকাতা : করিম বক্‌স ব্রাদার্স, তা.বি.।
: রায়নন্দিনী। দ্বি-স; কলিকাতা : করিম বক্‌স ব্রাদার্স, ১৩৩৫।
: সঙ্গীত-সঞ্জীবনী। সিরাজগঞ্জ : গ্রন্থকার, ১৯১৬।
: স্পেনবিজয় কাব্য। দ্বি-স; কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯২০।
: স্ত্রীশিক্ষা। চ-স, ত্রিপুরা : বজলুর রহামান চৌধুরী, ১৩২৩।
: স্বজাতি-প্রেম। কলিকাতা : আলহামরা লাইব্রেরী, ১৯৪৬।
সৈয়দ আবুল হোসেন : জ্ঞানভাণ্ডার। কলিকাতা : সৈয়দ আবুল হাশেম ১৯২৪।
: জীবন্ত পুতুল কাব্য। কলিকাতা : হাসেম, কাসেম এন্ড কোম্পানী, ১৩১৪।
: মোসলেম পতাকা : তারিখুল ইসলাম। কলিকাতা, ১৯২৪।
: যমজ-ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌল্লা উপন্যাস। কলিকাতা : হাসেম কাসেম এন্ড কোম্পানী, ১৩১২।
: সাবিত্রীর সত্যজীবনী। কলিকাতা ১৯২৩।
: স্পেনবিজয়। কলিকাতা, ১৯২৫।
সৈয়দ এমদাদ আলী : ডালি। ঢাকা : এলবার্ট লাইব্রেরী, ১৩১৯।
: তাপসী রাবেয়া। ঢাকা : আবুল খায়ের ছয়েফউদ্দীন ১৩২৪।
সৈয়দ নূরুদ্দীন : দাকায়েকূল হাকায়েক ও রূহনামা মউতনামা। নবপর্যায় প্র-স; কলিকাতা : হবিবী প্রেস ১৩৩৯।
সৈয়দ হামজা : কেচ্ছা মধুমালতী। কলিকাতা : রেয়াজিয়া প্রেস, ১৩০১।

: জৈগুনের পুথি। কলিকাতা : ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৫৫।
: লালমোন। কলিকাতা : তাজমহল বুক ডিপো, ১৩৫৯।
: সোনাভান। কলিকাতা : সোলেমানী প্রেস, ১৩৫৬।
: হাতেম তাই। ঢাকা : হামিদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৫৫।

খ. আলোচিত লেখকদের প্রবন্ধ

অজ্ঞাত : 'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা'। নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।
আফতাবউদ্দীন আহম্মদ : 'হিন্দু লেখক ও মুসলমান সমাজ'। নবনূর, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০।
আবদুল মালেক চৌধুরী ঃ 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান রমণীর স্থান'। আল এসলাম, বৈশাখ ১৩২২।
: 'বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান'। আল এসলাম, আশ্বিন, ১৩১২।
আবদুল্লাহ্ আল মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দী : 'আরবীয় দর্শনালোচনা'। নবনূর, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১০।
আর.এস. হোসেন : 'রসনাপূজা'। নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১১।
আহমদ আলী : 'আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম'। আল এসলাম আশ্বিন, ১৩২২।
একিনউদ্দীন আহমদ : 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ'। নবনূর, আশ্বিন ১৩১২।
'এবনে মাআজ' : 'বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন'। ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫।
এস. এ. আল মুসাভী : 'অবনতি-প্রসঙ্গ'। নবনূর, আশ্বিন ১৩১১।
এস. এম. এ. আহাদ, : 'সম্রাট আওরঙ্গজেব'। *নবনূর,* মাঘ ১৩১০, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩১১।
এসলামাবাদী : 'কোরান ও বিজ্ঞান'। আল এসলাম, ভাদ্র ১৩২০।
: 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান'। নবনূর, ভাদ্র ১৩১১।
: 'মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার'। আল এসলাম, আশ্বিন-ফাল্গুন ১৩২২।
: 'সমাজ-সংস্কার'। আল এসলাম, মাঘ ১৩২৫, ভাদ্র ১৩২৬।
কাজী ইমদাদুল হক : 'আমাদের শিক্ষা'। নবনূর, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১০।
: 'গ্রান্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য'। নবনূর, আশ্বিন ১৩১২।
: 'বিমলা ও হিন্দু সমাজ'। নবনূর, মাঘ ১৩১০।
: 'হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা'। নবনূর, বৈশাখ ১৩১০।
'কেনচিৎ মর্ম্মাহতের হিতকামিনা' : 'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার'। নবনূর, ভাদ্র ১৩১০।
'খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী' : 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা'। অল এসলাম, কার্তিক ১৩২২।
'খয়েরখাহ্ মুনশী' : 'রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান'। নবনূর, ভাদ্র ১৩১২।
খায়রুন্নেসা : 'স্বদেশানুরাগ'। নবনূর, আশ্বিন ১৩১২।
নওসের আলী খান ইউসফজী : 'একেই কি বলে অবনতি'। নবনূর, কার্তিক ১৩১২।
নূরর রহমান খান ইউসফজয়ী : 'ধর্ম্মজীবনের আদর্শ'। কোহিনুর, অগ্রহায়ণ ১৩২২।
ফজলর রহমান খাঁ : 'খলিফাগণের শাসননীতি'। নবনূর, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩১২।
'ভূতপূর্ব্ব সোলতান-প্রতিপালক' : '১৮ মাস-বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেআদবি ও সোলতান-প্রতিপালকের কৈফিয়ৎ'। ইসলাম প্রচারক, আগস্ট ১৯০৫।
মইনুদ্দীন হোসেন : 'কোরআন ও জ্যোতির্বিদ্যা।' আল এসলাম, ভাদ্র ১৩২২।
মীর মশাররফ হোসেন : 'সৎপ্রসঙ্গ'। কোহিনূর, ভাদ্র ১৩০৫।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : 'কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান'। আল এসলাম, শ্রাবণ ১৩২২।

: 'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য সম্মিলনীয় সভাপতির অভিভাষণ'। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৫।
মোহাম্মদ ইসহাক : 'বিশ্বকোষে বসুজ'। নবনুর, আষাঢ় ১৩১১।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ : 'তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ'। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, মাঘ ১৩২৬।
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী : 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য'। কোহিনুর, মাঘ ১৩২২।
মোহাম্মদ কে. চাঁদ : 'কোরআনের বিশুদ্ধতা আলোচনা'। আল এসলাম, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩২৩।
: 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান'। আল এসলাম, ফাল্গুন- চৈত্র ১৩২৩।
মোহাম্মদ হাবিবর রহমান : 'ওসমান ও জগৎ সিংহ'। নবনূর, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা : 'বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান'। নবনূর, কার্তিক ১৩১১।
: 'স্বাধীন আন্দোলন'। নবনূর, কার্তিক ১৩১২।
লেহাজউদ্দীন আহমদ : 'রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান'। নবনূর, আষাঢ় ১৩১২।
'শ্রীত:' : 'হিন্দু-সাহিত্য'। ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩।
'সমাজ- সেবক উচিত বক্তা' : 'বঙ্গসাহিত্যের মুণ্ডপাত'। ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২।
সেখ ওসমান আলী : 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি'। কোহিনুর, ভাদ্র ১৩১৩।
: 'কেন ?' কোহিনুর, বৈশাখ ১৩২২।
: 'শিবাজী উৎসব ও মুসলমান জাতি'। হাফেজ জানুয়ারী ১৮৯৭।
: 'সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র ?' ইসলাম প্রচারক, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫।
: 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়'।
: কোহিনুর, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪।
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী : 'সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন'। নবনূর, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।
: 'সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'। আল এসলাম, আষাঢ ১৩২৩।
সৈয়দ এমদাদ আলী : 'ধর্মযুদ্ধ, গাজী ও জেহাদ'। নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১০।
: 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান'। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৫।
: 'বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে নেতার অভাব'। ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩।
: 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান'। নবনূর, পৌষ ১৩১০।

গ. আলোচিত সাময়িকপত্র

আল এসলাম। কলিকাতা, ১৯১৫-১৮।
ইসলাম প্রচারক। কলিকাতা, ১৮৯৯-১৯০৬।
কোহিনুর। কুমারখালি ও পাংসা, ১৩০৫-১৩২২।
নবনূর। কলিকাতা, ১৯০৩-০৬।
মিহির। কলিকাতা, ১৯০৩-০৬।
মিহির ও সুধাকর। কলিকাতা, ১৩০৬।
লহরী। শান্তিপুর, ১৯০০।
হাফেজ। কলিকাতা, ১৮৯৭।

ঘ. সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল-যুগ। চ-স; কলিকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬১।
অরবিন্দ পোদ্দার : উনবিংশ শতাব্দীর পথিক। কলিকাতা : ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ১৯৫৫।
: বঙ্কিম-মানস। দ্বি-স ; কলিকাতা : ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ১৯৫৫।
আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম (সম্পাদিত) : কাব্য-মালঞ্চ। কলিকাতা : নূর লাইব্রেরী, ১৯৪৫।
আসিরুদ্দীন প্রধান : মেহেরুল্লার জীবনী। জলপাইগুড়ি, ১৯০১।
আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) : দৌলত উজীর বাহরাম খান-রচিত লায়লী মজনু। ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৫৭।
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, দু খণ্ড। কলিকাতা : ওরিয়েন্টা বুক কোম্পানী, ১৩৬৪।
এম. সেরাজুল হক : শিবাজী-চবিত। কলিকাতা : শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।
কাজী আবদুল ওদুদ : বাংলার জাগরণ। কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।
: শাশ্বত বঙ্গ। কলিকাতা : কাজী খুরশীদ বখত, ১৩৫৮।
গোপাল হালদার : বাঙ্গলা সাহিত্যের রূপরেখা, দু খণ্ড। কলিকাতা : এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৩৬১-১৩৬৫।
দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। অষ্টম-স; কলিকাতা : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লি:, ১৩৬৫
(সম্পাদিত) : বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দু খণ্ড। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪।
নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি। দ্বি-স; কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৬১।
নবীনচন্দ্র সেন : পলাশির যুদ্ধ। নতুন-স ; কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৩।
পাকিস্তান পাবলিকেশন : বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য। ঢাকা, ১৯৫৫।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-রচনাবলী, দু খণ্ড। নতুন-স ; কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১।
বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। কলিকাতা : পুস্তক, ১৯৫৬।
: বাঙলার নবজাগৃতি, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা : ইন্টারন্যাশনাল পাবিলিশিং হাউস, ১৩৫৫।
: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, তিন খণ্ড। কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৪-৬৫।
বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী : বিভক্ত ভারত কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।
বিহারীলাল সরকার : তিতুমীর। কলিকাতা : কালিকা যন্ত্র, ১৩০৪।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (সংকলিত) : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দু খণ্ড।
তৃ-স ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬।
ব্রজেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়।
তৃ-স ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫২।
: মীর মশাররফ হোসেন। দ্বি-স ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫০।
(সম্পাদিত) : ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। দ্বি-স ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৭।
ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব-রচনাসম্ভার। নতুন-স ; কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৭।
মযহারুল ইসলাম : কবি পাগলা কানাই। রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯।
মুজাফফর আহমদ : কাজী নজরুল-প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা)। কলিকাতা : বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৫৯।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

১৯৫৬।
মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব। কলিকাতা : মোহসীন এন্ড কোং, ১৯৩৫।
: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৫৭।
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি। কলিকাতা, ১৩৩৭।
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ : মোস্তফা-চরিত। তৃ-স ; কলিকাতা : মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯৩৮।
মোহাম্মদ ইদরিস আলী : মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ। ঢাকা : গ্রন্থকার, ১৩৬৫।
যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬) কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৬।
: বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৮০০-১৯৫৬) কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান। নতুন-স ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৪।
: রাজাপ্রজা। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' দশম খণ্ড। দ্বি-স ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।
: সমূহ। 'রবীন্দ্র রচনাবলী' দশস খণ্ড। দ্বি-স; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।
: সমূহ। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড। দ্বি-স ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।
রাজনারায়ণ বসু : আত্মচবিত। তৃ-স ; কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫২।
রামপ্রসাদ সেন : গ্রন্থাবলী। কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তা. বি.।
শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। নতুন-স ; কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬২।
শেখ হবিবর রহমান : কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা। কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৪।
সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সহিত্য। বর্ধমান : সাহিত্য সভা, ১৩৫৮।
: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। দ্বি-স : কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৫৫।
: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বি-স ; বর্ধমান : সাহিত্য সভা, ১৩৫৬।
হুমায়ুন কবির : বাঙলার কাব্য। দ্বি-স ; কলিকাতা : চতুরঙ্গ, ১৩৬৫।

ঙ. সহায়ক প্রবন্ধ

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী : 'সত্যপীরের পাঁচালী'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯।
আনিসুজ্জামান : 'দুটি পুরোনো বাংলা নাটক'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬।
: 'প্রেমলীলা'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ -শ্রাবণ ১৩৬৫।
: 'মেহেরুল্লা ও জমিরুদ্দীন'। সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৭।
: 'শেখ ফজলল করিম ও তাঁর রচনা'। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৬।
: 'সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্'। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৫।
: 'সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য'। সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৫।
আবদুল কাদির : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ'। মাহে-নও, ভাদ্র ১৩৬৫।
: 'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শাবণ ১৩৬৬।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী : 'জঙ্গনামা'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫।
: 'মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩।
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ : 'ভারতে ওহাবী আন্দোলন'। ইতিহাস, ১৩৬৩-৬৪।
কালীকান্ত বিশ্বাস : 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৮।
কুমুদরঞ্জন মল্লিক : 'ডাক্তার সরকার'। নবনূর, আষাঢ় ১৩১১।
গোলাম সাকলায়েন : 'কবি দাদ আলী'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫।

: 'মোহাম্মদ নজীবর রহমান সাহিত্যরত্ন'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ- চৈত্র ১৩৬৪।
তসলিমুদ্দীন আহমদ : 'পীর, সত্যপীর, পীর বরহক, বড়পীর'। রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২।
নগেন্দ্রনাথ বসু : 'গাজী সাহেবের গান'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩০।
'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০ ; পৌষ ১২৮০।
ব্যোমকেশ মুস্তফী : 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩।
: 'কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩।
মুনীর চৌধুরী : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯।
: 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন'। সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৬।
: 'মীর-মানস'। সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৭।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'পুঁথি সাহিত্যের আদিকবি গরীবুল্লাহ্ শাহ্'। মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৬৯।
: 'সমাজ ও সংস্কারক'। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৪।
: 'সৈয়্যিদ হামজা'। দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩।
মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য : 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১২।
মোহাম্মদ ইদরিস আলী : 'এসলাম তত্ত্ব'। মাহে-নও, মে-জুন ১৯৫৪।
: 'বাজীমাত'। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪।
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ : 'পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহমদ মশহাদী'। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬।
যাদবেশ্বর তর্করত্ন : 'রঙ্গপুরের জাগের গান'। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩১৪।
রাজবিহারী দাস : 'বঙ্গীয় সংবাদপত্র'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'মুসলমান সাহিত্য'। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, ষষ্ঠ সম্ভার, কলিকাতা : শরৎ স্মৃতি-মন্দির, ১৩৬১।
শেখ আবদুর রহমান : 'বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষৎ'। আল এসলাম, পৌষ-মাঘ ১৩২৩।
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল : 'কবি মুহাম্মদ মিরণ ও তাঁহার বাহার দানেশ'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২।
সুরেন্দ্রনাথ সেন : 'ভারতীয় ইতিহাস-বিষয়ক রচনাবলী'। ইতিহাস, ১৩৬৩।

চ. তালিকা-গ্রন্থ

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত পুথি পরিচিতি। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
কেদারনাথ মজুমদার : বাংলা সাময়িক সাহিত্য। ময়মনসিংহ : সাহিত্য কুটির, ১৯১৭।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা। কলিকাতা : তা. বি.।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক পত্র, দু খণ্ড। দ্বি-স ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯।
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় : ১৩২২-এর সাহিত্যপঞ্জিকা। কলিকাতা, ১৩২৩।

ছ. সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ

Andrews, C. F. and Mukerji, Girija. The Rise and Grow:h of the Congress in India. London. : George Allen & Unwin Ltd., 1938.
Anstey, Vera, the Economic Development of India. London: Longmans, Green & co, 1929.
Azad, Abul Kalam, India Wins Freedom, Calcutta : Orient Longmans, 1959.
Banerjea, Surendranath. A Nation in Making. 2nd edn. ; London : oxford University Press, 1925.
Banerji, Brajendranarh. Dawn of New India. Calcutta : M. C. Sarker & Sons. 1927.
Bradley-birt, F. B. Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century. Calcutta : S. K. Lahiri & co., 1910.
Browne, Edward G. A Literary History of Persia, 4 vols. 6th edn. ; Cambridge : University Press. 1956.
: The Persian Revolution of 1905-1909. Cambridge : University Press, 1910.
Chatterji, Suniti Kumar. Origin and Development of Bengali Language part 1. Calcutta : University of Calcutta, 1926.
Datta, Kalikinkar. Alivardi and his Times. Calcutta : University of Calcutta, 1939.
De, Shshil Kumar. A History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825). Calcutta : University of Calcutta, 1939.
Desai, A. R. Social Background of Indian Na:ionalism. 2nd den. : Bombay : Popular Book Depo:, 1954.
Dutt, Romesh. The Economic History of India Under early British Rule. 3rd edn. ; London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1908.
: The Economic History of India in the Victorian Age. 3rd edn.; London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1908.
Farquhar. J. N. Modern Religious movements in India. London : Macmillan & Co., 1924.
Faruqi, Zia-ul Hasan. *:he Deoband School and :he Demand for Pakistan.* Bombay : Asia Publishing House, 1963.
Firminger, Walker Kelly (ed.) *Fifth Report from the selec: Committee of the House of Common on the Affairs of the East India Company.* Vol. II. Calcutta : R. Cambray & Co., 1917.
Ghosh, Jamini Mohan. Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal. Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930.
Gibb, H. A. R. Mohammedanism. 2nd edn. ; '*The Home University Library*' ; London : Oxford University Press, 1950.
Goetz, H. The Crisis of Indian Civilisation in the Eighteenth and early Nineteenth Cenrturies [and] The Genesis of Indian Culture. '*Calcutta University Readership Lectures*' ; Calcutta : University of Calcutta, 1938.
Graham, G. F. I. :he Life and Work of Sir syed Ahmed Khan, 2nd edn. revised;

London : Hodder & Stoughton. 1909.

Hossein, Syed Ameer. A Pamphlet on Mahomedan Education in Bengal. Calcutta : G. C. Bose & Co ; 1880.

Hunter, W. W. The Indian Mussalmans. 3rd edn. ; London ; Trubber and Company, 1876.

: A Statistical Account of Bengal, Vol. IX ; Murshidabad. London : Trubner & Co ; 1876.

Hussain, Mahmud et al (ed.) History of the Freedom Movement, Vol. 1, Karachi ; Pakistan Historical Society, 1957.

Joshi, P. C. (ed.) Rebellion – 1857. New Delhi ; People's Publishing House, 1957.

Karim. A. K. Nazmul. Changing Society in India and Pakistan. Dacca : Oxford University Press, 1956.

Keith, A. Berriedale (ed.) Speeches and Documents on Indian Policy, 1850-1921, 2 Vols. 'The World's Classics' ; London ; Oxford University Press, 1922.

Khan, Syed Ahmed. The cases of the Indian Revolt. trans. Anon. Benares : Medical Hall Press, 1873.

Khan, Seid Gholam Hossein, Seir Mutaqherin, 4 Vols. (1783). English translation, Calcutta : R. Cambray & Co ; 1902.

Khuda Buksh, S. Essays- Indian and Islamic. London : Probsthain & Co ; 1912.

Long, Rev. J. (ed.) Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Behar. Calcutta : Home Secretariat Press, 1868.

Luteef, Abdul., A Short Account of My public life. Calcutta : Newman & Co., 1885.

. A Paper on Mahomedan Education in Bengal. "Transactions of the Bengal Social Science Association" ; Calcutta, 1808.

Mahmood, Syed. A History of English Education in India (1781-1893) Aligarh : M. A. O. College, 1895.

Majumdar, Bimanbehari. *History of Political Thought*. Vol. 1 : 'Bengal', Calcutta : University of Calcutta, 1934.

Majumder, R. C. Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1957.

Majumder. R.C. Raychuduri, H. C. and Datta, K.K. An Advanced History of India, Part III. 2nd edn.; London : Macmillan & Co. Ltd; 1949.

Mallick, A. R. British Policy and the Muslims of Bengal. Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

O'Malley, L. S. S. Midnapore 'Bengal District Gazetteers'; Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1911.

O'Malley. L. S. S. and Chakravarty, Manomohan. *Hooghly*, 'Bengal District Gazetteers', Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1912.

Peterson, J. C. K. Burdwan. 'Bengal District Gazetteers' ; Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1919.
Radhakrishnan, S. et al (ed.) *History of Philosophy – Eastern and Western*, Vol. I. London : George Allen & Unwin Ltd. ; 1952.
Ray, Rammohan, *Works*. Allahabad : The Panini Office, 1906.
Roberts, Field Marshal Lord. *Forty Years in India*. London : Richard Bentley and Son. 1897.
Rubbi, Khondkar Fuzli. *The Origin of the Musalmans of Bengal*. Calcutta; Thacker, Spink & Co., 1895.
Saksena, Rambabu, *A History of Urdu Literature*. Allahabad : Ram Narain Lal, 1940.
Sarkar, Jadunath (ed.) *A History of Bengal*, Vol. II. Dacca : University of Dacca, 1948.
Sen, Amit. Notes on the Bengal Renaissance, Bonbay : People's Publishing House, 1946.
Smith, Wilfred Cantwel, Modern Islam in India. 2nd edn, : London : Victor Gollanzc, 1945.
Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture. Allahabad : the Indian Press Ltd., 1946.
Taylor, James. *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*. Calcutta ; Military Orphan Press, 1839.
Thompson. Edward and Garratt, G. T. Rise and Fulfilment of British Rule in India. 2nd edn. ; London : macmillan & Co. Ltd., 1935.
Titus, Murray T. Indian Islam., 'The Religious Quest of India Series' ; London : Oxford University Press. 1930.
Wyatt. Sir George. *The Commercial Products of India*. London : John Murray, 1908.

জ. সহায়ক ইংরেজী প্রবন্ধ

Ali, A, Yusuf. *'Karamat Al'*. *Encyclopaedia of Islam*. Vol. II. Leiden : E. J. Greill & Co : 1927.
Anonymous. 'A Sketch of the Wahhabis in India down to the death of Sayyid Ahmad in 1831'. *Culcutta Review. Nos.* C (1870). CI (1871). CII (1872).
: 'Early Bengali Literature and Newspapers', *Calcutta Review*, Vol. XIII (1850).
: 'MIscellaneous Notices', *Calcutta Review*. Vol. XIV (1851), Vol. XXIX (1889).
Arnold, T. W. 'India', *Encyclopaedia of Islam*. Vol. II. Leyden : E. J. Breill, 1927.
Asiri, F. M. 'Shah Waliullah', *Visvabharati Annals*. Vol. IV (1951).
Beveridge, H. 'Warren Hastings in Lower Bengal', *Calcutta Review*, October

1877, April 1878, April 1879.

Blochmann, H. 'Notes on some Arabic and Persian Inscriptions in the Hughli District', *Journal of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. XXXIX, XL, XLI, Pts I. (1870-72)

: 'Notes on Places of Historical Interest in the District of Hughli', *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* 1870.

Cotton, J. S. 'Bengali', Encyclopaedia of Islam. Vol. I. Leiden : E. J. Breill & Co ; 1913.

Daman:, G. H. 'Notes on Shah Ismail Ghazi', *Journal of the Asiatic Sociaty of Bangal,* Vol. XLIII, pt. I. (1874).

Goldziher, I. 'Djamal al Din Al Afghani', *Encyclopaedia of Islam.* Vol. I Leiden : E. J. Breill & Co., 1913

Husain, Hidayat. 'Autobiography of Shah Waliullah' (Text and English Translation), *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* N. S. Vol. VIII, No. 4 (April, 1912)

: 'Faraidi sect', Encyclopaedia of Islam. Vol. II. Leiden : E. J. Breill & Co., 1927.

'J.R.C' 'Notices of the Peculiar Tenets held by the followers of Syed Ahmed, taken chiefly from the 'Sirat-ul Mustaqim', a principal Treatise of this sect, written by Moulvi Mohammed Ismail', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. I, No. 1 (November, 1832).

Khan, Mu'inuddin Ahmad. 'Tomb Inscription of Haji Shariat' 'Allah', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan.* Vol. III (1958).

Margolioath, D. S. 'Wahhabiya' *Encyclopaedia of Islam.* Vol. IV, Leiden : E. J. Breill & Co., 1934.

Money, D. 'An Account of the Temple of Triveni, near Hugli', *Journal of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. XVI. pt. I. (1847).

O'Kielay, J. 'Translation of an Arabic Pamphlet on the History and Doctrines of the Wahhabis written by the grandson of Abdul Wahhab, founder of the sect', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. XLIII, pt. II. (1874).

Ray, Benoy Gopal. 'Islam in Modern Bengal', *Visvabharati Quarterly,* Vol. XXI, pt. I (Summer, 1955).

Razzaq, Abdur. 'The Mind of the Educated Middle Class in the Nine-Teenth Century', *New Values.* Vol. IX, No. 2 (1957).

Rehatsak, E. 'The History of the Wahhabys in Arabia and in India', Journal of the Bombay branch of the Asiatic Sociaty. Vol. XIV (1878-80).

Wali, Abdul. 'A Bengali Book written in Persian Script', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* N.S. Vol. XXI (1925).

খ. বিবরণী

Abstract of the Proceedings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta. Calcutta : Mahomedan Literary Society, 1900.
A Quarter Century of the Mahomedan Literary Society of Calcutta. A Resume of its work, from 1864 to 1889. Calcutta : Mohamedan Literary Society, 1889.
Proceedings of an Extraordinary Genaral Meeting of the National Mahomedan Association held on Sunday the 6th February, 1879. Calcutta : National Mahomedan Assoiciation, 1879
The Opinion of the Press and the Resolution of the Bengal Government on the Pamphlet of Syed Ameer Hossein, Khan Bahadur, on Mahomedan Education. Calcutta : D'Rozario & Co , 1882.

ঙ. তালিকা গ্রন্থ

Blumhardt. J. F. Catalogue of the Library of the India office. Vol II, pt. IV : 'Bengali. Oriya and Assamese Books.' London. 1905
: *Catalogue of Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India office.* London : Oxford University Press, 1924.
: *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum.* London. 1884.
: *A Supplementary Catalogue of Bengli Books in the Library of the British Museum.* London. 1910
Blumhardt. J. F. and Wilkinson. J. V. S. *Second Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum.* London. 1939.
Asiatic Society. *Catalogue of Bengali Books in the Library of the Asiatic Society of Bengal.* Calcutta. n. d.
Imperial Library. *Author Catalogue of Printed Books in the Bengali Language,* 2 Yols. Calcutta, 1941-48.
Long. J. *A Descriptive Cataloge of Bengali Works.* Calcutta. 1855.
Rieu. Charles, *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum.* Vol. II. London, 1881.

চ. অপ্রকাশিত গ্রন্থ

Ali, Muhammad Mohar. 'The Bengal Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1853)' Unpublished Ph. D. Thesis, University of London, 1963.